"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

Editor, Sahitya Patrika.

তৃতীয় বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা

বর্ষা ঃ ১৩৬৬

সাহিত্য পত্রিকা

সম্পাদক

মুহম্মদ আবদুল হাই

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে দুবার **প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা** ও সাহিত্য এবং এ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত **গবেষণামূলক লেখা** এতে ছাপা হয়। যাঁরা এ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের রচনা এ পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হবে।

সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য আড়াই টাকা। এর গ্রাহক হতে হলে বার্ষিক চাঁদার টাকা অগ্রিম নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

এজেণ্টদেরকে শতকরা ৩৩'৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়া হবে। দশ কপির কম নিলে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেণ্টদেরকে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হবে। বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো হয় না।

অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
রমনা, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান:

বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার, ঢাকা

নলেজ হোম,
নিউ মার্কেট, ঢাকা

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা

মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও রেনেসাঁস্ প্রিণ্টার্স, ১০, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ-শিল্পী: কাইয়ুম চৌধুরী

সূচীপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে প্রদত্ত
কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-উন্নয়ন তহবিল

তত্ত্বাবধায়ক-সমিতি

সভাপতি :

বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান,
বি.এ., এল-এল. বি, বার-অ্যাট-ল (লণ্ডন),
ভাইস-চ্যান্সেলর।

সদস্যবৃন্দ :

ডক্টর আবদুল হালীম, এম.এ., পি-এইচ. ডি. (ঢাকা),
ডীন, কলা বিভাগ।

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন,
এম.এ. (কলিকাতা), পি-এইচ. ডি (ঢাকা),
ডীন, বিজ্ঞান বিভাগ।

জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই, এম.এ. (ঢাকা ও লণ্ডন),
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ।

জনাব মুনীর চৌধুরী, এম.এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

জনাব আহমদ শরীফ, এম.এ. (ঢাকা),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

সাহিত্য পত্রিকা
তৃতীয় বর্ষ : প্রথম সংখ্যা
বর্ষা, ১৩৬৬

ধ্বনিগুণ

(Sound attributes)

মুহম্মদ আবদুল হাই

ভাষার মূল ধ্বনিতে। তবু ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে ভাষার ব্যবহার করতে গেলে ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়না। প্রত্যেকটি পৃথক ধ্বনি বাক্যের মধ্যে এক প্রাণ হ'য়ে সামগ্রিকতা লাভ করে। গতানুগতিক পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও বিধেয় মূলক কর্তা কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান ক্রিয়া ইত্যাদি কারক বিভক্তি সম্পন্ন ব্যাকরণের আইনকানুন যুক্ত বৃহৎ বাক্যই হোক কিংবা ব্যবহার জীবনের প্রয়োজনানুযায়ী একাক্ষরিক শব্দবিশিষ্ট নেহাত একটি ছোট বাক্যই হোক বাক্যে ব্যবহৃত ধ্বনি মানুষের মুখ নিঃসৃত হ'তে গিয়ে জীবন্ত মানুষের প্রাণের ছোঁয়া পেয়ে নানা ভাবে স্পন্দিত হয়। সেজন্যে বাক্যে ব্যবহৃত ধ্বনির দুটো রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। একটা ভাষার মূলধ্বনিগত তার স্বতন্ত্র রূপ আর একটা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে উত্থিত জীবন্ত মানুষের আবেগানুভূতির স্পর্শ পাওয়া তার সামগ্রিক রূপ। এ দুই রূপে প্রত্যকটি ধ্বনি গুণান্বিত হয়।

সাধারণভাবে প্রত্যেকটি ধ্বনির উচ্চারণের স্থান এবং উচ্চারণের প্রক্রিয়া উক্ত ধ্বনির স্বতন্ত্র রং ও রূপ (tamber)কে অন্যান্য ধ্বনি থেকে বিশিষ্ট ক'রে তোলে। এ যাবৎ ধ্বনির সেই বিচ্ছিন্ন রূপেরই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাতে আমরা দেখেছি উচ্চারণের স্থান বিচার ক'রে একটি ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছ অন্য একটি ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছ থেকে পৃথক হ'য়ে গেছে। আবার এক স্থান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছের প্রত্যেকটিই উচ্চারণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে

প্রত্যেকটি থেকে আলাদা হ'য়ে গেছে। এজন্যে উচ্চারণের স্থান বিচার ক'রে যেমন দুই ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির ওষ্ঠতাকে তাদের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক গুণ ব'লে আমরা মেনে নিয়েছি, ধ্বনির দন্ত্যত্ব, দন্তমূলীয়ত্ব, দন্ত্যৌষ্ঠত্ব, দন্তমূলীয়তালব্যত্ব, এবং পশ্চাৎ তালব্যত্ব প্রভৃতি স্থানবাচক বৈশিষ্ট্য তেমনি ধ্বনির স্থানবাচকতা গুণ নির্ণয়ে আমাদের সাহায্য করেছে। স্থানবাচকতা ধ্বনির পৃথকীকরণ জনিত গুণ নির্ণয়ে সহায়ক হলেও তা ধ্বনিগুণের স্থূলতর দিক উদ্‌ঘাটিত করে। এর তুলনায় উচ্চারণ প্রক্রিয়াজাত গুণ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। তার কারণ এক স্থান জাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রত্যেকটি থেকে পৃথক হ'য়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বর্গীয় ধ্বনিগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক, চ, ট, ত এবং প বর্গীয় যে কোন এক বর্গের একটি ধ্বনি যে উক্তবর্গের আর একটি থেকে আলাদা হয় তা তার ঘোষতা কিংবা অঘোষতার বৈপরীত্যে, মহাপ্রাণতা কিংবা স্বল্পপ্রাণতার বৈশিষ্ট্যে। অঘোষতা, ঘোষতা, স্বল্পপ্রাণতা, মহাপ্রাণতা 'ক', 'গ' 'খ', 'ঘ' প্রভৃতি ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিয়ামক হিসেবে পৃথক ভাবে যেমন এদের প্রত্যেকটির গুণ নির্ণায়ক, তেমনি স্পর্শতা (plosivity), উষ্মতা (friction), স্পৃষ্টঘৃষ্টতা (affrication) পার্শ্বত্ব (laterality), অনুনাসিকত্ব (nasality), তাড়নত্ব (flapness), কাঁপুনি (rolling), প্রভৃতি গুন প্রত্যেকটি ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক। এ সব ধ্বনিগুণের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে কিংবা গোটাছয়েক মিলিতভাবে ধ্বনির নিম্নপর্যায়ে অর্থাৎ বাক্যঅসংলগ্ন ভাষার মূলধ্বনিকে একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করে দেয়। কিন্তু এই বাহ্য।

ধ্বনি বাক্যে ব্যবহৃত হ'লে জীবন্ত মানুষের ব্যবহারিক জীবনের নিত্য প্রয়োজনের তাড়নায় রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, ভালোবাসা, প্রভৃতি অনুভূতির ধারণক্ষম আধার হিসেবে কিংবা ক্ষুৎপিপাসাজনিত মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জৈব জীবনের বাহন হিসেবে ধ্বনিতে জীবন সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে। তখন প্রত্যেকটি ধ্বনিতে তার স্বতন্ত্র রূপের অতিরিক্ত অনির্বচনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। কিসের সাহায্যে এ বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার স্বাদ আমরা পাই? বীণার তারে তারে ঝঙ্কার উঠ্‌লে নানা সুর ধ্বনিত হয় এবং সে সুর অনুরণিত হ'য়ে শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে, মনকে মুগ্ধ করে। মানুষের

মুখনিঃসৃত কথার মধ্যে ধ্বনিতে ধ্বনিতে আঘাত সংঘাতে এমনি শত সুর ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে। সে সুর বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি। তাতে পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের হৃদয়াবেগের কিংবা ব্যবহারিক জীবনের আভাস পরিস্ফুট হয়। তারই সাহায্যে ভাষার মধ্যে মানুষের কণ্ঠধ্বনির তথা জীবনের আভাস পাই। ভাষায় জীবন্ত মানুষের কণ্ঠধ্বনির এ ছাপ কোথাও সূক্ষ্ম, কোথাও স্থূল, কোথাও তীক্ষ্ণ, কোথাও প্রলম্বিত—কোথাও জোরালো, আর কোথাও বা নিস্পন্দ। নদীস্রোতে যেমন নানা তরঙ্গ ওঠে, মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনিতেও তেমনি সেই তরঙ্গেরই লীলা। তা-ই ভাষার ধ্বনিগুণের সূক্ষ্ম ও জটিলতম দিককে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। ধ্বনির এ সূক্ষ্ম সুন্দর সামগ্রিক গুণ একদিকে যেমন অনুভূতি সাপেক্ষ অন্যদিকে তেমনি বিশ্লেষণাতীত। এদিক থেকে সামগ্রিক ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে দৈর্ঘ্য (length), ঝোঁক (stress), শ্রুতিদ্যোতকতা (Prominence), জোর (emphasis), ধ্বনিতরঙ্গ (intonation) প্রভৃতি গুণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমে দৈর্ঘ্যের কথা ধরা যাক। বাক্যের ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে শব্দার্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে কোন অক্ষর (syllable) কিংবা ধ্বনি দীর্ঘায়িত হ'তে পারে। কোনো কথা লিখতে গেলে যেমন একটা হরফের পর আর একটা হরফ আসে সেটাকে পড়তে গেলে প্রত্যেকটি হরফের অন্তর্নিহিত ধ্বনি সময়স্রোতে উন্মুক্ত হ'তে গিয়ে এক সেকেণ্ডের শত ভাগের একভাগ হ'লেও কিছু না কিছু সময় নেয়। এদিক থেকে প্রত্যেকটি ধ্বনিরই (তা স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনি যাই হোক না কেন) duration বা স্থিতিগত একটা দিক আছে। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির স্থিতিজনিত বা পরিমানগত দিক প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। মূলধ্বনি (phoneme) হিসেবে কোনো কোনো ভাষার স্বরের দীর্ঘতা তার হ্রস্বধ্বনির তুলনায় তার কালপরিমানকে বিশেষভাবে স্পষ্ট করে তোলে। প্রসঙ্গক্রমে মূলধ্বনি হিসেবে ইংরেজীর 'feel', 'seed', 'seat' প্রভৃতি শব্দের দীর্ঘ 'i:' (ঈ) এবং 'fool', 'cool' প্রভৃতি শব্দের দীর্ঘ 'u:' (ঊ) র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরেজীতে আভিধানিক পর্যায়ে দীর্ঘ 'i:' এবং দীর্ঘ 'u:' হ্রস্ব 'i' এবং হ্রস্ব 'u' সমন্বিত শব্দকে অর্থের দিক থেকে পৃথক ক'রে দেয়। তুলনীয় 'feel' এবং 'fill', 'fool' এবং 'full' শব্দাবলী।

ধ্বনি (duration)

বাংলা হরফে হ্রস্ব ই এবং ঈ, হ্রস্ব উ এবং দীর্ঘ ঊ আমরা লিখলেও মূলধ্বনি হিসেবে 'ঈ' এবং 'ঊ' এর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ ইংরেজীর মতো বাংলার হ্রস্ব 'ই' এবং 'ঈ' কিংবা হ্রস্ব 'উ' এবং ঊ দিয়ে অন্যান্য ধ্বনি ঠিক রেখে দুটো স্বতন্ত্র শব্দ আমরা পাইনা। বাংলার স্বরধ্বনিতে মূল স্বরধ্বনি হিসেবে হ্রস্ব কিবা দীর্ঘ 'ই' এবং হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ 'উ' এর কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। প্রশ্ন ওঠে শুধু 'ই' জাতীয় একটি ধ্বনির এবং 'উ' জাতীয় আর একটি ধ্বনির। বাংলায় মূলধ্বনি হিসেবে 'ই' এবং 'উ' এর দীর্ঘত্ব কোন স্বতন্ত্র ধ্বনিগুণের সৃষ্টি করে না। তা না করলেও বাংলার 'এ', 'এ্যা,' 'আ', 'অ', 'ও' এবং 'ও' র মতো 'ই' এবং 'উ' এরও পরিমানগত একটা অবস্থিতি আছে। তা-ই তার স্বাতন্ত্র্যগত বৈশিষ্ট্য, তার স্বরূপ, তার 'tamber'। বাক্যে ব্যবহৃত হ'লে প্রয়োজনানুসারে এদের প্রত্যেকটিই নানা মাপজোখের দীর্ঘত্বই গ্রহণ করতে পারে। বাংলা শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণে শেষের সিলেবলের যে কোন স্বরধ্বনির উচ্চারণই সময়ের দিক থেকে দীর্ঘতম আর তার পূর্ববর্তী সিলেবলের স্বরধ্বনিগুলোর দৈর্ঘ্য আপেক্ষিক ভাবে হ্রস্বতা লাভ করে—ফলে শব্দের প্রথম সিলেবলের স্বরধ্বনিই হয় হ্রস্বতম, এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বরধ্বনির এ দীর্ঘত্ব মূলধ্বনিগত নয়। ইংরেজীতে মূলধ্বনি হ্রস্ব 'i' এবং দীর্ঘ 'i:' এর মধ্যে এবং মূলধ্বনি হ্রস্ব 'u' এবং দীর্ঘ 'u:' এর মধ্যে সময় ঘটিত দীর্ঘত্বের যে তফাৎ এখানকার হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের মধ্যে সে তফাৎ নয়। বাংলা বাক্যে হৃদয়াবেগের কিংবা ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ বাহন হিসেবে প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেকটি স্বরধ্বনিই তার মূলধ্বনিগত (Phonemic) স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে অগণিত মাপজোখের (infinite shades of length) দীর্ঘত্বের পরিচয় বহন করতে পারে।

স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য

স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অ-স্পৃষ্ট (non Plosive) ব্যঞ্জনধ্বনির এবং স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব নানা মাপে ছোট বড় করা যায় কিন্তু অস্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির যে দীর্ঘত্ব তা অনায়াসলভ্য ব'লে স্বরধ্বনির বহুভঙ্গিম লীলায়িত রূপেই আমরা বেশী ক'রে মুগ্ধ হই; আর ভাবাবেগের টানাপোড়েনে স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর কিংবা হ্রস্ব হ'তে হ্রস্বতর ক'রে বাগধ্বনির

লীলারস আস্বাদন করি। বাংলাভাষার শব্দ ও সিলেবল গঠনে স্বরধ্বনিই প্রধানভাবে সহায়তা করে—অন্য কথায় স্বরধ্বনিই বাংলা সিলেবল তথা অক্ষরের নিয়ামক (nucleus) ব'লে প্রয়োজনানুযায়ী উক্ত স্বরধ্বনিকে টেনে ছোট বড়ো করা যায়। সে জন্যে কি স্বাভাবিক কথাবার্তায় কিংবা বক্তৃতায়, কি কোন গদ্যাংশের পাঠে কিংবা কবিতার আবৃত্তিতে শব্দান্তর্গত অক্ষরের মাত্রার নির্ভরস্থল স্বরধ্বনিতে হ্রস্বতা কিংবা দীর্ঘত্বের লীলা আস্বাদন-যোগ্য। এভাবে স্বরধ্বনি সময়ের পরিমাণ (duration)গত দিক থেকে মাত্রার নিয়ামক হয় ব'লে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি।

উদাহরণ স্বরূপ দূরত্ববাচক 'ওই' সর্বনামটির বিশ্লেষণ করা যাক। এটি মূলত দ্বিস্বর (dipthong) ধ্বনি। এর সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে প্রথম স্বরধ্বনি 'ও' স্বতন্ত্র কোন 'ও' ধ্বনির তুলনায় সামান্য একটু দীর্ঘ হ'লেও হ'তে পারে। কিন্তু এ শব্দটির সাহায্যে সাধারণ দূরত্ব বোঝাতে গেলে এ দ্বিস্বরধ্বনির প্রথমাংশ 'ও' কে একটু টেনে 'ও-ই' ভাবে ছেড়ে দিলেই চলে। কিন্তু দূরত্বের ব্যবধান যতই বেশী হ'তে যাবে ততই দেখা যাবে 'ও' র দীর্ঘত্বের মাত্রাও ক্রমেই 'ও—ই', 'ও—--ই', 'ও----ই' ভাবে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'য়ে উঠেছে। কোন রূপকথায় এ পরিবেশ (context of situation) ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে দেখা যাবে 'ওই' শব্দের 'ও' ধ্বনি উচ্চারিত হ'তে না হ'তে 'ও----ই' রূপে এমনভাবে দীর্ঘায়িত হ'য়ে উঠেছে যে শেষ পর্যন্ত 'ও' র পর একটানা একটা লম্বমান সুরের রেশ ছাড়া কানে যেন আর কিছুই ভেসে আসতে চায়না। এমনিভাবে সমাজজীবনের অবস্থাবৈচিত্র্যে ভাষায় স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য শেষ পর্য্যন্ত সুরের সূক্ষ্ম পাড়ে পরিণত হ'য়ে যায়।

প্রসঙ্গক্রমে 'আ' স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যের তারতম্যের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পরিবেশটা এরকম ক্ষেত্রে সোহাগের, স্নেহের, আদর আবদার কিংবা প্রেমের হ'তে হবে। বক্তা (speaker) এবং শ্রোতা (hearer) সমাজ জীবনের এমন একটা সুন্দর মুহূর্তের রূপ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে এমন এক মধুর মাহেন্দ্রক্ষণের অবতারণা করেছে যার নিবিড়তম স্বাদ শুধু তারাই উপলব্ধি করতে পারবে; বাইরে থেকে অন্য কারুর পক্ষে তার মাধুর্যের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হবেনা।

এরকম ক্ষেত্রে সমাজ সম্পর্কের (social context) নিতান্ত মামুলি কথাতেও যে কত রস কত স্বাদ এবং কত আনন্দ আছে তার উপভোগের অধিকার এক্ষেত্রে শুধু বক্তা ও শ্রোতারই। ধরা যাক বক্তা এক্ষেত্রে স্ত্রী আর শ্রোতা স্বামী। স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে সাংসারিক সম্পর্কের দাবীতে নয় বরং হৃদয় সম্পর্কের দাবীতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা পাওনা আদায় করতে গিয়ে কিছু টাকাই চেয়ে বসলেন। বললেন, 'দাওনা—দাও' তারপর শুরু হলো আদর ও আবদারের পালা— 'দা-ও', 'দা—ওনা'—, 'দা-া-া- -ও', 'লক্ষ্মী, দা - - - ও!' এক্ষেত্রের 'দ' ধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনি 'আ' হৃদয়াবেগের এবং স্নেহ সোহাগের আধার হিসেবে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর আর সেজন্য মধুর থেকে মধুরতর হ'য়ে উঠবে নাকি? কোনো বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যকে শুধু হ্রস্বের তুলনায় দীর্ঘ 'আ' কিংবা 'প্লুত আ' বলেই কি মুক্তি পাওয়া যাবে? কোনো বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের পরিমাপে কি আর এর দীর্ঘত্ব ধরা যাবে? এ থেকে কি প্রতিপন্ন হয়না যে ভাষা মানুষের হৃদয়ানুভূতিতে সিক্ত ও সমৃদ্ধ হ'য়ে জীবন্ত হয়ে উঠলে তাতে জীবনের রূপ যে কত ভাবে তরঙ্গায়িত হয় তাকে বাইরে থেকে কোনো কিছু দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। ধ্বনিতে জীবনের এ রস সংক্রমণে ধ্বনির যে দৈর্ঘ্য পরিস্ফুট হয় তা তার সামগ্রিক রূপের আর তা-ই ধ্বনির ব্যাখ্যাতীত সামগ্রিক গুণেরও।

স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য যতটা সহজবোধ্য এবং সুস্পষ্ট ভাবে শ্রুতিগ্রাহ্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ততটা নয়। তাই অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য সাধারণ্যে প্রতিভাত হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বল্পতম, শব্দের গোড়াতে তার তুলনায় দীর্ঘতর কিন্তু শব্দের শেষে আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতম। উদাহরণ স্বরূপ 'থাকুক্' (thākuk) এ শব্দটির প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি 'থ', আন্তঃস্বরীয় 'ক' এবং শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জন 'ক্'এর আনুপাতিক দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করলে এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আপাত অমুক্ত ব'লে উচ্চারকেরা তদবস্থায় কিছুক্ষণের জন্যে আটকে থাকে দেখে এর আনুপাতিক দৈর্ঘ্য অনুভব করা যায়। আবার শব্দমধ্যবর্তী অভিনিধান প্রাপ্ত অমুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘতর। তুলনীয় 'উপ্‌টান্',

অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য

'ঝাগ্‌ঝাল', 'চন্‌চন্‌', 'সাত্‌পাঁচ্‌', 'শাক্‌ভাত্‌', প্রভৃতি শব্দ। এ শব্দগুলোর অভিনিধান প্রাপ্ত 'প্‌', 'গ্‌', 'চ্‌', 'ত্‌' 'ক্‌' ধ্বনিগুলোর তুলনায় প্রান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন্‌', 'ল্‌', 'চ্‌', 'ত্‌' আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘতর।

শব্দের শুরুতে 'স্ক', 'স্খ', 'ষ্ট', 'স্ত', 'স্থ', 'স্ন', 'স্প', 'স্ফ', 'স্প্য', 'স্র', 'ক্র'(কৃ), 'খ্র'(খৃ), 'গ্র'(গৃ), 'ঘ্র'(ঘৃ), 'জ্র', 'ট্র', 'ড্র', 'ত্র'(তৃ), 'থ্র', 'দ্র', 'ধ্র'(ধৃ), 'প্র'(পৃ), 'ফ্র', 'ব্র'(বৃ), 'ভ্র' (ভৃ), 'ম্র'(মৃ), 'শ্র'(শৃ), 'ন্র', 'ক্ল', 'গ্ল', 'প্ল', 'ফ্ল', 'ব্ল', 'ম্ল' এবং 'শ্ল'—নিশ্বাসের এক প্রয়াসজাত এই একপ্রাণ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো এ পর্যায়ের অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় দীর্ঘতর কিন্তু শব্দের মাঝখানে যাবতীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির দৈর্ঘ্য যেমন সাধারণ কথাবার্তায় তেমনি ভাষার আলঙ্কারিক ব্যবহারেও অধিকতর শ্রুতিব্যঞ্জক (prominent) সেজন্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির এ দৈর্ঘ্য শব্দের শুরুতে তেমন নয় বরঞ্চ শব্দের মাঝখানেই বিশেষভাবে সুপরিস্ফুট।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির দৈর্ঘ্য

বাংলার শব্দ মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে এ ধরণের তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) 'র' (্র) ও 'ল' ফলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি তথা তরলধ্বনি জাত এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলো যেমন— -ক্র- (আক্রান্ত-আক্‌ক্রান্ত), -কৃ- (আকৃতি-আক্‌কৃতি), -গ্র- (আগ্রহ-আগ্‌গ্রহ), -গৃ- জাগৃতি (জাগ্‌গৃতি), -ঘ্র- (আঘ্রান-আগ্‌ঘ্রান), -ছ্র- (উচ্ছ্রয়), -ছৃ- (উচ্ছৃঙ্খল), -জ্র- (বজ্র-বজ্‌জ্র) -ত্র- (পুত্র-পুত্‌ত্র) তৃ- (পিতৃ-পিত্‌তৃ), -দ্র- (ভদ্র -ভদ্‌দ্র), -দৃ- (আদৃত-আদ্‌দৃত), -ধৃ- (বিধৃত-বিদ্‌ধৃত), -নৃ- (অনৃত-অন্‌নৃত), -প্র- (আপ্রাণ-আপ্‌প্রাণ), -ব্র- (অব্রাহ্মণ-অব্‌ব্রাহ্মণ), -বৃ- (আবৃত্তি-আব্‌বৃত্তি), -ভৃ- (পরভৃত-পরভ্‌ভৃত), -ম্র- (আম্র-আম্‌ম্র), -মৃ- (অমৃত-অম্‌মৃত), -শ্র- (আশ্রয়-আশ্‌শ্রয়)। -ক্ল- (শুক্ল-শুক্‌ক্ল), -প্ল- (আপ্লুত-আপ্‌প্লুত), -ম্ল- (অম্লান-অম্‌ম্লান); (২) দ্বিত্বপ্রাপ্ত (geminated) এ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো যেমন -ক্ক- (পক্ক-পক্‌কো), -ক্‌খ- (সখ্য, সক্‌খো), -গ্‌গ- (ভাগ্য, ভাগ্‌গো), -চ্চ- (উচ্চারণ), -চ্ছ- (আচ্ছা) -জ্জ- (সজ্জা, শয্যা-শজ্‌জা), -জ্ঝ- (সহ্য, সজ্‌ঝো), -ট্ট- (অট্টালিকা) -ড্‌ড- (বড্‌ডো), -ড্‌ঢ- (বুড্‌ঢা), -ত্‌ত- (সত্য-সত্‌তো, উত্তরণ-উত্‌তরণ) -ত্থ- (পথ্য, পত্‌থো), -দ্দ- (মোদ্দা), -দ্ধ- (বুদ্ধি-বুদ্‌ধি), -পপ্‌- (গপ্‌প), -ব্ব-

(সব্‌বাই), -ব্‌ভ- (গব্‌ভো), -শ্‌শ- (আশ্বাস-আশ্‌শাস), -ল্‌ল- (বোল্‌লা), -ল্‌লহ- (আহলাদ-আল্‌লহাদ), -র্‌র- (ছর্‌রা), -র্‌রহ- (বর্হ-বর্‌রহ) -ন্ন- (পান্না), -ন্‌নহ- (বহ্নি-বন্‌নিহ), -ম্‌ম- (সম্মান), -ম্‌মহ (ব্রাহ্মণ-ব্রাম্‌মহণ) ; (৩) এবং শব্দমধ্যবর্তী সমস্থানজাত (homorganic) এ নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো যেমন -ঙ্ক- (ঝঙ্কার), -ঙ্খ- (সংখ্যা), -ঙ্‌গ- (সঙ্গ), -ঙ্ঘ- (সঙ্ঘ), -ঞ্চ- (বঞ্চনা), -ঞ্ছ- (বাঞ্ছা), -ঞ্জ- (সঞ্জাত), -ঞ্ঝ- (ঝঞ্ঝা), -ণ্ট- (বণ্টন), -ণ্ঠ- (লণ্ঠন), -ণ্ড- (আণ্ডা), -ন্ত- (পান্ত), -ন্থ- (পান্থ), -ন্দ- (মন্দ), -ন্ধ- (সন্ধান), -ম্প- (ঝম্প), -ম্ফ- (গুম্ফ), -ম্ব- (গুম্বজ), -ম্ভ- (গম্ভীর),

উল্লিখিত '্র', '্য', ও 'ল' ফলাজাত তরলধ্বনি নিঃসৃত এবং দ্বিত্বপ্রাপ্ত শব্দমধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত (আঘ্রাণ = আগ্‌/ঘ্রাণ, শুক্র = শুক্‌/ক্র, সত্য = সত্‌/তো, আশ্বাস = আশ্‌/শ্বাস প্রভৃতি) শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি দুই অক্ষরে (সিলেবলে) বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে তার প্রথমভাগ পূর্ববর্তী অক্ষর এবং দ্বিতীয় ভাগ পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে মিশে এক প্রাণজাত দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। এ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে উচ্চারিত হয় দেখে তার প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয় (organs of speech)গুলো কিছুক্ষণের জন্য অর্গলবদ্ধ হ'য়ে যায়। সে জন্য সময়ের দিক থেকে এ গুলোর উচ্চারণের কালপরিমাণই বিশেষভাবে দীর্ঘ, অন্তত তার দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় দ্বিগুণ। এ কারণেই বোধ হয় আগের দিনে পুত্র, পত্র প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত পদ্ধতির বানানে এ ধরণের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব রক্ষা করা হতো। এ সব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি দুই অক্ষরে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয় দেখে তার প্রথম ভাগ অর্গলবদ্ধ অমুক্ত উচ্চারণ পায় আর দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্ত্রভাবে দীর্ঘতা লাভ করে ; তার দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় দ্বিগুন হ'য়ে যায়। এ দৈর্ঘ্য যেমন কানেও ধরা পড়ে, kymograph tracingএও তেমনি তার পরিমাপ করা যায়।

শব্দমধ্যবর্তী সমস্থানজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনি সঞ্জাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অনুনাসিক ধ্বনিটি (তুলনীয় ঝঙ্কার = ঝঙ্‌/কার, ঝঞ্ঝনা = ঝন্‌/ঝনা, ঝম্প = ঝম্‌/পো প্রভৃতি শব্দ) র উচ্চারণেও সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রির গুলোর অনুরূপ অবস্থা হয় ব'লে এ পরিবেশে এগুলোর কালপরিমাণও রীতিমতো দীর্ঘ।

ওপরে আলোচ্য শব্দমধ্যবর্তী এ তিন শ্রেণীর সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির কোন্ প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণের কালপরিমাণ দীর্ঘতম তার গাণিতিক হিসাব করা যায় এদের প্রত্যেকটির kymograph tracing নিলে। অনুভূতির সাহায্যে বিচার ক'রে বড্‌ডো, সত্তা গন্ধ, মিথ্যা প্রভৃতি দ্বিত্ব প্রাপ্ত (geminated) ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির কালপরিমাণই আমার কাছে দীর্ঘতম ব'লে মনে হয়েছে।

ভাষা কথা হ'য়ে ফুটে উঠ্‌লে তার অন্তর্নিহিত ধ্বনিগুণ ব্যাখ্যায় যে অসুবিধা, কাব্য সাহিত্যের ব্যঞ্জনা-মাধুর্য্যের ব্যাখ্যা তার চেয়েও কঠিনতর। তবু মানুষের প্রায়াসের শেষ নেই। অধরাকে ধরবার জন্যে, অনির্বচনীয়কে বচনে বিন্যস্ত ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করবার জন্যে সমালোচনার সৃষ্টি। কবিতার যে ছন্দ—আলোচনা তাও এ প্রয়াসজাত। বাংলা কবিতার মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির লীলা উপলব্ধির জন্যে মাত্রাবিন্যাসের আয়োজন করা হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব স্বর, হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর এবং দ্বৈতস্বরধ্বনির প্রথম স্বরে দুই মাত্রা ধরা হয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনুরূপ ক্ষেত্রে শব্দশেষে সর্বদা দুই মাত্রা, শব্দমধ্যে কিংবা শব্দের শুরুতে সচরাচর একমাত্রা ক্ষেত্রবিশেষ দু'মাত্রা এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে এসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই একমাত্রা, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন হ'লে দু'মাত্রা ধরা হয়। মাত্রা ত ধ্বনির দৈর্ঘ্যের পরিমাপ সময়ের গোনাগুন্‌তির হিসেবে তার নিম্নতম unit বা একক। এসব ক্ষেত্রে এক মাত্রা না ধ'রে দু মাত্রাই বা ধরা হয় কেন আবার দুয়ের অধিক মাত্রাই বা ধরা হয় না কেন?

বাংলা কবিতার মাত্রার কালপরিমাণ

সংস্কৃতের ছন্দ Quantitative, কিন্তু বাংলার মতো এক দুই মাত্রায় তার শেষ নয়। প্রয়োজনানুসারে মাত্রার ভগ্নাংশেরও সেখানে স্বীকৃতি আছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে বাংলায় মাত্রার ভগ্নাংশ স্বীকার করা যে যায় না তা নয়। কবিতার চরণের প্রত্যেকটি সিলেবল্‌ই যে হিসাবমাফিক এক কিংবা দুই মাত্রার ছাঁদে মেপে পড়া হয় তাও নয়। হয়তো যেটি দু'মাত্রার অক্ষর সেটিকে অন্য একটি দু'মাত্রার অক্ষরের তুলনায় কিছু বেশী কিংবা কম সময়ে পড়া হয় কিন্তু হিসেবের দিক থেকে পুরো একমাত্রাকে ভেঙে তার ভগ্নাংশ স্বীকার করতে গেলেই অনাবশ্যক

জটিলতার সৃষ্টি হয়। সেজন্যে পড়ার ওপর নির্ভর ক'রে শ্রুতি বিচারে এক এবং দু'মাত্রার অক্ষরই বাংলা ছন্দের পূর্ণতার গতি নিয়ামক হ'য়ে রয়েছে।

বাংলা ছন্দের বিভিন্ন নামকরণ এবং বৈচিত্র্য সবটাই নির্ভর করছে হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরের মাপের ওপর। তা সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর হওয়ার জন্যেই হোক, কিংবা অসংযুক্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব স্বরই হোক কিংবা দ্বৈত (diphthong) স্বরের শেষ স্বরধ্বনিটির ব্যঞ্জনাত্মিক (consonantal) ব্যবহারের জন্যই হোক সর্বত্র এক নীতিই ক্রিয়া করে। এ ধরণের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরে টেনে পড়ার অবকাশ থাকে ব'লে তার পড়ার ওপর নির্ভর করে ছন্দ বৈচিত্র্য সাধিত হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এরকম ক্ষেত্রে হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিজনিত বদ্ধাক্ষর তথা closed syllableকে মুক্ত বা open syllableএর তুলনায় বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে পড়া হয় বলেই বদ্ধাক্ষরের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে দু'মাত্রা ধরা হয় আর মুক্তাক্ষরের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে একমাত্রা ধরা হয়। অক্ষরবৃত্তে পড়ার ভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে এসব ক্ষেত্রে কোথাও একমাত্রা ধরা হয় কিন্তু ছড়ার ছন্দ স্বরবৃত্তে এক মাত্রা ধরা হয়। এসব ক্ষেত্রে মাত্রার যে হিসাব তা সর্বত্রই স্বরধ্বনি কেন্দ্রিক। এ হিসাবে ব্যঞ্জনধ্বনিকে তেমন আমল দেওয়া হয়না। তার মানে কি এই যে কবিতায় ব্যঞ্জনধ্বনির কোনো duration নেই? মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিতে কবিতায় ব্যঞ্জনধ্বনি কি কোনো কাজেই আসে না?

বাংলায় স্বরধ্বনি syllable তথা অক্ষর গঠন করে দেখে open syllable বা মুক্তাক্ষরে (তুলনীয় আ, ও, খা, যা, বা, কি, কে, রো প্রভৃতি) স্বরধ্বনিই যেমন time marker বা মাত্রার ধারক হয় তেমনি closed syllable বা বদ্ধাক্ষরে [তুলনীয় কাজ্, কাম্, জয়্, বুদ্ধি (বুদ্ধি), পত্ত্র (পত্র), ছায়্, ওই্ প্রভৃতি] শেষের ধ্বনি ব্যঞ্জনাত্মিক হওয়ার জন্যে তার পূর্ব স্বরই মাত্রাবাহক বা time marker রূপে পরিগণিত হয়। সময়ের দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনির duration থাকা সত্ত্বেও মুক্তাক্ষরে ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী স্বরধ্বনির এবং বদ্ধাক্ষরে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির duration ছোট বড়ো হয়ে কানে বিশেষভাবে ধরা পড়ে। একারণেই মনে হয় ধ্বনির duration বা অবস্থিতি সবটাই যেন স্বরধ্বনির; ব্যঞ্জনধ্বনির যেন কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক বিচারে কিন্তু এর সবটুকু সত্য নয়। ব্যঞ্জনধ্বনির অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি স-ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। সুতরাং সময়ের দিক থেকে ব্যঞ্জন-

ধ্বনিরও যে duration আছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। ব্যঞ্জনধ্বনির duration ঘটিত length স্বাভাবিক কথাবার্তায় কিংবা কবিতার ভাষায় বিশেষভাবে কানে ধরা পড়ে শব্দমধ্যবর্তী এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটির প্রথমভাগে— -'ক্র'-, -'(কৃ)'-, -'গ্র'-, -'(গৃ)'-, -'খ্র'-, -'ছ্র'-, -'ছৃ'-, -'জ্র'-, -'ত্র'-, -'(তৃ)'-, -'দ্র'-, -'(দৃ)'-, -'ধৃ'-, 'নৃ', -'প্র'-, -'ব্র'-, -'(বৃ)'-, -'ভৃ'-, -'ম্র'-, -'(মৃ)', -'শ্র'-, -'ক্ল'-, -'প্ল'-, -'ম্ল' ;-

কবিতায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির দৈর্ঘ্য

দ্বিত্বপ্রাপ্ত এ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটিতে— -'ক্ক'-, -'ক্‌খ'-, -'গ্‌গ'-, -'চ্‌চ'-, -'চ্ছ্‌'-, -'জ্জ্‌'-, -'জ্ঝ', -'ট্ট'-, -'ড্ড'-, -'ড্‌ঢ'-, -'ত্‌ত'-, -'ত্‌থ', -'দ্দ'-, 'দ্‌ধ'-, -'প্‌প'-, -'ব্ব'-, -'ব্‌ভ'-, -'শ্‌শ';, -'ল্‌ল্‌', -'ল্‌লহ্‌'-, -'র্‌র'-, -'র্‌রহ্‌', -'ন্ন'-, -'ন্‌নহ্‌'-, -'স্ম'-, -'ম্‌মহ্‌'- এবং সমস্থানজাত এ নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথম নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে যেমন— -'ঙ্ক'-, -'ঙ্খ'-, -'ঙ্গ'-, -'ঙ্ঘ'-, -'ঞ্চ'-, -'ঞ্ছ'-, -'ঞ্জ'-, -'ঞ্ঝ'-, -'ন্ট'-, -'ণ্ঠ'-, -'ণ্ড'-, -'ন্ত'-, -'ন্থ'-, -'ন্দ'-, -'ন্ধ'-, -'ম্প'-, 'ম্ফ'-, -'ম্ব'-, -'ম্ভ'- এবং শব্দান্তর্গত দুই স্বরধ্বনির পাশাপাশি অবস্থিত অভিনিধানপ্রাপ্ত অমুক্ত প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটিতে। যেমন— -ক্‌ত- (ভক্ত), -দ্‌গ- (উদ্‌গার), -প্‌ত- (তপ্ত), -ক্‌দ- (বাকদত্ত) জাতীয় ধ্বনি সমন্বিত শব্দে।

এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটিতে দৈর্ঘ্য যে এদের উচ্চারণ প্রতিক্রিয়াজাত তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কবিতা আবৃত্তির সময়ে প্রতিটি ধ্বনি সাধারণ কথার তুলনায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তিত হয় আর সংযুক্তব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয় রুদ্ধাবস্থায় থেকে তাদের উচ্চারণকে সুস্পষ্টতর করে তোলে দেখে কবিতায় এসব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির কালপরিমাণজনিত দৈর্ঘ্য স্ফুটতর হয়ে ওঠে।

শব্দমধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম স্পর্শধ্বনিটির দৈর্ঘ্য তার পরবর্তী ধ্বনিটির তুলনায় যে দ্বিগুণ তা যেমন অনুভূতি সাপেক্ষ তেমনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরীক্ষিত। কিন্তু দ্বিত্বপ্রাপ্ত অ-স্পৃষ্ট (যেমন শ, স, র, ল, ন, ম, ঙ প্রভৃতি) ধ্বনির উচ্চারকদের সন্নিহিত অবস্থায় বাতাস বের হয়ে গেলেও তাদের উচ্চারকরা তদ্‌গত অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করে দেখে তাদের প্রথমটির দৈর্ঘ্যও পরবর্তীটির তুলনায় দ্বিগুণের কাছাকাছি।

শব্দমধ্যবর্তী এ ধরণের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি যেমন তার পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে দীর্ঘ—অনেকক্ষেত্রেই যেমন দ্বিগুণ—তেমনি শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনিও শব্দের অন্যত্র অবস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘ। বাক্, থাকুক্, মাপ্, শরম্, নানান্ প্রভৃতি শব্দের শেষ হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ অনুভব করার প্রয়াস পেলেই একথার যাথার্থ উপলব্ধি করা যাবে।

সাধারণ কথাবার্তায় বাংলা ধ্বনির এ সবক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যজনিত আনুপাতিক যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণে কিংবা গদ্যের পঠন পাঠনেও বলাবাহুল্য তা অক্ষুন্ন থাকে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক—

(আমি) বসুধা বক্ষে | আগ্নেয়াদ্রি | বাড়ব্-বহ্নি | কালানল্ ০ ০
(আমি) পাতালে মাতাল্। অগ্নি পাথার্ | কলরোল্-কল | কোলাহল্ ০ ০

(ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—নজরুল ইসলাম)

ব্রাহ্মণ যুবা | যবনে মিলেছে | পবন্ মিলেছে | বহ্নি সাথে ০
এ কোন্ বিধাতা | বজ্র ধরেছে | নব সৃষ্টির্ | প্রলয়্ রাতে ০

(ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—মোহিতলাল)

পঞ্চশরে | দগ্ধ ক'রে | করেছ একী | সন্ন্যাসী ০
বিশ্বময়্ | দিয়েছ তারে | ছড়ায়ে ০ ০
ব্যাকুলতর | বেদনা তার | বাতাসে উঠে | নিশ্বাসি ০
অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে ০ ০

(পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—রবীন্দ্রনাথ)

(আজ) সংকেত | শংকিতা | বন বীথি | কায়

(কত) কুলবধূ | ছিঁড়ে শাড়ি | কুলের কা | টায়

(চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত—নজরুল ইসলাম)

পরক্ষণে ভূমি পরে
জানু পাতি' বসি | নির্বাক্ বিস্ময়্ ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু | পুষ্প শরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে | পূজা উপচার
তূণ শূন্য করি। | নিরস্ত্র মদন্ পানে
চাহিল সুন্দরী শান্ত | প্রসন্ন বয়ানে ॥

(অক্ষরবৃত্ত—রবীন্দ্রনাথ)

রাজশক্তি | বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারক্ত রাগ্ সম | তন্দ্রাতলে হয়্ হোক্ লীন্,
কেবল্ একটি দীর্ঘশ্বাস।
নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে | সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।

(প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত—রবীন্দ্রনাথ)

উপরি উদ্ধৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে 'বক্ষে', 'অগ্রেয়াদ্রি', 'অগ্নি', 'ব্রাহ্মণ', 'বহ্নি',

'বজ্র', 'স্থির', 'পঙ্ক', 'দক্ষ', 'সন্ন্যাসী', 'বিশ্বময়', 'নিশ্বাসি', 'অশ্রু' প্রভৃতি শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বর এবং 'কালানল্', 'কোলাহল্', 'পবন্' 'প্রলয়', 'তার' 'সংকেত' 'শংকিতা' 'বীথিকায়', 'কুলের' প্রভৃতি হলন্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর ছন্দের হিসেবে দু'মাত্রার এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 'পরক্ষণে'র 'ক্ষ' ধ্বনির পূর্বস্বর, 'বিস্ময়'র 'স্ম'য়ের 'পুষ্প'র 'ষ্প'র 'সমর্পিল' এর 'র্প'র, 'পদপ্রান্তের' 'প্র'র, 'শূন্য'র 'ন্য'র, 'নিঃস্বর' 'স্বর, 'শক্তির' 'ক্তর' 'বজ্র' এর 'জ্র'র, 'নিত্য'র 'ত্য'র, 'উচ্ছ্বসিত' এর 'চ্ছ্ব' প্রভৃতির ধ্বনির পূর্বস্বর ছন্দের হিসাবে একমাত্রার হলেও যথারীতি আবৃত্তির সময়ে কান সজাগ ক'রে রাখলে দেখা যাবে এ সব ধ্বনির পূর্বস্বরের দৈর্ঘ্য দুই কিংবা এক মাত্রার যেমনিই হোক না কেন এ দৈর্ঘ্য যতটা না স্বরভিত্তিক তার চেয়েও বেশী ক'রে এ সব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম ধ্বনি কিংবা হলন্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি ভিত্তিক। এ সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে উচ্চারকেরা কিছুক্ষণের জন্য আটকে গিয়ে তাদের ওপরে আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যের আরোপ করে। এ ধরণের ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারকদের আটকে দিয়ে যথাযথ উচ্চারণ করতে পারলে তাদের অন্তর্নিহিত ধ্বনির ঐশ্বর্য ও গাম্ভীর্যের স্বাদ পাওয়া যায়। এ ভাবে ধ্বনির পূর্বাপর ঝঙ্কারে কবিতায় 'ধ্বনিরাত্মা সর্বস্ব' অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি হয়। উৎকৃষ্ট কবিতা-সৃষ্টিতে যদিও বা ধ্বনিই একমাত্র উপকরণ নয় তবু ধ্বনির উদাত্ত গম্ভীর ও মনোহর ব্যঞ্জনাগুণই এ ভাবে পাঠক ও শ্রোতার চিত্তে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রস' এর উদ্রেক করে। এ জন্যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা ধ্বনি বা 'নাদকে' ব্রহ্মনামে অভিহিত করেছেন এবং ধ্বনিগুণের এ রসানন্দকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রস' ব'লে আখ্যা দিয়েছেন।

দৈর্ঘ্যের মতো stressও ধ্বনিকে গুণময় করে। ধ্বনির নানাগুণে বাকপ্রবাহ গুণান্বিত হয়। বাকপ্রবাহের অন্যান্যগুণ থেকে ধ্বনিসংশ্লিষ্ট শ্বাসক্ষেপনের জোরটুকুকে কোন ক্রমে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে যা পাওয়া যায় তাকেই stress বা aceent নামে অভিহিত করা যায়। বাংলায় stress কে

ঝোঁক : stress

ঝোঁক, প্রস্বন, প্রচাপন, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করার বিবিধ প্রয়াস করা হয়েছে। ধ্বনি বা অক্ষরের (syllable) প্রচাপন গুণ যত না শ্রুতিগ্রাহ্য তার চেয়েও বেশী ক'রে বক্তার সক্রিয় প্রয়াসজাত (—a subjective activity of the speaker)। সেজন্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট শব্দ কিংবা শব্দাক্ষর উচ্চারণ করার সময় তার পরিমাণ অনুযায়ী বক্তারও চোখমুখের ভঙ্গী বিকৃত হয় এবং তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও প্রবলভাবে আলোড়িত হ'য়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট ধ্বনি, অক্ষর ও শব্দ উচ্চারণে বক্তার শ্বাসক্ষেপনের বেগ বা চাপ এ জন্যে অনুভূতির তারতম্য অনুসারে লঘু গুরুরূপ লাভ করে।

ইংরেজীতে ˈincrease (ˈinkriːs,n), inˈcrease (inˈkriːs,v), ˈimport (ˈimpoːt,n), imˈport (imˈpoːt,v), ˈpresent (ˈpreznt,n) preˈsent (priˈzent, v) ˈinsult (ˈinsʌlt,n), inˈsult (inˈsʌlt,v) প্রভৃতি এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায় যেখানে একই শব্দে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন অর্থ হ'তে দেখি। ইংরেজী, জার্মান, স্পেনীয়, গ্রীক এবং সোয়াহিলী প্রভৃতি ভাষায় বিচ্ছিন্ন শব্দাবলীতে (words in isolation) এ ধরণের শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের সাহায্যে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং পৃথক পৃথক শব্দে শ্বাসাঘাতের বহুল প্রচলন থাকায় এগুলোকে 'stress language' বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ভাষা বলা হয়।

বাক্যে পার্শ্ববর্তী শব্দ কিংবা শব্দাবলীর তুলনায় কোনো শব্দের অর্থে আবেগের গভীরতা কিংবা কোন বৈপরীত্য (contrast) সৃষ্টির জন্যে সাধারণত শ্বাসাঘাতের ব্যবহার হয়। বাক্যের বৃহত্তর প্রয়োজনে সেজন্যে শব্দের নির্ধারিত শ্বাসাঘাত কখনও লুপ্ত হয়, কখনও স্থান পরিবর্তন করে আর কখনও বা অক্ষুন্ন থাকে। ইংরেজীর মতো বাংলা Stress বা শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষা নয়। এমন কি বাংলায় একই শব্দে শ্বাসাঘাতের স্থানপরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন অর্থ উদ্রিক্ত করার অবকাশও নেই। সে জন্যে জাপানী, হিন্দুস্থানী মারাঠী প্রভৃতি ভাষার মতো বাংলাকে Stressless language তথা শ্বাসাঘাতহীন ভাষা বলা হয়। শব্দের মধ্যে stressএর অবকাশ থাক বা না থাক শ্বাসাঘাতহীন ভাষাগুলোতে যে তাই ব'লে শ্বাসাঘাতের কোন

অবকাশ নেই, তা সত্য নয়। এ ধরণের ভাষায় শব্দের নিজস্ব শ্বাসাঘাত না থাকলেও বাক্যে জীবন্ত অনুভূতির দ্যোতক হিসেবে কোন না কোন শব্দের বিশেষ ধ্বনি কিংবা অক্ষরে নিশ্বাসের কোন না কোন প্রকারের আপেক্ষিক গুরুত্ব জনিত চাপ না প'ড়ে পারেনা। এ চাপটুকুই তাকে তার পার্শ্ববর্তী অন্য ধ্বনি ও শব্দাংশের তুলনায় বিশিষ্ট ও অধিকতর শ্রুতিব্যঞ্জক ক'রে তোলে। এ রকম পরিবেশেই বিশেষ কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হবার পূর্বে যেমন ছিল তার তুলনায় বাক্যের ভেতরে অনেকটা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে এবং মূল অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নার্থ বাচক কিছু পরিস্ফুট না ক'রে তুললেও আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত কোন রূপকার্থ প্রকাশ করে কিংবা ব্যক্তিহৃদয়ের জীবন্ত স্পর্শ পেয়ে গভীরতা লাভ করে। তুলনীয় 'তুমি যাও' এ বাক্যটির সাধারণ উচ্চারণ। বক্তা স্বাভাবিক ভাবে এ কথাটি উচ্চারণ করলে শ্রোতার সহজ ভাবে চ'লে যাবার কথাই বোঝাবে কিন্তু বক্তা ক্রোধান্বিত অবস্থায় সেই মুহূর্তে শ্রোতার উপস্থিতি সেখানে অবাঞ্ছিত মনে ক'রে যদি উগ্রভাবে এ বাক্যটি উচ্চারণ করে তা হ'লে তার কণ্ঠ স্বরের জোরের সঙ্গে সমস্ত শরীরের ভারও গিয়ে পড়বে 'যাও' শব্দটির প্রথম ধ্বনি 'যা'র ওপর। ফলে ধ্বনিটি শুধু যে প্রচাপিতই হবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনি 'আ'-ও পার্শ্ববর্তী স্বরধ্বনিগুলোর তুলনায় প্রলম্বিত হ'য়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত 'যাও' এর তুলনায় এ 'যা—ও'কে বিশেষিত ক'রে তুলবে। এ ভাবে আগের ও পরের 'যাও' মূলত এক শব্দ হওয়া সত্ত্বেও আবেগের তারতম্যজানিত এ দু'রকম উচ্চারণে তারা দু'টি ভিন্ন শব্দ হয়ে উঠবে।

পূর্ববাংলার আঞ্চলিক উচ্চারণে শব্দের শ্বাসাঘাত দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিম বাংলার অঞ্চলবিশেষে বিশেষ ক'রে কলকাতার শ্যামবাজারী standard dialect ভাষীদের মুখে শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাতের প্রচলন আছে। এ শ্বাসাঘাত প্রবল না হলেও খুব যে দুর্বল তাও নয়। 'মাথা, 'হাত, 'মনোরঞ্জন এবং এ ধরণের অগনিত শব্দের উচ্চারণ খেয়াল করে শুনলে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। বাংলা শব্দের আদ্যক্ষরের এ ঝোঁক যত না রীতির শাসনানুগ তারও চেয়ে বেশী কথা বলার সূচনাজনিত প্রয়াস বা impetusজাত। স্বতন্ত্র শব্দের এ ধরণের ঝোঁক বাক্যের মধ্যে লুপ্ত হ'তে

পারে কিংবা ভাবঅর্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে কোন শব্দেই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শব্দের তুলনায় বেশী চাপ খেয়ে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' এ প্রশ্ন বোধক বাক্যটীর তিনটি শব্দের প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করলে তাদের পরবর্তী অক্ষরগুলোর তুলনায় প্রথম অক্ষরে আপেক্ষিক শ্বাসাঘাত লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু এ বাক্যে স্বাভাবিক প্রশ্নবোধক উচ্চারণে প্রথম শব্দদুটির তুলনায় তৃতীয় শব্দ 'যাচ্ছ' এর 'যাচ' এর ওপরে ঝোঁকটা বেশী পড়ে।

ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হবে যে বাংলা ইংরেজীর মত stress language না হলেও অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক পৃথক ইংরেজী শব্দের যে ধরণের stress ব্যবহৃত হয় বাংলা শব্দে সে রকম stress ব্যবহৃত না হলেও এবং একই ইংরেজী শব্দে stress এর স্থান বদল হলে শব্দগত দিক থেকে তার যেমন দু'টো অর্থ হয় (তুং 'Present এবং Pre'sent ইত্যাদি) বাংলাতে সে ধরণের stress না থাকলেও বাংলা একেবারে stress বর্জিত ভাষা নয়। জীবন্ত ভাষা হিসেবে কোন ভাষা সম্পূর্ণ stress বর্জিত হ'তে পারে কিনা তা গবেষণা সাপেক্ষ। মানুষের মুখে ভাষা কথা হ'য়ে উঠ্‌লে, অর্থাৎ জীবন্ত মানুষের হৃদয়ের জারক রসে ভাষা রঞ্জিত হতে গেলেই তা নিছক একটানা স্রোতময় হ'য়ে বেরুতে পারেনা—তার উত্থান পতন থাকবেই। এ উত্থানপতনই ধ্বনির তরঙ্গমালা। এ তরঙ্গ আবেগের দোলায়, প্রেম প্রীতির অনুভূতিতে, ক্রোধ ও হিংসা দ্বেষের গ্লানিতে নানাভাবে উঁচুনীচু গতিময় হ'য়ে ওঠে। মুখনিঃসৃত কথার প্রকাশভঙ্গীর সেই পার্থক্য ভাষার শব্দাবলীর কোনটাকে জোরের সঙ্গে, কোনটাকে ধীরমন্থর গতিতে কোনটাকে দীর্ঘায়িত ক'রে আর কোনটাকে ঝটিতে বের ক'রে দেয়। তাতেই শব্দাবলীতে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে শব্দার্থও অপরূপ ব্যঞ্জনা লাভ করে। মানুষের মুখনিঃসৃত বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোন শব্দ এ কারণে শ্রুতিব্যঞ্জনার দিক থেকে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে।

শব্দ ও শব্দের অক্ষর বিশেষের এ প্রাধান্য সংঘটিত হয় ভাষাবিশেষে নিছক stressএর সাহায্যে কিংবা lengthএর সাহায্যে, আবার ভাষাবিশেষে stress ও length উভয়ের সাহায্যেই। বাংলাভাষায় আবেগের প্রকম্পনজনিত ভাবানুভূতির প্রাধান্য ও তারতম্য কিংবা শব্দার্থের বৈপরীত্য সৃষ্টি

হয় নিছক stress বা ঝোঁকের সাহায্যে ততটা নয় যতটা উভয়ের মিলিত দ্যোতনায়। উদাহরণ স্বরূপ বাংলা 'অদ্ভুত' কিংবা 'প্রকাণ্ড' এর যে কোন একটি শব্দের বিশ্লেষণই এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট হবে। কমপক্ষে দুজন মানুষ না হলে কথার মাধ্যমে সমাজ জীবনের কোন পরিবেশই সৃষ্টি করা যায় না। তাতে একজন কথা বলে আর একজন শোনে। এ ধরণের পরিবেশবিশেষে বক্তা যদি শ্রোতাকে লক্ষ্য ক'রে তার বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে 'প্রকাণ্ড' শব্দটি উচ্চারণ করে তাহ'লে তার অর্থ একটা statement বা বর্ণনার মতো শোনাবে কিন্তু 'প্রকাণ্ড' শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষর (syllable) 'কা' শুরু হ'তে না হ'তে তার ওপরে যদি তার নিশ্বাসের কিছু বেশী চাপ পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে 'ক' এর সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির 'আ' যদি 'প্রকা - - -ণ্ড'! ভাবে তার অনুভূতি প্রকাশের বাহন হিসেবে যথারীতি প্রলম্বিত হ'য়ে যায় তা হলে সেখানে কি আমরা বক্তার অনুভূতি লব্ধ বিস্ময়বোধের সঙ্গে পরিচিত হবোনা? দুবারে দুধরণের উচ্চারণে 'প্রকাণ্ড' শব্দটির মূলধ্বনি কয়টির (প্-র্-অ-ক্-আ ণ্-ড্-অ) পরিবর্তন হয়নি অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় বারের দ্বিতীয় সিলেবলের উচ্চারণের তারতম্য অর্থাৎ প্রথম বারে সেখানে stress এবং length বর্জিত উচ্চারণ এবং দ্বিতীয় বারের ঝোঁক ও দৈর্ঘ্যসমন্বিত উচ্চারণ শব্দটিতে দুটি অর্থের আরোপ করেছে। 'বালা' (bālā) এবং 'মালা' (mālā) শব্দ দুটিতে তিনটি ধ্বনি ā, l এবং ā একই অথচ প্রথমধ্বনি দুটি 'ব' (b) এবং 'ম' (m) ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে আমরা স্বতন্ত্র অর্থবোধক দুটি শব্দ পাচ্ছি। এ কারণেই 'ব' এবং 'ম' দুটো মূলধ্বনি বা স্বতন্ত্র phoneme।

Secondary Phoneme : অতিরিক্ত ধ্বনিমূল

'প্রকাণ্ড' শব্দটির এ ক্ষেত্রে দুই রকম উচ্চারণে দ্বিতীয়বারের ঝোঁক ও দৈর্ঘ্য তার ওপরে স্বতন্ত্র অর্থের আরোপ করায় এ ঝোঁক ও দৈর্ঘ্যও এখানে একরকম 'phoneme' এর কাজ করছে। বাংলাতে এ কারণে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দার্থের বিশ্লেষণে stress কিংবা length পৃথক ভাবে কিংবা একত্রে Secondary phoneme তথা অতিরিক্ত 'ধ্বনিমূল' হিসেবে গ্রহণযোগ্য। 'Every word used in a new context is a new word' এ কালের ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা এ কথা যে জোরের সঙ্গে বলেন তার যাথার্থ্য তাঁরা খুঁজে পান stress, length, emphasis

প্রভৃতি ধ্বনিগুণের সাহায্যে। বাংলা বাগধ্বনি প্রবাহের শব্দার্থের বিশ্লেষণে এবং তার সৌন্দর্য উদঘাটনে ধ্বনির attributes বা গুণগত দিক থেকে stress, length, emphasis ও intonation এরও আমাদের ভাষায় তাই আশ্চর্য স্বীকৃতি দেখতে পাই।

এখানেই intonation* বা ধ্বনিতরঙ্গের কথা আসে। বাংলায় ধ্বনি তরঙ্গের প্রকারভেদ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। প্রসঙ্গত কলমুখরিত নদীস্রোতের সঙ্গে ভাষার ধ্বনি তরঙ্গের তুলনা ক'রে এ আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। নদীতে কোন

Intonation
ধ্বনিতরঙ্গ

আলোড়নের সৃষ্টি না হ'লে নদীর পানি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সমতল ভূমির মতো যেমন সটান ঘুমিয়ে থাকে, মানুষের মুখে কথা হ'য়ে ফুটে না উঠলে ভাষা আছে কি নেই তেমনি তার অস্তিত্বও উপলব্ধি করা যায় না। কোন কারণে একটু আলোড়িত হ'লে নদীর পানিতে যেমন অগণিত ছোট বড়ো স্পন্দনের সৃষ্টি হয় তেমনি মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই হোক কিংবা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশের বাহক হিসেবেই হোক মানুষের মুখনিঃসৃত হ'তে গেলেই ভাষা নিস্তরঙ্গ থাকতে পারেনা। তাতে দোলা লাগে। একটানা নিশ্বাসের সাহায্যে শব্দগুলো লেখ্যপংক্তির মতো কিংবা বলাকার শ্রেণীর মতো লম্বমান রেখা টেনে এগিয়ে যায় না। নিশ্বাসের ভাঙাচোরায়, ভাবের ওঠানামায় শব্দগুলোও তরঙ্গিত হ'য়ে এগিয়ে চলে। বাক প্রবাহের এ স্পন্দনই ভাষার প্রাণ, তার জীবন্ত (anima-voce) রূপ। সে জন্যে ভাষা জীবন্ত মানুষেরই। মৃত মানুষের কোন ভাষা নেই। তাই জীবন্ত মানুষের ভাষায় নিশ্বাসের কিংবা ভাবাবেগের নিয়মিত ওঠানামাজনিত সমমাপের ব্যবধান তথা rhythm বা ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়। সমমাপের তরঙ্গায়িত এ ব্যবধান অন্যকথায় rhythm বা ছন্দস্পন্দই বাকস্রোতকে প্রাণবন্ত ক'রে ধ্বনিতরঙ্গ বা intonation এর সৃষ্টি করে।

যে কোন একটি বাক্যে কোন একটি শব্দ বা অক্ষর বিশেষের ওপরে

---

* "Intonation is the term given to the rise and fall in the pitch of the voice in speech. Change in pitch is due to differing rates of vibration of the vocal cords" The Phonetics of English Ida Ward 1944. p 169

তার পার্শ্ববর্তী শব্দ বা অক্ষরের তুলনায় আপেক্ষিক জোর (emphasis, weight), ঝোঁক, কিংবা দৈর্ঘ্যের আরোপ সেই বাক্যে নানা ধরণের ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ 'ও খেয়েছে' এই একটি ছোট বাক্যই বিশ্লেষণ করা যাক :—

(১) ও খেয়েচে।

এ বাক্যের দু'টো শব্দে চারটি অক্ষর (syllable) আছে। মাঝামাঝি স্বরগ্রামে প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরটি আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় শব্দের তিনটি সিলেবলকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে যদি নামিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করা হয় তা'হলে 'ও খেয়েছে' (ওর খাওয়া হয়েছে) এ সংবাদ পরিবেশন ছাড়া এতে আর কিছু পরিস্ফুট হবেনা।

(২) ও 'খে—য়েচে।

এবারের উচ্চারণে দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরে চাপদিয়ে তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিকে প্রলম্বিত ক'রে শেষের অক্ষর দুটিকে হাল্কাভাবে ছেড়ে দিলে তাতে যে ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি হবে তার ফলে বক্তার বর্ণিত ব্যক্তির খাওয়া যে সুনিশ্চিত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবেনা। (তার শ্রোতার মনে আলোচ্য ব্যক্তিটির খাওয়া সম্পর্কে কিছু সন্দেহ ছিল)

(৩) আর শ্রোতাটির মনে কোন সন্দেহ থাকলে কিংবা তার খাওয়া তার বিশেষভাবে কাম্য হলে এবং এ বিষয়ে বক্তাকে বারবার প্রশ্ন করলে বক্তা তার সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে বারবার বলার জন্য নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে এ বাক্যটির যে উচ্চারণ করবে তাতে

ও 'খেয়েচে—।

এ রূপ নেবে। এতে দ্বিতীয় অক্ষরটি দ্রুত ঝোঁকের সঙ্গে আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যযুক্ত হবে, তৃতীয় অক্ষর সঙ্কুচিত হবে আর শেষ অক্ষর 'চে' হবে প্রলম্বিত।

(৪) 'ও খেয়েচে।

এ বাক্যের এ ধরণের উচ্চারণে প্রথম অক্ষরে বক্তার ফুস্‌ফুস্‌ নিঃসৃত বাতাসের চাপ এবং তার সামান্য প্রলম্বন আর দ্বিতীয় শব্দের অক্ষর তিনটির আপেক্ষিক নিম্নগামিতা এমন একটি ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে যাতে শ্রোতার 'ওনয় বরং অন্য কেউ খেয়েছে'—এ বিশ্বাস ও সন্দেহের হয়েছে সম্যক নিরসন। আলোচ্য ব্যক্তিটির প্রতি শ্রোতার বিশ্বাস ভাঙতে এবং তার মনের সন্দেহ নিরসন করতে বক্তাকে 'ও' অক্ষরটির ওপরে তার কিছু নিঃশ্বাসজনিত প্রাণশক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে।

তার শ্রোতার এ ধরণের উক্তিতেও যদি সন্দেহের নিরসন না হয় তাহ'লে ক্রমেই বক্তার ক্রোধের মাত্রা বাড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে 'ও'র ওপরে তার ঝোঁকের আর তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যের মাত্রা বাড়তে থাকবে। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে এ ধরণের কথা কাটাকাটির অবতারণা অন্যান্য দর্শক ও শ্রোতার জন্যে বিশেষ উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়। এ উক্তির সত্যতা পাঠকেরা যাচাই ক'রে দেখতে পারেন।

(৫) ও খেয়েচে ?

প্রশ্নবোধক এ উক্তিটিতে বক্তাই এবারে ওদের আলোচ্য ব্যক্তিটির খাওয়া না খাওয়া সম্পর্কে হয়েছে সন্দিহান। তার শ্রোতার কাছ থেকে এবারে সে জবাব চায়—হয় হাঁ বোধক কিংবা না বোধক। এবারে বাক্যটির দ্বিতীয় অক্ষরে সামান্য ঝোঁক, তৃতীয় অক্ষরের সঙ্কোচন আর চতুর্থ অক্ষরের শেষে এবং ওপরের দিকে উত্থান—সবমিলে এমনই এক ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করেছে যা ওপরে বর্ণিত চারটি থেকে একে স্বতন্ত্র ক'রে দিয়েছে।

(৬) ও খেয়েচে !

এবারের উচ্চারণে এতে যে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে তাতে প্রকাশ পাচ্ছে বক্তার বিস্ময়। প্রথম অক্ষরটি মাঝামাঝি স্বরগ্রামে শুরু হয়ে পরের

তিনটিতে ক্রমেই নীচে নেমে গেছে। আর চতুর্থ অক্ষরটি হঠাৎ নেমে গিয়ে শেষ হবার পূর্বমুহূর্তে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীকে ওপরে ওঠাবার জন্য যেন ধাক্কা দিয়ে গেছে। ধ্বনিতরঙ্গের এ রূপটি বক্তার মনে শুধুই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে, কোন দুঃখ বা ক্রোধ নয়।

(৭) ও খে'য়েচে !!
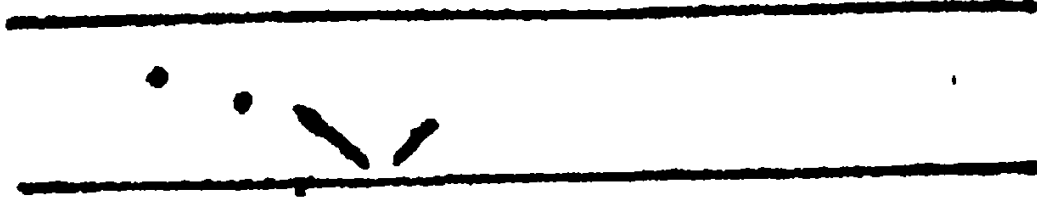
এ ভাবের উচ্চারণে অর্থাৎ তৃতীয় অক্ষরটিতে নিশ্বাসের দ্রুত চাপদিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই শেষ অক্ষরকে শুরু ক'রে ওপরের দিকে তার গতিকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর করলে বিস্ময়ের সঙ্গে বক্তার ক্রোধও প্রকটিত হবে। ও যদি সত্যি সত্যি খেয়েই থাকে তবে বক্তা যেন এবারে তাকে দেখে নেবার প্রতিজ্ঞা করছে।

(৮) ও 'খেয়েচে
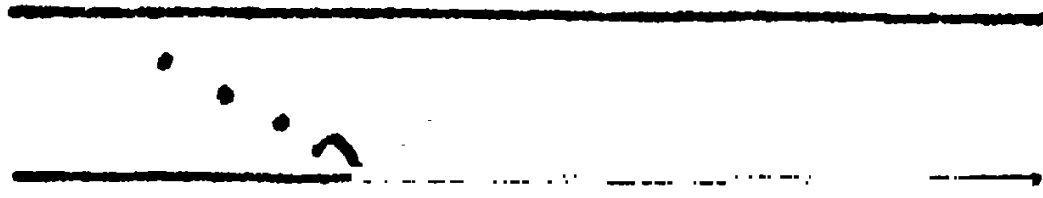
এ উক্তিতে অপূর্ব এক ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। স্বরতরঙ্গ এখানে প্রথম অক্ষরটির মাঝামাঝি স্বরগ্রামে সৃষ্টি হয়ে দ্রুত নেমে আসতে লেগে শেষ অক্ষরে যেখানে শেষ হচ্ছিল সেখানে ঝটিতে খাঁজে নেমে গিয়ে তাকে শেষ না হতে দিয়ে রীতিমতো ওপরের দিকে টেনে তুলেছে। ধ্বনি প্রবাহের এ ছন্দস্পন্দে বক্তা যেন তার শ্রোতার কাছ থেকে আলোচ্য ব্যক্তিটির খাওয়ার সংবাদে তার আগ্রহের অবসান হওয়ায় বিশেষ ভাবে আনন্দিত হয়েছে। বাক্যটির এ ধ্বনিতরঙ্গে এমন একটি পরিবেশের কথা চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেখানে রুগ্ন ও মরণাপন্ন ছেলে কি মেয়ের পরিচর্যারত মা ও বাবাকে দেখা যাচ্ছে। রোগী খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ডাক্তার বলে গেছেন যদি কোন একটি পথ্য রোগী খেতে পারে তা হ'লে এ যাত্রা সে রক্ষা পাবে। মা রোগীর শিয়রে দণ্ডায়মান। বাবা কোথাও গিয়েছিলেন অন্য কোন তদ্বিরে। ফিরতে একটু দেরী হয়েছে। ফিরতে না ফিরতে সন্তান সেবারতা স্ত্রীর কাছ থেকে তাঁদের সন্তানের পথ্যটুকু খাওয়ার সংবাদ তিনি পেলেন। এ সংবাদে মা বাবা উভয়ের চেহারায় আশার আলো দেখা যাবে না কি?

(৯) 'ও খে—য়ে—চে
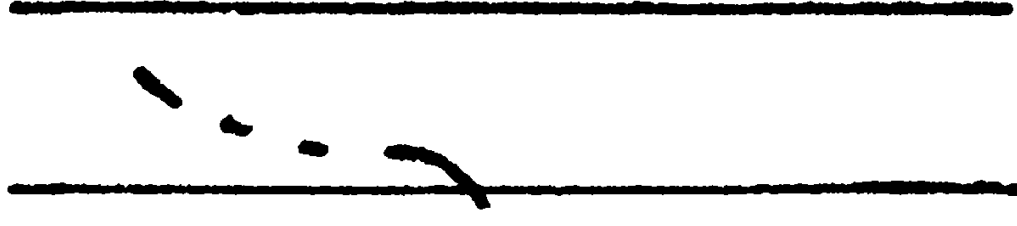
এ ভাবে প্রথম অক্ষরে একটু ঝোঁক দিয়ে পরবর্তী অক্ষরগুলিকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিয়ে শেষটিতে সামান্য একটু তরঙ্গ তুলে তাকে নামিয়ে দিলে যে ধ্বনি প্রবাহের সৃষ্টি হবে সেটাতে বক্তার আবদারের ও অভিযোগের সুর শোনা যাবে। এ রকম একটা পরিবেশের কথা স্মরণ করা যাক যেখানে দুভাই কিংবা দুবোন (দুবোনের উদাহরণই অধিকতর প্রযোজ্য) একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছিল। মা দুটো সন্দেশ রেখেছিলেন দুজনের জন্যে। স্কুলে যাবার সময় তাদের বলে দিয়েছিলেন ফিরে এসে দুজনেই যেন খায়। তাদের মধ্যে একজন কিছু আগে এসে দুটো সন্দেশই খেয়ে ফেলে। আর একজন কিছু পরে ফিরে এসে সন্দেশ খেতে গিয়ে দেখে যদি একটুও তার থাকত! মাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন 'তোমার ছোট বোনটি আগে এসে খেয়ে ফেলেছে।' এ সংবাদে বড় বোনের রাগ হওয়ায় কথা ছিল। কিন্তু ছোট বোনের প্রতি তার প্রসন্ন দৃষ্টি ও স্নেহের প্রকাশ মার প্রতি এ ধ্বনিতরঙ্গে এমনি ভাবে ভেঙে পড়েছে—''ও খে—য়ে—চে।' 'তাতো হ'বেই ওতো তোমার সুয়ো মেয়ে ওকেতো প্রশ্রয় দেবেই,—তা ভালো, কি আর করা!'

(১০) ও খে 'য়ে—চে

এখানে প্রথম অক্ষরটি মাঝামাঝি স্বরগ্রামে শুরু হ'য়ে দ্বিতীয় শব্দের তিনটি অক্ষরের প্রথমটিতে দ্রুত নেমে গিয়ে দ্বিতীয় অক্ষরে আবার প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর যে স্বরগ্রামে শুরু হয়েছিল সেখানে উঠে গিয়ে তৃতীয় অক্ষরে নীচের দিকে ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িত হয়ে গিয়েছে। ফলে এমন এক ছন্দস্পন্দময় ধ্বনিতরঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে যাতে শ্রোতার ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে। মনে হচ্ছে বক্তার মুখ ভেঙ্‌চে শ্রোতা যেন জোরের সঙ্গে বলতে চায় 'ও কিছুতে খায়নি, সে নিজে খেয়ে 'ও'র ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়।

উদাহরণ আর বাড়ানোর প্রয়োজন করেনা। এ বাক্যটির ধ্বনিতরঙ্গের আরও রকমফের করলে আরও নানা ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হতে পারে এবং প্রত্যেক বারই ছোট্ট এ বাক্যটুকু থেকে স্বতন্ত্র অর্থ নির্গত হ'তে পারে।

অবশ্য মানুষের মুখের ভাষার ধ্বনি তরঙ্গ এ কারণেই ঝোঁক ও দৈর্ঘ্যের মতো অতিরিক্ত ধ্বনিমূল (Secondory phoneme) এর পর্যায়ভুক্ত। বাংলাভাষায় intonation বা ধ্বনিতরঙ্গের ব্যবহারিক রূপ থেকে এ সত্যের সমর্থন পাই।

pitchও ধ্বনিগুণের পর্যায়ভুক্ত। কথার 'tone' বা স্বরগ্রামের অবস্থানের অন্য নাম pitch, সংস্কৃতে উদাত্ত (high) অনুদাত্ত (low) এবং স্বরিত (mid) স্বরগ্রামের ব্যবহার রয়েছে। কথা শুরু করা কিংবা কোন লেখ্য বিষয় পাঠ করার সময় স্বরগ্রামের কোন্ পর্যায়ে কোন শব্দ বা অক্ষর আরম্ভ করা হচ্ছে—উচুঁপিচ্ বা 'high tone' এ, নীচুঁপিচ্ বা 'low tone' না মধ্যপিচ বা 'level tone' এ—গানের মীড়ের মতো কণ্ঠ স্বরের ওঠানামা জনিত অবস্থানের সেই মাপই 'pitch'। এ মাপ ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টিতে যে বিশেষভাবে সহায়তা করে ওপরের আলোচনা থেকে আশাকরি তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

Pitch :
পীচ

বাঙালীর মুখনিঃসৃত ভাষা কাবিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে তাতে ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত, শ্রুতিব্যঞ্জকতা, অর্থের প্রাধান্য, স্বরগ্রামের অবস্থিতি, ছন্দস্পন্দ প্রভৃতি গুণের অতিরিক্ত শব্দঝঙ্কারজনিত আরও কতকগুলো ধ্বনিগুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ গুলোও ধ্বনিকে নানাভাবে স্পন্দিত ক'রে সুদূর সঞ্চারী ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। ধ্বনিগুণের সামগ্রিক মাধুর্য ব্যাখ্যায় কোন্ উপাদান বিশেষভাবে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া ধ্বনি তাত্ত্বিকদের পক্ষেও কম শক্ত নয়। বাক্‌প্রবাহে কোথায় কোন্ গুণ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে ধ্বনি তাত্ত্বিক তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন কিন্তু গুণে গুণে মিলিত হ'য়ে ভাষায় যে নিরুপম ব্যঞ্জনা-ঝঙ্কার, ও রসমাধুর্যের সৃষ্টি হয় তা কোন একটি বিশেষগুণজাত নয়। সেখানে stress, quantity (length-shortness),: duration, prominence, pitch, rhythm ও intonation প্রভৃতি যাবতীয় গুণই—"all playing together like a chime of bells—are concordant and not quarrelsome elements in the harmony" sweetness and attributes of a langnage. এমন হ'লে মানুষের মুখের কথা এবং কবিতার ভাষা একাকার হ'য়ে যায়। বাংলাভাষার ধ্বনি মাধুর্যের আবিষ্কারের ব্যাপারেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

শেখ ফজলল করিম ও তাঁর রচনা

আনিসুজ্জামান

মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭—১৯১২) পদাঙ্ক অনুসরণ করে যেসব বাঙালী মুসলমান আধুনিক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গদ্যলেখক হিসেবে মোজাম্মেল হক (১৮৬০—১৯৩৩) ও লিরিক কবি হিসেবে কায়কোবাদ (আ° ১৮৫৮—১৯৫২) বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিছুকাল পর আমরা আর দু জন সুপরিচিত লেখকের সাক্ষাৎ পাইঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০—১৯৩১) ও শেখ ফজলল করিম[১] (১৮৮২—১৯৩৬)। মোজাম্মেল হকের মতো এঁরাও গদ্য ও পদ্য দুইই রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর মতো এঁরাও প্রধানতঃ গদ্যলেখক। ইসমাইল হোসেন ও ফজলল করিম উভয়েই আবাল্য সাহিত্যচর্চা করেছেনঃ একজন প্রথম কবিতা রচনা করেন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে,[২] অন্যজন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় একটা গোটা কবিতার বইই প্রণয়ন করে ফেলেন[৩]। তবে — এজন্যে নয়, রচনাকুশলতার দিক দিয়ে— ফজলল করিমের দাবী বোধহয় ইসমাইল হোসেনের ওপরে।

১। তাঁর প্রথম যুগের বইগুলোতে নামের বানান ছিলঃ সেখ ফজলল করিম (তৃষ্ণা, মানসিংহ), পরে তা হয়ঃ শেখ ফজলল করিম (ছামীতত্ত্ব, পরিত্রাণ ইত্যাদি)। একটি বইয়ের আখ্যাপত্রে পাইঃ শেখ ফজলুল করিম, যদিও ভূমিকার নীচে স্বাক্ষর আছেঃ শেখ ফজলল করিম (আফগানিস্থানের ইতিহাস)। তাঁর কোন কোন বইয়ের সাম্প্রতিক সংস্করণে নাম আছেঃ শেখ ফজলল করীম (বিবি রহিমা, তৃ-স; পথ ও পাথেয়, দ্বি-স)। অধিকাংশ বইয়ের বানান অনুযায়ী এখানেও শেখ ফজলল করিম লিখিত হল।

২। এম. সিরাজুল হকঃ শিরাজী-চরিত (কলিকাতাঃ শিরাজী লাইব্রেরী, ১৯৩৫)।

৩। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬), পৃ ১৯৪।

শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ, কাব্যরত্নাকর (বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ এসব উপাধি তিনি নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন) -এর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও আমাদের ধারণা শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ। আমরা কেবল জানি যে, রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে আমিরউল্লাহ্ সরদারের ঔরসে ও কোকিলা বিবির গর্ভে তাঁর জন্ম হয়[৪] —১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে[৫]। কাকিনায় পাঠদ্দশায় তাঁর কবিত্বের বিকাশ হয়।[৬] নানা পত্রপত্রিকায় তিনি রচনা প্রকাশ করতে থাকেন এবং গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩১৫ সালে কাকিনা থেকে 'বাসনা' নামে একটি মাসিকপত্র তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়[৭] এবং দু বছর সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হয়[৮]। 'জনজম' ও 'কল্লোলিনী' নামে আরো দুটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়। আমি তাঁর আঠারোটি প্রকাশিত বইয়ের খোঁজ পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে তাঁর মোট গ্রন্থসংখ্যা বলা হয়েছে ছাব্বিশ, অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো।[৯] ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে,[১০] মতান্তরে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে,[১১] তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

শেখ ফজলল করিম যেকালে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, সেকালে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে দুটি চিন্তা রীতিমতো স্থানলাভ করেছে : ধর্মসম্প্রদায়

৪। ঐ, পৃ ১৯৩।

৫। আশরাফ সিদ্দিকী : "মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে শেখ ফজলুল করিমের শোক গাথা", মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৬২। এই তারিখ তিনি পেয়েছেন ফজলল করিমের অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিতে। এই আত্মজীবনীটি এখনো প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানিনা

৬। হাই ও আহসান : পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৪।

৭। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় : সাহিত্য পঞ্জিকা (কলিকাতা, ১৩২২), পৃ ১৪৭।

৮। ঐ, পৃ ১০৬।

৯। হাই ও আহসান : পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৪।

১০। আশরাফ সিদ্দিকী : পূর্বোক্ত। কবির আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে এই তারিখ তিনি পেয়েছেন।

১১। 'বিবি রহিমা'র তৃতীয় সংস্করণের (১৯৩৯) বিজ্ঞাপনে প্রকাশকের নিবেদন।

হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্যবোধ আর বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে সসঙ্কোচ সচেতনতা। সেইসঙ্গে ভবিষ্যতে উন্নতিলাভ সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট আশাবাদী চেতনাও গড়ে উঠছিল। ফজলল করিমের ব্যক্তিগত পরিবেশের দিকে তাকালে আমরা গভীর সুফী প্রভাব লক্ষ্য করি। বংশানুক্রমে তাঁরা ছিলেন চিশতিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পীরদের মুরীদ। সুফী ভাবধারাপুষ্ট পীরবাদ তাঁর আন্তরিক সমর্থনও লাভ করেছিল। 'পথ ও পাথেয়'র অবতরণিকায় তিনি তাই বলেছেন:

> ক্ষুধা যেমন অকাট্য সত্য হইয়া দুর্নিরীক্ষ, বিধাতাও তেমনি সত্য অন্তরঙ্গ হইয়াও দুর্দর্শ। তাঁহাকে অনুভব করিবার, হৃদয়ে ধরিবার জন্য জীবন ধারাটিকে কিরূপে সজ্জিত করিতে হইবে, মানুষ মাত্রেরই তাহা শিক্ষা করা উচিত।
>
> এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের আশ্রয় লইতে হয়।......এ পথের "গাইড"—গুরু ব্যতীত পথ চলা সাধারণতঃ অসম্ভব।

সুফীমতের একটি মূলকথা এখানে তিনি বলেছেন। এর মধ্যে আমরা যেন দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর (মৃত্যু ১১১১ খৃষ্টাব্দ) উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই:

> ...the disciple [*murid*] must of necessity have recourse to a director [*shaikh*, or in persian *pir*] to guide him aright. For the way of the faith is obscure, but the devil's ways are many and patent, and he who has no shaikh to guide him will be led by the devil into his ways. Wherefore the disciple must cling to his shaikh as a blind man on the edge of a river clings to his leader, confiding himself to him entirely, opposing him in no matter whatsoever, and binding himself to follow him absolutely. Let him know that the advantage he gains from the error of his shaikh if he should err, is greater than the advantage he gains from his own rightness, if he should be right.[১২]

বংশগতভাবে সংক্রামিত এই সুফী ভাবধারা তাঁর সাহিত্যসাধনাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে।

১২। quoted in H. A. R. Gibb: Mohammedanism (2nd ed., London: Oxford University Press, 1950), pp 150-51.

এর উপরে, মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র (১৮৬১-১৯০৭) প্রভাবও তাঁর জীবনে কার্যকরী ছিল। মেহেরুল্লাহ্‌ অবশ্য শরীয়তপন্থী ছিলেন এবং শরিয়তপন্থীদের সঙ্গে সুফীবাদীদের মত ও পথের ব্যবধান যত বড়ই হোক না কেন, মেহেরুল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ ইসলাম প্রচার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। আর ফজলল করিমের মধ্যে মেহেরুল্লাহ্‌ দেখেছিলেন এক সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক প্রতিভা। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা খুব সুলভ ছিল না বলে তাঁকে উৎসাহিত করা তিনি কর্তব্য মনে করেছিলেন। ফজলল করিমের সর্বপ্রধান কাব্যগ্রন্থ 'পরিত্রাণ' যখন চরম রক্ষণশীল মুসলমানদের নিন্দার বিষয় হয়েছিল, তখন মেহেরুল্লাহ্‌র আগ্রহাতিশয্যেই সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

অতএব, ইসলামের প্রতি গভীর নিষ্ঠাই যে ফজলল করিমের জীবনে প্রধান উপাদান হিসেবে দেখা দেবে, তা স্বাভাবিক। তবে সে ইসলাম যে বিশেষভাবে পারস্যের তত্ত্বচিন্তার লক্ষণাক্রান্ত, এতেও কোন সন্দেহ নেই।

দুই

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই শেখ ফজলল করিম সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম বই 'সরল পদ্য বিকাশ' রচনাকালে তিনি ছিলেন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।[১৩] পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রের হাতে বিকশিত পদ্য যত সরলই হোক না কেন, সাহিত্য-আলোচনায় তাকে টেনে না আনাই ভাল। বইটি ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল কিনা, জানি না। কারণ, ১৩০৭ সালে প্রকাশিত 'তৃষ্ণা' কাব্যকে তাঁর প্রথম গ্রন্থ বলা হয়েছে ঐ কাব্যের ভূমিকায়। প্রকাশক জানাচ্ছেন ঃ

> তরুণ কবির কএকটী ক্ষুদ্র ভক্তি সঙ্গীত প্রকাশিত হইল, তাঁহার দীর্ঘ সাহিত্য সেবার ফল—কবিতাগুচ্ছ—সময়ান্তরে "শেফালিকা" নামে প্রকাশিত হইবে, আপাততঃ সংবাদপত্রিকায় মুদ্রিত হইতেছে, আশা করি তদ্দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের অল্লাধিক উপকার হইতে পারে।...বর্ত্তমান পুস্তক তাঁহার প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়াস মাত্র।...

১৩। হাই ও আহসান ঃ পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৪

ক্রাউন ১/৮ মাপের চব্বিশ পৃষ্ঠার এই চটি বইটিতে (দাম তিন আনা) সতেরোটি গীতিকবিতা সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি সাধক মনস্থরের কবিতার অনুবাদ। সুফী কবিতার মতো এই রচনাগুলোয়ও স্রষ্টাকে প্রেমিকারূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভূমিকায় 'ভক্তিসঙ্গীত' কথাটির উল্লেখ না থাকলে অবশ্য রূপকের প্রতি কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হত না এবং এগুলোকে আবেগ-প্রবণ প্রেমের কবিতা বলে মনে করতে কোন বাধা হত না। উদাহরণস্বরূপ 'কেন যাও?' কবিতাটি থেকে উদ্ধৃত করা যাকঃ

দূরে কেন যাও সরি
আমি যে পরাণে মরি
তা তুমি কি এতদিনে জানিয়াও জান না,
এ হৃদয় কার তরে?
যা দিয়েছি তা তোমারে
অনর্থক হৃদিবনে দাবানল জেল না। [পৃ ৭]

'সমাধি-সঙ্গীত' কবিতাটি অল্পবয়সের ভাবালুতার পরিচায়ক। আঠারো বৎসর বয়স্ক লেখকের 'দীর্ঘ সাহিত্যচর্চা'র একটি মাত্র সুফল আমরা 'তৃষ্ণা' কাব্যে দেখতে পাইঃ তাঁর প্রকাশভঙ্গীর সারল্য ও বাচনভঙ্গীর প্রত্যক্ষতা। তবে সমসাময়িক সমালোচনায় কথিত 'প্রতি ছত্রে নবীন কবির প্রতিভা বিচ্ছুরিত হইতেছে'[১৪]—মন্তব্যটি অতিশয়োক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

ভূমিকায় উল্লিখিত 'শেফালিকা' কাব্যগ্রন্থ বোধহয় অনেক তরুণ লেখকের বিজ্ঞাপিত 'যন্ত্রস্থ' গ্রন্থের মতোই কখনো যন্ত্রের মুখ দেখে নি। সুতরাং, এতে বাংলা সাহিত্যের অল্পাধিক উন্নতি কি হতে পারত, সে সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না।

'তৃষ্ণা' উৎসর্গ করা হয়েছিল ডাক্তার ময়েজউদ্দীন আহমদ ওরফে মধু মিয়াকে, যাঁর সম্পাদিত 'প্রচারক' (১৮৯৯-১৯০২) নামক মাসিকপত্রে তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়মিত প্রকাশ পেত। অনতিবিলম্বে মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন

১৪। ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০০, পৃ ১৪।

আহমদ-সম্পাদিত মাসিক 'ইসলাম প্রচারক' (নবপর্যায় ১৮৯৯-১৯০৬)[১৫] এবং এস. কে এম. মহম্মদ রওসন আলী চৌধুরী-সম্পাদিত 'কোহিনূর' (১৮৯৮-১৯১৫) মাসিকপত্রেও তাঁর রচনা দেখা দিল। আরো পরে, সৈয়দ এমদাদ আলী-সম্পাদিত 'নবনূর' পত্রিকার (১৯০৩-১৯০৬) তিনি নিয়মিত লেখক হয়ে উঠলেন। মোজাম্মেল হক-সম্পাদিত 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়ও (১৯২০-২১) তিনি নিয়মিত লিখতেন।

'প্রচারকে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ ছোট আকারের ষোল পৃষ্ঠার পুস্তিকা হয়ে (দাম ছ পয়সা) বের হল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, নাম 'মানসিংহ'। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' এটিকে "গদ্যনাটক" বলা হল কেন, আমি তা বুঝতে পারি নি, যেমন বুঝি নি লেখকের পক্ষে বইটি লেখার আবশ্যকতা কি ছিল। 'বঙ্গভাষায় মানসিংহের জীবনচরিত নাই', এই অভাববোধ থেকে তিনি 'কয়েকখানি প্রাচীন ও প্রামাণ্য ইতিহাস অবলম্বনে এই অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সংগ্রহ' অর্থাৎ সংকলন করেন। এটি তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ, যাকে তিনি বলেছেন 'ঐতিহাসিক চিত্র'। সাধুভাষায় লেখা বই, মধ্যে মধ্যে ধ্বনিময় শব্দবহুল বাক্যরচনার চেষ্টা আছে:

> ভারতের রাজনৈতিক গগনে অলক্ষিতে আকবরের দৃষ্টি ভস্মাবৃত অগ্নির মত সুতীক্ষ্ণ আগ্রহে নিক্ষেপিত হইতেছে, সে জ্বালাময় অগ্নি সমুদয় শক্তিকেই গ্রাস করিতেছে, সুতরাং নিশ্চুপ থাকা অর্ব্বাচীনের কার্য্য: অধিকন্তু এই দুর্ভেদ্য কৌশলজাল ছিন্ন করিয়া অতি অল্প ব্যক্তিই মুক্তবন্ধন হইতে পারিবেন। সমুদয় পথ সংকীর্ণ ও কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং আকবর ভিন্ন সুচারুরূপে রাজ্যরক্ষার উপায় নাই। ইতিপূর্ব্বে অনেক রাজপুত কুল-ভাস্কর এ পথ পরিষ্কারও করিয়াছিলেন,—সুতরাং মানসিংহ সম্রাটের এই অমিততেজ অলৌকিক বলের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। [পৃ ৩]

রচনা হিসেবে 'মানসিংহ' সর্বাঙ্গসুন্দর নয়: এই উদ্ধৃতির মধ্যেই 'মত' 'নিশ্চুপ' ও 'পরিষ্কারও' শব্দের অসঙ্গত প্রয়োগ দৃষ্টি এড়ায় না। জীবনী হিসেবেও এটি অসম্পূর্ণ। 'নবনূর' যথার্থই বলেছেন:

১৫। প্রথম পর্যায়: ১৮৯১-৯২।

> এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক প্রসিদ্ধ মানসিংহের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু উপযুক্ত উপকরণাভাবে তিনি সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষাও অনেক স্থানে জটিল ও ইতিহাসের অনুপযুক্ত বোধ হইল।...[১৬]

'মানসিংহে'র পরই তাঁর আরেকটি পুস্তিকা বের হল, নাম 'আস্‌বাত-উস্‌-ছামা বা ছামাতত্ত্ব'। সাতাশ পৃষ্ঠার চটি বই, প্রকাশকাল 'সন ১৩১০ সাল, কার্ত্তিক'। এই শাস্ত্রীয় বিতর্কের বইটিকে আখ্যাপত্রে অবশ্য অনূদিত গ্রন্থ বলা হয়েছে। 'চিশ্‌তীয়হ্‌ ও সুহ্‌রওর্দীয়হ্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের মধ্যে অবিকল কীর্ত্তনের অনুরূপ প্রেম-প্রকাশের ধারা প্রচলিত ছিল—তাহার নাম "সমা" বা "গানের বৈঠক"। কোন বিশেষ বিশেষ দিবসে এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ একস্থানে একত্রিত হইতেন, এবং গান-বাজনার সাহায্যে অন্তরকে উদ্দীপ্ত করিয়া ভগবৎ প্রেমে গড়াগড়ি দিতেন বা নাচিতে থাকিতেন।'[১৭] চিশতিয়াহ্‌ ও সুহ্‌রাওয়ার্দীয়াহ্‌ সম্প্রদায়ের সাধকদের যিকিরের জন্য 'সামা'র ব্যবহার অপরিহার্য ছিল, তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সুফীরাও এর চর্চা করতেন। ধর্মানুশীলনের মধ্যে নৃত্যগীতের সংযোজন ধর্মসিদ্ধ কি না, এ নিয়ে মুসলমান শাস্ত্রকারদের মধ্যে নানারকম তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। আল-গাজ্জালী এর অনুমোদন করেছিলেন। 'সামা'র চর্চা করতেন বলে পরবর্তীকালে অনেক সুফী সম্প্রদায়ই নৃত্যরত দরবেশ নামে পরিচিত হতেন।[১৮] কাকিনা-নিবাসী মৌলভী আবদুল লতিফ নতুন করে আবার এই পুরোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, '(ক) সঙ্গীত ও (খ) বাদ্য—যাহা চিশতিয়া খান্দানের পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, এবং বর্ত্তমানে ভক্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে—ইহা সরাহ অনুসারে সিদ্ধ কি অসিদ্ধ?' তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

১৬। নবনূর, ফাল্গুন ১৩১০, পৃ ৪৪২।

১৭। মুহম্মদ এনামুল হক: বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব (কলিকাতা: মোহসীন এণ্ড কোং, ১৯৩৫), পৃ ১৬৯-৭০।

১৮। Tarachand: Influence of Islam on Indian Culture (Allahabad: The Indian Press Ltd., 1946) pp 82-83.

এই যুক্তি খণ্ডন করে একটি প্রতিবাদপত্র রচনা করেন মজফ্‌ফরনগর নিবাসী "জনাব, হজরত, মওলানা, হাজি, হাফেজ, কারী, মহম্মদ শাহাবুদ্দিন সাবেরি"। ফজলল করিমের 'ছানীতত্ত্ব' তারই অনুবাদ বা সেই ভিত্তিতে বাংলায় লেখা প্রবন্ধ।

সতেরো বৎসর বয়সে ফজলল করিম গদ্যে 'লায়লী মজনু'র প্রেমোপাখ্যান রচনা করেছিলেন, পরে হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনী অবলম্বনে লিখেছিলেন 'পরিত্রাণ' কাব্য। ১৯০১ সালে 'প্রচারক' পত্রিকায় এ দুটি রচনাই একসঙ্গে প্রকাশিত হতে থাকে। তিনি যদিও তখন 'ইসলাম প্রচারকে'র নিয়মিত লেখক, তবু তার সম্পাদকের রক্ষণশীল চিত্ত এতে ক্ষুব্ধ না হয়ে পারে নি। অধিকন্তু, বোধ করি, 'প্রচারকে'র সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার ব্যাপারটিও ইন্ধন জুগিয়ে থাকবে। 'সমাজ-সেবক উচিত বক্তা' নামে তিনি (অন্য কেউও হতে পারেন) অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লিখলেন :

> "প্রচারক" নামক একখানি মাসিকপত্র আছে।... বোধহয় কোন অর্বাচীন প্রতারক লোক সমাজসেবার ভাণ করিয়া প্রতারণার জাল বিস্তার করতঃ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিবার উপায় করিয়া লইয়াছে।... এক শেখ ফজলল করিম ও সম্পাদক ভিন্ন অন্য সমস্ত লেখকই ইসলামবিরোধী কোরাণ অবিশ্বাসী হিন্দু।... শেখ ফজলল করিম সাহেবেরও যে দুইটী প্রবন্ধ "প্রচারকে" প্রকাশিত হইতেছে, তাহার একটী লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান, অপরটী কবির কল্পনাপ্রসূত "পরিত্রাণ কাব্য"। ঐ লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান পাঠ করিয়া বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ কি শিক্ষা পাইবে?... লায়লীর রূপমাধুরী, অঙ্গসৌষ্ঠব, নয়নভঙ্গী, বিলোল কটাক্ষ, প্রেমকথন ও প্রেমচাতুর্য্য, মজনুর প্রেমাসক্তি ও প্রেমোন্মত্ততা দ্বারা আমাদের পতিত সমাজের কি উপকার হইবে?.. অধুনা আমাদের যে দুই চারিজন নব্য যুবক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, ঐরূপ প্রবন্ধ প্রকাশদ্বারা তাহাদের মাথা খাওয়ার যোগাড় হইতেছে না কি? তারপর পরিত্রাণ কাব্য। ইহার নাম যেমন কাব্য, প্রকৃতপক্ষে কাব্যই। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না; কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করি যে বিষয় অবলম্বনে উহা লিখিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে অসার কল্পনাপ্রসূত কাব্যাকারে প্রবন্ধ লেখার অধিকার কোন মুসলমানের আছে কি?...[১৯]

১৯। ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০২, পৃ ২৬-২৯

সমালোচকের এই অভিশাপের ফলে কি না, জানি না, 'প্রচারকে' 'লায়লী মজনু' ও 'পরিত্রাণ' সম্পূর্ণ হতে পারল না—রচনা সবটা ছাপা হবার আগেই পত্রিকার আয়ু শেষ হল।

ফজলল করিম এতে অবশ্য বিচলিত হলেন না। বরঞ্চ মুনশী মেহেরুল্লাহ্ স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'পরিত্রাণ' কাব্য প্রকাশ করায় তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। এটি উৎসর্গ করা হল 'চিশতিয়া খান্দানের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র' মোহাম্মদ শাহ্ শাহাবউদ্দীন চিশতি সাবেরি সাহেবকে। ইনিই তাঁদের পরিবারের পীর, লেখকের চোখে 'দেব'তুল্য। তাই তাঁর নিবেদন,

বড় আশা পাব দেব অন্তিমে তোমার
চরণ মঞ্জীর।

'গ্রন্থের দুই একটী স্থানে আমি মাইকেল ও নবীনবাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছি, এ জন্য তাঁহাদের নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিব'—অবতরণিকায় কবি একথা বলেছেন। এই ঋণ অমিত্রাক্ষর ছন্দগ্রহণে, কতিপয় শব্দপ্রয়োগে, (যেমন, 'আকাশ-সম্ভবা-বাণী' 'বিহঙ্গকুল' 'নীরবিলা' 'কল্লনে লো!' প্রভৃতি) এবং 'কি পাপে দারুণ বিধি তোমার কপালে লিখেছিলা হেন দুঃখ' প্রভৃতি বাক্য বা বাক্যাংশের ব্যবহারে। মাঝে মাঝে অবশ্য তিনি অন্য ছন্দও ব্যবহার করেছেন।

এই কাব্যের বিষয়বস্তু ইসলামপ্রচারের প্রথম পর্যায়ে কোরেশদের বিরোধিতা, নবীর মদিনায় হিজরত, বদর, ওহোদ ও খায়বরের যুদ্ধ এবং মক্কাবিজয়—হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনের এই ঘটনাবলী। এটা যাতে কাব্য হয়ে ওঠে, সেজন্য কবির চেষ্টা ছিল। তাই মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিসর্গবন্দনা আছে, যার অংশ ঃ

নিদাঘ-শর্ব্বরী-অন্ত, স্নিগ্ধ-সমীরণ
চুম্বিয়া লতিকা-বক্ষ বহে ধীরি ধীরি
শান্তোজ্জ্বল পূর্ব্বাসার ভাতিলা পূরবে
নাশিতে বিশ্বের তমঃ— হাসিলা প্রকৃতি
আনন্দে দোলায় শির ; নিকুঞ্জ বল্লরী
সে উৎসবে মাতিলেক যেন এ ধরায়
সুখের স্বপন পেয়ে। [পৃ ৪৯]

অন্যান্য লেখকের মতো তিনিও মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশার জন্য কাতরতা প্রকাশ করেছেন:

কাঁদার সময় আজি হয়েছে মোদের
মোস্লেম সন্তান মোরা হেন দীন হীন
ধর্ম্মহারা পথভ্রান্ত অলস অধম
কেবল গণিছি বসি মরণের দিন!
জগতে পতিত বলি ইসলামের নামে
কলঙ্ক দিয়েছি ঢালি অভাগ্য আমরা। [পৃ ৮৪]

মাতৃভাষার অনাদরের জন্যে কবির আক্ষেপোক্তি:

কি পাপে দারুণ বিধি তোমার কপালে
লিখেছিলা হেন দুঃখ বল বঙ্গভাষা,
অনাহারে, অবহেলে,— পরিচর্য্যাভাবে
জীর্ণাশীর্ণা হারায়েছ সকল ভরসা।...
হতভাগ্য বাঙ্গালীর অদৃষ্টের দোষে
তুমি মা কাঙ্গালী আজ আপনার দেশে। [পৃ ৮৩]

'পরিত্রাণ' সম্পর্কে 'নবনূরে'র সমালোচনাকে যথার্থ বলা যায়:

> সমালোচ্য কাব্যখানি বাহ্যদৃষ্টিতে সুন্দর হইলেও কবি মোজাম্মেল হকের গ্রন্থাপেক্ষা সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট।.. কেবল ব্যবহার-বিরল আভিধানিক শব্দ-সমষ্টি জুড়িয়া দিলেই যদি কাব্য হইত, তবে এই কাব্যখানিও উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই।... লেখক একমাত্র সংযমের অভাবেই স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির অপব্যয় করিয়াছেন, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।... বস্তুতঃ শেখ ফজলল করিম সাহেবের একটু শক্তিমত্তায় আমরা আশান্বিত হৃদয়ে এতদিন তদীয় গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। তিনি আমাদিগকে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিতেছেন কেন?[২০]

২০। নবনূর, কার্ত্তিক ১৩১১, পৃ ৩৩৫-৬

মোজাম্মেল হকের কাব্য[২১] যেখানে শেষ হয়েছে, ফজলল করিমের কাব্যের শুরু সেখানে। 'হজরত মুহম্মদ' কাব্যের প্রথম সর্গে 'মক্কানগরী ও জমজম কূপের কথা' বিবৃত হয়েছে, শেষ (সপ্তবিংশ) সর্গে 'হজরত আবুবকরের ইসলাম গ্রহণ'-এর কাহিনী। ছন্দের বৈচিত্র্যে ও ভাষার পরিচ্ছন্নতায় তাঁর কাব্যটি গুণান্বিত। তবে, এই তুলনার সময়ে একথা মনে রাখা উচিত যে, মোজাম্মেল হকের এটি পরিণত রচনা, আর ফজলল করিমের সাহিত্যসাধনার তখন প্রথম অধ্যায়। তাছাড়া, বিগত শতকের আদর্শে কাব্যকাহিনী রচনার ধারা তখন পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে থাকলেও তা প্রাণহীন গতানুগতিকতায় পরিণত হয়েছিল মাত্র।

সতেরো বৎসর বয়সে যে তিনি 'লায়লী-মজনু' লিখেছিলেন, এতে খুব বিস্মিত হবার কারণ নেই,— শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্ত তো আমাদের সামনেই আছে। রচনাটি পুস্তকাকারে বের হল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে। 'সূচনা'য় প্রেম সম্পর্কে যেসব তত্ত্বকথা তিনি বলেছেন, তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারার না হোক, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিতার প্রভাব আছে:

> ...প্রেমের দুই মূর্ত্তি— সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম প্রেম, রূপজ, মোহজ বা স্বার্থজ। ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক; সুতরাং উপেক্ষনীয়। আর নিষ্কাম প্রেম, খাঁটি জিনিষ। জীবজগৎ এই প্রকার প্রেমে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করুক, ইহাই বিধাতার অভিপ্রেত। [পৃ ।৵০]

সুফী ভাবধারার পরিচয়ও সুস্পষ্ট:

> এখানে আমরা নিষ্কাম প্রেমকে সদ্‌গুরুর আসন দিতেছি; কারণ প্রেমের উন্মেষ ভিন্ন মুক্তির পথ অন্ধকার ও বন্ধুর। সেইখান হইতেই মহাপ্রেমের সূচনা ও সম্মিলন বাসনা উদ্রিক্ত হয়। যখন প্রেম-রূপ সদ্‌গুরু হৃদয়ে বসিয়া, সরলতার মধ্য দিয়া ধর্ম্মের মহোচ্চ পথ দেখাইয়া দেয়, তখনই বিশুদ্ধ সত্যের জ্যোতিঃ আসিয়া কাম-রূপ পাপের কালিমাকে আবৃত করিয়া ফেলে। এইখানেই মানবজীবনের দেবত্ব,—এইখানেই অমরত্ব। [পৃ ।৶০]

২১। মোজাম্মেল হক: হজরত মোহাম্মদ (কলিকাতা, ১৩১০; পঞ্চম সংস্করণ, মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৩৪২)।

লায়লী-মজনুর জীবনে এই দেবদুর্লভ প্রণয়ের আবির্ভাবকেই তিনি তাঁর রচনায় গৌরবমণ্ডিত করেছেন। এই প্রেমের গভীরতা এবং ভাবতন্ময়তায় নায়ক-নায়িকার বাহ্যজ্ঞানলুপ্তি তিনি বেশ আবেগসহকারে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর সামাজিক মনের ভালমন্দ বোধও সক্রিয় ছিল। বইটিতে স্বকপোলকল্পিত একটি চরিত্র আমদানীর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

> চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা এক নূতন সখীর সরস ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি। আর কোনও ভাষার "লায়লী-মজনু"তে ইনি বোধহয় এখনও দেখা দেন নাই। মায়ের মুখোমুখী লায়লী প্রেম-ঘটিত গঞ্জনার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন, প্রাচীন লেখকের পক্ষে এ ছবি সঙ্গত বোধ হইলেও, একালে নিতান্ত নির্লজ্জতার পরিচায়ক। তাই আমরা ধরিয়া বাঁধিয়া এক সখী জুটাইয়াছি। [পৃ ॥০-॥৵০]

প্রকৃতপক্ষে এর কোন আবশ্যকতা ছিলনা। কেননা, বইতে নায়িকা প্রাচীন মাপকাঠিতে এতরকম "নির্লজ্জতা"র পরিচয় দিয়েছেন যে, সমাজ-ও সুনীতি-রক্ষক পাঠকের পক্ষে, মায়ের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটিতে আর নতুন করে মর্মাহত হবার সুযোগ নেই।

লায়লী মজনুর প্রেম যে প্রাকৃত প্রেম নয়, এ কথা বোঝাবার জন্যে লেখক চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। লায়লীকে পাবার জন্য সাধনা করতে গিয়ে মজনু অপার্থিব শক্তি লাভ করেছেন এবং শুধু তাই নয়, শেষ অবধি তাঁর প্রনয় ধাবিত হয়েছে লায়লীকে অতিক্রম করে তাঁর স্রষ্টার প্রতি। তাই লায়লীকে একান্ত কাছে পেয়েও মজনু তাঁকে পিত্রালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং নিজে সমাহিত হলেন পরমপুরুষের ধ্যানে। তাঁর সুফীধর্মী চিন্তার প্রকাশ এখানেও আমরা দেখতে পাই। গ্রন্থের শেষভাগে লায়লীর প্রতি রাজা নওফেলের আকর্ষণকে কেন্দ্র করে নাটকীয় জটিলতা গড়ে উঠতে পারত, সহজ বর্ণনা দিয়ে লেখক সে সুযোগ নষ্ট করেছেন। একটি কৌতুককর বিষয় হল, হজরত মুহম্মদের (দঃ) নামে লায়লীর শপথবানী উচ্চারণ। লেখক তার কৈফিয়ত দিয়েছেন এ ভাবে ঃ

এই ঘটনা শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের বহু পূর্ব্বের হইলেও, তাঁহার আগমন সংবাদ আদিকাল হইতে ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ ছিল। বিদুষী লায়লীর ইহা জানিবার বাকী ছিল না। [পৃ ৮৩ পা.টী.]

এ যুক্তি এতই অকিঞ্চিৎকর যে মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না।

এই বইটিতে তাঁর রচনা প্রথম দানা বাঁধল। এটি সাধুভাষায় লেখা, প্রায়ই চোখে পড়ে তৎসম শব্দের আধিক্য ও সমাসের আড়ম্বর:

বসন্তকাল— প্রেম সোহাগ উদ্বেলিত দিগঙ্গনা নব-সাজে বিভূষিতা। আকাশের চাঁদ, কাননের ফুল, ভ্রমরের প্রেমালাপ, পাপিয়ার অতৃপ্ত সঙ্গীত, বিরহীর নয়নাশ্রু এখন সমস্তই অনিন্দ্যসুন্দর।... রতিপতি কমল-আসনে ফুলশর হস্তে যুগ্ম-নেত্রে উন্মীলনপূর্ব্বক কাহারও কোমল প্রাণে শর-সন্ধান করিতেছেন,—সে দৃষ্টি কি ভীষণ! [পৃ ৮]

অলঙ্কৃতা লায়লী আলুলায়িতকুন্তলা তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিতা ওষ্ঠাধরা, অৰ্দ্ধোন্মুক্ত-বক্ষোবাসা, কোটীন্দুকল-কেন্দ্রিকৃতা, প্রেমিকা-কুল-কিরীটিনী লায়লী সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। [পৃ ৩৬]

সেইসঙ্গে অনুচিত প্রয়োগ ও গুরুচণ্ডালী দোষও দেখা যায়:

সত্যের জয় অবিসম্বাদী। নতুবা এ পবিত্র প্রেমের প্রীতিদ-তরঙ্গ যুগযুগান্তর ভেদ করিয়া আজ বিশ্বের স্নিগ্ধ বক্ষ অভিষিক্ত করিত না। বালুবায় জল ঢালার মত অকালে শুকাইয়া যাইত। [পৃ ২৭]

আমরা গ্রন্থকার। নায়ক-নায়িকার মুখে না কহিবার কথাটাও একবার বাহির করিয়া লই। তা' না'হলে আসর জমে না, পাঠক মজেনা; কিন্তু আমাদের একটা সার্ব্বভৌম আশা আছে। [পৃ ৪৯]

ভাষা ও ভাবঘটিত অনৌচিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুতর নিদর্শন:

বিনা তারে টেলিগ্রাম হয়, প্রাণে প্রাণে কথা হয়, ইহার আবার প্রমাণ কি দিব? হৃদয়ের মত টেলিগ্রামের যন্ত্র আজিও জগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? আর চোখের মত অপূর্ব্ব "ক্যামেরা" আজিও কেহ দেখিয়াছেন কি? এ ফটো তুলিবার প্লেট—প্রাণ। [পৃঃ ১৫]

শেখ ফজলল করিমের রচনাভঙ্গীর একটি বড় ত্রুটি এই ধরণের বালকোচিত উক্তি, যা তাঁর পরিণত বয়সের রচনাকেও আক্রান্ত করেছিল। এখানে আরেকটি উদাহরণ দিই। লায়লীর বিবাহ হয়েছে, সেই রাত্রে:

> উদ্‌ভ্রান্ত রাজপুত্র আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না,—আবেগভরে প্রিয়তমাকে বক্ষে জড়াইবার জন্য হস্ত সম্প্রসারণ করিলেন; কিন্তু এ কি? চপেটাঘাত তো প্রেমোপহার নহে! যে প্রেমরাণীর বিমল সুধার আশায় রাজপুত্রের দগ্ধ হৃদয় এতদিন ছিন্নকণ্ঠ কপোতের মত যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছিল, আজ তাহার এ কি ব্যবহার! [পৃঃ ৮১]

উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারেও ভাষারীতির মতোই তিনি উনিশ শতকী পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন:

> মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে সৌদামিনী বিকাশের মত একটু হাসিলেন। [পৃ ৩৩]
> ঈপ্সিতার মধুর চন্দ্রানন দেখিয়া কএস তৃষিত চাতকের মত জাগ্রত স্বপ্নে ব্যাকুল হইয়া গৃহপানে চলিলেন। [পৃ ২২]
> অনন্ত সাগরবক্ষে বাত্যাহত উর্মিমালার ন্যায় লায়লী তখন হৃদয়াবেগে পরিচালিতা। [পৃ ৩৯]
> যেন পবিত্রতা আসিয়া প্রেমের মন্দিরে প্রবেশ করিল। যেন রাজহংসী আসিয়া কমলবনে প্রবেশ করিল। যেন পুণ্য আসিয়া ধর্ম্মের মন্দিরে প্রবেশ করিল। [পৃ ৩২]

সমাসোক্তির ব্যবহার আছে, তেমনি ছেলেমানুষী করে এমন ব্যবহার নষ্ট করেছেন, তার উদাহরণও রয়েছে:

> তখন গোধূলী সিন্দুর পরিয়া মেঘবালা যেন শ্বশুরালয়ের দিক অগ্রসর হইতেছিল। [পৃ ১৮]

প্রতিবস্তূপমার (Parallel simile) প্রয়োগ এবং আত্মগত উক্তি [পৃ ২৬, ৪৫, ৬৭] বা পাঠক ও পাত্রপাত্রীর উদ্দেশ্যে উক্তিও [যেমন, পৃ ৭১] এতে আছে। সংলাপের ভাষা সাধারণতঃ কথ্য: কখনো কখনো সাধুভাষার সংলাপ আছে এবং কখনো কখনো সাধু ও কথ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে একই সঙ্গে।

,লায়লী মজনু'র পর শেখ ফজলল করিম লিখলেন চিশ্‌তিয়া সাধকদের আদিগুরু 'মহর্ষি হজরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) জীবন চরিত' (১৯০৪)। এ জীবনকাহিনী যে অলৌকিক ঘটনায় আকীর্ণ হবে, তার আভাস পাওয়া যায় ভূমিকা থেকেই:

> বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর লোক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কিন্তু নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যাঁহাদিগের হৃদয় সর্ব্বশক্তিমান খোদাতা'লার অসীম শক্তির প্রভাবে ক্ষমতাশালী, তাঁহাদিগের পক্ষে সাধারণ মানুষের অসাধ্য কোন আশ্চর্য্য ঘটনাপ্রদর্শন, বিস্ময়ের বা অবিশ্বাসের কথা নহে।

এই 'আশ্চর্য্য ঘটনাপ্রদর্শনে'র মধ্যে আছে একটি শিশুসহ খাজা সাহেবের অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ ও অক্ষত অবস্থায় নিষ্ক্রমণ, তাঁর ইচ্ছায় ছিন্নমুণ্ড ব্যক্তির জীবনলাভ, হজরতের সমাধি থেকে তাঁর প্রতি আহ্বান, তাঁর ইচ্ছায় প্রস্তরমূর্তি কর্তৃক আল্লাহ্‌র জয়গান, তাঁর আদেশে মাতৃগর্ভস্থ শিশুর বাক্যালাপ, প্রতি রজনীতে খাজা সাহেবের মক্কাগমন ও প্রাতে আজমীরে প্রত্যাবর্তন। এইসঙ্গে 'সামা'র পক্ষসমর্থন আছে, আর আছে চিশতিয়া সম্প্রদায়ের গুরুত্বজ্ঞাপনের একটি শস্তা পন্থা। খাজা সাহেব যখন কাবা প্রদক্ষিণ করেন, তখন তাঁর প্রার্থনার উত্তরে নাকি আকাশবাণী হয় যে, 'যে ব্যক্তি চিশ্‌তিয়া খান্দানে মুরিদ হইবে, সে নির্ব্বিচারে বেহেশ্‌তে গমন করিবে' [পৃ ৩৫]।

মোজাম্মেল হকও মঈনউদ্দীন চিশ্‌তীর জীবনী রচনা করেন—তবে অনেক পরে।[২২] তাঁর গ্রন্থেও অতিপ্রাকৃত ঘটনার অভাব নেই। ফজলল করিম পীর সাহেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, মোজাম্মেল হক তাঁর পাদুকার অলৌকিকতা দেখিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু সুফী মতবাদের ইতিহাস ও প্রকৃতি এঁরা কেউই ব্যাখ্যা করেন নি, অথবা, প্রধান প্রধান

২২। মোজাম্মেল হক: খাজা ময়ীনউদ্দীন চিশ্‌তি (ঢাকা: আবদুল আজিজ খাঁ, ১৩২৫)।

সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একমাত্র শাখা (চিশতিয়া) ভারতের মাটিতে বিকাশলাভ করে, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ বা সম্পূর্ণ পরিচয়দান করতে এঁরা কেউই প্রবৃত্ত হন নি।

'মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আল্‌ফ-সানী' (১৯০৫) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল।[২৩] আলফ-ই-সানীকে তিনি 'নক্‌শবন্দিয়া ও মোজাদ্দাদিয়া তরিকার প্রদীপ্ত রবিকর' বলে অভিহিত করেছেন। মুজাদ্দাদ-ই-আলফ-ই-সানী শেখ আহমদ সরহিন্দী (১৫৬৩-১৬২৪) যদিও নক্‌শবন্দীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক, তবু ভারতে সুফী মতবাদের প্রধান সংস্কারক এবং সমগ্র মুসলমান সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হিসেবে ইতিহাসে স্থানলাভ করেছেন। সুফীদের তসউফের সঙ্গে ভারতীয় ব্রহ্মবাদের মিলন এবং সামগ্রিকভাবে সুফী চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের ভাবমিশ্রণের ফলে যে সব ইসলাম-বিরোধী মনোভাব ভারতীয় সুফী সমাজে প্রবেশলাভ করেছিল, সরহিন্দী তারই বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন।[২৪] এঁর জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে ফজলল করিম একথা জানাতে ভোলেন নি যে, মুজাদ্দাদ তাঁর জনক হজরত শেখ আবদুল আহাদ চিশতী কুদ্দসীর কাছে চিশতীয়া ও কাদিরীয়া পন্থায় দীক্ষালাভ করেছিলেন, নক্‌শবন্দীয়া ধারায় দীক্ষিত হন পরবর্তীকালে— হজরত বাকীবিল্লাহ্‌র প্রভাবে। এই মহাপণ্ডিতের জীবনকাহিনী বিবৃত করতে যেয়েও তিনি অলৌকিকতার মোহ ত্যাগ করতে পারেন নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরকে প্রণতি জানাতে অস্বীকার করায় মুজাদ্দাদ কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

> প্রবাদ আছে, এই সময়ে হজরতের সিদ্ধ শিষ্য সেবকগণ আধ্যাত্মশক্তিবলে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত জানিতে পারিয়া, স্বপ্নে তাঁহাদিগের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "ধৈর্য্য ধারণ কর; ইনশা আল্লাহ্‌ আমি শীঘ্রই এখান হইতে মুক্তিলাভ করিব"।[২৫]

২৩। ইসলাম প্রচারক, আগস্ট ও ডিসেম্বর ১৯০৪, জানুয়ারী ১৯০৫

২৪। মুহম্মদ এনামুল হক: পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪০।

২৫। ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৫, পৃ ৫৯-৬০।

অতঃপর সম্রাট-দুহিতা স্বপ্নে হজরত মুহম্মদের (দঃ) আদেশলাভ করলেন আহমদ সরহিন্দীকে মুক্তিদানের জন্যে। অনুতপ্ত জাহাঙ্গীর তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে মুক্তি দিলেন আর স্বয়ং তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হলেন।

'আফগানিস্থানের ইতিহাস' (১৯০৯) রচনার আশু উপলক্ষ্য ছিল আমীর হাবীবউল্লাহ্‌ খানের ভারত সফর। বইটি তেমন সুখপাঠ্য নয়, তবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধনে লেখকের আগ্রহের পরিচয় আছে নিম্নোদ্ধৃত অংশে ঃ

> যেদিন দিল্লীতে ঈদের সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দোম্বা কোরবানীর অনুরোধ করিয়া তিনি [আমীর হাবীবউল্লাহ খান] অনন্যসুলভ সাম্যবাদের পরিচয় দিয়াছিলেন, সেদিন কোন রাজনীতিবিদ ব্যক্তি তাঁহার প্রজাপালন নীতির সুস্পষ্ট আভাষ বুঝিতে না পারিয়াছিল। [১০]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে মনোভাবকে ফজলল করিম এখানে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কুড়ি বছর আগে মীর মশাররফ হোসেন সেই একই মনোভাব থেকে তাঁর 'গো-জীবন'[২৬] পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন। এতে কিন্তু গোঁড়া মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, পুস্তিকা-রচয়িতাকে 'কাফের' আখ্যা দিতে এবং তাঁর স্ত্রী হারাম হবার ফতোয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। এমন কি, পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মশহাদীর মতো লেখকও ছদ্মনামে 'অগ্নিকুক্কুট'[২৭] রচনা করে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই সমুদয় বাদ-প্রতিবাদের নিস্পত্তি হতে মশাররফ হোসেন এবং তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়দেরকে আদালতে পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। শেখ ফজলল করিমকে এ বিপদে পড়তে হয় নি। তিনি একজন মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ সমর্থন করেছিলেন বলে কেবল নয়, যুগের ভাবলোকেই কিছুটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল।

বাঙালী মুসলমানের যে পতন হয়েছে, এটা সে যুগে স্বতঃসিদ্ধ ছিল। এই পতনের একটি কারণও তখন সাধারণভাবে গ্রাহ্য হয়েছিল। কারণটি হচ্ছে,

২৬। মীর মোশাররফ হোসেন ঃ গো-জীবন (টাঙ্গাইল ঃ চন্দ্রকুমার সরকার, ১২৯৫)।

২৭। ফকির আবদুল্লা-বিন-এসমাইল অল্ কোরেশী অল্ হিন্দী ঃ অগ্নিকুক্কুট (কলিকাতা ঃ ভারত মিহির প্রেস, ১২৯৬ ; ব্বি-স শাহানশা এণ্ড কোং, ১৩০৯)।

বাঙালী মুসলমানের আদর্শচ্যুতি। অতএব, তার জীবনে যাতে এই আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে, সে বিষয়ে অনেকেই সচেষ্ট হয়ে পড়লেন এবং এই চেষ্টাটা প্রধানতঃ দেখা দিল আদর্শ পুরুষদের জীবনকাহিনী রচনার মধ্য দিয়ে। 'পথ ও পাথেয়'তে (১৯১৩) শেখ ফজলল করিম এই আদর্শ জীবনযাত্রার পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন:

> সংসারের শত সহস্র আকর্ষণের মধ্যে, সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে, যাহাতে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে, সকল সময়, সকল অবস্থায় এক করুণাময়ের প্রতি নির্ভর রাখিয়া বাঞ্ছিত "সৌভাগ্যের" অধিকারী হইতে পারি, সেই আশায়, প্রত্যেক মানুষকেই মহদিগণের ব্যবস্থিত "পাথেয়" গ্রহণে শান্তির পথে,—খোদার পথে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। অন্য পথে শান্তি নাই।

এরপর তিনি বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনে নীতি ও ধর্মনিষ্ঠার নানা দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। ইমাম আহমদ হমবলের পুত্র উৎকোচের অর্থে ময়দা কিনে পিতাকে উপহার দিয়েছিলেন: সেই ময়দায় তৈরী রুটী গ্রহণ করতে ইমাম সাহেব তো অস্বীকার করলেনই, উপরন্তু যখন সেই রুটী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হল, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, সারা জীবন আর মাছ খাবেন না। প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি হবার ভয়ে জনৈক মহর্ষি নিজের বাড়ীতে চুরি হতে সাহায্য করলেন। কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে এসে নির্দিষ্ট স্থানে হজরত ইসমাইল দু দশ মিনিট নয়, একাদিক্রমে বাইশ দিন অপেক্ষা করে অঙ্গীকার পালন করলেন। নীতির দিক দিয়ে এগুলো হয়তো খুবই প্রশংসার্হ, এঁদের অসাধারণ চরিত্রবলের প্রকাশ এতে নিশ্চয়ই ঘটেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে এইসব দৃষ্টান্ত অনুসৃত হবে, এমন আশা দুরাশা মাত্র। বরঞ্চ, দু একটি দৃষ্টান্তে, যেখানে প্রতিবেশীর অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় হজরতের পুণ্য ঘটল কিংবা রসুলের বাণীতে যেখানে পরাক্রান্ত নৃপতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দণ্ডপ্রাপ্ত হলে তাকে শহীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা-দানের প্রতিশ্রুতি আছে, সেই সব অংশ বোধহয় আমাদের কাছে অধিকতর আবেদন জানায়। অবশ্য লৌকিক জগতের যেসব সুখদুঃখে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটা লেখকের অকাম্য, সেই সুখদুঃখকে স্বীকার না করলে সম্ভবতঃ এই অভাব পূরণের বা এই বিদ্রোহের মাহাত্ম্য স্বীকার করা যায় না।

মোজাম্মেল হকের 'তাপস কাহিনী'র'[২৮] সঙ্গে ফজলল করিমের 'পথ ও পাথেয়'র একটি পার্থক্য বোধহয় এখানে। মোজাম্মেল হকের গ্রন্থ পূর্ববর্তী: তপস্বীদের এইসব গুণে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁদের প্রতি লেখকের চিত্ত শ্রদ্ধাবনত হয়েছে, কিন্তু জীবনসাধনার ঋজু পন্থা ত্যাগ করে এইসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে তিনি বলেন নি। এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসেবে 'তাপস কাহিনী' উপাদেয় বই: পতিত জনকে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে সত্যজীবনের আলোকে আনয়নের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হবার কোন দাবী তার নেই।

লিখনরীতির দিক দিয়ে 'পথ ও পাথেয়'র বৈশিষ্ট্য রচনার সংযমে এবং ভাষার আবেগহীন প্রকাশে। এর ভাষা যুক্তিবাহী গদ্যধর্মী, বর্ণিত উপাখ্যান-গুলোকে পল্লবিত করবার কোন প্রয়াস এতে নেই।

'চিন্তার চাষ' (১৯১৬) একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতি উপদেশমূলক রচনার সমষ্টি।

'বিবি রহিমা'কে (১৯১৮) লেখক বলেছেন 'ঐতিহাসিক চিত্র'। এটি ঠিক জীবনকাহিনী নয়, হজরত আইউব ও বিবি রহিমার দাম্পত্য জীবন এতে বর্ণিত হয়েছে। তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি "বিষয়টিকে সুখপাঠ্য এবং সময়োপযোগী করিবার জন্য একটু উপন্যাসের রসে রসাইয়া" দিতে চেয়েছেন। চরিত্র, ঘটনা ও সংলাপ এতে আছে: উপন্যাসের সঙ্গে ঐক্য এটুকুই।

পাত্রপাত্রীর বংশপরিচয়দানের আবশ্যকতা বোধ করে লেখক শুরু করেছেন হজরত আদম থেকে এবং তাঁর বেহেশ্‌ত বাসের সময় থেকে। বইয়ের প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়েই এই পরিচয় চলেছে। পিতামাতার শিক্ষায় বিবি রহিমা শৈশব থেকেই আদর্শ চরিত্র হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। মানবীয় দুর্বলতা হজরত আইউবের চরিত্রেও একবার দেখা দিয়েছে, শয়তানের চক্রান্তে পড়ে তিনি অন্যায় প্রতিজ্ঞা করেছেন। কিন্তু বিবি রহিমা আপাদমস্তক আদর্শ রমণী। সংসারের প্রলোভন, শয়তানের চক্রান্ত, সপত্নীদের হিংসা, প্রতিবেশীদের আচরণ,

২৮। প্রথম প্রকাশ 'তাপস জীবনী' নামে (কলিকাতা: লতিফ প্রেস, ১৩০৭)

আল্লাহ্‌র পরীক্ষা, স্বামীর জ্বরা, দারিদ্র্যের জ্বালা—কিছুই তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারে নি। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি তাঁর অটুট রয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তাঁর অপূর্ব বিনয় অবিচলিত আছে ঃ

> আইউব বল্লেন,—"রহিমা! পরশ পাথরের স্পর্শ পেলে নীরস লৌহখণ্ডও সুবর্ণে পরিণত হয়; তোমার মত সাধ্বী রমণীর স্বামী হয়ে আইউবের জীবনও ধন্য হয়েছে; পরশ পাথরের মত তুমি তার অন্তরের মলিনতা ঘুচিয়ে তাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তুমি সতীময়ী;—তোমার পবিত্র আদর্শ জগতের ঘরে ঘরে অনুকৃত হবে।"
>
> করুণাময়ী রহিমা কুণ্ঠিত হয়ে বল্লেন,—"নাথ! রাক্ষসীকে দেবী বলছ? পিশাচীকে হুর বলছ? আমার পাপেই তো তোমার এই কষ্ট। আমি যদি তোমার উপযুক্ত সহধর্মিনী হতে পারতেম, তাহলে কি তোমাকে এত দুঃখ পেতে হয়!—এ সবই আমার কপাল।"
>
> আইউব ব্যাকুলভাবে বল্লেন,—"না, রহিমা। এ তোমার ভুল বিশ্বাস। তুমি স্বর্গের হুর,—আমার জন্য তুমি অশেষ যাতনা ভোগ করেছ;—আমাকে ক্ষমা ক'রো। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখতে পেলে আইউব শান্তিতে মরতে পারবে।" [পৃ ১৩৬]

আসলে দোষ অবশ্য রহিমার নয়, আইউবেরও নয়। শয়তানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আল্লাহ্‌ এঁদের ভক্তিপরীক্ষার জন্যে নানারকম দুর্দশার সৃষ্টি করছেন।

'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২) রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন গৃহে গৃহে অমৃত ফলার আশা প্রকাশ করেছিলেন, 'বিবি রহিমা'র লেখকও তেমনি গৃহে গৃহে আদর্শ স্ত্রী ফলার আশা প্রকাশ করেছেন। বইয়ের মুখবন্ধে তাই এর moralটিকে তিনি ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

> শয়নে স্বপনে সতি! পতি-পদে রাখ মতি :
> পতিসেবা, পতিভক্তি নারীধর্মসার।
> পতির চরণতলে স্বরগ তোমার॥

স্বামীসেবায় রহিমার চরমোৎকর্ষলাভের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক প্রায়ই তাঁর চারপাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। ফলে, আমাদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কিছু কিছু reflection এতে—এবং কেবল এই বইটিতেই—ধরা

পড়েছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা [পৃ ৪৯-৫০], বাল্যবিবাহের কুফল [পৃ ৫২-৫৩], বিবাহে পণপ্রথা [পৃ ৫৭-৫৮], সপত্নীদের আচরণ [পৃ ৬৯-৭০] সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য থেকে মোটামুটী একটা পরিচ্ছন্ন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। একালের মেয়েদের শ্রমবিমুখতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য কৌতুকজনক ঃ

> বড় লোকের বড় আদরের—বড় সোহাগের মেয়ে রহিমা ; কিন্তু তা বলে তোমরা মনে ক'রো না যে রহিমা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান, — ইজি চেয়ারে সিগারেট মুখে কেবল নভেল পড়েন ! হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বড়লোকের মেয়েরা সাধারণতঃ গরীব-দুঃখীকে অহঙ্কারে কথা বলেন না,— দেমাকে তাঁদের মাটিতে পা পড়ে না',—লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতেও যেন তাঁদের মান যায়,—কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় অভিমাম করেন,— যাকে-তাকে কটুকথা বলেন, পশুপক্ষীকে যাতনা দিয়ে আমোদ উপভোগ করেন ; কিন্তু রহিমা ছিলেন ঠিক এর বিপরীত। [পৃ ৪৬-৪৭]

'বিবি রহিমা'কে লেখক 'নারী-সাহিত্য' বলে অভিহিত করেছেন। শিশু সাহিত্যিকমাত্রই যেমন শিশু নন, তেমনি নারী-সাহিত্যিক পুরুষও হতে পারেন ঃ সে বিষয়ে আমরা সঙ্গতভাবে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে পারি নে। "স্ত্রীলোক-দিগের নিমিত্ত প্রকাশিত" 'মাসিক পত্রিকা'র ভাষাকে প্যারীচাঁদ যেমন সহজবোধ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন, ফজলল করিম তেমনি সবকিছু বড় সহজ করে বোঝাতে গেছেন। ফল কিন্তু এক হয় নি। প্যারীচাঁদ যেখানে বাংলা গদ্যরীতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন, সেখানে ফজলল করিমের রচনায় মাঝে মাঝে বালসুলভ চপলতা দেখা দিয়েছে। যেমন ঃ

> সে [নমরুদের চাকর] রাগের মাথায় একবার হাতুড়িটা তুলে এমন জোরে কষে দিল "ঠক্কাস" যে, সেই আঘাতে বাদশার মাথার খুলিটা একেবারে পাকা বেলের মত পটাস। [পৃ ২১-২২]

কিংবা,

> সেকালের ধর্মহীন লোকদিগকে সুপথ দেখানোর জন্য খোদাতা'লা তাঁকে [আইউবকে] পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেছিলেন। এই "প্রেরণ" অর্থে তোমার এ মনে ক'রো না যে, খোদাতা'লা তাঁকে আকাশ থেকে ধপ্ করে ফেলে দিয়েছিলেন। [পৃঃ ৬০]

কিন্তু এর চেয়েও দুঃখজনক বোধ এই অংশটি ঃ

> হজরত আইউবের চৌদ্দ ছেলে-মেয়ে। তারা সব ভাই বোন এক জায়গায় বসে হাসি-খুশী করে আহার কচ্ছিল। কেউ খাচ্ছে, কেউ গল্প কচ্ছে, কেউ মুখের কাছে আহার তুলছে, এমন সময় পাপের সহচরেরা এসে একটা প্রকাণ্ড পাঁচীর ভেঙ্গে তাদের উপর ফেলে দিল—তারা সব টুপ্‌ টুপ্‌ করে মরে গেল। [পৃ ৯৯—১০০]

যেখানে একটি ট্র্যাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা চলত, সেখানে এই 'টুপ্‌ টুপ্‌ করে মরে' যাওয়ার বর্ণনায় লেখকের নির্লিপ্ততাকে প্রশংসা করা যায় না, তাঁর সুযোগগ্রহণে অক্ষমতার কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

সেকালের সমালোচনায় 'বিবি রহিমা'র প্রশংসা করা হয়েছিল এর নীতিবোধের জন্যে আর ভাষার প্রাঞ্জলতার জন্যে। দুইই সত্য। ইবসেনের নোরাকে তার স্বামী যেকথা বলেছিলেন Before all else you are wife and mother, সেখানে mother-এর বদলে আল্লাহ্‌র ভক্ত জুড়ে দিলেই এই নীতির স্বরূপ বোঝানো যায়। আর ব্যবহারিক জীবনে এই নীতির প্রয়োগ কিভাবে করা যেতে পারে, রহিমার জীবন কাহিনী দিয়ে এবং নানা রকম নীতি উপদেশ দান করে লেখক তা স্পষ্ট করে তুলেছেন। আদর্শবাদের চাপে তাঁর অঙ্কিত চরিত্রসমূহ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে হয়েছে বর্ণহীন, তাদের মানবীয় আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়েছে. নীতিকথা বলার আগ্রহাতিশয্যে তেমনি অনেক সময়ে তাদের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়েছে। রহিমার পতিগৃহে যাত্রার সময়ে তাঁর পিতার চার পৃষ্ঠাব্যাপী অনর্গল উপদেশ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। চার পৃষ্ঠার অন্তে তাঁর কণ্ঠ যদি বাষ্পরুদ্ধ না হত, তবে অনায়াসে তা আরো চার পৃষ্ঠা চলতে পারত।

অন্যদিক দিয়ে 'বিবি রহিমা'র প্রশংসা করতে দ্বিধা হতে পারে না। কাহিনী পাঠক-চিত্তকে আকর্ষণ করে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়। প্রাঞ্জল ও লালিত্যময় কথ্য ভাষায় বইটি লেখা হয়েছে ঃ রচনার একটা সাবলীল গতি আছে। রচনারীতির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে Parallel simile-র ব্যবহার ঃ

> সোনার সহিত সোহাগার মত, ফুলের সহিত সুবাসের মত, রূপের সহিত গুণের মত, আইউবের চরিত্রে ধর্মের বিমল মাধুর্যও ফুটে উঠেছিল। [পৃ ৬৩]

সমাসোক্তির ব্যবহার (রূপক-সহযোগে) :

> জ্যোৎস্নার সাগরে সাঁতার দিয়ে সিক্তকেশা ধরণী সবেমাত্র চুল শুকাবার জন্য মুক্ত বাতাসে খোঁপা খুলে দাঁড়িয়েছে। [পৃ ৮৩]

যমকের প্রয়োগ :

> তাই খুব আহ্লাদ করেই আমরা ফল খেলেম। ফলের শেষে ফলটা যে কি রকম দাঁড়াবে, তা তখন ভেবে দেখলেম না। [পৃ ৬]

'বিবি ফাতেমা'ও (১৯২১) কথ্যরীতিতে লেখা। ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, আবেগপ্রবণ এবং সাংগীতিক ব্যঞ্জনাময়। যেমন,

> হজরত এলেন, নির্ম্মল চাঁদের মত স্নিগ্ধ আলোক ছড়িয়ে। পাপী-তাপীর বন্ধু এলেন—ভেসে যাওয়া লোকগুলির প্রাণ বাঁচাবার জন্য প্রেমের তরণী বেয়ে। মর্ম্মে মর্ম্মে ঝঙ্কারিত ক'রে—কর্ম্মের আলোকে সকল পথ সুগম ক'রে দিয়ে—সাম্য মৈত্রীর পতাকা তুলিয়ে—তপ্ত মরুতে শীতল জলধারার মতই তিনি এসে উপস্থিত হ'লেন। মানুষের কল্যাণের জন্য এলেন, অনুতপ্তের চোখের জল মুছাতে তিনি এলেন। বন্দীর প্রাণ আনন্দে নেচে উঠ্‌ল, হতাশের প্রাণ আশায় বাঁচল, রুগ্নদেহে শক্তি সঞ্চারিত হ'ল, নীরস কঠোর চিত্তশিলা, গলে জল হয়ে গেল। যেহেতু তিনি বন্দীর মুক্তিদাতা, হতাশের আশা, নষ্ট স্বাস্থ্যের নূতন রক্তকণিকা, কঠিন শিলার উগ্র দ্রাবক। তাঁকে পেয়ে সকলের আশা মিটল, তাঁকে দেখে সকলের বিষাদ ঘুচল, বন্ধুরূপে, ভ্রাতারূপে বৈদ্যরূপে, সান্ত্বনারূপে তিনি এলেন। [পৃ ২২—২৩]

বইটির প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে চার চরণের স্বরচিত কবিতা যোজিত হয়েছে। গ্রন্থ শুরু হয়েছে হজরত মুহম্মদ (দঃ) ও বিবি খাদিজার বংশপরিচয় দিয়ে। এখানেও লেখক মাঝে মাঝে উপন্যাসের রস দিতে চেয়েছেন। নফিসার মুখে বিবি খাদিজার বিবাহপ্রস্তাব শুনে হজরত বিশ্বাস করেন নি। তখন,

> বিবি খাদিজা, নফিসার মুখে সব কথা শুনে হজরতকে ডেকে পাঠালেন। হজরত গেলে বল্লেন,—"আপনি কি নফিসার কথায় অবিশ্বাস করেছেন? মনে করেছেন, আমার ধন আছে, আমি ধনীর ছেলেকে বিয়ে করবো? না, না, ভুল বুঝেছেন। আমি ধন চাই নে—আপনার নির্ম্মল মনের তুলনায় সে ধন যে ধনই নয়। যে ধন আপনার আছে, পৃথিবীতে সকলের তা থাকে না। আপনি দুঃখিনীকে চরণে ঠাঁই দিন, এই আমার প্রার্থনা। [পৃ ৭]

এর উত্তরে হজরতের মুখ দিয়ে অবশ্য উপন্যাসের নায়কের মতো উক্তি করাতে লেখক সঙ্কোচ বোধ করেছেন। তাই,

> হজরত মাথা নীচু ক'রে বল্লেন—আচ্ছা, আমি চাচাজীকে জিজ্ঞেস ক'রে কাল আপনাকে আমার মতামত জানাব। [পৃ ৮]

নবীনন্দিনীর জীবনকথা বলতে গিয়ে লেখক নবীর মহিমাই বেশী করে স্মরণ করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ

> অসাধারণ মানুষ যাঁরা, তাঁরাও ঠিক এই সূর্য্যেরই মত। তাঁদের আশেপাশে আর যার চাঁদেও যেন সূর্য্যের পাশে কৃষ্ণ আলোর মতই ম্লান—দীপ্তিহীন হ'য়ে যায়। [পৃ ৪৭]

এখানেও তাই হয়েছে। বইটিতে ফাতেমার কথা বেশী, না তাঁর জনকের কথা কথা বেশী, তা বলা দুষ্কর। ফাতেমার চরিত্রটিও হজরতের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন যে, তার স্বতন্ত্র বিকাশ হয় নি—হজরত-চরিত্রের একটি উপগ্রহ বলে তাঁকে মনে হয়। ফাতেমার মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্যে লেখক হজরত আয়েশা বা বিবি খাদিজার চেয়েও তাঁকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন; কোন চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এটি বোধহয় একমাত্র পন্থা নয়। সকল জীবনীকারের মতো ইনিও সাধারণ ও তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যত মাহাত্ম্য লক্ষ্য করেছেন।

যে মহিলা সম্প্রদায়কে 'আনন্দ, শিক্ষা এবং তৃপ্তি'দানের জন্যে এই গ্রন্থের অবতারণা, তাঁদের জন্যে, বিশেষ করে, ফাতেমার পতিগৃহে যাত্রার সময়ে হজরতের বারোটি উপদেশ মূল্যবান। কৃচ্ছ্রসাধনার পরাকাষ্ঠা ফাতেমার জীবনে আছে, তাঁর ধর্মপ্রাণতার তুলনাও বিরল।

'রাজর্ষি এবরাহীম' (১৯২৪)-কে শেখ ফজলল করিমের শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যেতে পারে। তার প্রধানতম কারণ এই যে, এ বই কেবল রাজর্ষি এবরাহীমের (মৃত্যু আঃ ৭৭৭ খৃষ্টাব্দ) কাহিনী নয়ঃ বইয়ের দুই-তৃতীয়াংশ কি তার চেয়েও বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে তপস্বী আদহামের কাহিনী এবং সেই কাহিনীই অধিকতর চিত্তাকর্ষক। আদহাম ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিতপ্রাণ দরবেশ, অপার্থিব প্রণয়ে বিভোর, নিত্যবস্তুর সন্ধানে হৃতজ্ঞান। আকস্মিকভাবে বলখ-

রাজনন্দিনীর অপূর্ব রূপলাবণ্য দর্শন করে তাঁর চিত্তবৈকল্য ঘটল এবং একইরকম নিষ্ঠা নিয়ে সেই রমণীকে লাভ করবার সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। এই ঘটনাটির মধ্যে যে human interest আছে, তা সত্যিই মূল্যবান। আধ্যাত্মিক জীবনসাধনা থেকে পার্থিব জীবনে ফিরে আসার দৃষ্টান্ত আমাদের 'গোরক্ষবিজয়ে'ও আছে। কিন্তু মীননাথের সেই "পতনের" পেছনে ছিল দেবীর অভিশাপ; তাঁর ভোগলালসা বিকৃতিরই নামান্তর। আদহামের প্রেমে বরঞ্চ সুস্থ, সবল কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় আছে। তাঁর ভক্তজীবন ও প্রেমিক জীবনে চিরবিচ্ছেদ ঘটে নি, একই সূত্রে তিনি দুই জীবনকে গ্রথিত করেছিলেন। সুফী সাধকের ভাবতন্ময়তার সঙ্গে প্রেমিক হৃদয়ের অতলস্পর্শী গভীরতা যুক্ত হয়ে তাঁর চরিত্রটিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আর সে চরিত্র অঙ্কনেও লেখক তাঁর সকল ক্ষমতা নিয়োগ করেছিলেন।

মোজাম্মেল হকও ইবরাহীম ইবনে আদহামের সাধনকাহিনী বিবৃত করেছেন,[২৯] কিন্তু তাঁর পিতার এই পার্থিব জীবনের প্রতি কোন ইঙ্গিত করেন নি। ইবরাহীমের জীবনী বর্ণনায় উভয়ে একই ধরণের উপাখ্যান প্রায় একই ধরণের ভাষায় বিবৃত করেছেন। সুফী ঐতিহ্যের সঙ্গে এঁদের বর্ণিত কাহিনীর কোথাও কোথাও অসঙ্গতি আছে। যেমন, ফরিদউদ্দীন আত্তারের 'তাজকিরাতুল আউলিয়া'য় ইবরাহীমের বল্‌খ রাজ্যত্যাগের কাহিনীটি যেভাবে বলা হয়েছে, ফজলল করিম—মোজাম্মেল হক সেভাবে বলেন নি। এঁদের কথিত কাহিনীটি সকলেই অবগত আছেন: প্রাসাদের ছাদে কে হারানো উট খুঁজতে এসেছিল এবং কে নাকি রাজপ্রাসাদকে পান্থশালা বলে অভিহিত করেছিল, এরই প্রতিক্রিয়ায় সম্রাট হলেন মহর্ষি। আত্তারের বইটিতে স্বয়ং ইবরাহীম-আদহামের জবানীতে কাহিনীটি বলা হয়েছে: একদিন তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন, এমন সময়ে কে এনে দিল এক দর্পণ; সেদিকে তাকিয়ে নিজের গন্তব্য তিনি দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন নিজের সমাধি, যেখানে কোন

২৯। তাপস-কাহিনী।

বন্ধু নেই—স্বজন নেই,—আর সেই পথও দুস্তর অথচ পথচলার পাথেয় তাঁর নেই। এক ন্যায়পরায়ণ বিচারককে তিনি দেখতে পেলেন, মনে হল তাঁর স্বপক্ষে কোন দলিল নেই আর অমনি নিজের কাছেই সাম্রাজ্য হয়ে উঠল বিস্বাদ।[৩০]

ইবরাহীম ইবনে আদহাম যদিও প্রথম যুগের খ্যাতনামা সুফী সাধক এবং সারা জগতে আলোচনার বিষয়, তবু আদহামের বিচিত্র জীবনকাহিনীর তুলনায় তাঁর উপাখ্যান বর্ণহীন বললে ভুল হবে না—অন্ততঃ বাংলায় আমরা যেভাবে এ কাহিনী পেয়েছি, তা থেকে এই ধারণাই জন্মায়। মানুষের রিপুর যে স্বীকৃতি আদহাম-চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে, তার প্রবল অস্বীকৃতিই ইবরাহীমের বৈশিষ্ট্য। রাজ্যত্যাগী ঋষির হৃদয়ে পুত্রস্নেহ যখন প্রবল হয়ে দেখা দিল, তখনই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে পুত্রের জীবনাবসান কামনা করলেন আর—সেই পুত্রের জননীর উপস্থিতিতেই—তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হল। এ ঘটনা অলৌকিক শক্তিলাভের চরম নিদর্শন সন্দেহ নেই, এতে আমরা বিস্ময়ে আপ্লুতও হতে পারি; কিন্তু ধূলায় লুণ্ঠিত জননীর কাতর আর্তনাদের মধ্যেই আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এই উপাখ্যানে mystic element আরো আছে, তার মধ্যে একটি হল খাজা খেজেরের চরিত্র।[৩১]

'রাজর্ষি এবরাহীমে' লেখক সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন (এটি লেখা হয় ১৯১৯ এ), এমন কি, অধিকাংশ সংলাপই—ক্রিয়াপদের দিক দিয়ে—সাধু ভাষায় লেখা। সংলাপ অবশ্য মাঝে মাঝে বড় দুর্বল—বিশেষ করে, কথ্যভাষার ঢং আনার চেষ্টা যেখানে হয়েছে। যেমন, বল্‌খের উজীর রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী ফকীরকে ভর্ৎসনা করছেন :

৩০। quoted in E. G. Browne : A Literary History of Persia (Cambridge : University Press, 1951 edn.), 1, 425.

৩১। কোরআনের একটি সুরায় (সুরা ১৮ ; The Koran, trans. Rodwell, "Everyman's Library", p 180) এঁর উল্লেখ আছে বলে মনে করা হয়। তবে চরিত্রটি বিশেষ করে পারস্যের সুফীদের কল্পনাকে আকৃষ্ট করেছিল বলে তাঁদের রচনাবলীর মাধ্যমে সাধারণের চেতনায় জীবন্ত হয়ে আছে। দেশভেদে এঁর রূপান্তরও ঘটেছে।

যদি মঙ্গল চাও, তবে সোজা পথে প্রস্থান কর। কেন, গাছতলা বুঝি আর পছন্দ হয় না? গেরুয়ায় বুঝি আর সাধ মিটে না? "জামাইবাবু" সাজিবার বড় আগ্রহ যে! [পৃ ৭১—৭২]

এ সত্বেও, সামগ্রিকভাবে, 'রাজর্ষি এবরাহীমে'র ভাষা ললিত, মধুর ও বেগবান: সাংগীতিক ব্যঞ্জনা ও ভাবাবেগময়তা এর বৈশিষ্ট্য। যেমন,

বিধাতার লীলা চিরদিনই দুর্জ্ঞেয়। অগ্নিময় বিজনমরুতে সুরসাল পান্থপাদপ যাঁহার অসীম করুণার নিদর্শন, বন্ধুর পর্বতগাত্রে সুশীতল নির্ঝরিণী যাঁহার অপূর্ব মাহাত্ম্যের পরিচায়ক, তাঁহার ভাব কয়জনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? [পৃ ৩-৪]

ফুল দেখিয়া মানুষ মোহিত হয়, আগ্রহভরে হস্ত সম্প্রসারণ করে; কেন বলিতে পার কি? আগুন দেখিয়া ব্যাকুল পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে ছুটিয়া আসে,—মরণের মাঝেও সে সুধা অন্বেষণ করে; কেন বলিতে পার কি? ফুলে কি চুম্বকশক্তি আছে? আগুনে কি শৈত্য আছে? কোন্ মোহে মানুষ মজে? পতঙ্গ আত্মবিসর্জন করে? শান্ত এবং রুদ্র, কোমল এবং কঠোরের অন্তরালে থাকিয়া কে এমনভাবে তাহাদের ব্যাকুল হৃদয়কে টানিয়া লয়? [পৃ ৫]

ফজলল করিমের গদ্যরচনার সবচেয়ে পরিণত রূপ বোধহয় এ বইটিতেই ধরা পড়েছে। তবে এ ভাষার এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, যা মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক বা এয়াকুব আলী চৌধুরীর রচনায় পাওয়া যায় না।

ঘটনার গতি রুদ্ধ করে এই বইতে তিনি প্রাসঙ্গিক চিন্তা সন্নিবেশ করেছেন—এবং একটু বেশী মাত্রায় করেছেন। এর উদাহরণ:

দাম্ভিক মানুষ! অত্যাচারী মানুষ! দেখ, দেখ, মানবদেহের পরিণামের দিকে একটীবার ফিরিয়া দেখ। তোমার জীবনের গতি ফিরিতে পারে, চরিত্রের হীনতা দূর হইতে পারে, হৃদয়ের মলিনতা ঘুচিতে পারে,—এই তোমার পরিণাম! ধনের মাদকতায় মনের প্রজ্ঞাহারা তুমি,—এই তোমার চরম গতি! ধনী-নির্ধন সকলকেই একদিন এই পথে গমন করিতে হইবে, এই শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে,—এইখানে আসিয়া বুভুক্ষিত কীটকুলের ভক্ষ্য

হইতে হইবে,—সেদিনের আর বিলম্ব নাই! জীবন-সঙ্গিনী প্রেয়সী, প্রাণাধিক পুত্র-কন্যা, হিতার্থী বন্ধু-বান্ধব কেহই সেদিন তোমার সহযাত্রী হইবে না; একা-একা—নিতান্তই তুমি একা পড়িয়া রহিবে। [পৃ ৮৩-৮৪]

অবশ্য এটি তাঁর নিজস্ব রীতি নয়। পাঠককে উদ্দেশ্য করে বা আত্মগতভাবে এই ধরণের ভাবপ্রকাশ প্রথম বোধহয় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই দেখা দিয়েছিল। পরে, মশাররফ হোসেন এর যথেষ্ট চর্চা করে গেছেন 'বিষাদ সিন্ধু', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়। ব্যাপারটি যে সব সময়ে উপাদেয় হয়, তা নয়: 'রাজর্ষি এবরাহীমে'ও সর্বত্র তা শোভন হয় নি। তবে মোটের উপর, যে ভাবুকতার পরিচয় রাখতে লেখক ইচ্ছা করেছিলেন, তাতে তিনি সফলকাম হয়েছেন।

বল্‌খ-অধিপতি ও তাঁর দৌহিত্র ইবরাহীমের মিলনের দৃশ্যটিতে 'শকুন্তলা'র দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর শিশুপুত্রের মিলনদৃশ্যের সক্ষম অনুকরণ আছে।

এরপর তাঁর যে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম 'বিবি খাদিজা' (১৯২৭): এটি রচিত হয়েছিল ১৯২৪ সালের মধ্যেই। বর্ণিতব্য চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

খাদিজা ছিলেন এক সওদাগরের মেয়ে। সওদাগর বলতে তোমরা যা বোঝ, তা নয়। তিনি পিঠে বোচ্‌কা নিয়ে কাবুলীদের মতন গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করে বেড়াতেন না,—তিনি ছিলেন দুচার লাখ টাকার মানুষ। [পৃ ১-২]

এইরকম ব্যাখ্যার একটাই কারণ হতে পারে: এ বই তিনি লিখেছিলেন মেয়েদের জন্যে আর তাঁদের কল্পনাশক্তি সম্পর্কে লেখকের ধারণা একটু সংকীর্ণই ছিল। প্রচলিত ছাঁদে লেখা এই জীবনীটিতে একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি আছে:

বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকায় সমাজ ধর্ম্ম দুইই রক্ষা পেয়েছে। নতুবা সমাজের অবস্থা আজ অন্যরকম হয়ে দাঁড়াত। [পৃ ৭৩]

এই উক্তির পেছনে সেকালের সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব আছে। বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্যে মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌ রীতিমতো প্রচার করতেন। হিন্দু

বিধবার পুনর্বিবাহের সুপারিশ করে তিনি 'বিধবাগঞ্জনা' নামে একটি বই লিখেছিলেন গত শতকের শেষে। 'ইসলাম কৌমুদী'তেও তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শেখ আবদুর রহিম-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকরে' মন্তব্য করা হয় যে, 'তাঁহার অসাধারণ চেষ্টায় মুসলানদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহেব প্রচলন হইয়াছিল।'[৩২] দেখা যাচ্ছে, ফজলল করিম সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

ফজলল করিমের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে 'গাথা' নামে একটি কাব্য এবং 'হাতেম তাই'য়ের গদ্য-উপাখ্যান। ছোটদের জন্যে দুটি জীবনচরিত তিনি রচনা করেছিলেন: 'সোনার বাতী' হজরত আবদুল কাদির জিলানীর জীবনী, 'হারুণর রশীদের গল্প' ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্রাটের কাহিনী।

তিন

শেখ ফজলল করিমের আরো অনেক রচনা সাময়িকপত্রের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। এখানে কয়েকটির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

'ইসলাম-প্রচারকে'[৩৩] ধারাবাহিকভাবে বের হয়েছিল 'ভগ্নবীণা বা ইসলাম চিত্র' কাব্য। প্রথম কিস্তিতে গদ্যে লেখা অবতরণিকা বের হয়: তারপর আট চরণের প্রতি স্তবকের ৫৯ স্তবকে সম্পূর্ণ কাব্যটি প্রকাশ পায়। এর বিষয় ইসলামের এককালের উন্নত অবস্থার স্মৃতি, সেই তুলনায় বর্তমান পতনের উপলব্ধি এবং পুনর্জাগরণের আহ্বান:

> সভ্যতা-শিরসে যে ইসলাম বিরাজে
> সে বাদশা-জাতি ফকির সাজে
> স্মরিলেও কথা বুকে শেল বাজে
> গোলামী হয়েছে জীবন সার।

৩২। শেখ হবিবর রহমান: কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা (কলিকাতা: মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৩৫)-তে উদ্ধৃত।

৩৩। মে-জুন ১৯০২, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০৩।

রুদ্রমন্ত্রে নেচে হুহুঙ্কার রবে
আয় আয় তোরা চল্‌ যাই তবে
ইসলাম-পতন কেমনে দেখিবে
কেমন রে বসিয়া রয়েছ আর।

কৌতূহলের বিষয় এই যে, এর অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত প্রবন্ধে তিনি এই ধরণের মনোভাবের সমালোচনা করেছেন :

"পতিত মুসলমান" নামটা আমরা অনেকদিন হইতেই পাইয়াছি। কবির কাব্যে, বক্তার গলাবাজীতে, লেখকের মসীলেপনের আড়ম্বরে এবং সমাজের সাধারণ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ধারণাটাও জন্মিয়া গিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে, এই "পতিত" নামটা আর কতদিন থাকিবে?—এখন কেমন করিয়া আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে—তাহাই বিচার্য।[৩৪]

এর উত্তরে তিনি বলেছেন যে, বাঙালী মুসলমানের উন্নতির জন্যে প্রয়োজন বিদ্যাশিক্ষা, আর্থিক উন্নতি, ধর্মনিষ্ঠা এবং একতা।

'সিপাহী যুদ্ধের [illegible]' নামে বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা কুমার সিংহ সম্পর্কে লেখা একটি হিন্দী ছড়াও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।[৩৫]

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পামার-অনূদিত 'হারুন অল রশীদ' গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ অবলম্বন করে তিনি 'আল হারুণ বা বোগদাদাধিপতি মহামান্য খলিফা হারুন অল রশিদের বিস্তৃত জীবনচরিত' সংকলন করেন।[৩৬] এছাড়া অন্যান্য ইতিহাসও তিনি লেখেছিলেন। হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মের পূর্বে আরবের অন্ধকার যুগের পরিচয় দিয়ে তিনি রচনা আরম্ভ করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যন্ত লেখাটা আমি দেখেছি। শিয়াদের মতো তিনিও এতে দাবী করেছেন যে, হজরত আলীর প্রতি বিবি আয়েশার মনোভাব অপ্রসন্ন ছিল এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হবার কারণ এই মনোভাব থেকেই জন্মায়।

৩৪। "উন্নতির উপায় কি?", ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩।

৩৫। ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০২।

৩৬। ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর ১৯০৫—ফেব্রুয়ারী ১৯০৬। এরপর 'ইসলাম প্রচারকে'র কোন সংখ্যা আমি দেখিনি। ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়ও 'আল হারুণ' অসমাপ্ত ছিল।

'কোহিনূর' পত্রিকায় বেরিয়েছিল 'উচ্ছ্বাস কাব্য'—'মোসাদ্দাস-ই-হালী'র বঙ্গানুবাদ।[৩৭] অনুবাদক নিবেদন করেছেন ঃ

> মোসাদ্দসে হালী উর্দ্দু ভাষার একখানি সর্ব্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহাতে আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন কাহিনী জলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।... এই অমৃতোপম কাব্যের ফলে যুক্তপ্রদেশে মরা গাঙ্গে জোয়ার ছুটিয়াছে। বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই কষ্টসাধ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি।...
>
> বঙ্গভাষায় "মোসাদ্দস্" ছন্দের অনুকরণ কষ্টকর, তবে করিতে পারিলে কিছু স্থায়ী লাভ হইত। আমি তাহা করিতে না পারিয়াই আপন পথে চলিয়াছি।

মধ্যে মধ্যে অনুবাদ বেশ ভাল হয়েছে। যেমন,

> পশুর সমান হায়! তোমাদের নিদারুণ দশা,
> অপমানে ঘৃণা নাই, সম্মানের নাহি কর আশা।
> মুখর শ্যামল কুঞ্জে প্রেম-মুগ্ধ হয়ে দিবানিশি
> কাটা'লে অমূল্য কাল, ডুবে গেল সৌভাগ্যের শশী।
> নরকে নাহিক ভয়, স্বর্গসুখ কর না কামনা,
> জ্ঞানধর্ম্ম বিসর্জ্জিলে, বিসর্জ্জিলে মুক্তির সাধনা।
> পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে ঢেলে দিলে পাপের কালিমা,
> তোমাদের সে পাপের কেহ কি রে দিতে পারে সীমা?

৩৭। কোহিনূর, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ১৩১২, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র ১৩১৩। এখানে কাব্য সমাপ্ত হয় নি, অথচ পরবর্তী সংখ্যায় আর প্রকাশিত হয় নি। এরপর 'কোহিনূরে'র প্রথম পর্যায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৮র বৈশাখ থেকে 'কোহিনূর' নবপর্যায় প্রকাশিত হতে থাকে। তাতেও 'উচ্ছ্বাস' বের হয় নি। আবদুল মওদুদ লিখেছেন, '১৯১৮ খৃষ্টাব্দে শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ 'জোয়ার ভাটা' নাম দিয়ে 'মুসাদ্দসের' অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন' ("বাংলা সাহিত্যের চর্চায় মুসলমান", সমকাল, শ্রাবণ ১৩৬৬)। এটি কি তাঁর স্বতন্ত্র অনুবাদ?

প্রথম চার চরণের অন্ত্যানুপ্রাস দুষ্ট বিবেচিত হলেও এখানে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও রচনার গতিশীলতা দুইই দেখা যায়।

১৩১১ সালের 'কোহিনূরে' তাঁর রচিত "দৃশ্যকাব্য" 'প্রেমের স্মৃতি' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল। এই নাট্য-রচনার বিষয়বস্তু নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার বিষাদময় জীবনকাহিনী।

১৯০৭ সালের 'সোলতান' পত্রিকায় তাঁর 'শোকগাথা' নামক রচনাটি প্রকাশিত হয়।[৩৮] মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে ২২৮ চরণের এই ছন্দোবদ্ধ শোকোচ্ছ্বাস তিনি রচনা করেন। এর মধ্যে একটু ব্যক্তিগত তথ্য আছে, সেটাই উল্লেখযোগ্য ঃ

> হায় আজো মনে পড়ে সেদিনের কথা
> যেদিন প্রথম দেখা তোমায়-আমায়,
> হৃদয়ের সে প্রগাঢ় প্রীতির প্লাবন
> কেমনে করিল পূর্ণ যুগল জীবন!
> তোমার বিপুল স্নেহ—আকুল আহ্বানে
> হতভাগ্য এই কবি লভি নববল
> অবতীর্ণ হয়েছিল সাহিত্য সংসারে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, শেখ হবিবর রহমান-প্রণীত 'কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা'র প্রারম্ভে ফজলল করিমের লেখা তেরো পৃষ্ঠার 'পূর্ব্বাভাস' সংযোজিত হয়েছে। এখানেও তিনি মেহেরুল্লাহ্‌র প্রতি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

চার

এক অর্থে, শেখ ফজলল করিমের সাহিত্যিক-মানস উনিশ শতকী সাহিত্যচর্চার আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিল। তাঁর রচনার সর্বপ্রধান লক্ষণ হচ্ছে

৩৮। অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী এটি পুনর্মুদ্রিত করেছেন 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৬২)।

আদর্শবাদ। আদর্শ পুরুষ ও রমণীর জীবনচিত্র অঙ্কনই ছিল তাঁর গদ্যরচনার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। কবিতায়ও তিনি নানা রকম নীতিবাদ প্রচার করেছেন। রচনার অবলম্বন হিসেবে তিনি কখনো ফারসী কাব্যকাহিনী আশ্রয় করেছিলেন, কখনো বা ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে মালমশলা সংগ্রহ করেছেন। আদর্শ জীবনচরিত রচনার ধারা বিদ্যাসাগরের হাতেই (জীবনচরিত, ১৮৪৯) শুরু হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র এতে যোগ দিয়েছিলেন (শ্রীকৃষ্ণচরিত্র, ১৮৮৬); তারপর একে পরিপুষ্ট করেছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১০), যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি এবং শেষ দুই দশকের মুসলমান লেখকেরা। ফারসী কাব্যকাহিনীর গদ্যরূপায়ণও শতাব্দীর প্রথম দিকেই আরম্ভ হয়েছিল—হরিমোহন কর্মকার, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাক প্রভৃতির হাতে। পরে মুসলমান লেখকেরা এই ধারাটিকেও বেগবতী করেছিলেন।

কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে এই বাহ্যিক ঐক্য বড় কথা নয়। লক্ষ্য করা যাবে যে, উনিশ শতকের humanismএর ছোঁয়া তাঁর রচনায় লাগে নি। তাই তিনি যে দেশের ও যে কালের মানুষ, তার প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর রচনায় মেলা দুষ্কর। হয় সেটা এসেছে নিতান্ত আকস্মিক ভাবে, কথাপ্রসঙ্গে, কিংবা যেখানে তিনি সচেতনভাবে দেশকালের কথা বলেছেন, সেখানে। তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলীর তুলনায় এই অনুভূতির অভিজ্ঞান খুবই সামান্য। বরঞ্চ তাঁর লেখা থেকে এ ধারণাই জন্মায় যে, প্রাকৃত জীবনের প্রতি লেখকের ততটা আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা ছিল না। আদর্শ জীবন বলতে তিনি ধর্মসাধনায় নিয়োজিত জীবনকেই বুঝেছেন; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য— সবকিছু ত্যাগ করে যে জীবন তার স্রষ্টার ধ্যানে সমাহিত হয়েছে— এবং শুধু তাই নয়— যে জীবন অলৌকিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেই জীবনকেই তিনি প্রণতি জানিয়েছেন। আধুনিক পাঠকের কাছে তাঁর এই জীবনবোধের আবেদন গভীর হতে পারে না।

এর ফলে, তিনি রূপকথাকে উপন্যাসের ছাঁচে ঢালার চেষ্টা করে গেলেন, অলৌকিকতাকে বাস্তবের মর্যাদা দিতে চাইলেন— কিন্তু বাস্তব মানুষের জীবন-কাহিনীর কথক হতে পারলেন না। আদর্শবাদিতার আতিশয্যে তাঁর লেখাকে

অনেক সময়েই 'বচন' বলে মনে হয়—'রচনা' বলে মনে হয় না। সংস্কৃত আলংকারিকদের একটি মূল্যবান সিদ্ধান্তের কথা মনে পড়ে। এক শ্রেণীর রচনাকে তাঁরা চিত্রকাব্য নাম দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, চিত্র যেমন বস্তু নয়, বস্তুর অনুকরণ, তেমনি কাব্যের অনুকরণ হচ্ছে চিত্রকাব্য ঃ চিত্রকাব্য রচনার হেতু লেখকের অশক্তিও হতে পারে, আবার উপদেশদান ও প্রচারপ্রবৃত্তি থেকেও এর সৃষ্টি হতে পারে। ফজলল করিমের শক্তি ছিল, কিন্তু নীতিগ্রন্থ-রচনার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়ে সেই শক্তিকে তিনি প্রধানতঃ উপদেশদানেই ব্যবহার করেছিলেন।

এসব কারণেই, তাঁর সৃষ্টিকে আমরা মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা দিতে পারি নে।

আমি অবশ্য ভুলি নি যে, যেকালে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, সেযুগে তাঁর রচনাবলী বাঙালী মুসলমান সমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। তার প্রধান কারণ, তখন পর্যন্ত সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের রুচিবোধ পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। ঈশপের গল্পের নীতিবাক্যের মতো একটি moral সাবালকসেব্য সাহিত্যেও আমরা আশা করেছি। ফজলল করিম সেই প্রত্যাশা মিটিয়েছিলেন।

কিন্তু সেকাল থেকে কিছুটা দূরে বসে আজ আমাদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, তাঁর প্রচারিত আদর্শবাদের আত্যন্তিক মূল্য কি ছিল? তাঁর জীবনবোধ কিছুটা পলায়নমুখী, লৌকিক জীবনবিরোধী। এমন কি, শরিয়তপন্থী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলেও এই সুফী ভাবধারাপুষ্ট আদর্শবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

উনিশ শতকে ধর্মসাধক ও তাপসদের অলৌকিক জীবনকাহিনী-রচনার ধারাটি ফজলল করিমে এসে পরিণতি লাভ করেছে। ফারসী কাব্যকাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থরচনার কালও এখানে এসে সম্পূর্ণ হয়েছে। এরপর লেখকেরা নিজেদের কাল নিয়েই সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। বাঙালী মুসলমান লেখকদের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে নজরুল ইসলামের দান অসামান্য। মোজাম্মেল হক-সম্পাদিত যে 'মোসলেম ভারতে' ফজলল করিমের 'রাজর্ষি এবরাহীম' প্রকাশিত হয়েছিল, সেই পত্রিকায়, সেই সময়েই, নজরুল তাঁর প্রথম জীবনের রচনা প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু নজরুলের রচনার প্রাণশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে নতুন ধারায় সাহিত্যসৃষ্টি করা তখন আর একজন প্রবীণ লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁর পালা তাই তখনই সাঙ্গ হল।

পরিশিষ্ট -

শেখ ফজলল করিমের গ্রন্থাবলী

১. তৃষ্ণা। করিমস লাইব্রেরী, কাকিনা, রংপুর, পৌষ, ১৩০৭। পৃ ৫+১৯।
২. মানসিংহ। কাকিনা, রংপুর, ১৯০৩। পৃ ১৪+২।
৩. আসরাত উস ছামী বা ছামীতত্ত্ব। শেখ ওয়াহিদ হোসেন, রংপুর, কার্তিক, ১৩০৭। পৃ ২৭।
৪. পরিত্রাণ। মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, যশোহর, ফাল্গুন, ১৩১০। পৃ ১৪৩+৯।
৫. লায়লী মজনু। ১৯০৩: দ্বি-স ১৯১৪, পৃ ১৫৭+১০; পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ষষ্ঠ-স নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৩৩, পৃ ১৫৭+১৫। অষ্টম-স কলিকাতা, ১৯৩১।
৬. মহর্ষি হজরত খাজা মইনুদ্দীন চিশতি (রহঃ)। জীবন চরিত। ১৯০৪; পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বি-স, নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯১৪। পৃ ১২৪+৮।
৭. মহর্ষি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফসানী (কদঃ)। জীবনচরিত। [কলিকাতা, ১৯০৪]
৮. আফগানিস্থানের ইতিহাস। ১৯০৯; দ্বি-স মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯২৭। পৃ ৯৬+৬।
৯. পথ ও পাথেয়। ১৯১৩; দ্বি-স ১৯১৮; তৃ-স নবযুগ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৫৪। পৃ ১৬২+৮।
১০. চিন্তার চাষ। কলিকাতা, ১৯১৬।
১১. গাথা।
১২. বিবি রহিমা। কলিকাতা, ১৯১৮; দ্বি-স ১৯২৫; তৃ-স ১৯৩৯; চ-স নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৫২। পৃ ১৯১+৪।
১৩. হারুণ অল রশীদের গল্প।
১৪. সোনার বাতী।
১৫. বিবি ফাতেমা। কলিকাতা, ১৯২১; দ্বি-স মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৪০। পৃ ১৫০।
১৬. রাজর্ষি এবরাহীম। কলিকাতা, ১৯২৪; দ্বি-স মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৪০; তৃ-স ১৯৫৫, পৃ ১৬৮।
১৭. বিবি খাদিজা। মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯২৭। পৃ ১২০+৮।
১৮. হাতেম তাই।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' তাঁর আরো কয়েকটি প্রকাশিত বইয়ের নাম করা হয়েছে ঃ

১. সরল পদ্য বিকাশ।
২. ওমর খৈয়ামের অনুবাদ (কাব্য)।
৩. বেহেশতের ফুল (গদ্য)।
৪. বাগ ও বাহার (উপন্যাস)।
৫. ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি (কাব্য)।
৬. রাজা মহিমারঞ্জন (কাব্য ও গদ্য মিশ্রিত)।

গ্রন্থপঞ্জী

ক. শেখ ফজলল করিম-রচিত গ্রন্থাবলী

খ. অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থতালিকা

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শকুন্তলা। দ্বিতীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৯।

২। এম. সিরাজুল হক : শিরাজী-চরিত। কলিকাতা : শিরাজী লাইব্রেরী, ১৯৩৫।

৩। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)। ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬।

৪। (ডক্টর) মুহম্মদ এনামুল হক : বঙ্গে সূফী প্রভাব। কলিকাতা : মোহসীন এণ্ড কোং, ১৯৩৫।

৫। মোজাম্মেল হক : খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তী। ঢাকা : মজিদীয়া লাইব্রেরী, ১৩১৫।

৬। ———তাপস-কাহিনী। কলিকাতা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস,।

৭। ———তাপস-জীবনী। কলিকাতা : হানিফ প্রেস, ১৩০৭।

৮। ———হজরত মোহাম্মদ। পঞ্চম সংস্করণ; কলিকাতা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৩৪২।

৯। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় : সাহিত্যপঞ্জিকা। কলিকাতা, ১৩২২।

১০। শেখ হবিবর রহমান (সাহিত্যরত্ন) : কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা। কলিকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১৯৩৫।

১১। Blumhardt, J. F.: Catalogue of the Library of the India Office, Vol. II, pt. IV: "Bengali, Oriya and Assamese Books." London, 1905.

১২। ———A Supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum. London, 1910.

১৩। ———& Wilkinson, J. V. S: Second Supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum. London, 1939.

১৪। Browne, E. G.: A Literary History of Persia, Vol 1. 5th edn.; Cambridge: University Press, 1951.

১৫। Gibb, H. A. R.: Mohammedanisn. 2nd edn.; "The Home University Library"; London: Oxford University Press, 1950.

১৬। Imperial Library: Author Catalogue of Printed Books in the Bengali Language, 2 Vols. Calcutta, 1941-43.

১৭। The Koran. translaled by Rodwell, J. M. "Everyman's Library"; London: J. M. Dent & Sons Ltd. Repinted 1953.

১৮। Tarachand: Influence of Islam on Indian Culture. Allahabad: The Indian Press Ltd., 1946.

গ. সাময়িকপত্র

১৯। ইসলাম প্রচারক। কলিকাতা, ১৯০০-১৯০৬।

২০। কোহিনূর। কলিকাতা, ১৩১২-১৩১৩। ২১। নবনূর। কলিকাতা, ১৩১০-১৩১১।

২২। মোহাম্মদী। ঢাকা, ১৩৬২। ২৩। সমকাল। ঢাকা, ১৩৬৬।

বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

সাহিত্যে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে ও ব্যক্তিজীবনে—সর্বত্রই প্যারীচাঁদ মিত্র অবিসংবাদী খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর জ্ঞানানুশীলনে যেমন ছিল অদম্য স্পৃহা তেমনি ছিল অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা ও অনুসন্ধিৎসা। এই অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও চিন্তাশীলতা অবশ্য সেই যুগেরই সাধারণ লক্ষণ। বাঙলা সাহিত্যের সেই ক্রান্তিকালের প্রথমাংশের যুগপুরুষ রামমোহন, শেষাংশের বিদ্যাসাগর; মধ্যবর্তীকাল 'ইয়ং বেঙ্গল'দের চাঞ্চল্যমুখর। প্যারীচাঁদ মিত্রের মানস গঠিত হয়েছে রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আলোকে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের সঙ্গে, আর তাঁর প্রতিভার স্ফূর্তি ঘটেছে বিদ্যাসাগরের সমকালে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই কলকাতায় প্যারীচাঁদের জন্ম। ১৮২৭এর ৭ই জুলাই তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন; এক বছর আগে (১৮২৬) ডিরোজিও এই কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৮২৯এ সতীদাহরহিত আইন পাশ হয় এবং ১৮৩০এর ১৫ই নভেম্বর রামমোহন বিলেত যাত্রা করেন—তাঁর এ যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থায় ভারতের অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করা। ১৮৩১এর এপ্রিলে কলেজ কমিটির হিন্দু সভ্যদের চক্রান্তের ফলে ডিরোজিও পদত্যাগ ক'রে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন; কিন্তু এ বছরেই ১৭ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৩১এর আগষ্ট থেকেই ডিরোজিওর ছাত্রেরা সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলার পরিচয় দিতে শুরু করেন[১] এবং ১৮৩২এর শেষাংশে প্রথমে মহেশচন্দ্র ঘোষ ও পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭ই অক্টোবর)—ডিরোজিওর এই দুই ছাত্র খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৩৩এ রামমোহনের চেষ্টায় ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীরা ডেপুটী

১। এর একটি চমৎকার বিবরণ আছে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (নিউ এজ। কলিকাতা ১৩৬২) গ্রন্থে। দ্রষ্টব্য: পৃ ১০৬।

ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ পর্যন্ত পাবার অধিকার পেল ; ইতিপূর্বে তাদের চূড়ান্ত অধিকার ছিল সেরেস্তাদারের পদ পর্যন্ত। এই ১৮৩৩এর ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহনের মৃত্যু হয়, এবং এই বছরই রামতনু লাহিড়ী ছাত্রজীবন শেষ করে হিন্দু কলেজেরই অধ্যাপক হন। আর কৃতীছাত্র হিসেবে প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৩৬ সালে হিন্দু কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরীর সাব-লাইব্রেরীয়ান পদ গ্রহণ করেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, প্যারীচাঁদ ছাত্রজীবন শেষ করার আগেই রামমোহনের মৃত্যু হয়েছে এবং ডিরোজিও-র ছাত্রদের অনেকেই সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। ১৮৪৮ সালে প্যারীচাঁদ পূর্বোক্ত লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান পদ পেলেন। ইতিপূর্বে তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন এবং ১৮৫৫ সালে নিজের দুই পুত্রকে অংশীদার করে তিনি 'প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স' নামে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির জন্য তিনি লাইব্রেরীয়ান পদ ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর কর্মনিষ্ঠার জন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ তাঁকে আজীবন কিউরেটর ও কাউন্সিলরের মর্যাদা দেন।

উনিশ শতকের সেই সামাজিক ভাঙাগড়ার দিনে কুলীন-অভিজাতের জন্য সমাজের উচ্চমঞ্চ আর নির্দ্দিষ্ট রইল না ; সমাজ শাসনের ভার নেমে এলো 'বিদ্যা' ও 'বিত্ত' অধিকারীদের হাতে।[২] প্যারীচাঁদ মিত্র বৈষয়িক উন্নতির জন্য যেমন শ্রমশীল ছিলেন তেমনি পরিশ্রমী ছিলেন জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও। ছাত্রজীবনেই তিনি নিজের বাড়ীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[৩] এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন, বীটন সোসাইটী, পশু ক্লেশ নিবারণী সভা, বঙ্গদেশীয় সমাজবিজ্ঞান সভা, ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার এণ্ড হর্টিকালচার সোসাইটি এবং সবশেষে থিয়োসফিকাল সোসাইটির পরম উৎসাহী কর্মী ছিলেন।[৪] কিন্তু তিনি সর্বাধিক স্মরণীয় তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য। বস্তুত ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন

২। দ্রষ্টব্য : বিনয় ঘোষ। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম খণ্ড। (বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ১৩৬৪)।

৩। দ্রষ্টব্য : শিবনাথ শাস্ত্রী। পূর্বোক্ত। পৃ ১২৯।

৪। (ক) "কেবল যে নামমাত্র সভ্য ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সভ্য থাকার অর্থ ছিল সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করা।"—শিবনাথ শাস্ত্রী। ঐ। পৃ ১৩২।

রেখে গেছেন। এর কারণ হচ্ছে: ডিরোজিওর ছাত্র হলেও প্যারীচাঁদ মিত্র অন্যান্য 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মত উগ্রস্বভাবের ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, "ডিরোজিওর মধ্যে নববৌবনের অসংকোচ ছিল……, কিন্তু কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি ছিলনা তাঁর আচরণে। তাঁর ছাত্রদের আচরণে যে বাড়াবাড়ি দেখা দিল তা তাঁদের বিশেষ পরিবেশের ফল—সেই পরিবেশে ধর্মের নামে মিথ্যাচার চলেছিল ব্যাপকভাবে, এই ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তারই অদ্ভুত, হয়তবা সাময়িক, প্রতিক্রিয়া।"[৫] আগেই বলেছি, প্যারিচাঁদ যখন কর্মজীবনে প্রবেশ

৪।(খ) 'প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথমে (১৮৩৯ সালে) "কালাচাঁদ শেঠ এণ্ড কোম্পানী"তে আমদানি-রফতানির কাজ করেন। পরে ১৮৫৫ সালে দুই ছেলেকে নিয়ে "প্যারীচাঁদ মিত্র এণ্ড সন্স" কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ক'রে স্বাধীন বানিজ্যে প্রবৃত্ত হন। "গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল কোং লিঃ", "পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোং", "হাওড়া ডকিং কোং লিঃ", ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন প্যারীচাঁদ। তিনি "বেঙ্গল টি কোং" "ডারা টি কোং লিঃ"-এরও ডিরেক্টর ছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতন সংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও প্যারীচাঁদের অভিযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৮ সালে যখন "দি সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ" প্রতিষ্ঠা হয় তখন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী তার যুগ্ম-সম্পাদক হন। "দি বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির" (১৮৪৩) সভাপতি ছিলেন জর্জ টমসন, অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ। তিনি গোড়া থেকেই "দি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" (১৮৫১), "বীটন সোসাইটি" (১৮৫১), "দি ক্যাল্‌কাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেন্‌শন অফ্ ক্রুয়েলটি টু এনিম্যাল্‌স" (১৮৬১) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বেভারলি সাহেব ও প্যারীচাঁদ "দি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের (১৮৬৭) যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৮২০ সালে কেরী সাহেব এদেশের কৃষির উন্নতির জন্য যে "এগ্রিকালচার এণ্ড হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া"র প্রতিষ্ঠা করেন, ১৮৪৮ সালে প্যারীচাঁদ তার সদস্য হন, কৃষিবিষয়ে সোসাইটির জার্নালে অনেক প্রবন্ধ লেখেন এবং অনেক ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন।' —বিনয় ঘোষ। বাঙলার নবজাগৃতি, প্রথম খণ্ড (ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড। কলিকাতা ১৩৫৫)। পৃ ১৭৫।

৫। (ক) কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলার জাগরণ (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। কলিকাতা ১৩৬৩) পৃ ৫২।

(খ) অবশ্য উগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির দেশপ্রীতিও যে সদাজাগ্রত ছিল সে কথা স্মর্তব্য। দ্রষ্টব্য: শিবনাথ শাস্ত্রী। পূর্বোক্ত। পৃ ১১২-১২০।

করেন তখন 'ইয়ং বেঙ্গল'র কর্ণধারেরা প্রায় সকলেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাই 'ইয়ং বেঙ্গল'দের পরিমণ্ডলে মানসগঠিত হলেও তাঁদের উগ্রস্বভাব তিনি বর্জন করেছিলেন সযত্নে; কেননা প্রথমত এই উচ্ছৃঙ্খলার পরিণাম তিনি লক্ষ্য করেছিলেন খুব কাছ থেকে, তাছাড়া রামমোহনের আদর্শও ছিল সামনে এবং সর্বোপরি, কৃতিছাত্র হিসেবে তিনি পূর্বাপরই ছিলেন উচ্ছৃঙ্খলতা-বিরোধী। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গল'দের পরিমণ্ডলে থেকে তিনি লাভ করেছিলেন মুক্তদৃষ্টি এবং অপূর্ব কর্মোদ্যম। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা।

প্রাচ্য ঐতিহ্যে গভীর জ্ঞান অর্জন করার পর রামমোহন পশ্চাত্যজ্ঞান আহরণে ব্রতী হয়েছিলেন। এই প্রাচ্য-ভিত্তি ছিল বলেই তিনি কখনো সত্যবিচারের সমদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেননি। তাই দেশের মঙ্গলার্থে তিনি প্রাচ্যকে বর্জন ক'রে পাশ্চাত্যকে আঁকড়ে ধরেননি 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মত। বরং এক সমন্বয়ের চেষ্টা ছিল তাঁর এবং এ জন্যেই তিনি মানবীয় দৃষ্টিকোন থেকে এক নতুন উদার ধর্মের প্রবর্তন করলেন—গড়ে তুললেন ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর থেকেই এই ব্রাহ্মসমাজের কাজ স্তিমিত হয়ে এল এবং এ সময়ে সমাজে 'ইয়ং বেঙ্গল'দেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেল। ইতোমধ্যে আলেকজাণ্ডার ডাফে প্রচারিত খৃষ্টধর্মের আকর্ষণ বেড়ে গেল শিক্ষিতদের মধ্যে। সনাতন পন্থীরা রামমোহনেরই বিরোধিতা করেছিলেন তাই 'ইয়ং বেঙ্গলদল' তাঁদের কাছে ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠল। ১৮৪৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সবান্ধব ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং এ সময় থেকে ব্রাহ্মসমাজে আবার উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি হতে লাগল। এরই মধ্যে কর্মীপুরুষ কেশবচন্দ্রের আগমনে ব্রাহ্মধর্ম দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মিলিত শক্তিতে সনাতনপন্থী ও 'ইয়ং বেঙ্গল'দের দুই মেরুকে প্রায় একত্রিত করে ফেলল। ব্রাহ্মসমাজ একদিকে যেমন সনাতনপন্থীদের গোড়ামী ও অন্ধদৃষ্টির নিন্দা করল অন্যদিকে তেমনি নব্যদলের অত্যধিক উচ্ছৃঙ্খলা প্রশমিত করতে সচেষ্ট হল। আর এরই মধ্যে যুগ-পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হল। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পর তিনি নবজাগ্রত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে স্বীকৃতিলাভ করলেন। এবং এরপর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য ও বাঙালীসমাজ

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব-শাসিত। রামমোহনের মত তিনিও ছিলেন 'হিউম্যানিষ্ট পণ্ডিত'।[৬] তিনিও প্রাচ্য-মনীষার দৃঢ় ভিত্তির উপরে পশ্চাত্যজ্ঞান আহরণ করেছিলেন। তাই তাঁর প্রত্যেকটি সমাজচিন্তা ও নির্দেশ ছিল অভ্রান্ত।

বিদ্যাসাগর প্যারীচাঁদের বয়োকনিষ্ঠ।[৭] সামাজিক প্রতিষ্ঠাও তিনি পেয়েছেন অনেক পরে। কিন্তু সাহিত্য সাধনার দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর প্যারীচাঁদের অগ্রজ। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগী হিসেবে প্যারীচাঁদ 'মাসিক পত্রিকা' নামে 'স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্তে' একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার ৭ম সংখ্যা (১ম বর্ষ) থেকে তাঁর বহুখ্যাত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হ'তে থাকে।[৮] এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে।[৯] কিন্তু ইতোমধ্যেই বিদ্যাসাগর তাঁর প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলো প্রকাশ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।[১০] প্যারীচাঁদ অন্তত ভাষারীতির দিক থেকে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করবার জন্যেই যেন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এ উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ছিল বটে। তবু প্যারীচাঁদ-মানসে, প্রথম পর্যায়ে গৌণ হলেও, সাহিত্য রচনার স্বতন্ত্র কারণও ছিল। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিজের মুক্ত বিচার-দৃষ্টি তাঁকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনা বহুলাংশে ব্রাহ্মধর্মেরই সপক্ষে নিয়োজিত হয়েছে।

৬। দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষ। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ: প্রথম খণ্ড। পৃ ৪৮-৬৪।

৭। বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ খৃষ্টাব্দ।

৮। দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 'আলালের ঘরের দুলাল' (তৃ-স ১৩৬২)। ভূমিকা। পৃ ।/০।

৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (ঢাকা ১৯৫৬) 'আলালের ঘরের দুলালের' প্রকাশকাল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বলা হয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ জাতীয় অনুমানে ভ্রান্তির কারণ নির্দেশ করেছেন। দ্রষ্টব্য: পূর্বোক্ত। পৃ ।৶০ পাদটিকা।

১০। বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৬), সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩), শকুন্তলা (১৮৫৪), বিধবা বিবাহ বিষয়ক দুটো প্রস্তাব (১৮৫৫), ইত্যাদি।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরোধিতা করে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন।[১১] "১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় একটি বিশেষ বিবাহ-বিধি পাশ করা হল—যা তাঁদের প্রতি প্রযোজ্য যাঁরা নিজেদের প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করেন না।" এতে হিন্দু সমাজে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কেশবচন্দ্র বলেন: The term Hindu does not include the Brahmo। প্রতিবাদে ১৮৭৩ সালে রাজনারায়ন বসু লেখেন: ব্রাহ্মধর্ম উন্নতি হিন্দু ধর্ম।[১২] এ সময়ে ডফের খৃষ্টধর্মান্দোলনের হাত থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সনাতনপন্থী ধর্মসমাজের সঙ্গে একত্রে কাজে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে আপনকন্যার বিবাহের কালে কেশবচন্দ্র স্বপ্রতিষ্ঠিত বিবাহবিধি লঙ্ঘন করায় এবং অন্যান্য কারণে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। "কেশবচন্দ্রের বিরোধীদল নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেন 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'। তাঁরাই হলেন ব্রাহ্মদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবশিষ্ট শিষ্যদের নিয়ে কেশবচন্দ্র গড়লেন 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ', আর মন্থরগতি ব্রাহ্মরা এতদিন 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত ছিলেন, এবার তাঁরা নিজদের প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেন 'আদিব্রাহ্ম সমাজ"।[১৩]

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ 'বঙ্গদেশে ব্যাবস্থাপক সভার সদস্য' মনোনীত হন। এ পদে তিনি দু'বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৪] ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে নভেম্বর প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু হয়। তাঁর "মৃত্যুতে 'হিন্দু পেটরিয়ট' লেখেন: 'In him the country loses a literary veteran, a devoted worker, a distinguished author, a clever wit, an earnest patriot and an enthusiastic enquirer.'"[১৫] বলাবাহুল্য, প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত এই বিশেষণরাজির কোনটিই অতিরঞ্জনদুষ্ট নয়।

১১। কাজী আবদুল ওদুদ। পূর্বোক্ত। পৃ ৯৩ দ্রষ্টব্য।
'অভেদী'তে ব্রাহ্মসমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র আছে।
১২। কাজী আবদুল ওদুদ। ঐ। পৃ ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য।
১৩। ঐ। পৃ ১০৯।
১৪। দ্রষ্টব্য: শিবনাথ শাস্ত্রী। পূর্বোক্ত। পৃ ১৩২।
১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। পূর্বোক্ত। পৃ ১, উদ্ধৃত।

দুই

সাহিত্যকর্মী হিসেবে প্যারীচাঁদের খ্যাতির উৎস তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'। প্যারীচাঁদ সর্বমোট ১৯টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—তার ১১ খানি বাঙলা।[১৬] কিন্তু কালের অবক্ষয় এড়িয়ে ওই একটি মাত্র গ্রন্থই নিত্যকালের বাঙালীর কাছে তাঁর পরিচয় চিরভাস্বর করে রাখবে। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে 'আলালের ঘরের দুলাল' ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। আর প্যারীচাঁদের প্রায় সব গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হলেও এই একটিগ্রন্থ সহজলভ্য।

১৬। প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত গ্রন্থাবলী:

আলালের ঘরের দুলাল॥ 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ ৭ম সংখ্যা (১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়; তবে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭; তৃ-স পৌষ ১৩৬২। নতুন সাহিত্যভবন থেকে সচিত্র সংস্করণ, প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৬৩॥

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯)। রামারঞ্জিকা (১৮৬০) মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে এটি প্রকাশিত হয়, 'সুতরাং রামারঞ্জিকা প্যারীচাঁদের প্রথম রচনা'—ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: ২ (বর্ধমান সাহিত্যসভা। তৃ-স ১৩৬২) পৃ ১৬৯। কৃষিপাঠ (১৮৬১)। গীতাঙ্কুর (ঐ)।; যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫)। অভেদী (১৮৭১)। ডেভিড হেয়ারের জীবন-চরিত (১৮৭৮)। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা (ঐ)। আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)। বামাতোষিনী (১৮৮১)॥ 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' থেকে এই গ্রন্থগুলো 'সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত' হ'য়ে তৎ লিখিত 'গ্রন্থকারের জীবনী ও সমালোচনাসহ' 'টেকচাঁদ গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)' নামে প্রকাশিত হয়॥

এ ছাড়া প্যারীচাঁদ কয়েকটি বাঙলা প্রবন্ধ, ৮টি ইংরেজী গ্রন্থ ও প্রায় ২৩টি ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এ সব রচনার অধিকাংশই থিয়োসফি সংক্রান্ত। তাঁর আলালের ঘরের দুলালের দুটো ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল॥

বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সাহিত্য সাধক চরিতমালা দ্বিতীয় খণ্ড, ২১ সংখ্যা। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলিকাতা। পঞ্চম সং ১৩৬২)। পৃ ১৯১—১৯৬।

তবু প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙলা সাহিত্যের অধিক কথিত এবং অল্প আলোচিত গ্রন্থকারদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা হয়েছে প্রায়ক্ষেত্রেই তা ভাষার ইতিহাসে তাঁর গুরুত্বসম্পর্কিত এবং সে আলোচনাও প্রধানত 'আলালের ঘরের দুলাল'-কেন্দ্রিক; সুতরাং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্রের যে ভূমিকা তা আদৌ উপেক্ষণীয় নয়; এবং নয় বলেই, তা স্বতই পুনর্বিচারের দাবী রাখে।

আলালের ঘরের দুলাল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উপন্যাস বিচারের একটা মূলকথা মনে পড়ছে: "One looks to the novel less for its significance in the history of ideas than for its connexions with social history, of which it is often a transposition or more or less a deliberate commentary. It may show us the physical manner in which people lived at a particular date, but it is also likely to deal with the personal relationships of people living together in a social group and regulated in their conduct by the prevailing conventions".[১] কথাটি পরিণত পর্যায়ের উপন্যাস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হলেও বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের সূত্রপাত সমাজ-সমালোচনা হিসেবেই—সমকালীন জীবনের 'deliberate commentary' রূপেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই উপন্যাসের পূর্বসূত্র হিসেবে ঐতিহাসিক কাহিনী বা রোমান্সমূলক কাহিনী বিদ্যমান; অথচ আধুনিক বাঙলা গদ্যে উপন্যাসের জন্ম হ'ল এই তথাকথিত অতি আবশ্যক স্তরকে অতিক্রম করে, আর ততোধিক বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে: নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সমাজই হল তার ভিত্তিভূমি। বাঙলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক বঙ্কিম চন্দ্রের আজীবন 'রোমান্স' রচনার তাৎপর্য এই সূত্রেই নিহিত বলে মনে হয়: প্রথম যুগের এই উল্লম্ফনের কারণেই বঙ্কিমকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। এদিক থেকে বঙ্কিম

১। Geoffrey Brereton: A Short History of French Literature, (Penguin Books. London. 1956 edn.) ch 8, p 108.

মানসের নবমূল্যায়ণ হয়ত অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগের মুসলিম সাহিত্য সাধনায় রোমান্স রসের পরিচয় মেলে সত্য; কিন্তু আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের পূর্বসূত্র এ সমস্ত উপাখ্যানে সন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া রোমান্স রসের কাব্য আর রোমান্স মূলক উপন্যাসের ভিত্তি যে স্বতন্ত্র, তা বলা বাহুল্য।

'ইয়ং বেঙ্গল'দের উচ্ছৃঙ্খলতা 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার কারণ হল। এই রক্ষণশীল দলের প্রবক্তা তাঁর 'নববাবু বিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়',[১৮] প্রভৃতি তীক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক রচনায় আপাত সূত্রবদ্ধ গল্পের আশ্রয় নিলেন। কিন্তু মুখ্যত খণ্ডচিত্র রচনায় আগ্রহ থাকায় 'কোন পূর্ণাঙ্গ কাহিনী' গড়ে উঠল না। টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্রই এই 'সম্পূর্ণ সামাজিক কাহিনী গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন'।[১৯] তাঁর সাফল্যের প্রধান কারণ তিনি ভবানীচরণের মত রক্ষণশীল ছিলেন না। সমাজ সমালোচক হিসেবে প্যারীচাঁদের প্রচার্য তত্ত্বকথাটি যেমন সমকালীন মাপকাঠিতে উদার ও আধুনিক তেমনি সমাজচিত্র হলেও 'আলালের ঘরের দুলালের' স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টরেখায় চিহ্নিত। 'এর মর্মগত সুশিক্ষার বাণী', 'একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক' কাহিনী, কাহিনী বর্ণনার বিশিষ্ট ভঙ্গি, চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য এবং 'সাহিত্যে লোকায়ত ভাষার প্রথম প্রয়োগ প্রয়াস'[২০]—সব মিলিয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা গদ্য সাহিত্যে নতুন পথের সূচনা করেছে।[২১]

১৮। কলিকাতা কমলালয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। কলিকাতা ১৩৪৩।
নববাবু বিলাস। ঐ। ১৩৪৪।

১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নতুন সাহিত্য ভবন সংস্করণ (কলিকাতা ১৩৬৩) আলালের ঘরের দুলালের ভূমিকা। পৃ ৪।

২০। ঐ। পৃ ৬।

২১। প্রয়োজন সামান্য হলেও প্রসঙ্গত Mrs. Hanna Catherine Mullens রচিত 'The history of Phulmani and Karuna, a book for native christian women, ফুলমনি ও করুণার বিবরণ. স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থে বিরচিত' (কলিকাতা ১৮৫২) গ্রন্থটির কথা এসে পড়ে। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য সহ গ্রন্থটি সম্প্রতি পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে (জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা, নতুন সংস্করণ ১৩৬৫)।

উনিশ শতকের বংলায় হিন্দু মধ্যবিত্ত জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 'বিত্ত' এবং 'বিত্ত' যখন সমাজ শাসনের অধিকার অর্জন করল তখন স্বাভাবিকভাবেই শুধুমাত্র বিত্তের অধিকারীরা উচ্ছৃঙ্খলার চক্রাবর্তে নিমজ্জিত হলেন। এর অবশ্যম্ভাবী অবক্ষয়ী পরিণতি থেকে সমাজকে রক্ষা করবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ

কথিত আছে, এটিই বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক গদ্য-কাহিনী। মূল গ্রন্থটি প্রকাশের পর বৎসর (১৮৫৩) এর একটি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। মিসেস মুলেন্সের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বিশ্বাস বিজয় অর্থাৎ বঙ্গদেশে খ্রীষ্ট ধর্মের গতির রীতির প্রকাশার্থ উপাখ্যান' (কলিকাতা ১৮৬১) মূল ইংরেজীর অনুবাদ। অধুনা দুষ্প্রাপ্য এই শেষোক্ত গ্রন্থটি উদ্ধার করে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান মিসেস মুলেন্সের প্রথম গ্রন্থটির বাঙলা মৌলিক রচনার দাবী সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন (দ্রষ্টব্য 'Bengali Novel'. Letters to the Editor. The Sunday Statesman. July 12, 1959)। এ প্রশ্নের পেছনে যুক্তি হল: খৃষ্ট ধর্ম প্রচারার্থে যিনি প্রথম গ্রন্থ বাঙলায় রচনা করেছেন তিনি একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থ রচনাকালে ইংরেজীর আশ্রয় নেবেন কেন? আট বছরের ব্যবধানে লেখিকার বাঙলা ভুলে যাবার তো কোন কারণ নেই! সুতরাং এমন সন্দেহ করা কি অসঙ্গত যে, 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' মূলগ্রন্থও ইংরেজীতে লেখা হয় এবং যেহেতু তার প্রচার 'native christian women'-দের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন সেহেতু তার বাঙলা অনুবাদই প্রথম প্রকাশ করা হয়; হয়ত প্রয়োজনবোধে পরে ইংরেজী গ্রন্থও প্রকাশিত হয়—পরে প্রকাশিত বলে অনুবাদের নাম নিয়ে? নতুন সংস্করণ গ্রন্থটির ভূমিকায় বা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবাবে (দ্রষ্টব্য: 'Bengali Novel.' Letters to the Editor. The Sunday Statesman. July 19, 1959) এ সব প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না।

মৌলিকতা সম্পর্কে এই সন্দেহের অবকাশ ছাড়াও, মুখ্যত দুজন খৃষ্টান রমণীর জীবনযাত্রা প্রণালীর বাইবেল-উদ্ধৃতি-কণ্টকিত এই 'বিবরণে' 'উপন্যাস লক্ষণ' দুর্লক্ষ্য। এবং যে কারণে ভবানীচরণের রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নয় সেই একই কারণে এটিও অগ্রাহ্য। ভূমিকাকার কর্তৃক দাবীকৃত প্রেম-চিত্র রচনার প্রচেষ্টামাত্রই উপন্যাস নয়। বলাবাহুল্য 'আলালের ঘরের দুলাল' ও সীমিত অর্থেই উপন্যাস।

এ ক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন: 'ফুলমনি ও করুণার বিবরণ' যদি বাঙলা ভাষার প্রথম মৌলিক গদ্য কাহিনী হয়ও তবু 'আলালের ঘরের দুলালের মর্যাদা যে সমস্ত কারণে সুপ্রতিষ্ঠিত, তা তৎকালে অনন্যসুলভ, সুতরাং সহজ ভঙ্গুর নয়।

যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে কথা আগেই বলেছি। প্যারীচাঁদ মিত্র এই নবলব্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলেন যে ধর্ম- ও নীতি-হীনতাই এই উচ্ছৃঙ্খলার মুখ্য কারণ। সুতরাং আদর্শ জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যেই রয়েছে এ থেকে মুক্তির পথ। এ কথাই প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি 'আলালের ঘরের দুলালের' কাহিনী নির্মাণ করলেন। আবাল্য অতিআদরে ধনীপুত্র মতিলাল কখনো ধর্ম ও নীতির শিক্ষা পায়নি উপরন্তু অসৎ সঙ্গে সে অবনতির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে; অন্যদিকে মতিলালেরই অনুজ রামলাল আদর্শচরিত্র বরদাবাবুর একান্ত স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হয়ে, তাঁর সকল নির্দেশ মান্য ক'রে, সর্বজনের প্রশংসা অর্জন ক'রেছে। মতিলালের চৈতন্যোদয় এবং আদর্শজীবনের প্রতি আকর্ষণে গ্রন্থের সমাপ্তি। গ্রন্থের এই দুই প্রধান ঘটনাস্রোত বিচিত্র খণ্ডক্ষুদ্র ঘটনায় পল্লবিত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মূলঘটনা অপেক্ষা এই বিচিত্র খণ্ড ক্ষুদ্র পল্লবিত ঘটনাই গ্রন্থটির আশ্চর্য সফলতার কারণ। "বস্তুতঃ বরদাবাবুর মত মূর্তিমান নীতিপাঠ, বেণীবাবুর মত সজ্জন অথবা আদর্শ যুবক রামলাল—এরা কেউই আলালের মূল আকর্ষণ নয়। এদের মধ্যে সুশিক্ষা থাকতে পারে —কিন্তু উপন্যাসের যা প্রধানতম উপকরণ—জীবনের স্পর্শস্বাদ, তা এই চরিত্রগুলিতে কোথাও নেই। 'আলালের অবিস্মরণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে মতিলাল স্বয়ং এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ হলধর গদাধর ইত্যাদি, ধড়িবাজ মুৎসুদ্দি বাঞ্ছারাম, শিক্ষক বক্রেশ্বরবাবু ও সর্বোপরি একটী অপরূপ সৃষ্টি ঠকচাচা।··· ···সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সম্পর্কেই প্যারীচাঁদের তীক্ষ্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল।"... এবং প্রত্যেকটি চরিত্রই "সেই অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছ।"[২২]

আলালের কাহিনী বিন্যাসে 'Stock situation ও Stock character-এরই বাহুল্য রয়েছে, তবু তার মধ্যেই মানসভঙ্গি অনুযায়ী চরিত্র নির্দেশের সূচনাও ঘটেছে। বিশিষ্ট বাচনভঙ্গি বা আচরণের আভাসে পার্শ্বচরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এবং এ ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ যে বাস্তবতা ও রসচেতনার পরিচয় দিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ। মতিলালের জীবনকাহিনী রচনাই

২২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত, পৃ ৭

প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, সেদিক থেকে সে-ই এই কাহিনীর নায়ক; কিন্তু উপন্যাসের উত্থান পতন নিয়ন্ত্রণ করেছে ঠকচাচা। "সেদিক দিয়া দেখিলে ঠকচাচাই আসল নায়ক, এবং তাহা হইলে বইটি 'পিকারেস্‌ক' নভেলের পর্যায়ে পড়ে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম অমর চরিত্র হইতেছে ঠকচাচা' পুরানোর সাহিত্যের ভাঁড়ুদত্তের পাশে তাহার স্থান সাহিত্যসৃষ্টির জনবিরল অমরাবতীতে।"[২৩] "সুনীতির মানদণ্ডে ভাঁড়ুদত্ত ও ঠকচাচা যতখানি খাটো, সুবাক্যের মানদণ্ডে তাহার ততখানি বড়।"[২৪] 'তুনিয়াদারি করিতে গেলে ভালা বুরা তুই চাই—তুনিয়া সাচ্চা নয়, মুই একা সাচ্চা হ'য়ে কি করবো?'[২৫] ঠকচাচার এই জীবনদর্শনে স্পষ্টোচ্চারিত বাস্তববুদ্ধি চমৎকৃত করে। ঠকচাচা চরিত্রচিত্রণে প্যারীচাঁদের রসচেতনার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে:

> 'জাল করিতে, সাক্ষী সাজাইয়া দিতে, দারোগা ও আমলাদিগকে বশ করিতে গাঁতের মাপ লইয়া হুকুম করিতে, দাঙ্গাহাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে নয়কে হয় করিতে তাহার তুল্য আর একজন পাওয়া ভার। তাহাকে আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত। তিনিও তাহাতে গলিয়া যাইতেন এবং মনে করিতেন আমার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে, রমজান ঈদ সোবেরাত আমার করা সার্থক, বোধ হয় পিরের কাছে ক'ষে ফয়তা দিলে আমার কুদরৎ আরও বাড়িয়া উঠিবে।[২৬]

এ গ্রন্থের অধিকাংশ চরিত্রই অসাধু, আর তারা "সকলেই ঠকচাচার প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু প্রতিভার জোরে সে আর সকলকে অনেক পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে, ঠকচাচী

২৩। ডঃ সুকুমার সেন। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস: ২ (বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা। তৃ-স ১৩৬২) পৃ ১৬৭।

২৪। প্রমথ নাথ বিশী। বাংলা সাহিত্যের নরনারী। (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। কলিকাতা ১৩৬০) পৃ ১৯।

২৫। নতুন সাহিত্য ভবন সং। ১৩ পরিচ্ছেদ। পৃ ৮২।

২৬। ঐ। ৫ পরিচ্ছেদ। পৃ ৩৬-৩৭

ছাড়া ঠকচাচার তুলনা মেলা ভার, কেবল চাচীর কাছে চাচা কিঞ্চিত সংযত"।[২৭] বস্তুতঃ এই গ্রন্থের স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ঠকচাচী চরিত্রে প্রবল সম্ভাবনা ছিল। ঠকচাচার মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ ধড়িবাজ ব্যক্তি যে ঠকচাচীর কাছে কেমন অসহায় তা একটি মাত্র দৃশ্যে আশ্চর্যজনকভাবে উপস্থিত করা হয়েছে ঃ

> 'যেমন দেবা তেমনি দেবী—ঠকচাচা ও ঠকচাচী দুইজনই রাজযোটক—ঃ বুদ্ধির জোরে রোজগার করে—স্ত্রী বিদ্যার বলে উপার্জন করে। যে স্ত্রীলোক স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু গুমর হয়, তাহার নিকট স্বামীর নির্জলা মান পাওয়া ভার, এইজন্যে ঠকচাচাকে মধ্যে মধ্যে দুই একবার মুখঝামটা খাইতে হইত। ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কি ফয়দা? তুমি হরঘড়ি বল যে বহুত কাম, এতনাবাতে কি মোদের পেটের জ্বালা যায়। মোর দেল বড় চায় যে জরি জর পিনে দশজন ভালো ভালো রেণ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখিনা, তুমি দেয়ানার মত ফের—চুপচাপ মেরে হাবলিতে বসেই রহ। ঠকচাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি যে কোশেশ করি তা কি বল্‌ব, মোর কেতনা ফিকির—কেতনা ফন্দি—কেতনা প্যাঁচ—কেতনা শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এল এল হয় আবার পেলিয়ে যায়। আলবত শিকার জল্‌দি এসবে..."[২৮]

আবার গ্রন্থের শেষাংশে 'মানিকজোড়ের' মত ঠকচাচা ও তার সহযোগী বাহুল্য যখন জাহাজে চড়ে দেশান্তরের বন্দীশালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে তখন ঠকচাচী সম্বন্ধে ঠকচাচার আশঙ্কা হচ্ছে ঃ 'মোর বড় ডর তেনাবি পেল্টে সাদি করে।' মতিলালের মায়ের চরিত্রের সহিষ্ণুতা ও সংযম বাঙালী মায়ের চিরন্তন রূপের প্রতীক। বাবুরামের দ্বিতীয় বার বিবাহের সংবাদে নাপতানী চরিত্রের উক্তি—'ওমা মুই কোজ্জাব, বুড়ো ঢোক্সা আবার বে করবে?'—প্যারীচাঁদের তীক্ষ্ণ সমাজসচেতন দৃষ্টির ও সুকুশল বচন রচনার একটি উজ্জ্বল পরিচয়।

২৭। বিশী। পূর্বোক্ত, পৃ ১৯।

২৮। নতুন সাহিত্য ভবন সং। ১৬ পরিচ্ছেদ। পৃ ৯৪

বস্তুত বৃহৎ বর্ণনা অপেক্ষা এই সব সামান্য ঘটনা নির্ভরতা প্যারীচাঁদের একটা কৌশল। অবশ্য "কেবল বাস্তব চিত্রাঙ্কণ বা জীবন-পর্যবেক্ষণই উচ্চঅঙ্গের উপন্যাসের একমাত্র গুণ নহে। বাস্তব উপাদানগুলিকে এরূপভাবে সাজাইতে হইবে, যেন তাহাদের কার্যকারণ-পরম্পরার মধ্য দিয়া জীবনের জটিলতা ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে একটা গভীর ও ব্যাপক ধারণা পাঠকের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে; মানবহৃদয়ের গভীর সনাতন ভাবগুলি যেন তাহাদের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বাহ্য ঘটনার উপরেও একটা অচিন্তিত-পূর্ব গৌরব-মুকুট পরাইয়া দিতে পারে।"[২৯] 'আলালের ঘরের দুলাল' এ কৃতিত্বে উজ্জ্বল নয় এবং সেদিক দিয়ে এটি Goldsmith এর Vicar of Wakefield এর সমশ্রেনীস্থ। বস্তুতঃ প্যারীচাঁদ তাঁর পরবর্তী বঙ্কিমের মত মানবতার অন্তর্গূঢ় রূপের আবিষ্কারে সক্ষম হননি সত্য, কিন্তু মানবতার বিষয়গত চেতনার পরিচয় আলালের ঘরের দুলালে আছে। এবং তা আদৌ উপেক্ষণীয় নয় বলেই "আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাস সাহিত্যের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া প্রথম অনিশ্চয়াত্মক যুগের অবসান ও আসন্ন পূর্ণ পরিণতির ঘোষণা করে।"[৩০]

বাস্তবদৃষ্টি, চরিত্রসৃষ্টি, কৌতুকবোধ ইত্যাদির মত প্যারীচাঁদের ভাষার স্বাতন্ত্র্যও সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। 'আলালের' গদ্যের ভিত্তি সাধুভাষা হলেও সরল ও সর্বজনবোধ্য শব্দ নির্বাচনে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছেন—'আলালেই' আমরা 'আদর্শ' বাংলা উপন্যাসের ভাষার সর্বপ্রথম ইঙ্গিত পাই। সংলাপ রচনায় প্যারীচাঁদ যেমন বাস্তবতামুখীন তেমনি অসংখ্য প্রবাদ বাক্যের উপযুক্ত প্রয়োগে তা প্রাণবন্ত। তিনি বাংলা গদ্যরীতিতে 'রঙ্গরস' এনেছেন এবং কাহিনী বলার আকর্ষণী শক্তি তিনি বাংলাভাষায় সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন।

২৯। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। (মডার্ণ বুক এজেন্সি। কলিকাতা, তৃ-স ১৯৫৬) পৃ ২১।

৩০। ঐ। পৃ ২২।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, : "প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।"[৩১] অবশ্যই আলালের কৃতিত্ব আকস্মিক নয়। সমাজচিত্র রচনার সমকালীন প্রচেষ্টাকেই প্যারীচাঁদ প্রথম সফল আখ্যায়িকারূপে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট তথ্য তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।[৩২] আবার অন্যদিকে বঙ্কিমের তুলনায় প্যারীচাঁদের সীমাবদ্ধতার কথাও মনে রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া বাঙলা সাহিত্যের পরবর্তী রচনাবলীর উপর এ গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আলালের ১৭ পরিচ্ছেদে নীল বিদ্রোহের (১৮৫৮-৬০) একটি বর্ণনা আছে; দীনবন্ধু মিত্র তাঁর বিখ্যাত 'নীল দর্পণ' নাটক রচনার প্রেরণা পান এখান থেকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' পরিকল্পিত হয় সম্পূর্ণরূপেই আলালের আদর্শানুসরণ করে। বলাবাহুল্য, এই ইতিহাসের ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই 'আলালের ঘরের দুলালে'র যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব।

আলালের ঘরের দুলাল সমকালীন জীবনের 'deliberate commentary', বিশেষ কাল পরিধিতে মানুষের সামাজিক অবস্থা ও তাদের পারস্পরিক আচার আচরণের চিত্র এতে আছে। এদিক দিয়ে Geoffrey Brereton কথিত সফল উপন্যাসের সকল লক্ষণই এতে বিদ্যমান। উপরন্তু এর 'Significance in the history of ideas'-ও কম নয়; বরং গ্রন্থকারের সেইটেই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থের সামাজিক উপযোগিতা যাই থাক না কেন, ভাষাগত দিক দিয়ে তা যতই মূল্যবান হোক না কেন, একথা সত্য যে প্যারীচাঁদের এক ধর্মগূঢ় চেতনা অন্তঃ সলিলা প্রবাহের মত এর পূর্বাপর ব্যপ্ত রয়েছে। এবং ক্রমান্বয়ে গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে এই চেতনা গভীরতা ও ব্যাপ্তি পেয়েছে। ফলতঃ, এ কারণেই প্যারীচাঁদের পরবর্তী কোন গ্রন্থই আলালের সমান মর্যাদার অধিকার পায়নি।

৩১। বাঙ্গলা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান ['লুপ্তরত্নোদ্ধার'-এর ভূমিকা]। বঙ্কিম রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড : সমগ্র সাহিত্য।(সাহিত্য সংসদ। কলিকাতা ১৩৬১)। পৃ৮৬৩।
স্মর্তব্য : 'great charm consists in its nationality and truth'—প্যারীচাঁদের বন্ধু ই. বি. কাউএল-এর পত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত সম্পাদিত সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভূমিকায় উদ্ধৃত। পৃ ॥৹।
৩২। দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত। পূর্বোক্ত। পৃ ॥৹—॥৶৹।

তিন

কৌতুকপ্রিয়তা, বাস্তববুদ্ধি এবং কথার বয়ন-দক্ষতাই 'আলাল' রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্রকে প্রথম বাঙলা ঔপন্যাসিকের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু, প্যারীচাঁদের জীবনবোধ, শিল্পাদর্শ ও সাহিত্যকীর্তির পূর্ণ পরিচয় শুধুমাত্র 'আলালের ঘরের দুলালে' বিধৃত নেই। 'আলাল' পরবর্তী রচনাবলীতে লেখকমানসের যে পরিচয় মেলে তা পূর্বোক্ত গুণকেন্দ্রিক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীত: বাস্তবতা থেকে বহু দূরবর্তী, নীরস তত্ত্বপ্রচারমুখী। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আলালের রঙ্গরস ও হাস্যকৌতুকের পশ্চাতে সর্বদাই একটা ধর্মগূঢ় চেতনা ছিল; সুতরাং তাঁর রচনার ধারায় পরবর্তীকালের এই ধর্মপ্রবণতা আকস্মিক নয়। অন্যকথায়, প্যারীচাঁদের রচনার তত্ত্বপ্রচারপ্রবণতা সর্বদাই ছিল; 'আলালে' তা সুগ্রথিত কাহিনীর, সুস্পষ্ট রঙ্গরসের ও সুষ্ঠু বাস্তবতার আবরণে প্রকাশিত হয়েছে আর পরবর্তী রচনাবলীতে পরিণত প্যারীচাঁদ এ আবরণের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করেছেন। এ কারণেই প্যারীচাঁদের সৃষ্টির মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে তাঁর পরবর্তী রচনাবলীর আলোচনা অপরিহার্য।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলাল'-পরবর্তী রচনাবলীকে আলোচনার সুবিধার্থে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, সমকালীন জীবনচিত্রণ: এ পর্যায়ে একটিমাত্র নক্সা জাতীয় রচনা—'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?'; দ্বিতীয়, আধ্যাত্মিক উপন্যাস—'অভেদী', 'আধ্যাত্মিকা', 'রামারঞ্জিকা', 'বামাতোষিনী' ও 'যৎকিঞ্চিৎ' এ পর্যায়ের; তৃতীয়, বিবিধ রচনা—'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা', 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত', 'গীতাঙ্কুর' ইত্যাদি।

সমকালীন জীবনচিত্রণ প্যারীচাঁদের সুপরিচিত এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'আলালে'র জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণও এটি। এই বৈশিষ্টের পরিচয় উত্তরকালের রচনাবলীর মধ্যে একমাত্র তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?' এই নক্সাজাতীয় রচনাতে মেলে।

গ্রন্থটি উপন্যাস নয়, খণ্ডচিত্র। এবং এজাতীয় রচনাতেই প্যারীচাঁদের প্রতিভা অধিকতর স্ফূর্তিলাভ করে। নামকরণ থেকেই গ্রন্থটির উদ্দেশ্যমূলকতা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। অল্পবিস্তর ইয়ং বেঙ্গলদলের অন্তর্ভুক্ত হয়েও এদলের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি তীব্র বিদ্রূপের আঘাত হেনেছেন প্যারীচাঁদ; এ আঘাত প্রাচীনপন্থী বা পশ্চাদমুখী নয় বলে 'মদ্যনিবারণী সভা'র উদ্দেশ্যে সহায়ক হয়েছিলে।

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশ জুড়ে ছোট ছোট বিশ্লিষ্ট ঘটনার মাধ্যমে, পরিহাসতরল ও রঙ্গরসপূর্ণ বর্ণনার সাহায্যে মদ্যপানের ক্রমবিস্তৃতি, বিভিন্নশ্রেণীর মাতাল, মত্ততার বিপদ, 'নেসাতেই সর্বনাশ' ইত্যাদি 'মদ খাওয়া বড় দায়' পর্যায়ের তত্ত্বকথা লেখক প্রচার করেছেন। কলকাতায় মদ্যপানের ক্রমবিস্তৃতি সম্বন্ধে তিনি বলছেন:

> "কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায়, সেখানেই মদ খাবার ঘটা। কি দুঃখী কি বড়মানুষ কি যুবা কি বৃদ্ধা সকলেই মদ পাইলে অন্নত্যাগ করে। কথিত আছে, কোন ভদ্রলোক এক গ্রামে কিছুদিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন; সেখানে দেখিলেন, প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়?' গাজাখোরের মধ্যে একজন উত্তর করিল, 'আমরা সকলেই গাজা খাইয়া থাকি। গ্রামে শালগ্রাম ঠাকুর ও আমাদের টেঁপী পিসী—যাহার বয়স ৯৯ বৎসর তারাই খারিজ আছেন।' কলিকাতা এখন তদ্রূপ।"[৩৩]

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের 'আগড়ভম সেন'ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তার নেশার আড্ডাধারীরা 'পক্ষী'বৎ এবং নিজে সে দলের 'পক্ষিরাজ'। তার এবং সমগ্র পরিবেশটির বর্ণনা লেখক অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে করেছেন। উপভোগ্য বলে একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> "আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড পেটটি একটি ঢাকাই জালা—নাকটি চেপ্‌টা—চোক দুটি মৃদঙ্গের তালা—হা-টি বোড়া সাপের মত—

৩৩। প্রথম খণ্ড। প্রথম পরিচ্ছেদ: মদ খাওয়া বড় বাড়িতেছে, মাতাল নানারূপী।

দন্তগুলি মিসি ও পানের ছিবের তবকে চিক চিক করিতেছে—গোঁফ-জোড়াটি খ্যাঙ্করার মুড়া ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালাফিতে দিয়া বান্ধা। নানা প্রকার নেসা করিয়া থাকেন—কোন নেসাই বাকি নাই—প্রাতঃকালাবধি তিনি চারিটা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া স্নানআহার করেন, পরে পক্ষীদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদয় রজনী সজনী সজনী বলিয়া চিৎকার পুরঃসর সখীসংবাদ বিরহ লাহড় খেউড় টপ্পা নক্সা জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লীকে কম্পিত করেন। আগড় ভমের প্রধান বন্ধু ডঙ্কেশ্বর।......

সন্ধ্যার সময় পক্ষীসকল বোধ করিত, তাহারা যোগবলে একেবারে আসন ছাড়া হইয়া শূণ্যমার্গে উড়িতেছে—সপ্তলোক তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে—স্বশরীরে স্বর্গে যাইতেছে। এক একজন পড়িতে পড়িতে উঠিয়া বলিত, আমাকে ধর—আমি স্বর্গে যাই।' অমনি আর একজন জাপুটিয়া ধরিয়া বলিত—না বাবা, কর কি, একটু থাম এই বুলিয়া বাঁদে যেয়ো।' পক্ষীদের গান সকল অতি বিচিত্র। সকলে মিলে সর্ব্বদা এই গান গাইত—বড় বিলের পাখী মোরা ছোট বিলের কে, আধার না পেয়ে পাখী মুলা ধরেছে—কু কু রামশালিকে কু কু কু গঙ্গাফড়িং।"[৩৪]

আলোচ্য গ্রন্থের শেষাংশে লেখকের সমাজসচেতন দৃষ্টি সকৌতুকে লক্ষ্য করেছে এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলদের ভণ্ডামী। গোপনে যারা মদ্যপ অনাচারী তারাই প্রকাশ্য আহারীদেরকে জাতিচ্যুত করবার মন্ত্রণায় লিপ্ত; তাদের মুখেই 'গেল গেল হিন্দুয়ানী'র বাণী। এ অংশই 'জাত থাকার কি উপায়' পর্যায়ের। এমন একটি 'জাতি মারিবার মন্ত্রণা'সভায় উদ্যোক্তাদের সংলাপঃ

বাচস্পতি। কুক্কুটের মাংস অতি উপাদেয়, মনু বিধি দেন যে বনকুক্কুট আমাদের খাদ্য। পূর্বে ঋষিরা গোমেধ করিতেন—বরাহের মাংসাদিতে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন

৩৪। দ্বিতীয় খণ্ড: প্রথম পরিচ্ছেদ।
তুলনীয়: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শুভদা' উপন্যাসের বামুনপাড়ার গাঁজার আড্ডা। শরৎ সাহিত্যসংগ্রহ, অষ্টমসম্ভার দ্রষ্টব্য।

> হইত। যদ্যপি প্রাচীনকালে চতুষ্পদ পশু আমাদের উদরস্থ হইত, তবে দ্বিপদ পক্ষী এক্ষণে কেন অখাদ্য হইবে?…
> গোস্বামী। আমি আর একটু মদ্যপান করিব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদ্যপান করিতেন। মাংসটা আহার করিতে বড় রুচি হইতেছে না। হানপে বেটা জুতা পায়ে দিয়া আনিয়াছে। সে দিবস উইলসনের যে হোটেলে মাংস খাইয়াছিলাম, সে বড় উপাদেয়।"[৩৫]

গোস্বামীর এ উক্তিতে প্রেমচাঁদ তাকে জিজ্ঞেস করল সে প্রাকাশ্যে আহার করে কি না; এবং করে না জেনে খুশী হল, কেননা প্রকাশ্য আহারী হরিনাথ দত্তের বোনের বিয়েতে যোগদানকারীদের 'জাতমারার' ইচ্ছা তার।

প্যারীচাঁদের এই সমাজ সচেতন দৃষ্টি যে উদার ও আধুনিক ছিল তার প্রমাণ এইসব সমাজচিত্র রচনার মধ্যেই স্পষ্টভাবে বিধৃত। মত্তপ লাউসেনপৌত্র আগড়ভমকে শিক্ষা দেবার জন্য 'ত্রপণ্ড' 'বাগবাজারের নব্য সম্প্রদায়'ই উদ্যোগী, ভণ্ড প্রেমচাঁদের জাতি-রক্ষার্থসভা' পণ্ড করতে সুশিক্ষিত বশিষ্ঠ হেমচন্দ্রই সাহসী; এ সব ক্ষেত্রে কোন আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী নিষ্ফল আস্ফালনে লিপ্ত হয়নি। প্যারীচাঁদের এ রচনা বাংলা নাটকের এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত রচনার মূল এবং এ কারণে ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণও বটে। এ গ্রন্থের আগড়ভম সেনই হেঁাদলকুৎকুৎ-রূপে দীনবন্ধু মিত্রের "নবীন তপস্বিনী"তে আবির্ভূত হয়েছে। তাছাড়া এ গ্রন্থের 'জাতি মারিবার মন্ত্রণা', 'জাতিরক্ষার্থ সভা', ও জাতি মারিবার বাসিমন্ত্রণা' এবং 'বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম আবতার' পরিচ্ছেদগুলা "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা" প্রহসন দুটি রচনায় মধুসূদনকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে আর একটি খণ্ড চিত্রে লেখক তৎকালীন হিন্দুসমাজে জাতি, ধর্ম ও ধর্মধারীদের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। নর্মদা নদী তীরে নিদ্রাবস্থায় কুচবিহারের ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখল যে বৃদ্ধরূপী 'জ্ঞান' তাকে স্বর্গ দেখাবার পর

৩৫। দ্বিতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: জাতি মারিবার মন্ত্রণা

কলকাতা সহরে নিয়ে এলেন। জ্ঞান-স্পর্শে দিব্যচক্ষু লাভ করে শঠতা ও অধর্মের সমুদ্র কলকাতার অনাচারের ও ভণ্ডামীর ঘটা দেখে ব্রাহ্মণ হতবাক হয়ে গেল। এমন সময় সে দেখল একটা বিকলাঙ্গ গরু 'পালাই পালাই' ডাকছে 'একজন তিলকধারী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ' তার লেজ ধরে টানছে, আর এক স্বর্গকন্যা অশ্রুপাত করছেন। জ্ঞান জানালেন ওই গরু হচ্ছে 'জাতি', লোকটি 'হিন্দুগিরি আর স্বর্গকন্যা হচ্ছেন 'ধর্ম'। এরপর ব্রাহ্মণের স্বপ্নবৃত্তান্ত হচ্ছেঃ

> "জাতি এমনি দৌড়িতেছে যে, হাজার টানাটানিতে থামে না, হিন্দুগিরিও লেজ কসে ধরিয়া পেছনে পেছনে ঝুলিয়া যাইতেছে। এইরূপ টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়িতে জাতির লেজ পটাস করিয়া ছিড়ে গেল ও হিন্দুগিরি বেগে চিৎ পটাং হইয়া ঠিকরে পড়িলেন। লেজের জ্বালার চোটে জাতির গাঁ গাঁ হাম্মা হাম্মা শব্দে পৃথিবী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই গোলমালে আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হওয়াতে দেখিলাম, নর্ম্মদা তীরস্থ সেই বৃক্ষের তলায় পড়িয়া রহিয়াছি, আমার নিকটে কয়েকজন বৈরাগী বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছে।"[৩৬]

শেষাংশে বৈরাগীদের খঞ্জনী বাজিয়ে গান করার সঙ্গে বিশ্ববিদারী 'গাঁ গাঁ হাম্মা হাম্মা' আর্তরবের তুলনা দিয়ে লেখক যে পরিমিত হাস্যরসের অবতারণা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে শক্তির পরিচায়ক।

এ গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ 'বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার'-এ একটিমাত্র বাক্যে একটি চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেঃ

> "রঙ্গপুরের রমানন্দ মুখোপাধ্যায় বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান।...
> ভণ্ডামীর সহিত ষণ্ডামী থাকতে আপামর সাধারণ লোকে তাঁহার কথা সর্বদা আন্দোলন করিত।"

টাইপ-চরিত্রসৃষ্টিতে এবং ভাষাব্যবহারে আলালী কৃতিত্বের পরিচয় এ গ্রন্থে দুর্লক্ষ্য নয়। রসদৃষ্টিতে প্যারীচাঁদের রচনা তত্ত্বপ্রচার প্রকটতা দুষ্ট, তবু তাঁর এই দৃষ্টির ঔদার্য ও সমাজ চেতনা অনন্যসুলভ, এতে কোন সন্দেহ নেই।

৩৬। দ্বিতীয় খণ্ড : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কি আজব দেখিলাম সহর কলিকাতা।

২

অবশ্য এই সমাজ চেতনার ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের যে উদার মনোভাবের কথা বলা হয়েছে তার পরিচয় তিনি সর্বদা দিয়েছেন, এমন কথা বলা চলেনা। সহমরণে উৎসাহ, বিধবা-বিবাহে বিরোধিতা তাঁর রক্ষণশীলতাকেই প্রতিষ্ঠা করে। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?' গ্রন্থে আগড়ভম ও এক বিধবা রমণীকে নিয়ে যে কৌতুক করা হয়েছে স্পষ্টতই তা বিধবা বিবাহ বিরোধিতা। এই কৌতুকের একটি দৃশ্য হচ্ছে ঃ ডাকযোগে জনৈক বিধবা ভুবনময়ীর বরণ পত্র পেয়েছে আগড়ভম; ইতিপূর্বে ঘটক তার কাছে এক পাত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল। এখন ঃ

> "পক্ষীরাজ উক্ত লিপি পড়িয়া লোভভরে ও উদ্বাহু বাসনায় ডগমগ হইয়া বিরল স্থানে গিয়া বসিলেন এবং বিগলিত নয়ন বিলোলিত রসনাযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার ভাবিতে লাগিলেন—আমার কি এত রূপ—এত গুণ? তবে তো আমি আত্মবিস্মৃত! তবে তো আমি অঞ্জনাপুত্র, কি আশ্চর্য! বিধবা বিবাহে কি দোষ? এখন কি করি? কোন মেয়েটিকে বিয়ে করি? একটা কি ডঙ্কাকে দিব? না—ও কি আমার কুলের পুরুত? আমি দুটো মেয়েকেই বিয়ে করে সব শালাকে কলা দেখাইয়া ডেং ডেং করিয়া চ'লে যাব।"[৩৭]

পরবর্তী রচনায় প্যারীচাঁদের বিধবা-বিবাহ বিরোধিতা স্পষ্টতর আকার পেয়েছে। 'অভেদী'তে তিনি সহমরণ প্রথার প্রতি সহানুভূতিশীলতা প্রকাশ করেছেন।

প্যারীচাঁদের মানসিকতায় এই স্ববিরোধের স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন। বস্তুত এই স্ববিরোধের কারণ একদিকে যেমন সমকালীন 'অসচেতন হিন্দু জাতীয়তা'য় বিধৃত—যা 'মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের স্ববিরোধ' জাত[৩৮] অন্যদিকে তেমনি প্যারীচাঁদের ব্যক্তিমানস গঠনেও নিহিত। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর মৃত্যুর পর থিয়োসফিতে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন; এ প্রসঙ্গে তাঁর স্বীকৃতি ঃ

৩৭। দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ।

৩৮। দ্রষ্টব্য ঃ অচ্যুত গোস্বামী। বাংলা উপন্যাসের ধারা। (নতুন সাহিত্য ভবন। কলিকাতা ১৩৬৪)। পৃ ১—১৪

"In 1860, I lost my wife, which convulsed me much, I took to the study of spiritualism which, I confess, I would not have thought of otherwise nor relished its charms."[৩৯]

ওলকট ও মাদাম ব্লাভট্স্কির থিয়োসফিকাল সোসাইটিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন ; এ সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার সভাপতির পদও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।[৪০] এবং 'তিনি বিলাত ও আমেরিকা হইতে এই বিষয়ে রাশি রাশি গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করেন।'[৪১]

ফলত এই গভীর অনুরাগ ও অধ্যবসায় তাঁর আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে ধারণাকে প্রত্যয়ের পর্যায়ে উন্নীত করে। এ কারণেই তিনি সহমরণে উৎসাহী, বিধবা-বিবাহ বিরোধী হয়ে ওঠেন ; যেন অমর যে আত্মা তাকে তিনি অমলিন অকলঙ্ক রাখতে চান। তাই বারংবার বলেছেন :

"এই ভারতভূমিতে পতিব্রত্যধর্ম্ম যেরূপ বদ্ধমূল, এমত আর কোন দেশে নাই। এ দেশে পতি জীবিত অবস্থায় সাকার পতি, মৃত্যু হইলে নিরাকার পতি।"[৪২] "স্ত্রীলোক শিক্ষিত হউক বা না হউক, উচ্চজাতীয় হউক বা নীচজাতীয় হউক যথার্থ স্বামী পরায়ণা হইলে যাবজ্জীবন স্বামীকে স্মরণ করে ও স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসিনী হয়।"[৪৩]... ইত্যাদি।

৩৯। প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'On the soul' পুস্তকের ভূমিকা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সাহিত্যসাধক চরিতমালা (২১ : প্যারীচাঁদ মিত্র), দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৪০। এপ্রিল ১৭, ১৮৮২ তারিখে। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ। পৃ ১৮৫—১৮৯।

৪১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ। পৃ ১৮৬।

৪২। আধ্যাত্মিকা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৪৩। ঐ অষ্টম পরিচ্ছেদ। তুলনীয় 'যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না ; যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সে জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাব বিশিষ্টা, স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না।' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাম্য; বঙ্কিম রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড : সমগ্র সাহিত্য পৃ ৪০১।

এবং সহমরণের মর্মান্তিক দৃশ্যকেও মনোহর করে চিত্রিত করতে হয়েছে :

> "রমণীর জীবিত শরীর মৃত স্বামীর শরীরের সহিত দগ্ধ হইতে লাগিল—দেহ স্থৈর্য্যে সম্পূর্ণ—দুই হস্তসংযুক্ত—বদন ঈষদ্ধাস্যান্বিত— নয়ন সমাধিতে আবৃত ও যদবধি আত্মা শরীর হইতে পৃথক না হইল তদবধি তাহার পবিত্র রসনার হরিনাম সকলের শান্তিদায়ক হইয়াছিল।"[৪৪]

অন্যদিকে স্বামীর মৃত্যুর পর—

> "সরলা পতিব্রতা, ইচ্ছা করিলেন যে সহমরণে গমন করিবেন; কিন্তু ঐ প্রথা নিষেধক আইন জারি হওয়াতে ক্ষান্ত হইলেন।"[৪৫]

এবং 'ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাসিনী' হ'লেন।

সুতরাং বলা চলে, প্যারীচাঁদের এই মানসিকতা গভীর বিশ্বাসজাত এবং সে কারণেই প্যারীচাঁদের নিজের কাছে এ স্ববিরোধ ধরা পড়েনি।

৩

প্যারীচাঁদের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রচনাবলী—আধ্যাত্মিক উপন্যাসগুলো—তাঁর ব্যক্তিজীবনের এই আধ্যাত্মিকচেতনার গভীরে উত্তরোত্তর উৎক্রমণের কাহিনী।

'অভেদী'র নায়ক অন্বেষণচন্দ্র। তিনি সত্যান্বেষী—এবং সে কারণেই সংসারনিষ্ঠ নন। ফলে গৃহদাহে স্ত্রীকন্যাপুত্রের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি অরণ্যে ও লোকালয়ে সত্যসন্ধানে ব্যাপৃত। অন্যদিকে যথার্থই মৃত না হওয়ায় স্ত্রী পতিভাবিনী স্বামী-সন্ধানে রত। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পর্যায়ক্রমে সাধনার পর স্বামী স্ত্রীর মিলন এবং রম্য পর্বোতোপরি অভেদীর কাছে চরম দীক্ষা গ্রহণে এ উপন্যাসের সমাপ্তি। এখানে দাম্পত্যসম্পর্ক 'আধ্যাত্মিক'![৪৬] পতিসন্ধান রত পতিভাবিনীর উক্তি :

৪৪। আভেদী। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

৪৫। ঐ। ১৮ পরিচ্ছেদ।

৪৬। 'আমাদিগের সম্বন্ধ শারীরিক সম্বন্ধ নহে—আমাদিগের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক'। পতিভাবিনীর উক্তি। ১১ শ পরিচ্ছেদ।

"নাথ সর্বদা কহিতেন, তুমি আমাকে বড় ভালবাস, তাহা আমি ভাল জানি, কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের প্রেমের পক্বতা জন্য উভয়ের আত্মা ঈশ্বরেতে অর্পণ করিতে হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ এ কেবল পার্থিব সম্বন্ধ—এ সম্বন্ধীয় প্রেম নশ্বর, কিন্তু এ সম্বন্ধের তাৎপর্য এই যে ইহার দ্বারা পরস্পরের আত্মা উন্নত হইবে। যদি এ অভিপ্রায় সম্পন্ন না হয়, তবে স্ত্রী পুরুষের প্রেম পশুবৎ হইয়া পড়ে।"[৪৭]

দীর্ঘদিনপর স্বামী-স্ত্রীর মিলন দৃশ্য আশ্চর্য কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত:

অন্বেষণচন্দ্র নিষ্কামচিত্তে ও অকুতোভয়ে ঐ রমণীর সম্মুখে বসিয়া নীরিক্ষণ করিতে লাগিলেন। দিবা অবসান—অস্তমিত দিনমণি গবাক্ষের দ্বার দিয়া স্বীয় নানাবর্ণীয় মণিতে ঐ মহিলার মুখমণিকে যেন উজ্জ্বল মণির খনি করিতেছেন—কিন্তু তাহার অন্তরের অমূল্যমণির অবিনাশী ও অক্ষয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া লজ্জা পাইতেছেন। এ নারী কে? সুনির্ম্মিত চাঁপা ফুলের ন্যায় গৌরাঙ্গী যুবতী—রূপের ছবি—কিন্তু পার্থিবভাবশূণ্যা। যাহার ধ্যানে আহ্লাদ, তাহার মন অন্যের ধ্যান দেখিলে ধ্যানে আকৃষ্ট হয়।

এবং পরস্পর পরিচয় লাভের পর:

'চাঞ্চল্য ত্যাগ কর, এমন উচ্চ যোগিনী হইয়া রোদন করিলে?' পতিভাবিনী উত্তর করিলেন, 'এটি দুর্বলতা বটে, কিন্তু তোমার জন্য ব্যাকুলতা সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারিনা, তুমি এমনি আকর্ষণ কর যে, তোমাকে দেখিলেই আমি তোমাতে মগ্ন হই। অদ্য তোমাকে পাইয়া মনে দৃঢ় সংস্কার হইতেছে যে আত্মসাধনে অনেক লাভ করিব।' পরে দুইজনের বাক্য স্থগিত হইয়া পরস্পরের আত্মা দ্বারা আপন আপন বক্তব্য যাহা ছিল, তাহা ক্রমশ প্রকাশ হইতে লাগিল ও পরস্পরের আত্মা সংযুক্ত হইয়া নানা অপার্থিব বিমল আনন্দে রাত্রিযাপন করিলেন।..."[৪৮]

৪৭। ৭ম পরিচ্ছেদ।

৪৮। উনিশ পরিচ্ছেদ

পরদিন ভোরে সরোবরে স্নানরতা যোগিনীদের সামনে পতিভাবিনী স্বামীসহ উপস্থিত হলে যোগিনীরা লজ্জিত হল। তখন পতিভাবিনী স্বামীর পরিচয় দিয়ে বলল ঃ

"ইনি সম্পূর্ণ যোগী—ইহার স্ত্রীপুরুষ সমজ্ঞান। কেবল আত্মার সুখেই সুখী—শারীরিক সুখ বিসর্জন করিয়াছেন। তোমরা নগ্না থাক, আর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হও ইঁহার আত্মা সমভাবে থাকিবে। কিন্তু তোমরা স্ত্রীলোক—যোগেতে পক্ক হও নাই, এ জন্য আমরা উদ্যানে গমন করিতেছি।"[৪৮]

এই মূল ঘটনার পাশাপাশি বাবুসাহেব, জেঁকো বাবু ও লালবুঝকড় চরিত্রের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশিত চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সাহায্যে কিছু কৌতুক রস উদ্দীপনের প্রয়াস আছে। এইসব উন্নাসিক চরিত্রের করুণ পরিণতি নির্দেশ করে লেখক স্বীয় উদ্দেশ্যের যাথার্থ্য সম্পাদনে সচেষ্ট হয়েছেন। এ আখ্যায়িকার লালবুঝকড় চরিত্রের রূপ, বাচনভঙ্গি, পরিণতি, ইত্যাদি ঠকচাচাকে স্মরণ করিয়ে দেয়ে; অতখানি জীবন্ত না হলেও ঠকচাচার ছায়া এ চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়।

'অভেদী'তে সমকালীন ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র আছে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নব্যদলের আচরণ সম্পর্কে প্যারীচাঁদ তির্যক মন্তব্য করেছেন ঃ

'পৈতাফেলা—পৌত্তলিকতা ইত্যাদি ইংরাজী বহি পড়ার দরুণ—আপনি কি বলেন?

অন্বেষণচন্দ্র। তাহা হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, বাহ্য প্রবল অন্তর দুর্বল—এই জন্য আত্মা দণ্ডে দণ্ডে নব সংস্কারাধীন। যেমন তরকারী সন্তলনকালীন হাড়িতে তপ্ত-ঘৃত উপরে ফোড়ন দিলে ফড় ফড় শব্দ হয়, তেমনি প্রবল বাহ্য কারণ বশাৎ নব নব মত ও বিশ্বাসের সৃষ্টি—তাহার কি তর্জন গর্জন হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিবে না।[৪৯]

৪৯। সতের পরিচ্ছেদ।

'অভেদী'র পাত্রপাত্রীরা বাস্তবজীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত হয়েছে। সেদিক থেকে 'অভেদী'কে হয়তবা 'রূপক উপন্যাস' হিসেবে আখ্যাত করা চলে।[৫০] কিন্তু 'আধ্যাত্মিকা' প্রকৃতই 'আধ্যাত্মিক উপন্যাস'। এখানে উপন্যাস লক্ষণ শুধুমাত্র দুর্লক্ষ্যই নয়, পরন্তু তা বাস্তবতা থেকে বহু দূরবর্তী। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক। মাঝে মাঝে ক্ষীণস্বরে ঢুলি, বেহারা, চাকর, রাস্তায় লোক, বাজারে জনরব প্রচারক ইত্যাদি পার্শ্বচরিত্র রচনায় প্যারীচাঁদের কৌতুকবোধ ও রসসিক্ত দৃষ্টির পরিচয় মেলে এবং স্পষ্টতই অনুভব করা যায় লেখকের এই স্বরূপ ক্রমবিলীয়মান। তাছাড়া এসব পার্শ্বচরিত্র 'আলালে'র মত মূলকাহিনার সঙ্গে সুগ্রথিত হয়েও বর্ণিত হয়নি।

নায়িকা আধ্যাত্মিকার জন্ম, শিক্ষায় বিপুল পারদর্শিতা, যাবতীয় আধ্যাত্ম-সাধনায়—বিশেষত আত্মসাধনায় চরমসিদ্ধিলাভ, সাংসারিক বিপর্যয়ে স্থৈর্য, খ্যাতি এবং সবশেষে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মৃত্যুবরণ এ উপন্যাসের কাহিনী। সুস্পষ্ট আধ্যাত্মিক ঘটনা নির্ভর এই কাহিনীতে বাস্তবতার সঙ্গে তীব্র বিরোধ যেখানে উপস্থিত হয়েছে সেখানে 'বৈঠকী কথা' বা 'স্ত্রীলোকদিগের ভোজ ও পার্থিব কথোপকথন' কিংবা 'দোকানীদের কথাবার্তা'[৫১] ইত্যাদি রচনা করে পরক্ষণেই গভীর আধ্যাত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখক অবলীলাক্রমে ব্যাপৃত হয়েছেন। বাস্তবতায় এই ক্ষণিক অবতরণ বিশ্বাসের তীব্রতার জন্যই তাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। নায়িকা আধ্যাত্মিকা বিবাহে অসম্মত; কেননা সে আত্মতত্ত্বজ্ঞ, আর

> "যে সকল স্ত্রীলোক আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহেন, তাহাদিগের পতি প্রয়োজন। কারণ পতি গ্রহণে স্ত্রীপুরুষের শুদ্ধ প্রেম পরস্পরে সর্বদা অর্পিত হইলে নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপন, নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপনে আত্মার উদ্দীপন। .."

৫০। 'অভেদী পুরাপুরি রূপক উপন্যাস'।—ডঃ সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, তৃ-স ১৩৫৬)। পৃ ৯৩।

৫১। "রাস্তার লোক বলিতেছে, 'দোকানীদাদা ভাল মোর ভাই!' পেছন দিক থেকে দোকানিনী এসে বলছে, 'ওরে মিন্সে! ভাত যে কড়কড়া হল, আটকুড়ীর বেড়াল পাত থেকে মাছটা নিয়ে চলে গেল, এখন কি দিয়ে গিলবি? কেবল ডুগাছা সজনের ডাটা আছে।" —একাদশ পরিচ্ছেদ।

সুতরাং তাহার পাণিপ্রার্থী 'ডাহা ব্রাহ্ম'

> "অনঙ্গ ছল ছল চক্ষে আধ্যাত্মিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া বলিলেন, "আমি একভাবে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত হইতেছি, আপনি মনুষ্য নহেন—শারীরিক ও মানসিক ভাবশূন্য। আপনাকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করি।"[৫২]

আধ্যাত্মিকার পিতা হরদেব তর্কালঙ্কারের অবস্থাবিপর্যয়ের তিন বৎসর পরে একদিন :

> "একজন চিড়চিড়ে পাওনাওয়ালা অন্যান্য পাওনাওয়ালাদিগের নিকট রাগ ও ঈর্ষা সংগ্রহ করত ফটাস ফটাস করিয়া উপস্থিত হইলেন। 'কোথা গো তর্কালঙ্কার? শেষটা খুব চলালে। আপনার বিষয় বিভব লুকিয়ে এখন আমাদিগের ফাঁকি দিতে চাহ। একদিকে ধর্ম্মের ছালা আর একদিকে ডাকাতি! গলায় দড়ে জাতিই অন্তজ। কিছু যে বলছ না?' পিতা ও কন্যা এই সকল নিন্দাতে আপন আপন আত্মার অশান্তভাব হয় কিনা, তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ। বাহ্য ঝটিকার ওষধি সহিষ্ণুতা'।"[৫৩]

তর্কালঙ্কারের মৃত্যু সংবাদে বিভিন্ন জল্পনার একটি হচ্ছে :

> 'মেয়েটার দশা কি হইল, ওর বা কে একটা ঘর বর দেখে দেয়, এরপর কি ব্যভিচার দোষ ঘটবে?'

বলাবাহুল্য যাঁর জন্য এ দুশ্চিন্তা তিনি এসব পার্থিব দুর্ভাবনার বহু উর্ধে। তিনি

> 'খোদান্বিতা নহেন, দুঃখান্বিতা নহেন, শোকান্বিতা নহেন; শান্তা, ধ্যানযুক্তা আধ্যাত্মিকা হইয়া বসিয়া আছেন।'[৫৪]

'বামাতোষিনী'তে পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশু ও স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে প্যারীচাঁদের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। নায়ক গোপাল 'সৎকুলোদ্ভব, উচ্চ চরিত্র' এবং তার 'স্ত্রীর নাম শান্তিদায়িনী, কন্যার নাম ভক্তিভাবিনী ও পুত্রের নাম কুলপাবন'।[৫৫]

৫২। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : অধ্যাত্মিকার বিবাহের প্রস্তাব।
৫৩। উনবিংশ পরিচ্ছেদ : বড় গোলযোগ।
৫৪। ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : তর্কালঙ্কারের মৃত্যু সংবাদ।
৫৫। প্রথম পরিচ্ছেদ।

লক্ষণীয় যে এসব উপন্যাসে শুধুমাত্র গ্রন্থের নামকরণে নয়, চরিত্রাবলীর নামকরণেও প্যারীচাঁদের উদ্দেশ্যমূলকতা স্বতপ্রকাশিত।

ঘটনাসূত্রে 'বামাতোষিনী'তে 'ইউরোপীয় উচ্চ নারীদিগের বিবরণ' 'বিলাতীয় বিবিদিগের বিবরণ'[৫৬] ইত্যাদি রচনা করে প্যারীচাঁদ আদর্শ নারী চরিত্রের প্রতি নির্দেশ করেছেন।

'রামারঞ্জিকা'য় স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে প্যারীচাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত কথোপকথনের আকারে গ্রথিত হয়েছে। মোট কুড়িটি পরিচ্ছেদের প্রথম ষোলটিতে 'গৃহকথা' পর্যায়ে স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। শেষ চারিটি পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে 'জাপান দেশের স্ত্রীলোক' 'সৎস্ত্রীকে স্বামী কখন ভুলিতে পারেন.', 'ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে পথ', 'ধর্ম্মপরায়না নারী'।

'যৎকিঞ্চিৎ'-এ এসে প্যারীচাঁদের প্রত্যয়বোধ তীব্র হয়ে উঠেছে। ফলে অধ্যাত্মিক জগত ও তার ঘটনার পরিণতি স্বাভাবিক ভাবেই কাহিনী সৃষ্টি করবে—এ বিশ্বাস তিনি লাভ করেছেন। "ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বর কিরূপ, তাঁহার সহিত কি সম্বন্ধ, আত্মার অবিনাশিত্ব, ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম, উপসনা, ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য, পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আত্মোন্নতি"—ইত্যাদি গূঢ় তত্ত্বকথা জ্ঞানানন্দের বক্তৃতা ও প্রেমানন্দে প্রার্থনার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে এ গ্রন্থে। গঠন কৌশলের দিক দিয়ে সচেতন পরিচর্যার পরিচয় রয়েছে এখানে। প্রথমে কিঞ্চিত বাস্তব পরিবেশ রচনা, তারপরেই তত্ত্বকথায় প্রবেশ : এ গ্রন্থে পূর্বাপরই এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। এবং বাস্তব পরিবেশ রচনার প্রয়াস এখানে আর রঙ্গরসে অভিষিক্ত নয়।

এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় : 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব'; রামমোহন রায়ের কবিতা

'ভাব সেই একে

জলেস্থলেশূন্যে যে সমানভাবে থাকে।'—এই উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু। তারপর :

৫৬। যথাক্রমে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"ঢং ঢং ঢং। হি-স, হি-স। ছোট ছোট রেলগাড়ী যায়। ওহে ভুবন উঠেছ—ও ভুবন।'...

"একখানা দ্বিতীয় ক্লাশ গাড়ীতে মধ্যবয়স্ক দুইজন ব্যক্তি বসিয়াছেন—ইহারা অতিশান্ত, মিতভাষী ও অনন্যমনাঃ। সূর্য অস্তমিত হইতেছে। আকাশের কি চমৎকার শোভা। সকল কোলাহল যেন স্থৈর্য্য সাগরের নিমগ্ন হইয়াছে—বায়ুর মন্দ মন্দ গতি—এই সকল একত্রিত হওয়াতে বৈকালিক মাধুর্য্য প্রকৃত শান্তিদায়ক হইয়াছে। এই দুই ব্যক্তি এক একবার নভোমণ্ডল দর্শন করিতেছেন এবং এক একবার দর্শনোদ্ভব আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ইহারা কে? ইহারা দুই ভ্রাতা—জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ।"

"লোকে বলাবলি করিতেছে—এ দুটো গুম অবতার কোথা হইতে এলো, বোধ হয় অজ পাড়াগেঁয়ে অথবা জঙ্গুলে।"

কিন্তু এরপরই এই কৌতুকমিশ্রিত আবহ বর্জিত হল; 'নাস্তিকবাবু'দের সঙ্গে জ্ঞানানন্দ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত যুক্তিজাল বিস্তার করতে শুরু করলেন এবং শেষে "প্রেমানন্দ করজোড়ে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি করতঃ......উপাসনা করিলেন"।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে শহরে মাতালদের উপদ্রব শুরু হলে—

"এইরূপ ভ্রান্ত, অশান্ত ও নিতান্ত দুরন্ত ব্যবহার দেখিয়া সহর কোতোয়াল কৃতান্তস্বরূপ আসিয়া বাবুদিগকে ধৃত করিলেন"[৫৭]

অবশ্য জ্ঞানানন্দের অনুরোধে তাদের মুক্তি দেওয়া হল।

এ গ্রন্থের শেষে প্যারীচাঁদের ধর্ম সম্বন্ধে অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে:

"এ ধর্ম্ম সমুদ্র স্বরূপ—অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নদী স্বরূপ যত ধর্ম্ম আছে, তাহা কালেতে এই ধর্ম্মেতে বিলীন হইবে। এই ধর্ম্মই নিত্য ধর্ম্ম—এই-ই সত্য ধর্ম্ম—এই-ই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম"।[৫৮]

৫৭। দশম অধ্যায়। গল্পের শেষ।

৫৮। On the Soul পুস্তকের ভূমিকায় প্যারীচাঁদ উল্লেখ করেছেন যে—

প্যারীচাঁদের শেষ পর্যায়ের বিবিধ রচনার মধ্যে 'ব্রহ্মবাদিনী' ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আছে বলে 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা' উল্লেখযোগ্য।[৫৯]

'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' রচনা সমাপ্ত ক'রে লেখক প্রার্থনা করেছেন :

> "জগদীশ্বর আমাদিগকে এই কৃপা করুণ যে, হেয়ার সাহেবের যেরূপ শুদ্ধ প্রেম ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি।"

'গীতাঙ্কুর' রাগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ ৩৪টি ব্রহ্মসঙ্গীতের সমষ্টি।

প্যারীচাঁদের অন্যান্য প্রবন্ধ ও ইংরেজী রচনাবলী মূলত তত্ত্বনিবন্ধ : প্যারীচাঁদ মানসের কোন নতুন পরিচয় তাতে উদ্‌ঘাটিত হয় না বলে বর্তমানে তার আলোচনা পরিত্যক্ত হল।

"My desire to understand God and his Providence was earnest from the reading of standard works on those subjects and theists and christian authors, as well as of Arya works, in Sanskrit and Bengali, produced a living conviction that there was one God of infinite perfection. I become theist or a Brahma." ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত। পৃ ১৮৬ উদ্ধৃত।

৫৯। গ্রন্থটিতে 'আর্য্যরাজ্য', 'ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ', 'উচ্চসদ্যোবধূ', 'স্ত্রীলোকদিগের সম্মান', 'পুনর্বিবাহ', 'সহমরণ ও ব্রহ্মচার্য', 'বিবাহ', 'স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে গমন', 'রাণীদিগের রাজ্যগ্রহণ', 'পরিচ্ছদ ও গমনাগমন', 'বৌদ্ধমত', 'রাণীদিগের গৃহ', 'দয়াদি', 'চৈতন্য'—ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

প্যারীচাঁদ-রচনাবলী পর্যালোচনা শেষ করার আগে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করেছি প্যারীচাঁদের মানসগঠনে 'ইয়ং বেঙ্গল', ব্রাহ্মসমাজ (রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব) ও থিওসফিক্যাল সোসাইটি মুখ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তাঁর রচনাবলী বহুলাংশে প্রাচীন সংস্কারমুক্ত, ব্রাহ্ম আদর্শবাহী এবং থিওসফির জ্ঞানলব্ধ গভীর প্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল। এই মিশ্র প্রভাবের ফলে আমরা তাঁর রচনায় একদিকে যেমন ব্রাহ্ম আদর্শের মহিমা প্রচারের সুস্পষ্ট অভিলাষ দেখি অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্ম রুচির কঠোর অনুসরণের প্রয়াস দেখিনা ; বরং তাঁর প্রথম উপন্যাস দুটোতে তার শৈথিল্যেই প্রত্যক্ষ করি, আবার আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বশত বিধবা বিবাহ বিরোধিতা এমনকি সহমরণে উৎসাহ লক্ষ্য করি।

এই মিশ্র মনোভঙ্গির পেছনে পূর্বোক্ত বাহ্য প্রভাব ছাড়াও স্বতন্ত্র গূঢ় কারণ আছে বলে মনে হয়। প্যারীচাঁদ মানসে সর্বদাই যেন একটি 'নীতিবোধ' সদাজাগ্রত ছিল যা তাঁর অন্যান্য বাহ্যপ্রভাব আহরণের প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই 'ইয়ং বেঙ্গল' বা ব্রাহ্মসমাজ তাঁর চিত্তে আত্যন্তিক আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি বরং তাঁর সচেতন নীতিবোধের সঙ্গে থিয়োসফির কোন মৌল বিরোধ না থাকায় এই শেষোক্ত বিষয়েই তিনি অধিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এই 'নীতিবোধ' উনিশ শতকী হিন্দুমধ্যবিত্ত মানসের লক্ষণ। এবং এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম মানসের উপস্থিত এই বিশিষ্ট উপাদানটির পূর্বরূপ প্যারীচাঁদে বর্তমান, এমন কথা বলা চলে। প্যারীচাঁদের আধ্যাত্মিক উপন্যাস-গুলোতে এই নীতিবোধ, ব্রাহ্মধর্মপ্রীতি ও থিয়োসফি-নিষ্ঠা আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করেছে যদিও তাঁর প্রথম দুটো রচনায় এ সমন্বয় ঘটেনি। বস্তুত প্যারীচাঁদ মানসের এই নীতিবোধ তাঁর প্রথম দুটো রচনাতেই স্বতন্ত্রভাবে সুলভ। প্যারীচাঁদ-মানসের এই সমগ্ররূপটিকে 'ধর্মগূঢ় চেতনা' বলেও আখ্যাত করা যেতে পারে।

চার

প্রচলিত কথাটি হল: বিদ্যাসাগরের 'পণ্ডিতি রীতির' গদ্যাদর্শের বিরুদ্ধে প্রথম 'বিদ্রোহী' হচ্ছেন প্যারীচাঁদ মিত্র এবং তাঁর এই 'বিদ্রোহ' তাঁর বিপ্লবী দৃষ্টির ফল। বলাবাহুল্য কিছু সত্য থাকলেও এই মন্তব্যটিই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতে পারে না।

প্রথমত বিদ্যাসাগর আজীবন 'পণ্ডিতি রীতির' গদ্য রচনা করেননি। শেষ জীবনের polymics-গুলোতে তিনি স্বচ্ছন্দে কথ্যবাকভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে প্যারীচাঁদও আজীবন 'আলালী ভাষায় গ্রন্থরচনা করেননি বরং ক্রমান্বয়ে তাঁর ভাষাভঙ্গি জটিলতার পথে অগ্রসর হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র ভাষার ক্ষেত্রে নয় ভাবের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর সমাজমুখীন, ফলে ক্রমান্বয়ে সরলতামুখীন আর প্যারীচাঁদ ক্রমান্বয়ে জটিলতামুখীন হয়েছেন। তাই, বরং বলা যায়, কি ভাবগত কি ভাষাগত উভয় দিক দিয়েই প্যারীচাঁদ মিত্র যেন বিদ্যাসাগরের বিপ্রতীপ। এর কারণও স্পষ্ট।

'হিউম্যানিস্ট্ পণ্ডিত' বিদ্যাসাগর সাহিত্যরচনা করেছিলেন 'হিউম্যানিস্ট্' আদর্শ প্রণোদিত হয়ে।[৬০] তাঁর সাহিত্যজীবন তাঁর কর্মজীবনের প্রক্ষেপমাত্র।[৬১] তাই পুঁথি সন্ধান ও সম্পাদন, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সামাজিক আলোচনা মিলিয়ে তাঁর সাহিত্যসাধনা বিচিত্র। এই বিচিত্র সাহিত্যসাধনার জন্য একদিকে তিনি যেমন একনিষ্ঠ অনুশীলন করেছেন অন্যদিকে তেমনি নবজাত বাঙলাভাষার সর্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন নীরিক্ষাতে ব্যাপৃত হয়েছেন। তিনিই

৬০। দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষ। পূর্বোক্ত।

৬১। দ্রষ্টব্য: প্রমথনাথ বিশী। ভূমিকা: বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার। (অমর সাহিত্য প্রকাশনী। কলিকাতা ১৩৬৫)।

প্রথম কমা সেমিকোলন ইত্যাদি বিরামচিহ্নের প্রয়োগ করে বাঙালা লিখিত ভাষাকে স্বচ্ছন্দ পাঠোপযোগী করে তোলেন। তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রত্যেকটি সংস্করণে তিনি ভাষাকে ক্রমান্বয়ে সরল ও প্রাঞ্জল করতে প্রয়াসী হয়েছেন।"[৬২]

অন্যদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও ব্রাহ্মসমাজাদর্শ প্রাণিত, থিয়োসফিতে উৎসাহী; এবং তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম এই জ্ঞানলব্ধ ধর্ম ও ধ্যানের মহিমা কীর্তনে নিয়োজিত। ক্রমান্বয়ে এই দ্বৈত আদর্শ তাঁর মনে গভীর প্রত্যয়রূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর যে গভীর পাণ্ডিত্য তাঁর পরবর্তী রচনাবলীতে বিধৃত তা যথোপযুক্ত ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে। এখানেই প্যারীচাঁদের আর একটি নতুন পরিচয় মেলে। 'আলালী' ভাষা বলে কথিত সংস্কৃতানুসারী বাঙলা গদ্যের যে 'প্রতিবাদ'—তার পরিচয় প্যারীচাঁদের এই পরবর্তী রচনাবলীতে মেলে না; বরং বিষয়বস্তু আহরণের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ একদিকে যেমন সমকালীন সমাজজীবনের বাস্তবতা থেকে ক্রমশঃ স্বীয় আধ্যাত্ম-জগতের 'বাস্তবতার' জটিল পথে সঞ্চরণ করেছেন, তেমনি ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রেও কথ্যভঙ্গি আলালীভাষা থেকে ক্রমশঃ 'সংস্কৃতানুসারী' ভাষা গ্রহণ করেছেন। অবশ্য সংস্কৃত শব্দাবলীর যথাযথ ব্যবহারেই নয় প্রাঞ্জল বাক্যরীতিতে তার যথার্থ প্রয়োগেই প্যারীচাঁদের শেষ বয়সের গদ্যের বৈশিষ্ট্য নিহিত; যেমন তাঁর 'আলালী' ভাষার বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে প্রাঞ্জল বাক্যরীতিতে কথ্যশব্দ ও বাক্‌ভঙ্গির উপযুক্ত ব্যবহারে।

১৮৫৫ সালে রাধানাথ শিকদারের সহযোগী হিসেবে প্যারীচাঁদ 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার 'প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে' লেখা হল: "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে

৬২। দ্রষ্টব্য: ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী: সাহিত্য সংখ্যা; ভূমিকা। (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। কলিকাতা ১৩৪৪)। পৃ।০—॥০।

এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।…"[৬৩] এই ভূমিকাতেই সম্পাদকদের সচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[৬৪] এ কারণেই কেরীর কথোপথনে বা ভবানীচরণের রচনায় ইতিপূর্বেই কথ্যভাষা প্রযুক্ত হলেও তাদের কাছে—বিশেষত "কেরির কাছে প্যারীচাঁদের ঋণের কোন কথাই ওঠেনা।"[৬৫]

ভাষায় তীব্র শ্লেষ ও কৌতুকরস; বাক্যরীতির কথ্যভঙ্গি: কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের ভাষা ও 'মুসলমানী' ভাষা প্রয়োগ; দেশী, বিদেশী ও তৎসম শব্দের অবলীলাক্রমে ব্যবহার; ক্রিয়াবিভক্তি,—কারকবিভক্তি ও অব্যয়ের নতুন রূপ আবিষ্কার এবং সমাস, সন্ধি ও দীর্ঘ বাক্য পরিহার—এই হচ্ছে 'আলালের ঘরের দুলালে' ব্যবহৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য। "প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখায় কথ্যরীতির সুষ্ঠু রূপ গ্রহণ করেনি; সাধু ও কথ্যভঙ্গীর নানা মিশ্রণ হয়েছে। তবু চলিত ভাষার আদলে যে লঘু ভংগীর আমদানী তিনি করেছিলেন সেকালের ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে তা ছিল এক অভিনব ঘটনা।"[৬৬]

৬৩। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত। পূর্বোক্ত পৃ।/০ উদ্ধৃত।

৬৪। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্ত্রীশিক্ষাই প্যারীচাঁদের মূল লক্ষ্য হলেও বাংলা ভাষা শিক্ষার্থী বিদেশিদের প্রতিও তাঁর সচেতন লক্ষ্য ছিল। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'আধ্যাত্মিকা'র ইংরেজীর Preface এ তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে:

(ক) আলালের ঘরের দুলাল: "The work has been written in a simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic life, it will perhaps be found useful.

(খ) আধ্যাত্মিকা: The conversation and manners of different classes of people in differnt circumstances which have been portrayed in different styles, and which may perhaps be usefule to foreigners, wishing to acquire a colloquial knowledge of the Bengali Language."

৬৫। ডঃ মনোমোহন ঘোষ। বাংলা গদ্যের চার যুগ। (দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লি। কলিকাতা। দ্বি-স ১৯৪৯)। পৃ ১৪৫।

৬৬। মুহম্মদ আবদুল হাই (ও সৈয়দ আলী আহসান)। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। পৃ ৫৬।

রামগতি ন্যায়রত্ন এই ভাষাকে 'আলালী ভাষা' বলে আখ্যাত করেছিলেন[৬৭] এবং বলেছিলেন যে আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা কিছুতেই এ হতে পারেনা। কিন্তু "এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রী রহিল না, বঙ্কিমী হইয়া দাঁড়াইল।"[৬৮]

বস্তুতঃ প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃতিত্ব এখানেই। বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষার প্রতি বিমুখ নবশিক্ষিতদেরকে আকর্ষণ করেছিলেন সে ভাষায় প্রাণশক্তি সঞ্চার ক'রে. আর প্যারীচাঁদ এর নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত ক'রে বঙ্কিমকে উৎসাহিত করলেন এই ভাষার বিপুল সম্পদ আবিষ্কারে।

ভাষাভঙ্গি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, "বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।" প্রায়োজন হলে যে কোন 'রীতির' ভাষা প্রয়োগ করতে হবে "আপত্তি কেবল নিষ্প্রয়োজনে"।[৬৯] এবং প্রতিভাধর যিনি তিনি প্রয়োজনানুসারে ভাষাপ্রয়োগের দক্ষতা স্বতই অর্জন করেন। বিদ্যাসাগর ও প্যারীচাঁদ এদিক দিয়ে সগোত্র; প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগে সমকালীন মাপকাঠিতে তাঁরা পূর্বাপর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।[৭০]

৬৭। দ্রষ্টব্য: বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। গৌরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। (চুচুড়া বুককোম্পানী। চ-স ১৩৪২)।

৬৮। শিবনাথ শাস্ত্রী। পূর্বোক্ত পৃ ১৩১।

৬৯। বাঙ্গালা ভাষা। বিবিধ প্রবন্ধ। বঙ্কিম রচনাবলী: দ্বিতীয় খণ্ড: সমগ্র সাহিত্য। পৃ ৩৭৩।

৭০। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন:

'Their style varies between the literary and colloquial, and bears testimony to the uncertainty still pervailing in Bengali Prose style in the third quarter of the century.' —J. C. Ghosh : Bengali Literature (Oxford Univerity Press. London, 1948) p. 129.

পাঁচ

সবশেষে পুনরুক্তি ক'রে বলা যেতে পারে, প্যারীচাঁদের খ্যাতির উৎস তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' হলেও তাঁর মানসিকতার পূর্ণ পরিচয় সেখানেই বিধৃত নেই। সামগ্রিকভাবে তাঁর সাহিত্যকর্ম মর্যাদা পেতে পারে 'for its significance in the history of ideas'।

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি ('imitation of life') কিন্তু তা সর্বদাই ব্যক্তি-বিশেষের মানসভঙ্গিজাত ; "That is to say it can only be a knowledge of other people's knowledge of life, not of life itself"। বলা চলে, তা হচ্ছে "the view of life of a person who was a good observer within his limits"।[৭১] তাই ধর্মচেতনা যে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি দিয়েছে তাঁর রচনা স্বভাবতই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির রচনা থেকে পৃথক হবেই। এই কারণে প্যারীচাঁদের অধিকাংশ রচনাই আজকের পাঠকের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম নয় ; প্যারীচাঁদের সীমাবদ্ধতার কারণেই তাঁর রচনা সকল 'রসবেত্তা-অধিগম্য' হয়ে ওঠে নি। তবু এ প্রসঙ্গেই 'বাঙলা ভাষায় বিমূর্তচিন্তা প্রকাশ দুঃসাধ্য'—একথা যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের প্যারীচাঁদের জটিল তত্ত্বালোচনাকীর্ণ রচনাবলী পড়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার পুরোভাগে জাগ্রত নায়কের দায়িত্বে তিনি আজীবন অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি সত্য, কিন্তু তাঁরই দিকনির্দেশে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য অতি অল্প কালের মধ্যেই আশ্চর্য প্রাণশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি বাঙলা সাহিত্যে প্রথম মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনীকারের অতি মূল্যবান দায়িত্ব তিনি পালন ক'রে গেছেন ; এই একটিমাত্র কৃতিত্বেই তিনি অবিস্মরণীয়।

৭১। T. S. Eliot : Religion and Literature. Selected Prose (Penguin Books. 1953 edn.) P. 39.

সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ
বা
যুগ-সংবাদ

[মুহম্মদ খান বিরচিত]

॥ ভূমিকা ॥

কবি মুহম্মদ খান আমাদের সাহিত্যে প্রথম রূপককাব্য রচয়িতা। আজকাল বিদ্যাসুন্দর, নল-দময়ন্তী, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি উপাখ্যানকেও রূপকরচনা বলে ব্যাখ্যা করার রেওয়াজ চালু হয়েছে। কিন্তু সে-সবের রূপক এমন প্রত্যক্ষ নয়, পাণ্ডিত্যের জোরে ব্যঙ্গ্যার্থ বের করা হয় মাত্র। যুগসংবাদের রূপক খুবই স্পষ্ট। কবি নিজেই বলেছেন ঃ

১। উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন।
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ॥
২। বাক্য উপদেশ হেতু বহুল যতনে।
তেকারণে বিরচিলুঁ ভাবি নিজ মনে॥

মুহম্মদ খান আরো একদিক দিয়ে আমাদের সাহিত্যে বিশিষ্ট কবি। ইনি বাংলায় তৃতীয় ট্র্যাজেডী রচয়িতা। বাংলা ট্র্যাজেডীর আদি কবি 'জঙ্গনামা' ও লায়লী মজনু রচয়িতা দৌলতউজীর বাহরাম খান (১৫৪৫-৫৩ খৃঃ)। দ্বিতীয় কবি 'জঙ্গনামা' লেখক নসরুল্লাহ খান খোন্দকার (আঃ ১৫৮০-১৬৪০ খৃঃ) এবং তৃতীয় 'মক্তুল হোসেনে'র কবি মুহম্মদ খান (১৬৩৫-৪৫ খৃঃ)। প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। কাজেই 'মক্তুল হোসেন' আমাদের সাহিত্যে আজো বিশিষ্ট কাব্য।

বাংলা সাহিত্যের আদি উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক মুসলমান ; এ সাহিত্যের আদি কবিও মুসলমান—শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪০৯ খৃঃ)। বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডী রচয়িতা মুসলমান। এ ভাষায় ধর্মপ্রেরণাবিহীন মানবিক

কাহিনী নিয়ে রসসাহিত্যের সৃষ্টিও করেন মুসলমান, এবং এ ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কাজী দৌলতও মুসলমান। রক্তে-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘরোয়া সুখ-দুঃখ এবং প্রণয়-বিরহের গাথা রচয়িতারও অধিকাংশই মুসলমান। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বাংলার মুসলমানের অবদানে সৃষ্ট, পুষ্ট ও ঋদ্ধ। এর উন্মেষে, বিকাশে ও বৈচিত্র্য সাধনে বাংলার মুসলমানের দান অপরিমেয়। সে-মুসলমানের মনেই আজ সংশয়—বাংলা তাদের জাতীয় ভাষা কি-না!

॥ পাণ্ডুলিপি পরিচিতি ॥

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহে এই একখানা মাত্র পাণ্ডুলিপি ছিল। ১৬″×৬″ পরিমিত তুলোট কাগজে লেখা। ১-৫৫ পত্রে সমাপ্ত। কিন্তু মধ্যে ২, ৩৬-৩৯ পত্রগুলো নেই।

এর লিপিকাল ১১৪৪ মগী বা ১৭৮২ খৃস্টাব্দ। লিপিকর গোলাম আলী। পুষ্পিকা—

> "পুস্তকাধিকারি শ্রী নোজিস খলিফা পীং এআর মাং খলিফা সাং হাজার বিঘা খএদাত নিজ বকসীহামিদ লিখক শ্রী গোলাম আলী নৈস্য সন ১১৪৪ মঘি তাং ১২ জমাদিস আখের মাহে ২২ চৈত্র রোজ রবি বাসর বেলি ১২ বাড়এ দণ্ড।"

শীগ্‌গীর এর আর কোন পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই মনে করে, আমরা এই একখানিমাত্র পাণ্ডুলিপি সম্বল করে কাব্যখানি সম্পাদনা করে দিলাম। আপাতত এতেই প্রাথমিক আলোচনার কাজ চলতে পারবে।

॥ কবি পরিচিতি ॥

'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ'-এ কবি আত্মপরিচয় দেননি। কেবল ভণিতায় দু'একজন পূর্বপুরুষের নামোল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মক্তুল হোসেন'-এ কবি—কেবল আত্মপরিচয় নয়—পীর পরিচিতিও সবিস্তারে দিতে চেষ্টা করেছেন। আমরা তাই 'মক্তুল হোসেন' থেকেই কবির আত্মপরিচয় তুলে ধরছি ঃ

॥ চট্টগ্রামের পীর-পরম্পরার স্তুতি ॥

একমনে প্রণাম করম বারেবার।
কদল খান গাজী পীর ত্রিভুবন সার॥
যার রণে পড়িল অক্ষয়[১] রিপুদল।
ভএ কেহ মজ্জি গেল সমুদ্রের তল॥
একেশ্বর মহিম হইল প্রাণহীন।
রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধীন॥
বৃক্ষডালে[২] বসিছিলা কাফিরেরগণ।
সেই বৃক্ষ ছেদি[৩] সবে করিলা নিধন॥
তান একাদশ মিত্র করম প্রণাম।
পুস্তক বাড়এ হেতু না লেখিলু নাম॥
তান একাদশ মিত্র জিনিয়া চাটিগ্রাম।
মুসলমান কৈলা চাটিগ্রাম অনুপাম॥
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবান।
শএখ শরীফুদ্দিন ত্রিভুবনে জান॥
একমনে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ।
শিক্ষাগুরু কল্পতরু অতি বিতপণ॥
প্রণামহোঁ তান সুত গুণের সাগর।
কুলগুরু কাজী সে আলাম নাম ধর॥
মহাসত্য মীর[৪] কাজী তাহান নন্দন।
একমনে প্রণামহোঁ এ দুই চরণ॥
তানসুত গুণযুত খান কাজী নাম।
তাহান পদেত মোর সহস্র প্রণাম॥
তাহান নন্দন জান সর্বগুণালয়।
করতার ভাবে মগ্ন তাহান হৃদয়॥
শএখ হামিদ পীর জানে ত্রিভুবন।
এক মনে প্রণামিএ সে দুই চরণ॥
তান সুত সুলতান[৫] বুদ্ধি সুরগুরু।
দুঃখিত জনের প্রতি ভব-কল্পতরু॥
যার করমেতে ভরি গেল ত্রিভুবন।
বাবা ফরিদের পদে করম বন্দন॥
তাহান ঔরসোদ্ভব ত্রিভুবনের সার।
দশদিক ভরি কীর্তি হইল যাহার॥
ক্ষেণেকে মক্কাতে চলি যাএ যেই জন।
তথা গিয়া সেবন্ত নিরূপ নিরঞ্জন॥
তিলেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশ।
যথাবিধি করতার সেবন্ত বিশেষ॥
হামিদ আলাম পীর ভুবনের গতি।
তান দুই পদ বন্দম করিয়া ভকতি॥
তাহান ঔরসোদ্ভব কুলের কেতন।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ অতি বিতপণ॥
বধিল সে রিপুকুল করিয়া সংগ্রাম।
আপনেহ স্বর্গবাসী হৈলা পরিণাম॥
শাহা নাসিরুদ্দিন পীর মর্যাদা সাগর।
চরণ রাজীবে প্রণামহোঁ বহুতর॥
তাহান ঔরসে বিবি মানিক্য ধরিলা।
সর্বসুলক্ষণ শিশু তাতে উপজিলা॥
পরম উজ্বল কান্তি কমল লোচন।
আখেরে কুতুব হেন বলে সর্বজন॥
পীর মোকারম নাম ভুবনের সার।
মাতা সঙ্গে তাহান প্রণামি বারেবার॥
তাহান কনিষ্ঠ সে যে পূজিত ভুবন।
পূর্ণ চন্দ্রাধিক মুখ কমল লোচন॥
গৌরাঙ্গ কাঞ্চন-কান্তি উচ্চ নাসাদণ্ড।
দীর্ঘবাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচণ্ড॥

১ অসংখ্য ২ তলে ৩ ভেদি ৪ পীর ৫ সুতনয়

তাহান নন্দন শ্যাম-সুন্দর শরীর।
পূর্ণিমার চন্দ্র মুখ সর্বশাস্ত্রে স্থির॥
গৌড়রাজ্য অধিপতি যাকে প্রশংসিলা।
ভিক্ষুক জনের পতি যাঁহাকে বুলিলা॥
চাটিগ্রাম পতি জান নসরত খান।
আপনার প্রিয় সুতা দিলা যার স্থান॥
বার বাঙ্গালার রাজা ইসা খান বীর।
দক্ষিণ-কূলের রাজা আদম সুধীর॥
স্নেহভাবে যাহাকে পূজন্ত প্রতিনিতি।
যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধির পতি॥[১]
সদর জাঁহা কবি[২] যার ভুবনে বাখান।
পরম পাণ্ডিত্য গুণে রসের নিদান॥
পীর মুলুকে যারে বোলে সর্বজন।
বারে বারে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ॥
একমনে ভাবে যেবা এক নিরঞ্জন।
ক্ষমাকুল দয়াশীল মধুর বচন॥
শাহা আবদুল ওহাবের করম বন্দন।
শাহা ভিখারী তানে বোলে সর্বজন॥
বারে বারে প্রণামহোঁ সে দুই চরণ।
গুণবান মৃত্যুঞ্জয় নবরসে 'দধি।
বহুল প্রকারে যারে সৃজিলেক বিধি॥
নিরন্তর নিরঞ্জন ভাবে সেই জন।
প্রভুভাবে ঝরে নীর কমল লোচন॥
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে পূজএ যার পদ।
আল্লার কালাম যার হএ কণ্ঠগত॥
কোরেশী বংশের জান প্রসিদ্ধির হেতু।
মহাসত্য মহাশয় কুলজয় কেতু॥
ধবল গজেন্দ্র সেবে বুলি যাহাকে বাখানে।
যা হোন্তে পাইল পদ রোসাঙ্গীরগণে॥
শাহা আহমদ[৩] পীর করম বন্দন।
উদ্ধার করহ মোরে পশিলুঁ শরণ॥
মোহাম্মদ খানে কহে মনে করি সার।
তুহ্মিমাত্র সহায় নরক হৈতে পার॥

এ উদ্ধৃতিতে চট্টগ্রামের পীর-পরম্পরার প্রশস্তি রয়েছে। সম্ভবত এঁরা কোন একক বংশসম্ভূত নন। তিনটে কিংবা 'সুলতান'এর 'সুতনয়' পাঠ মেনে নিলে দুটো বংশ দেখা যায়ঃ

(১) শেখ শরীফুদ্দিন → কাজী আলাম → মীর কাজী → খান কাজী → শেখ হামিদ → সুলতান

(২) বাবা ফরিদ → হামিদ আলাম → শাহ নাসিরুদ্দিন → মোকারম, সদর জাঁহা

(৩) আবদুল ওহাব ওরফে শাহ ভিখারী → শাহ আহমদ
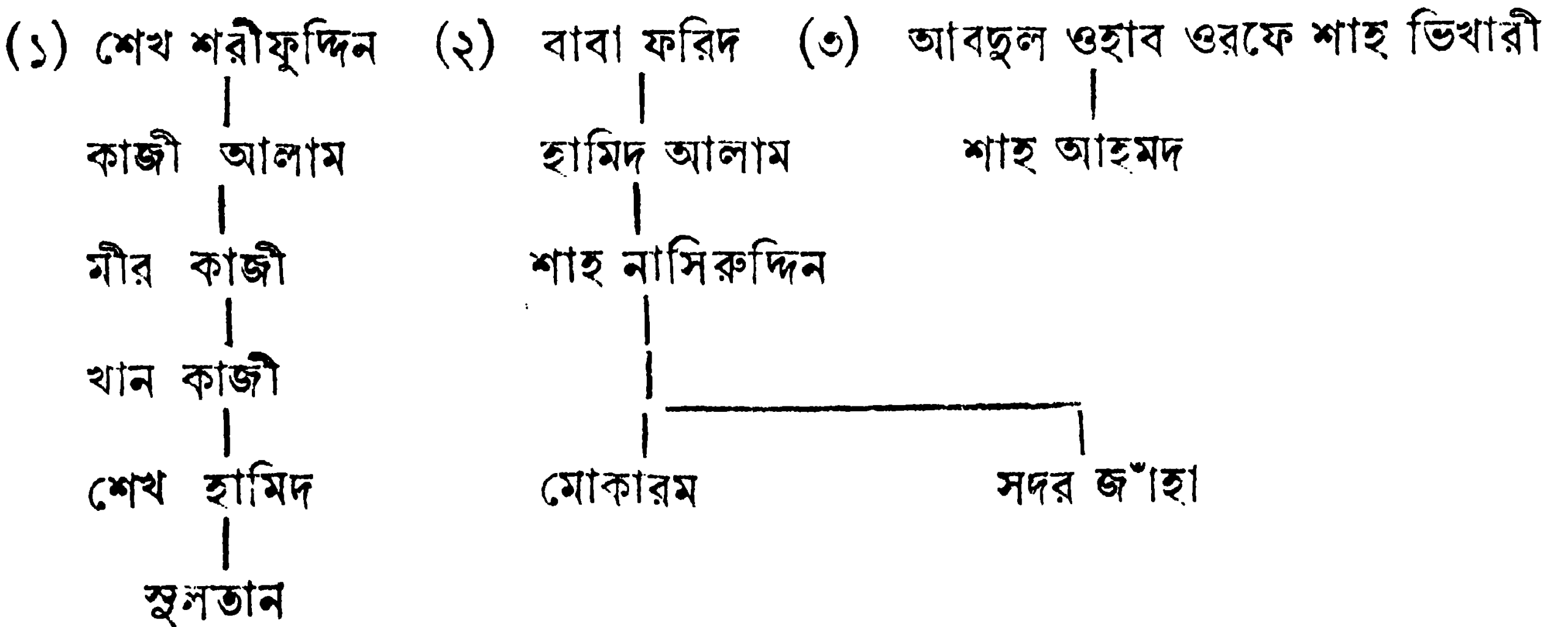
১ মগধি-বৌদ্ধ, মগধিরপতি-আরাকানরাজ। 'মগধি বা মগধ' নামে যে বৌদ্ধদেরই নির্দেশ করা হত, তা আমরা বিভিন্ন পুথিতে পাচ্ছি। বিস্তৃত আলোচনার জন্য সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন—'গ্রন্থ পরিচয়'; বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২-৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন—'আওরাদে বারোজ প্রশস্তি', এবং শেখ মনোহর কৃত 'শমশের গাজীনামা দ্রষ্টব্য। ২ কাজী ৩ মোহাম্মদ

মোটের উপর কবিপ্রদত্ত পীর-পরিচিতি বিভ্রান্তিকর। এটা কি কবির পীর সৈয়দ সুলতানেরই বংশ পরিচয়, না মুহম্মদ খানের পূর্বপুরুষদের পীর পরম্পরার পরিচিতি কিংবা কবির পূর্ববর্তী ও সমকালীন চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ পীরদের প্রশস্তি তা নির্ণয় করা আপাতত দুঃসাধ্য।

॥ কবির বংশ পরিচয় ॥

তবে পিতামহ গণ প্রণমিএ একমন
পিতামহ মাহি আছোয়ার।
সিদ্দিকের বংশে জন্ম উমরের সদৃশ ধর্ম
লজ্জাএ ওসমান সমসর॥
জ্ঞানেতে সদৃশ আলী দানেতে হাতিম বুলি
হামজা সদৃশ বলবান।
শিক্ষাগুরু কল্পতরু সর্ব অস্ত্রশাস্ত্রে গুরু
জন্ম হৈল আরবের স্থান॥
হাজী খলিল পীর ওর চাহি পৃথিবীর
ফিরিয়া আসিতে আরবার॥
সহরিষে তান সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
আসিতে সমুদ্রতীর সে হাজী খলিল পীর
সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ।
আল্লার ফরমান পাই একমৎস্য আইল ধাই
পৃষ্ঠ পাতি দিলা ততক্ষণ॥
আল্লার অস্তুত করি সে মৎস্যর পৃষ্ঠেতে চড়ি
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার।
গহন সমুদ্র তরি দুই পীর আইলা চলি
চাটিগ্রাম দেশের মাঝার॥

একাদশ মিত্র সঙ্গে কদল খান গাজী রঙ্গে
দুই পীর বাড়ি লই গেলা।
হাজী খলিলকে দেখি বদর আলাম সুখী
অঙ্গে অঙ্গে বহুল সম্ভাষিলা॥
মাহি আছোয়ার তবে সে দেশ ভ্রমন্ত যবে
দেখিলেন্ত আচার্য নন্দিনী।
রূপে বিদ্যাধরী জিনি সুধাহাসি মধু বাণী
নয়ান চকোর[১] কমলিনী॥
তান মুখ জুতি দেখি চকোর ভ্রমর আঁখি[২]
পরস্পর বাধিলেক দ্বন্দ্ব।
বিধি ভাল সীমা কৈল সমুখে নলিনী হৈল
ললাটে শ্রীখণ্ড অর্ধচন্দ্র॥
দেখি মাহি আছোয়ার পিতা স্থানে সে কন্যার
মাগিলেন্ত বিবাহ করিতে।
আচার্য না দিল যবে ব্যাঘ্রে আরোহি তবে
বিপ্র দ্বারে আইলা তুরিতে॥
ভএ দায় বিপ্রগণ আচার্যে ভাবিয়া মন
দান কৈলা আপনা নন্দিনী।
কথ কাল ক্রীড়া করি ফিরি দেশে গেলা চলি
পুত্র প্রসবিলা যশস্বিনী॥

১ অমল ২ সুখী

হাতিম তাহান নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম
দানে জ্ঞানে দ্বিতীয় হাতিম।
পাসন্ত ভিক্ষুক কুল বিক্রমে হামজা তুল
শৌর্য বীর্য দিতে নাহি সীম॥
তান পদ শিরে ধরি পঞ্চালি রচনা করি
তাহান নন্দন গুণনিধি।
সিদ্দিক তাহান নাম অস্ত্র শাস্ত্রে অনুপাম
বদন কমল কলানিধি॥
সর্বসিদ্ধি কল্পতরু পর উপকার চারু
সত্য বাদী সিদ্দিক সমান।
তান পুত্র জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ মানে কুরু
রাস্তিখান রূপে পঞ্চবাণ॥
চাটিগ্রাম দেশপতি স্বর্গে যেন সচীপতি
তাহানে প্রণামি বারেবার।
তাহান নন্দন বলি রসে 'দধি বলে শূলী
দানে হরিচন্দ্র সমসর॥
তেজে অগ্নি কোপে যম মানেত কৌরবসম
রণে যেন ভৃগুপতি রামা।
কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চশর
মিনাখান রূপে অনুপাম॥[১]
তান পুত্র গুণবান ভীমসম বলবান
কার্তবীর্য সম ধনু ধারী।
জ্ঞানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু দানে বলি কল্পতরু
যার কীর্তি গৌড় দেশ ভরি॥
ভিক্ষুক জনের গতি ঐশ্বর্যে যে যযাতি[২]
ধৈর্যে বীর্যে গম্ভীর সাগর।
গাভুর খান গুণনিধি থিরে ক্ষিতি রসে 'দধি
তাহানে প্রণামি বহুতর॥

করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ
লীলাএ পাঠানগণ জিনি।
শত্রুসব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয়
বাপ হোন্তে কৈলা রাজধ্বনি।[৩]
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র শুনে অনুক্ষণ
রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার।
হামজা খান মছলন্দ হাস্যবাণী মকরন্দ
তাহাকে প্রণামি বারেবার॥
তাহান নন্দনবর রসে যেন রত্নাকর
ধর্মে কর্মে যেন বৃহস্পতি।
সুমেরু সদৃশ থির পার্থসম মহাবীর
ঐশ্বর্যাদি নৃপ যযাতি॥[৪]
বংশের প্রসিদ্ধি হেতু নিজ কুল জয়কেতু
জন্ম হৈল প্রচণ্ড প্রতাপ।
গান্ধারী-নন্দন মানে কর্ণবলী জিনি দানে
ভিক্ষুক জনের যেন বাপ॥
বিজয়ে বিজয় সম বিপক্ষ কুলের যম
চন্দ্রমুখ সুধা মধু হাস।
রূপে কাম সমসর ধীর সুবলিত বর
পুরান্ত সকল নারী আশ॥
প্রজার পালক রাম বাপ হোন্তে অনুপাম
বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি।
বান্ধব জনের প্রাণ নসরত খান জান
তান পদে করম মিনতি॥
প্রণামি তাহান পদ রচিব পঞ্চালি পদ
তান পুত্র বলে হলধর।
চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথ্বী জিনি ধৈর্যবন্ত
গাণ্ডীবে অর্জুন সমসর॥

---

১ মিনখান ছিল তান নাম ২ জয়জাতি—যক্ষজাতি ? ৩ রাজধানী
৪ জয়জাতি—যক্ষজাতি ?

সান্ত দান্ত গুণবন্ত মর্যাদার নাহি অন্ত
কৃতান্ত একান্ত কোপগণি।
ক্ষেপন্ত করাল শেল নাশন্ত রিপুর কুল
জসন্ত আনন্দ হেন জানি ॥
প্রশংসন্ত সর্বদেশ কীর্তি গান্ত সবিশেষ
মহিষ[১] মারন্ত এক শরে।
শৌর্যবন্ত বীর্যবন্ত অনন্ত কি কহিব অন্ত
একশরে শার্দুল সংহারে ॥
সত্যবন্ত জিনি ধর্ম জ্ঞানবন্ত শিব সম
প্রজা পালিলেন্ত ধর্ম রাখি।
মুখ জ্যুতি পূর্ণ চন্দ্র হাস্য জিনি মকরন্দ
অমল কমল দল আঁখি ॥
দশন মুকতা পাঁতি অধর রঙ্গিম অতি
ভুরুযুগ টালনি দোলনী।
দীর্ঘ বাহু মধ্যচারু গজ শুণ্ড দুই উরু
চরণ অমল কমলিনী ॥
নারী-মুখ-পদ্ম-ভৃঙ্গ সমরে সদৃশ সিংহ
মধুবাণী সুধা সম হাসি।
তেজি গুরুজন ভীত সকল কামিনী চিত
শ্যাম ঘন মিলিবারে আসি ॥
কেহ বোলে হর ভএ দেখি আইল কামরাএ
কেহ বোলে কোথায় অনঙ্গ।
এহি মুখ পূর্ণ শশী কেহ বোলে নহে বাসি
কোথা চান্দ নাহিক কলঙ্ক ॥
কেহ বোলে দিনকর কেহ বোলে বিদ্যাধর
কেহ বোলে নহে এ সকল।
সুরশশী পঞ্চবাণ এহি সে জালাল খান
রূপে জিনি গেল বিদ্যাধর ॥
সে পদ-পঙ্কজ রেণু শিরে ধরি ফাগু জনু
রচিলুঁ পঞ্চালি অনুপাম।
তাহান নন্দন বলি বলে ভীম মহাশূলী
সমরেত ভৃগুপতি[২] রাম ॥

সুমেরু সদৃশ স্থির দানে জিনি কর্ণবীর
নতু কিবা হাতিম সমান।
বান্ধব পালক রাম রূপে অভিনব কাম
নতু ষড়াননের সমান ॥
কোপে যুগান্তরের যম তেজশালী হুতাসন
দহএ যেহেন কানন।
শ্যাম নবজলধর যেন স্বর্গ বিদ্যাধর
চন্দ্রমুখ কমল নয়ান ॥
ধর্মে ধর্ম জ্ঞানে গুরু সর্বসিদ্ধি কল্পতরু
মর্যাদায় সদৃশ রত্নাকর।
মধুসম বাক্য জান শ্রীযুত রহিম খান[৩]
তাহানে প্রণমি বহুতর ॥
তাহান অনুজবর পার্থসম ধনুর্ধর
বলে ভীম ধর্মে যুধিষ্ঠির ॥
কোপে অগ্নি মানে কুরু দানে কর্ণ কল্পতরু
ক্ষেমাএ পৃথিবী সম স্থির ॥
শাস্ত্রে অস্ত্রে অনুপাম রূপে অভিনব কাম
বদন অমল কমলিনী।
পর উপকার চারু দ্বিতীয় কলপতরু
মধুহাসি অমিয়া সে বাণী ॥
নিরঞ্জন অনুক্ষণ ভাবে অবিশ্রাম মন
তিলেক নাহিক বিস্মর।
কমল নয়ন নীর বহএ যে অনিবার
স্মরিতে যে নিরূপ আকার ॥
প্রভু মুবারিজ খান কমল চরণে তান
প্রণমিএ সহস্রেক বার।
তান সুত অল্পজ্ঞান মোহাম্মদ খান জান
পঞ্চালি রচিলুঁ শিশুবুদ্ধি।
শুন কহি গুণীলোক অপরাধ ক্ষেম মোক
গুণ কহিলুঁ সকল সুদ্ধি ॥

১ মহিম ২ রঘুপতি ৩ শ্রী বিরহিম খান

কবির আদিপুরুষ মাহি আসোয়ার। তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দিকের বংশজাত। আরবে তাঁর জন্ম। পীর হাজী খলীল দুনিয়া সফরে বের হলে মাহি আসোয়ারও তাঁর সঙ্গী হন। তাঁরা চট্টগ্রামে পৌঁছলে গাজী কদর খান তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যান। মাহি আসোয়ার এক ব্রাহ্মণ কন্যার রূপে মুগ্ধ হন এবং ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তার কন্যা বিয়ে করেন। পরে এক সময় তিনি স্ত্রী-পুত্র রেখে দেশে ফিরে যান। তাঁর বংশ পরিচয় এরূপ ঃ

মাহি আসোয়ার (অনুঃ ১৩৩৯-৪৫ খৃঃ)
|
হাতিম
|
সিদ্দিক
|
রাস্তি খান (চট্টগ্রামের অধিপতি)
|
মিনা খান (যাঁর কীর্তি গৌড় দেশ ভরি)
|
গাভুর খান (ত্রিপুরা বিজেতা ও নব রাজধানী স্থাপয়িতা)
|
হামজা খান (পিতৃরাজ্য শাসন কর্তা)
|
নসরত খান (চট্টগ্রাম-দেশ-কান্ত)
|
জালাল খান (সমরেত ভৃগুপতি-সম)

রহিম বা বিরহিম খান — মুবারিজ খান
মুবারিজ খান
|
কবি মুহম্মদ খান

মুহম্মদ খানের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত 'মুলুক সোয়াং' গাঁয়ে এক নায়েব উজীর মুহম্মদ খানের পাকা মসজিদ রয়েছে। মসজিদের দেয়ালে আরবী ডোগরা হরফে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিও আছে। আজো এর পাঠোদ্ধার করা হয়নি। কেউ কেউ এই নায়েব উজীর ও কবি মুহম্মদ খান অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেন। উৎকীর্ণ লিপির পাঠ না জানা পর্যন্ত কিছুই অনুমান করা উচিত হবে না। তবে আমাদের সংশয়ের কথা এই যে, নায়েব উজীরের মত পদস্থ ব্যক্তি হলে, কুল-গৌরব-গর্বী মুহম্মদ খানের পক্ষে তা' চেপে রাখা অস্বাভাবিক।

যদিও কবি উচ্ছ্বাস বশে অনেক অত্যুক্তি করেছেন, তবু এ দীর্ঘ বর্ণনা থেকে ইতিহাসের বহু উপাদান পাওয়া যাচ্ছে। কবি তাঁর পূর্বপুরুষদের কাহিনী বর্ণনায় কোন ইতিহাসের সাহায্য পাননি। পিতৃপুরুষের মুখে-শোনা অতিরঞ্জিত আর সত্য ও কল্পনায় বিকৃত ইতিকথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। কবি যে এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে গৌরব বোধ তিনি গোপন করতে পারেননি। তাই অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বপুরুষের ও পীরের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে ভণিতা শেষ করেছেন। এতে আমাদের প্রচুর লাভের সম্ভাবনা—কেননা চটুল-ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায় আবার আমাদের চোখে ধরা দিচ্ছে।

(ক) মাহি আসোয়ার বা মৎস্যারোহী (মৎস্যাকৃতির জাহাজে আরোহী) এবং পীর হাজী খলীলের চট্টগ্রামে আসার কাহিনী আমাদের বহুশ্রুত আরব-চট্টগ্রাম তথা আরব-বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।[১] আমরা অনুমান করতে পারি, মাহি আসোয়ার আরব ব্যবসায়ী এবং হাজী খলীল ধর্মপ্রচারক ছিলেন। অন্তত খৃষ্টীয় আট শতক থেকে আরব বণিকেরা চট্টগ্রামে যাতায়াত করত। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে খলিফা হারুন-অর-রশীদের আমলের (৭৮৬-৮০৯ খৃঃ) মুদ্রার (৭৮৮ খৃঃ) আবিষ্কার আমাদের এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণে সাহায্য করছে। আরব-পারস্যের সূফী দরবেশেরাও দেশ ভ্রমণ ও ধর্মপ্রচারের জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। সে যুগে যাতায়াত সহজ ছিল না বলে, আরব বণিকদের এ দেশে দীর্ঘকাল থাকতে হত। তাই এ দেশে বাসকালে তারা দেশীমেয়ে বিয়ে করত। যেমন ইয়ুরোপীয় বণিকদের অনেকে করেছিল। এমনকি পর্যটক ইব্‌ন বতুতাও স্থানে স্থানে স্বল্পমেয়াদী (মো'তা) বিয়ে করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। মাহি আসোয়ারের বিয়ে করা এবং পরে দেশে ফিরে যাওয়ার কাহিনী আমাদের ধারণার সত্যতা প্রমাণ করছে।

১ (ক) Early Muslim Contact with Bengal—Dr. A. H. Dani, Proceedings of All Pakistan History Conference : Ist Session 1951. pp 188-202.

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম: দ্বিতীয় অধ্যায়—ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।

কাজেই মাহি আসোয়ার কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। মৎস্যাকৃতিক জাহাজে চড়ে সে কালে আরব থেকে যারা আসত, সম্ভবত তারাই মাহি আসোয়ার নামে খ্যাত হত। এ জন্য বাংলা দেশে আরো অনেক মাহি আসোয়ার বংশ রয়েছে। হযরত মুহম্মদ (দঃ) ও ইসলামের উদ্ভবভূমি আরবের প্রতি এ দেশী মুসলমানের একটি শ্রদ্ধা ও সমীহের ভাব রয়েছে। তাই ও'দেশ থেকে যে কেউ আসে, তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখানো হয়, এর ফলে তাদের উপর আলৌকিক শক্তিও আরোপিত হয়। বলাবাহুল্য, মহাস্থান গড়ের মাহি আসোয়ার সৈয়দ সুলতান মাহমুদের সঙ্গে কবি মুহম্মদ খানের পূর্বপুরুষ আমাদের আলোচ্য মাহি আসোয়ারের কোন সম্পর্ক নেই।

(খ) গাজী কদর খান বা কদল খান ঐতিহাসিক ব্যক্তি। লোকশ্রুতি মতে ইনি সোনার গাঁয়ের সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্‌র (১৩৩৮-৪৯ খৃঃ) সেনাপতি রূপে চট্টগ্রাম জয় করেন এবং কিছু কালের জন্য সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। চট্টগ্রামের বুকে রাউজান থানায় এঁর নামের গ্রাম (কদলপুর), মস্‌জিদ ও দীঘি আজো বিদ্যমান রয়েছে।

(গ) বদর আলাম পীর বদরই হবেন। এই বদর আলাম বা বদরউদ্দীন আল্লামাহ্‌ হযরত শাহ্‌ জালাল মুযরদ-ই-য়মনের সমসাময়িক ছিলেন। শাহ জালাল ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সিলেট যান আর ১৩৪৬ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। সুতরাং পীর বদর আলাম চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রামে বাস করতেন। ইনিই দেও-জীন অধ্যুষিত ও জঙ্গলাকীর্ণ চট্টগ্রাম আবাদ করেন বলে প্রবাদ আছে। এঁর হাতের 'চাটি' (দীপ) থেকেই অঞ্চলটির নাম 'চাটিগ্রাম' হয়েছে বলেও জনশ্রুতি চালু আছে। চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে 'বদর পাতি (পট্টি ?)' নামে বদর শাহ্‌র দরগাহও রয়েছে। কবি মুহম্মদ খানের বিবৃতি থেকে দেখা যায় মাহি আসোয়ার, হাজী খলীল, বদর আলাম ও গাজী কদর খান সমসাময়িক ছিলেন। কবির বংশ লতিকার আলোকেও এর কালিক যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। বিহারের পীর বদর উদ্দীন বদর-ই-আলম (মৃত্যু-১৩৪০ খৃঃ) [বর্ধমান জেলার কাল্‌নায় যাঁর নকল সমাধি রয়েছে] আর চট্টগ্রামের পীর বদর হয়ত অভিন্ন ব্যক্তি।

(ঘ) 'বার বাঙ্গালার রাজা ঈসা খান বীর' ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খানই। কবি মুহম্মদ খানের বিবৃতি থেকে জানা যায়, তাঁর পীর ছিলেন চট্টগ্রাম বাসী সদর জঁাহা। এ সূত্রে ঈসা খান হয়তো চট্টগ্রাম যাতায়াত করতেন। মুঘলের ভয়ে তিনি চট্টগ্রামের পাহাড়-ঘেঁষা অঞ্চলে কিছু কাল (দু'বছর) আত্মগোপন করে ছিলেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছে। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার 'ঈসাপুর' গ্রাম তাঁর এ আত্মগোপনের স্মৃতিই বহন করছে বলে লোকের ধারণা। ঈসা খান ১৫৮৯ খৃস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[১]

(ঙ) 'আদম সুধীর' কোন্ দক্ষিণ কূলের রাজা ছিলেন জানা যায় না। প্রচলিত ইতিহাস ও কিংবদন্তীতে তাঁর খোঁজ মিলে না।

(চ) 'মগধির পতি' বা মঘদের পতি অর্থে রোসাঙ্গ বা আরাকানরাজকে নির্দেশ করে।[২]

(ছ) এক রাস্তি খান ঐতিহাসিক ব্যক্তি। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত জোবরা গ্রামে তাঁর নির্মিত মসজিদে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় তিনি গৌড়ের সুলতান রুকুনউদ্দীন বরবক শাহের (১৪৫৯—৭৬ খৃঃ) পদস্থ কর্মচারী বা তাঁর চট্টগ্রামস্থ অধিকারের শাসনকর্তা ছিলেন।[৩]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক[৪] ও ডক্টর আহমদ হাসান দানী[৫] এই রাস্তি খানকেই কবি মুহম্মদ খান-উক্ত রাস্তি খান বলে স্বীকার করেছেন। অথচ পরাগলী মহাভারত সূত্রে আমরা জানি যে রাস্তি খানের পুত্র স্বনামধন্য পরাগল

১ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন, 'আওরাদে বারোজ প্রশস্তি'।

২ 'বৌদ্ধ' অর্থে মগধি বা 'মগধ' বা 'মগ' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'গ্রন্থপরিচয়' সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন, দ্রষ্টব্য। নানা পুথিতে এ অর্থে 'মগধ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে।

৩ বিস্তৃত বিবরণের জন্য আলাউল বিরচিত 'তোহফা'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪ মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য। পৃঃ ১৮২।

৫ Early Muslim Contact with Bengal : The Proceedings of the All Pakistan History Conference : Ist Session held at Karachi 1951, pp. 201—2.

খান ও পৌত্র ছুটি খান। আলোচ্য বংশ লতিকায় এই দুজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম নেই। সঙ্গতি রক্ষার জন্যে ডক্টর দানী যথাক্রমে মিনা খান ও গাভুর খানকে কৃতি সাদৃশ্যে পরাগল ও ছুটি খান বলে মনে করেছেন, আর হামজা খান ও আবদুল বদরের আমলের (১৫৩৩—৩৯ খৃঃ) চট্টগ্রামের শাসনকর্তা আমিরজা খানকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেছেন। কিন্তু তথ্যবিহীন এ সিদ্ধান্তের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। বিশেষত মিনা খান বা গাভুর খান এমন কোন ভাল নাম নয় যে কবি সুখ্যাত পরাগল খান ও ছুটি খান নামের পরিবর্তে ওগুলো প্রয়োগ করবেন। পরাগলী কিংবা ছুটি খানের মহাভারতেও মিনা খান বা গাভুর খানের নাম নেই। একখানি পরাগলী মহাভারতে[১] আমরা রাস্তি খান ও পরাগল খানের নিম্নরূপ পরিচয় পাচ্ছি ঃ

(ক) রুদ্রবংশ রত্নাকর তাতে জন্ম সুধাকর
লস্কর পরাগল খান।
পয়ার প্রবন্ধ স্বরে কবীন্দ্র পরমেশ্বরে
বিরচিত ভারত বাখান।

(খ) দাতাকর্ণ গুণান্বিত, কৃতিমতি সঙ্গীতি বিদ্যাপতি
নানা বাক্য বিলসিত সিদ্ধান্ত বাচস্পতি ॥
নিত্যং ধর্ম সুমতি জিতেন্দ্রিয় তথি কর্ম শুভগতি।
খান শ্রীপরাগল স জীবতি ক্ষত্রিয় সেনাপতি ॥

(গ) (পরাগল) রাস্তি খান তনয় গুণনিধি। পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৪ সন, পৃঃ ১৬৬।

(ঘ) নৃপতি হোসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর ॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥
লস্করী বিষয় পাই আইলেন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি আইল হরষিত হৈয়া ॥

(ঙ) পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি ॥

১ গৃহস্থ ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। এবং শ্রীবৎস চরিতম প্রঃ ১৯১৫ খৃঃ। —জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ।

(চ) লস্কর পরাগল খানের তনয়।
শুনিয়া যজ্ঞের কথা সরস হৃদয়।
ছুটি খান নাম নসরত মহামতি।[১]
পশ্চাতে কি হইল হেন পুছিল ভারতী॥
শ্রীকর নন্দীএ কহে শুনিয়া সংহিতা।
জৈমিনি কহিলেক ভারতের কথা॥
(G. A. S. B. No 4124 P304B)

(ছ) খান পরাগল সুত পিতৃ ভক্ত অতি।
বাপের সংহতি যে নৃপতি সেনাপতি॥
(G. A. S. B. 4124 P330A)

(জ) খান পরাগল সুত দানে কল্পতরু।
পিতার দুর্লভ বড় গুরু ভক্তি চারু॥
(G, A. S. B. 3710 P139)

(ঝ) নৃপতি হোসেন শাহ তনয় ক্ষিতিপতি।
সাম-দান-দণ্ড-ভেদে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরা গড়েতে গিয়া কৈল সন্নিধান॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয়॥
বাপের বল্লভ পুত্র কুলের নন্দন।
কলিকাল অবতরি বিপক্ষ তপন॥
তাহান যতেক গুণ শুনিয়া নরপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি॥
নৃপতি অগ্রেত তার বহুত সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ তবে পাইল ছুটি খান
ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ি দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ॥
যদ্যাপি অভয় দিল খান মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে থাকে ত্রিপুর নৃপতি।
আপন নৃপতি সন্তর্পিয়া সবিশেষ॥
সুখে বৈসে লস্কর আপনার দেশ।[২]

'ক' ও 'খ' উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় রাস্তিখান রুদ্রবংশীয় হিন্দুসন্ততি। জোবরার মসজিদে উৎকীর্ণ লিপি থেকে দেখা যায় রাস্তিখান ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে

১ আমার কাছে একখানা সম্পূর্ণ ছুটি খানী অশ্বমেধপর্ব আছে। এর লিপিকাল ১১৫২ বাং ১৭৯০ খৃঃ। কিন্তু ওতে এ ভণিতা নেই।

২ অধিকাংশ উদ্ধৃতি ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ২২৫-২৮ থেকে গৃহীত। কেউ কেউ শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন। প্রথম গ্রন্থে কবীন্দ্র বা পরমেশ্বর উপাধি ব্যবহার করে পরবর্তী গ্রন্থে স্বনামে ভণিতা দেওয়ার ব্যাপার অদ্ভুত ঠেকে।
মনে হয়, লিপিকর প্রমাদে ভণিতা বদল হওয়ায় এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে আলোচনা রয়েছে।

বর্তমান ছিলেন। পরাগল খান যে এই রাস্তি খানেরই সন্তান ছিলেন, তা তাঁর হোসেন শাহের সেনাপতিপদ প্রাপ্তি থেকেই অনুমান করা যায়। 'ঘ' থেকে জানা যায়, পরাগল খান ১৫১৩-১৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ ছিলেন। 'চ' উদ্ধৃতিতে দেখা যায় বড়খান পরাগলের পুত্র হিসেবেই নসরত খান পিতার জীবিতাবস্থায় ছুটি খান (ছোট) নামে অভিহিত হতেন। নামের দিক দিয়ে মিল না হলেও কৃতি ও সময়ের দিক দিয়ে মিনা খান ও গাভুর খানের সঙ্গে পরাগল ও ছুটি খানের মিল রয়েছে। তাই বোধ হয় ডক্টর দানী এঁদের অভিন্নত্ব অনুমান করেছেন। কিন্তু রাস্তিখানের যে পরিচয় অন্য সূত্রে পাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে কবি মুহম্মদ খানের বর্ণনার মিল নেই। চট্টগ্রামের কিংবদন্তী থেকে জানা যায় 'প্রতিপত্তিশালী মহেশ রুদ্রের পৌত্র ভরত রুদ্র আরাকান রাজের বশ্যতা অস্বীকার করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলে চক্রশালার আরাকানী শাসনকর্তার হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর পরিজনেরা কোয়েপাড়া, পাটনীকোটা প্রভৃতি গাঁয়ে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করেন। এ বংশেরই এক শাখা ইসলাম গ্রহণ করে। রাস্তিখানের এ শাখায় উদ্ভব। ভরতরুদ্রের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও সাতটি দীঘি আজো পটিয়া-সংলগ্ন গাঁ ভাটিখাইনে বর্তমান রয়েছে। তাঁর বাস্তু 'রুদার ভিটা' নামে পরিচিত। পটিয়া গাঁয়ের প্রান্তে মজে-যাওয়া পরীর দীঘিও নাকি ভরতরুদ্রের কীর্তি। লোকচক্ষুর আড়ালে রাতারাতি এ দীঘি খনন করা হয় বলে বিস্মিত জনসাধারণ একে পরীর কাটা দীঘি বলে বিশ্বাস করে।'

এরূপ ক্ষেত্রে দুই রাস্তি খানকে অভিন্ন মনে করা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমীচীন নয়। তবে মুহম্মদ খান শ্রুতিস্মৃতিকে পল্লবিত ও বিকৃত করে বর্ণনা করেছেন বলে ধরে নিয়ে এবং দুটো পরিচিতির সামঞ্জস্য বিধান করে নিতান্ত অনুমান-নির্ভর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়: রাস্তিখানের সম্ভবত দুটো পুত্র ছিল— পরাগল খান ও মিনা খান। মোহাম্মদ খান এই মিনা খানেরই বংশধর। লক্ষনীয় যে পিতা ও পিতৃব্য ছাড়া কবি সবক্ষেত্রে একক বংশধরেরই নামোল্লেখ করেছেন। এবং সম্ভবত ছুটি খানের পর শাসন ক্ষমতা এ তরফেই চলে আসে। কিন্তু তবু 'মাহি আসোয়ার' ও রুদ্র বংশের বিভিন্নত্বের সমস্যা থেকে যায়, ফলে সংশয় ও বিতর্কের অবকাশও রয়ে গেল প্রচুর।

॥ পীর-পরিচিতি ॥

মুহম্মদ খানের পীর ছিলেন 'নবীবংশ' রচয়িতা কবি সৈয়দ সুলতান। ভক্ত কবিদের ভাষায় তাঁর নাম পীর 'মীর সৈয়দ সুলতান'। ইনি ১৫৮৪-৮৬ খৃস্টাব্দে [গ্রহশত রসযুগে অব্দ গোঞাইল-৯৯২-৪ হিজরী সনে] 'নবীবংশ' রচনা সুরু করেন। বিরাট গ্রন্থ বলে পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য এই 'নবী বংশে'র চার পর্ব ও তিনটে পর্বাংশ যথাক্রমে—নবীবংশ, রসুল চরিত, শবেমেরাজ, ওফাত-ই-রসুল, জয়কুম রাজার লড়াই, ও ইব্লিস নামা নামে রামায়ণ-মহাভারতের পর্বাদির মত পৃথক পৃথক গ্রন্থ রূপে চালু ছিল। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ভ্রমবশত এগুলোকে এক একটি স্বতন্ত্র রচনা বলে মনে করেছেন।[১] নবী বংশেরই 'বন্দনাংশ' শবেমেরাজে উদ্ধৃত হয়েছে। এ'ও ডক্টর হকের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ। কিন্তু এ বন্দনাতেই রয়েছে[২] :

> যেরূপে আদম সফি হৈল উত্পন
> কহিব যে সব কথা কিঞ্চিত বিবরণ [···বুঝিতে কারণ]··· =
> গ্রহশত রস যুগে অব্দ গোঞাইল।
> দেশী ভাষে এহি কথা কেহ না কহিল ॥

কাজেই এটা যে নবীবংশেরই উপক্রম, তাতে সন্দেহ থাকে না।

সৈয়দ সুলতানের অপর রচনা যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ 'জ্ঞান প্রদীপ'। 'জ্ঞান চৌতিশা' কোন পৃথক গ্রন্থ নয়। এটি জ্ঞান প্রদীপেরই অংশ এবং সম্ভবত উপসংহার। সৈয়দ সুলতান কিছু অধ্যাত্ম সঙ্গীতেরও রচয়িতা। অতএব সৈয়দ সুলতানের মোট তিনটি রচনা : (ক) নবীবংশ (খ) জ্ঞান প্রদীপ ও (গ) অধ্যাত্ম সঙ্গীত (এতে রাধাকৃষ্ণ রূপকের পদাবলীও আছে)।

সৈয়দ সুলতান যে চট্টগ্রামের চক্রশালাবাসী ছিলেন, তাতে আজকাল আর সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। কেন, তাই বলছি :

১ মুসলিম বাঙলা সাহিত্য। পৃঃ ১৪৩-১৫৮।

২ পুথি পরিচিতি। পৃঃ ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫৬, ৫৫৭।

১। 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'এর লিপিকর মুজাফফর উক্ত পুথির যে-ক'জায়গায় নিজের 'ভণিতা' যোজনা করে দিয়ে কবিযশ আত্মসাৎ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন' তার একটিতে পরোক্ষে কবি সৈয়দ সুলতানের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার কথা প্রকাশ পেয়েছে ঃ

সুলতান দৌহিত্রে হীন চক্রশালা ঘর।
কহে হীন মুজাফ্ফরে এক্ষির উত্তর॥
মুই হীন অধম যে বুদ্ধি ক্ষুদ্র কহি।
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ ধীর করে ছহি॥

২। 'গুলে বকাউলি' রচয়িতা মুহম্মদ মুকিম (১৭৬০-৮০ খৃঃ) পীর বন্দনায় বলেছেন ঃ

(ক) চক্রশালা ভূমি মধ্যে পীর জাদা ঠাম।
ছৈদ সুলতান বংশে শাহাতুল্লা নাম॥
একে তান ভ্রাতৃপুত্র দ্বিতীয়ে জামাতা।
সর্বশাস্ত্র বিশারদ শরীয়ৎ জ্ঞাতা॥
তান পুত্র শ্রী সৈদ মোহাম্মদ সৈয়দ।
নিজ পীর স্থানে সেহ হইল মুরীদ॥ (?)

(খ) চট্টগ্রাম দন্য ধন্য মহত্ত্ব বাখান।
ধার্মিক অতিথশালা ফকীর আস্তান॥
শাহ জাহিদ, শাহ পন্থী, আর শাহ পীর।
হাদী বাদশা আর শাহ সোন্দর ফকির॥[২]
শাহ সুলতান[৩] আর শাহ শেখ ফরিদ॥
শহরের মধ্যে বুড়া বদরের স্থিত॥

(গ) এবে প্রণমিব আমি পূর্ব কবি জান।
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান॥
মোহাম্মদ খান বিতপন দৌলত কাজীবর
এহি তিন আর এক আছএ তৎপর॥
গৌড়বাসী রইল আসি রোসাঙ্গের ঠাম।
কবিগুরু মহাকবি আলাউল নাম॥

১ সাহিত্য বিশারদ ভণিতা দেখে মুজাফ্ফরকেই 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'এর রচয়িতা বলে মনে করে ছিলেন। প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য। অবশ্য মুজাফফরও কবি ছিলেন। ইনি 'ইউনান দেশের পুথি' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। দ্রষ্টব্যঃ পুথিপরিচিতি, পৃঃ ২৯, ৩০। ২ সুন্দর ফকির পদাবলী রচয়িতা ছিলেন। পুথিপরিচিতি ঃ পৃঃ ৬৭৫। ৩ সুলতান বায়েজীদ বিস্তামী ?

৩। লাইলমতি সয়ফুলমুলুকের কবি শরীফ শাহও সম্ভবত সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ছিলেন ঃ

শাহ সুলতান সুত সর্বগুণে অলঙ্কৃত।
তান পদে করিয়া ভকতি।
কাজী মনসুর মানি তাহার তনয় জানি
শরীফ যাহার ভবতি।। (?)

৪। 'শির্নামা' রচয়িতা শেখ মনসুরের পীরও ছিলেন সৈয়দ সুলতানের বংশীয় ঃ

সুলতান বংশের কান্তি শাহ তাজুদ্দিন।
ভাগ্যফলে হৈলুঁ আমি তাহার অধীন॥
তান পদ পাদুকার রেণু ভুরু দেশ—
দিয়া মনে আশা করি আছিএ বিশেষ॥

৫। 'নুরনামার' কবি শাহ মীর মুহম্মদ সফী সম্ভবত সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ছিলেন ঃ

কহে মীর শাহ সফী আমি দুঃখ মতি।
এহলোক পরলোক সেই দুরগতি॥
পিতামহ শাহ ছৈদ জানহ দরবেশ।
কিঞ্চিৎ জানাইলুঁ সেই পন্থের নির্দেশ॥

৬। 'আজবশাহ সমনরোখ' প্রণেতা মোহাম্মদ চুহর (১৮০৪-৫০ খৃঃ) চট্টগ্রামবাসী 'কবিপ্রণামে' বলেছেন ঃ

আদ্যগুরু কল্পতরু ছৈদ সুলতান।
কবি আলাওল পীর মোহম্মদ খান॥ ['পীর' বিশেষণটি লক্ষণীয়]

৭। 'নুরনামা'য় কবি শেখ পরাণ [আনুঃ ১৫৮০—১৬৪০ খৃঃ] বলেন ঃ

শাস্ত্রনীতি কথা কহি কর অবধান॥
ফাতেমাক বিভা কৈল আলি মতিমান।
নবী বংশে রচিছন্ত ছৈদ সুলতান॥
যেন মতে আদেশিলা প্রভু করতার।
আলি স্থানে বিভা দিল বিবি ফাতেমার॥[১]

১। ২ থেকে ৭ নম্বর অবধি উদ্ধৃতির জন্ত পুথি পরিচিতি, পৃঃ ১৫, ৯২, ৯৪, ৯৬, ৪৯৮, ৫১৯ দ্রষ্টব্য।

৮। পদকার ফতে খানও সৈয়দ সুলতানের শিষ্য ছিলেন ঃ

কহে ফতে খানে সখি
উপায় আছএ নাকি
শ্রীযুত ইব্রাহিম খান।
ভব কল্পতরু জানহ আমার
পীর মীর শাহ্ সুলতান।

এ সব উদ্ধৃতির আলোকে সৈয়দ সুলতানের বংশলতিকাও খাড়া করা যায় ঃ

সৈয়দ সুলতান————————————ভাই
| |
কাজী মনসুর   শাহ্ দুল্লাহ্ (সৈয়দ সুলতানের জামাতা)
| |
মীর শাহ্ মুহম্মদ সফী   শরীফ শাহ্ মুজাফফর   সৈয়দ মুহম্মদ সৈয়দ
|
তাজুদ্দিন

সৈয়দ সুলতান-মুহম্মদ খানের—পীর-সাগরেদের কালিক ব্যবধান ও গ্রন্থ সম্বন্ধে একটু ভুল ধারণার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এখানে বিস্তৃত উদ্ধৃতিযোগে তার নিরসন প্রয়াস প্রয়োজন।

কবি সৈয়দ সুলতানের ইচ্ছা ছিল,—তিনি সৃষ্টিপত্তন থেকে কেয়ামত তক্ ইসলামি ধারার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিকথা রচনা করবেন। এ পরিকল্পনানুযায়ী তিনি আদম থেকে ওফাত-ই-রসুল পর্যন্ত এ ধারার সমস্ত কিছু বর্ণনা করে গেছেন। সৈয়দ সুলতানের রচনা একাধারে কাব্য, সঙ্গীত, ধর্মকথা, দর্শন, ইতিহাস ও জীবনী সাহিত্য। ওফাত-ই-রসুল রচনা শেষ করে তিনি আর এগুতে পারেননি। সম্ভবত ব্যাধি অথবা জরা এসে তাকে অথর্ব করে দিল। তিনি অনুভব করতে পারলেন—এবার যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু তাঁর দেহদুর্গে হানা দিতে পারে। মৃত্যুর

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য কবি-প্রতিভা সম্পন্ন মুহম্মদ খানকে স্মরণ করলেন। তাঁর স্বপ্নকে যদি কেউ সার্থক করে তুলতে পারে, তবে সে মোহাম্মদ খান, তাঁর পুণ্য সাধন ব্রতে পূর্ণতা দান করতে পারে কেবল মুহম্মদ খান, তাই মৃত্যু প্রতীক্ষু কবি তাঁর আরব্ধ কর্মের গুরুভার দিয়ে গেলেন সর্বদিক দিয়ে যোগ্য শিষ্য মুহম্মদ খানকে। মুহম্মদ খান সানন্দে ও সার্থক ভাবে সে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। পীরের পাণ্ডিত্য, জ্ঞানগভীরতা শিষ্যের ছিল না সত্য, কিন্তু কবিত্বে, সহৃদয়তায়, ভাষার লালিত্যে ও বর্ণনভঙ্গীর নিপুণতায় শিষ্য পীরকে ছাড়িয়ে গেছেন, এখন পীর-সাগরেদ সংবাদ মুহম্মদ খানের মুখেই শোনা যাক ঃ

ইমাম হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নবরস 'দধি॥
শ্যাম নবজলধর সুন্দর শরীর।
দানে কল্পতরু পৃথিবী সম স্থির॥
পূর্ণ চন্দ্রধিক মুখ কমল লোচন।
মন্দ মন্দ মধু হাসি মধুর বচন॥
শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর।
সেবক বৎসল প্রভু গুণে রত্নাকর॥
ভাবে ভবকল্পতরু গুণে রত্নাকর।
সিদ্দিক সিদ্দিক সম ধর্মেত উমর॥
ওসমান সদৃশ্য লজ্জা আলি সম জ্ঞান।
অসীম মহিমা পীর সাহা সুলতান॥...
উদরেত বৈসে তান জগতের গুণ।
বিজয় করিলা শাস্ত্র পৃথিবী ত্রিকোণ॥

হৃদয় মুকুর তান নাশে আন্ধিয়ার।
বহু যত্নে এহি রত্নে কৈল্লা করতার॥...
নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান।
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান॥
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা।
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা॥
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত আকলী।
চারি ছাব্বার কথা কৈলুঁ পদাবলী॥
দুইভাই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া।
প্রলয়ের কথা সব দিলুঁ প্রচারিয়া॥
অন্তে পুনি বিরচিলুঁ প্রভু দরশন।
এহা হন্তে 'ধিক কথা নাহি কদাচন॥
দুই পঞ্চালিকা যদি একত্র করএ।
আদ্যের অন্তের কথা সন্ধিযুক্ত হএ॥

মুহম্মদ খান একটিমাত্র গ্রন্থ 'মুক্তুল হোসেনে' কেয়ামত তক্ বর্ণনা করে পীরের আরব্ধ কার্যে সমাপ্তি দান করেন। কিন্তু উক্ত উদ্ধৃতি পড়ে মনে হবে তিনি কয়েকখানা গ্রন্থই রচনা করেছিলেন। [অবশ্য গ্রন্থটি প্রকাণ্ড বলে বিভিন্ন পর্ব পৃথকভাবে চালু ছিল]। তাই এখানে মুক্তুল হোসেনের বিভিন্ন পর্বের নামোল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি ঃ

আদি পর্বে ফাতেমার বিবাহ কহিব।
দুই ভাইর জন্ম তবে পাছে বিরচিব॥...
কহিব দ্বিতীয় পর্বে শুন দিয়া মন।
চারি আসহাবার কথা শাস্ত্রের নিদান॥...
কহিব তৃতীয় পর্বে হাসনের বাণী।
জনবকে বিবাহ করিলা মনে গুণি॥...
চতুর্থে মুসলিম পর্ব শুন দিয়া মন।...
কহিব পঞ্চম পর্বে যুদ্ধ অবশেষ।...
ষষ্ঠমে হোসেন পর্ব কহিবাম পাছে।...
সপ্তমেত স্ত্রীপর্ব কহিবাম পুনি।...
অষ্টমেত দূতপর্ব শুন দিয়া মন।.
নবমে ওলিদপর্ব শুন গুনিগণ॥...
দশমে এজিদপর্ব কহিবাম এবে।...
একাদশ পর্ব তার পশ্চাতে কহিব।
প্রলয় হইতে যথ অনর্থ হইব॥
যেন মতে দজ্জাল পাপী ভুলাইব নর।
যেন মতে আসিয়া পুনি ইসা পয়গাম্বর॥
মোহাম্মদ হানিফা ইমাম সঙ্গে করি।
যেমতে পালিবা লোক দজ্জাল সংহারি।
এআজুজ মাআজুজ সেই দুই বাহিনী।
যেন মতে হেসাব দিবেক সর্বজনি॥[১]

সৈয়দ সুলতান অথর্ব হয়েও দীর্ঘজীবী হয়ে ছিলেন বলে মনে হয়, নইলে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে মক্তুল হোসেন রচনাকালে মোহাম্মদ খান জীবিত [ভনিতার ভাষায় সে আভাস আছে] পীরের স্তুতি করতে পারতেন না। এ প্রসঙ্গে অনুমান করা যায়, নবী বংশের মত বিরাট গ্রন্থ রচনা করতে ১০-১৫ বছর লেগেছিল অর্থাৎ ১৬০০ অব্দের দিকে শেষ হয়েছিল ।

॥ মোহাম্মদ হানিফার লড়াই ॥

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'কে মুহম্মদ খানের আদি ও স্বতন্ত্র রচনা বলে সাব্যস্ত করেছেন ।[২] কিন্তু এটাও মক্তুল হোসেনের অংশ মাত্র।[৩] এর প্রথম ও শেষাংশে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন রয়েছে। বন্দনাটি প্রক্ষিপ্ত।

আরম্ভ: মক্তুল হোসেন এক কিতাব আছিল॥
এ সকল পরস্তাব কিতাবে লিখিল॥...
এজিদকে সংহারিয়া আলীর নন্দন।
এজিদের সৈন্য প্রতি অতি কোপ মন॥
মনে বাঞ্ছা কৈল বহু সংহারিতে সৈন্য।
নর আদি দেবগণে বোলে ধন্য ধন্য॥

শেষ: মক্তুল হোসেন কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম হরে পরলোকে তরি।[৪]...

'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'এর পাণ্ডুলিপিতে এরূপ ভণিতা অনেক রয়েছে।

২ মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃঃ ১৮৩। ৩ মুসলিম বাংলা সাহিত্য। পৃঃ ১৮৭-৮৮।
১—৪ পুথি পরিচিতি—পৃঃ ৩৯৯, ৪০৪-০৬।

।। রচনা কাল ।।

সৌভাগ্যের কথা মুহম্মদ খানের উভয় গ্রন্থের রচনা কাল পাওয়া গেছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ।' এর রচনা কাল :

দশ শত বাণ শত বাণ দশ 'দধি রাত্রি হইয়া গেল পঞ্চালিকা অবধি ।।

এতে ১০০০+৫০০+৫০+৭=১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৬৩৫ খৃস্টাব্দ পাওয়া যায়।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক 'যুগ সংবাদে' কবির পীরের নাম খুঁজে না পেয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন মুহম্মদ খান মুরীদ হওয়ার আগেই 'যুগ-সংবাদ' রচনা করেছিলেন।[১] কিন্তু যুগ-সংবাদের সমাপ্তি অংশে একটি ভণিতায় পীরের নাম আছে, অবশ্য একে কৃত্রিম বা প্রক্ষিপ্ত মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। প্রথমত গ্রন্থের কোথাও আর পীরের উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত যে-স্থানে ও যেভাবে প্রায় অসংলগ্ন অবস্থায় ভণিতাটি পাওয়া গেছে, তাতে তাকে কবির রচনা বলে মনে করা যায় না। যেমন ঃ

মুহম্মদ খানে কহে গুরু বিনে কার্য নহে
শিখিবেক গুরুর সাক্ষাৎ।
যুগ সংবাদ যদি সমাপ্ত হইল।
হরষিতে মিত্র কণ্ঠ আশীর্বাদ দিল।।
হরষিত পাত্র সব স্তবে জোড় হাত।
যার যে দেশেত গেলা তিন নরনাথ।।
সিদ্দিক বংশেত ভব নব কল্পতরু।।
শাহা সুলতান পীর জ্ঞানে শুক্রগুরু।।

তৃতীয়ত গ্রন্থারম্ভে কবি নিজের পীরের স্তুতি করেন নি ঃ

'একে একে প্রণামহুঁ যথ নবীপদ।
যথপীর প্রণামহুঁ খণ্ডাও আপদ।।
জনক জননী দোহো প্রণাম করিয়া।
গুরুজন পদ শিরে আনন্দে ধরিয়া।।
উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন।
সত্য কলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ।।

কাজেই ডক্টর হকের সিদ্ধান্তই যথার্থ বলে মনে করা যেতে পারে।

১। মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য (পৃঃ ১৮৩)।

মক্তুল হোসেনের রচনাকাল ঃ

মক্তুল হোসেন কথা অমৃতের ধার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥
মুসলমানি তারিখের দশ শত ভেল।
শতের অর্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল॥
হিন্দুয়ানি তারিখের শুন কহি কত।
বাণ বাহু সম অর্ধ আর বাণ শত।
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া 'দধি।
[শেষ দু' পঙ্‌ক্তির অনুমিত বিশুদ্ধ পাঠ ঃ
বাণ বাহু শত শব্দ আর বাণ শত।
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া 'দধি॥]

পঞ্চাশিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি॥
সুরগুরু শেষ নিদস্থ গুরু আগে।
মিত্র এই কুমুদিনী প্রীতিবর মাগে॥
হইয়া নক্ষত্ররূপ উড়ি গেল শশী।
দশদিকে প্রসন্ন পাতকী তম নাশি।
মাধবী-মাসের সপ্ত দিবস গঁইল।
সেই রাত্রি পঞ্চাশিকা সমাপ্ত হইল॥

এতে মুসলমানি হিজরী ১০০০ + ৫০ + ৬ = ১০৫৬ = ১৬৪৫-৪৬ খৃস্টাব্দ।

এবং হিন্দুয়ানি শক ৫ × ২ = ১০০০ + ৫০০ + ২০ × ৩ + ৭ = ১৫৬৭ + ৭৮ = ১৬৪৫ খৃস্টাব্দ পাওয়া যায়।

অতএব, মুহম্মদ খান ১৬৩৫ খৃস্টাব্দে 'যুগ সংবাদ' এবং ১৬৪৫ খৃস্টাব্দে মক্তুল হোসেন রচনা করেন। এ যাবৎ তাঁর আর কোন রচনার সন্ধান মেলেনি।

॥ **গ্রন্থ পরিচিতি** ॥

সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় এটি মৌলিক রূপক কাব্য। এ ধরণের রচনা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নেই। আর সব রূপক কাব্য—যেমন নল-দয়মন্তী, বিদ্যাসুন্দর, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতির রূপক আবেদন পরোক্ষ। এটির উদ্দিষ্ট তত্ত্ব একেবারে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট। কাব্যটির কবিপ্রদত্ত নাম দুটো—'সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ' ও 'যুগ-সংবাদ' ঃ

উপদেশ পঞ্চাশিকা করিব রচন
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ।

এবং যুগ সংবাদের কথা অমৃত বরিষে।

কাব্যটি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত। কবির ভাষায় ঃ

(ক) প্রথমে সত্যক সত্যবতী দুই মিলি।
যেন মতে কলির দুঃশীলা সঙ্গে কেলি॥
সত্য সঙ্গে যুঝিতে কলির আগমন।
মিত্র কণ্ঠ দূত গেলা নিষেধিতে রণ॥
না করিল সন্ধিপত্র আইল পুরোহিত।
নারদের স্থলে যুদ্ধ হৈল অতুলিত॥

(খ) দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুই সৈন্যের সংগ্রাম।
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ অনুপাম॥
কপটে জিনিল সত্যে কলি ধনুর্ধর।
মূহুশ্চিত সত্য লই পুনি গেল ঘর॥

(গ) তৃতীয় অধ্যায়ে তবে কহিলুঁ কথন।
কাঞ্চলি মুখেত শুনি সত্য অচেতন॥
যেন মতে বিলাপিলা সত্যবতী নারী।
সুবুদ্ধি আনিলা গিয়া যোগী ধন্বন্তরী॥
জ্ঞান-বড়ি দিয়া যোগী সত্যে চেতাইল।
যোগী-সত্যবতী যেন সংবাদ ঘুচিল॥

(ঘ) চতুর্থ অধ্যায়ে পুনি সত্য পাইল জয়।
পুনি মূহুশ্চিত হৈল কলি পাপাশয়॥
মৃতবৎ কলি লৈয়া দুঃশীলা কান্দিল।
ভোগী ধন্বন্তরী আসি কলি চেতাইল॥
যোগী সঙ্গে দুঃশীলার আছিল সংবাদ॥

(ঙ) পঞ্চম অধ্যায়ে পুনি যুদ্ধের বিবাদ।
তৃতীয় [ত্রেতা?]দ্বাপরে যেন নিবারিল রণ।
লাজ পাই ঘরে গেল কলীন্দ্র দুর্জন॥

এ কাব্যে সত্য ও কলির রূপকে ন্যায়-অন্যায়, সত্যমিথ্যা ও পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও পরিণাম একটি সরস উপাখ্যানের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, যাতে তত্ত্বকথা একঘেঁয়ে হয়ে না পড়ে তার জন্যে উপ-কাহিনী হিসেবে রোমান্সও জুড়ে দেয়া হয়েছে। একটি নামান্তরে বেতাল পঞ্চবিংশতির চতুর্দশতম উপাখ্যান, একটি চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতী-উপাখ্যান অপর দুটো সূর্যবীর্য-চন্দ্ররেখা নামক রূপকথা ও কিস্মিক রাজার কাহিনী।

'সত্যের জয় মিথ্যার লয়' বা পুণ্যের প্রসার ও পাপের ক্ষয় প্রদর্শনই কবির লক্ষ্য হলেও কবি শিল্পীসুলভ সংযম রক্ষা করেছেন এবং বাস্তব জীবনের উপলব্ধ-সত্যে তাচ্ছিল্য দেখান নি, পাপও যে পুণ্যকে আচ্ছন্ন ও ঘায়েল করে এবং মিথ্যাও যে আমাদের জীবনে সত্যের উপর জয়ী হয়, (তা যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন), সর্বোপরি সত্য ও পুণ্যের পথ যে অপেক্ষাকৃত বন্ধুর ও লাঞ্ছনা-দুষ্ট তা কবি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। এতে কবির জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান ও উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি এক একটা দোষ বা গুণের প্রতীক স্বরূপ এক একটি পাত্র বা পাত্রী সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো কিন্তু নিতান্ত জড় প্রতীক নয়, একান্তভাবে রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ বর্ণনায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছায়া আছে।

পাত্র পাত্রীর নামগুলো যেমনি গুণজ্ঞাপক, তেমনি সুন্দর ঃ কলীন্দ্র, দুঃশীলা, পাপসেন, ভীতসেন, কপটকেতু, দোষন (দুর্শন), মিথ্যাসেতু, কৃপণ, ভোগী, নারদ, মিত্রকণ্ঠ, সত্যকেতু, সত্যবতী, বীর্যশালী, ধর্মকেতু, সুখ, সুদাতা, যোগী প্রভৃতি। সত্যের ধ্বজা সূর্য, কলির পতাকা চন্দ্র। এ দুটোও গভীরতর ব্যঞ্জণাসমৃদ্ধ। সূর্য অগ্নিময়—সত্যে দাহ আছে, চন্দ্র স্নিগ্ধ ও রমনীয়—পাপ আপাতমধুর।

যোগী-সত্যবতী ও ভোগী-দুঃশীলা সংবাদে ব্যবহারবিধি, নিয়মনীতি, পাপ-পুণ্য ও সংযম-অসংযমের যে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে তা' মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যার ইতিকথা।

সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ কবির প্রথম রচনা। এতেই তাঁর হাতে খড়ি। তাই বোধ হয় মক্কুল হোসেন কাব্যের মত এতে রসামৃত ধারা সর্বত্র বয়ে চলেনি। অবশ্য বিষয়বস্তুও এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। ভাষাও তাঁর দ্বিতীয় কাব্যের মত ললিতমধুর নয়। কিন্তু তবু এ রচনা মক্কুল হোসেনের কবির অযোগ্য বলা যায় না। রূপ বর্ণনা ও সম্ভোগচিত্র অন্য কবির রচনার তুলনায় হীন-প্রভ নয়। মাঝে-মধ্যে কবিত্বের বিজুলি ছটারও অভাব নেই। অলঙ্কারাদিও সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

কয়েকটি প্রাবচনিক বা সুভাষিত বুলির দৃষ্টান্ত দেই ঃ

১ নারী নাহি নৃপতির শূন্য বাসা ঘর
দীপহীন গৃহ যেন না দেখি সুন্দর ॥

২ অতিরূপবতী যেন বিচিত্র সাপিনী।

৩ বহু বহু নষ্ট হইল বাদে পরিবাদে।
সবংশে রাবণ মৈল রামের বিবাদে ॥

৪ দুগ্ধে সিদ্ধে কভু মল না তেজে অঙ্গার।

৫ কোথাত অমৃত ফল বানরের ভোগ।

৬ বুদ্ধিএ শশক মারে কেশরী দুরন্ত।

৭ লবণ ভূমিত যেন পুষ্প বৃক্ষ মরে।

৮ যদি ক্ষুধাতুর অগ্নি ধৈর্য-কাষ্ঠ পোড়ে।
লোভের লাকড়ি দেই ঔষধ-বড়ি লাড়ে

সত্য-কলির পৌরাণিক দ্বন্দ্ব বাঙালী মাত্রেরই নৈতিক-সংস্কারের অঙ্গীভূত। বৃহত্তর অর্থে এ দ্বন্দ্ব সর্বমানবিক ও সর্বকালিক। তাই কবির উদ্দিষ্ট তত্ত্ব সত্য-কলির রূপক ছাড়া আর কিছুতেই এতখানি স্বচ্ছ, সুন্দর ও কার্যকর হত না।

কবি প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর সমকালীন লোকচরিত্রের যে আভাস দিয়েছেন, তাতেই বোঝা যায় সতের শতকে আর বিশ শতকে তফাৎ নেই কিছুই। মানুষের অমানুষিকতা আজো তেমনি রয়েছে।

সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ
বা
যুগ-সংবাদ

[মুহম্মদ খান বিরচিত]

।। স্তুতি ।।

পীর ও উস্তাদ

যার পদ রেণু হোন্তে পাতকী উদ্ধারে।
যার গুণের অন্ত কহিতে না পারে ॥
সর্ব সিদ্ধি মহাদাতা ভব কল্পতরু।
সেবক বৎসল পর উপকার চারু ॥
রিপু তৃণ কুলাল যে দুর্জনের কাল।
সর্ব শাস্ত্র বিশারদ সর্ব গুণে ভাল ॥
নিরঞ্জন চিনিবারে নবীমাত্র লক্ষ্য।
নহে প্রভু চিনিবারে করি আছে সক্য।

দর্পণে দেখিএ যেন আপনা বদন।
নবীক ভাবিলে পাই প্রভু নিরঞ্জন ॥
দণ্ডবৎ হই পড়ি নবীর চরণ।
উদ্ধার করহ প্রভু পশিলুঁ শরণ ॥
যদ্যপি পাপের ভরে ডুবএ তরনী।
তুহ্মি হেন কাণ্ডারী, কি হএ তাত পুনি
তুহ্মি হেন সহায় পরম পুণ্য ফলে।
আহ্মি হেন ভাগ্যবন্ত নাহি মহী তলে।

॥ প্রস্তাবনা ॥

একে একে প্রণামহুঁ যথ নবী পদ।
যথ পীর প্রণামহুঁ খণ্ডাও আপদ ॥
জনক জননী দোঁহো প্রণাম করিয়া।
গুরুজন পদ শিরে আনন্দে ধরিয়া ॥
উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন।
সত্য কলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ ॥
প্রথমে সত্যক সত্যবতী দুই মিলি।
যেন মতে কলির দুঃশীলা সঙ্গে কেলি ॥

সত্য সঙ্গে যুঝিতে কলির আগমন।
মিত্রকণ্ঠ দূত গেলা নিষেধিতে রণ ॥
না করিল সন্ধি পত্র আইল পুরোহিত
নারদের স্থলে যুদ্ধ হৈল অতুলিত ॥
দ্বিতীয় অধ্যাএ দুই সৈন্যের সংগ্রাম।
সত্য-কলি বিবাদ সংবাদ অনুপাম ॥
কপটে জিনিল সত্যে কলি ধনুর্ধর।
মুহুশ্চিত সত্য লই পুনি গেল ঘর ॥

তৃতীয় অধ্যাএ তবে কহিলুঁ কথন।
কাঞ্চলি মুখেত শুনি সত্য অচেতন॥
যেন মতে বিলাপিলা সত্যবতী নারী।
সুবুদ্ধি আনিলা গিয়া যোগী ধন্বন্তরী॥
জ্ঞান-বড়ি দিয়া যোগী সত্যে চেতাইল।
যোগী-সত্যবন্তী যেন সংবাদ ঘুচিল॥

চতুর্থ অধ্যাএ পুনি সত্য পাইল জয়।
পুনি মুহুশ্চিত হৈল কলি পাপাশয়॥
মৃতবৎ কলি লৈয়া দুঃশীলা কান্দিল।
ভোগী ধন্বন্তরী আসি কলি চেতাইল॥
ভোগী সঙ্গে দুঃশীলার আছিল সংবাদ।
পঞ্চম অধ্যাএ পুনি যুদ্ধের বিবাদ॥
তৃতীয়া[<ত্রেতা]দ্বাপরে যেন নিবারিল রণ।
লাজ পাই ঘরে গেল কলীন্দ্র দুর্জন॥

॥ **সত্যরাজ সভা** ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

পশ্চিমে দিল্লীর নাথ বীর্যবন্ত রঘুনাথ
ধৈর্য বীর্য বলে হৈল যোধ।
সত্যকেতু সত্যবন্ত শান্তদান্ত গুণবন্ত
সংগ্রামে অর্জুন সম যোধ॥

[২য় পত্র নেই]

॥ **কলীন্দ্র সভা** ॥

মিথ্যাসেতু নামে আর পাত্র পাপমতি।
অরাতি তোষণ পাত্র সহজে কুমতি॥
নারদ রাজার গুরু বিধির ঘটন।
যেন ফল তেন তরু হইল মিলন॥
এই সব পাত্র লই এই পুরোহিত।
রাজ্য করে কলীন্দ্র অধিক আনন্দিত॥
নারী নাহি নৃপতির শূন্য বাসা ঘর।
দীপ হীন গৃহ যেন না দেখি সুন্দর॥

চিন্তিয়া নারদ গুরু মনে বিমর্ষিল।
জাতিধ্রস রাজার স্থানে দূত পাঠাইল॥
জাতিধ্রস রাজার কন্যা দুঃশীলা পাপিনী।
অতি রূপবতী যেন বিচিত্র সাপিনী॥
জাতিধ্রস রাজা শুনি কলীন্দ্রের নাম।
দান কৈলা নিজ কন্যা রূপে অনুপাম॥

।। কলিরাজের বিবাহ ।।

(দীর্ঘ ছন্দ)

কলির উতল ভাব বাঢ়িল বিরহ তাপ
বিবাহ করিতে হৈল মতি ।
জাতিধ্রস রাজ-সুতা রূপে অতি অদ্ভুতা
বিভা কৈল কলীন্দ্র নৃপতি ।।
সখী দুষ্টমতি সঙ্গে পতি পাশে চলে রঙ্গে
সখী সঙ্গে করি নিজ সাজ ।
কানড়ি কবরী বান্ধি মুক্তাদানা তাত ছান্দি
রাহুকে গ্রাসিল দ্বিজ রাজ ।।
জাতিধ্রস রাজবালা যেন নব শশী কলা
কুঙ্কুম কস্তুরী প্রয়[১] বলি ।
চঞ্চল সিন্দূর মাথে চড়াইল বর হাতে
মেঘে যেন চঞ্চলা বিজুলি ।।
আঁখিত অঞ্জন রঞ্জি যে হেন খঞ্জন গঞ্জি
ভুরুর ভঙ্গিম ধনুর্গুণ ।
কজ্জল টাঙ্ক্যবাণ কলির হরিতে প্রাণ
মদন সিন্ধিল শুনি পুন ।।
মাত্র আমোদ হাসি দুঃখে হইব বাসি
গৌরীর পাইব বৃদ্ধি শাপ ।
ফণীর বিষের জ্বাল কাম দহে যে আনল
সে দাহ দহনে পাইব তাপ ।।
যে চান্দ গগন 'পরে যাইয়া গঙ্গার তীরে
সুখ দেখি চান্দথু অধিক ।
নন্দী ভৃঙ্গী পাইব লাজ আপনার স্মরি কাজ
উন্মত্ত দেখিয়া অম্বিক ।।

কলীন্দ্র রাজার নারী যুবা নিন্দে দু'চারিণী
দুঃশীলা যাহার কৈল[২] নাম ।
যদি সিত হেন হৈত মাত্র তনু দহি যাইত
রাবণে বধিত দেখ রাম ।
অধর অমিয়া রসে পর স্বামী আনে পাশে
সাজে বান্ধিয়া কেশ ফান্দ ।
নয়ন কটাক্ষ হেরি পর চিত্ত আনে হরি
তারক হরিল যেন চান্দ ।।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে চিকুর সাপিনী তুলে
কলীন্দ্রের রমণী সমসর ।
যে নাগের বিষঘাত পরীক্ষিত হৈল পাত
সে নাগে বন্দিল কেশ ভার ।।
যেন কুম্ভ কুচ তার উপরে কপট হার
হৃদেত রতন মালা দোলে ।
সেহ মাত্র হএ নাগ মিছা করে আনে রাগ[৩]
ফণীমালা শোভে শিবগলে ।।
নাভিকুম্ভ কৃশমাজ সিংহ সম ক্ষীণ মাজ
বিনি সিংহ নাহিক সন্তোষ ।
খাইয়া স্বামীর মা'স পুরায় আপন আশ
পরিণামে কারে দেয় দোষ ।।
হেমলতা সম দেহ দেখি দেখি বাঢ়ে নেহ
অসক্য শ্রীফল কুচ ভার ।
ক্ষীণ লতে ফল চারু ভাঙ্গিয়া পড়িল তরু
ঝাটে কাম করহ সঞ্চার ।।

১ পয়বলি—মঙ্গলরেখা ২ বালি ৩ অনুরাগ

শুনি কাম আইল ঝাটে ধরিল আপনা খাটে
নিসর[১] নিতম্ব বর রামা।
উরু গজ-শুণ্ড নিন্দ পদ থল-অরবিন্দ
সে রূপের কেবা দিব সীমা।
কঙ্কন বিজএ সাজে নূপুর বাজনা বাজে
পরি নিল যতনেত শাড়ি।
যোবের পতাকা যেন নেতের পতাকা তেন
পাছে পাছে যায় উড়ি উড়ি॥
আগে সখী দুষ্টমতি পাশেত চপলাবতী
পাছেত দুঃশীলা পাপ ছিলা।
চৌদিকে নেহারে অক্ষি চঞ্চলা খঞ্জন পক্ষী
হংস লীলাগতি চলে বালা॥
কলি দেখি সুবদনী আলিঙ্গএ পুনি পুনি
দুষ্টে দুষ্টে মিলি দৈব পাকে।
নয়ন কটাক্ষ বাণে কলির মরমে হানে
কলিরাজ ঠেকিল বিপাকে॥
হেমকুম্ভ কুচ নিধি কলিকে মিলাইলা বিধি
কৃপণে পাইল মহাধনে।
গা তার মর্দন করি কামে বিঁধে করে ধরি
হৃদমাঝে রাখিল যতনে॥
হরষিতে কুচ ধরি উরু যুগে উরু জড়ি
বসিল মদন সিংহাসনে।
একেত দুঃশীলা রাই কলি সঙ্গে মিল পাই
সুধামধু বরিষে লোচনে॥

অধরে মাধুরী পিয়া দসনের ঘাও দিয়া
বয়ন চুম্বএ ঘন ঘন।
যেহেন কমল দলে ভুখিল ভ্রমর বুলে
মধুএ মাতলি হই মন॥
তাড়িয়া নিতম্ব দেশ জঘন তাড়না শেষ
পিয়া মোহন কাম গুণী।
দুঃশীলাএ মনোরঙ্গে কেলি করে কলি সঙ্গে
রাধে যেন পাএ কানু কেলি।
সহজে নিল জুড়াই অনঙ্গের রঙ্গ পাই
মনোরঙ্গে করে বিপরীত।
ধরিয়া নাটবেশ কেলি করে সবিশেষ
দেখি কলি অধিক পীড়িত॥
মুকুলিত পাট খোপা খসিল জাদের থোপা
সিন্দুর দিনেশে ঢাকে নিশি।
চকিত চকোর পাখী মিত্রের বিপদ দেখি
গ্রাসিলেক দেখি পূর্ণ শশী॥
পতির সমুখে বালা যেন নব শশী কলা
অধরে মাধুরী করে পান।
বিপরীত রসে শশী রাহু গ্রাসএ আসি
নেহারিয়া কটাক্ষের বাণ॥
শ্রমকলা পুরে তনু দেখি হাসে ফুলধনু
উল্লাসি কুসুম ধনুর্বাণ।
যেহেন সেহেন শরে দোঁহানেতে দিয়া পরে
ঘন শ্বাস বহে দিতে প্রাণ॥

১ নিসর-নিঃসর ?

প্রথম শৃঙ্গারে বালা বিপরীত রতিকলা
ঘরিষণে কম্পে সর্বদেহা।
কুচগিরি-যুগ ভরে ক্ষীণ মাজা ভাঙ্গি পড়ে
দেখিয়া কলির বাঢ়ে নেহা॥
কঙ্ক হইল স্থর খসিল শোনিত পুর
অদ্ভুত ফাড়িয়া[১] গেল রসে।
ভাসিল কুমকুম্ রাগ শ্বেত নত কটিভাগ
অভিমানে পাটাম্বর খসে॥
জঘন শীতল হইল কামরাএ ভঙ্গ দিল
শৃঙ্গরসে এড়ি ভুরুধনু।[২]
কজ্জলে লুলিত মুখ ভাবি গুরু শাপে দুঃখ
কলঙ্ক জড়িল চান্দ তনু॥
কামরসে বাণ হতা না জানিল রাজ স্থতা
স্বামীত বোলএ মিনতি ভাষ।
শুনহ কলীন্দ্র নাথ হের করে॑। জোড় হাত
দান কর আম্মারে সন্তোষ॥

কুচঘন অবিপীন অলেখা নখের চিন
ঢাকহ চন্দনে লেপ দিয়া।
কঙ্কন রতন হার মণিকর শোভাকার
শুনহ কলীন্দ্র প্রাণ প্রিয়া॥
করিয়া তাম্বুল দান অধরেত অভিমান
খণ্ডাও বাণেত পুতি রাখি।
সিন্দূর চড়াও মাথ প্রাণ রাখ প্রাণনাথ
অঞ্জনে রঞ্জহ দুই আঁখি॥
জাতিভ্রস রাজ স্থতা দুষ্টবুদ্ধি পাপ যুতা
লাজ ছাড়ি বোলে অনুচিত।
শিথিল জঘন মোর সঘনতা কর দূর
ঝাটে কর চন্দনে বেষ্টিত॥
দুঃশীলা বোলএ যথ কলিহ করএ তথ
দুষ্ট সঙ্গে মন করি তোষ।
মোহাম্মদ খানে কহে মন্দে হামলা হএ
রাজা কলীন্দ্র পরিতোষ॥

॥ কলির যুদ্ধযাত্রা ॥

(খর্ব চন্দ)

এই মতে কেলি নির্বহন্ত প্রতিনিতি।
পাপক্ষণে দুঃশীলা হইল গর্ভবতী॥
উপজিল গর্ভ হোন্তে স্থন্দর কুমার।
পাপসেন বলি নাম রাখিল তাহার॥
সম্ভ্রান্ত যুবক যদি পাপসেন হৈল।
যুবরাজ অভিষেক কলি তারে কৈল॥

এইমতে রাজ্য করে কলি নরপতি।
রঙ্গে ঢঙ্গে নিতি দুষ্ট ভার্গার সঙ্গতি॥
একদিন সভাত বসিছে নরনাথ।
সত্য ত্রেতা আর কথা হইল সভাত॥
কলির সভাত যথ ধর্মবন্ত আছে।
সত্যের বাখান দিল বসি কলি কাছে॥

১ ফাড়িয়া—ফাটিয়া—বিদীর্ণ হইয়া ২ ফুলধনু

সত্যের বাখান শুনি আপন গোচর।
কোপে অগ্নিবর্ণ হইল কলীন্দ্র বর্বর ॥

রাজ-মতি বুঝি বালার কাঁপে হৃদ।
রোষে ক্ষোভে দুঃশীলা কহিল তুরিত ॥

সহজে তপস্বীসহ নিল সত্য তার।
সুখভোগ বিহীন নিত্যহি ধর্মসার ॥

পরধন না হরে না হরে পরনারী।
তপে জপে যার সুখ সত্য সদাচারী ॥

না হয় মুনির যোগ্য পাট সিংহাসন।
তেকারণে তৃতীয় [ত্রেতা] হরিল রাজ্যধন ॥

তৃতীএ ব্রাহ্মণে নিত্য হিংসা করে বলি।
ভান হোন্তে দ্বাপরে হরি নিল রাজধ্বনি ॥

দ্বাপরেহ সত্য নিত্য হিংসে সাধু বৃত্তি।
আর রাজ্য লইয়া রাখিল নিজ কীর্তি ॥

পরপ্রাণ বধিতে তোহ্মার নাহি ভয়।
এ কাজে তোহ্মার দর্প কেহ নাহি সহে ॥

ধর্মের বিনাশ তুহ্মি পাপ অধিকারী।
ধর্মভীতে তোহ্মাত এ রাজ্য গেল ছাড়ি ॥

তুহ্মি ধৈর্যধর সত্যরাজ যুধিষ্ঠির।
সহজে পাণ্ডুর হএ কৌরব অচির ॥

বিক্রম কেশরী তুহ্মি জ্বলন্ত হুতাশ।
তোহ্মার অসত্যে সত্য ধর্মের বিনাশ ॥

যে কহএ নারদ পাপিষ্ঠ বাক্যজাল।
ধার্মিক জনের শ্রবণেত ফুটে শাল ॥

কলি ভএ সিদ্ধান্ত না কহে কোন জন।
সত্য সত্য-ধর্মএ ভাবএ মনে মন ॥

পুনি বোলে নারদে শুনহ নরপতি।
হিত তত্ত্ব কহিএ তাহাতে দেঅ মতি ॥

যাবৎ আছএ সত্য পৃথিবী মাঝার।
ভাল মতে অধর্ম না হইব প্রচার ॥

সসৈন্য সঙ্গতি চল সত্য মারিবার।
যদি চাহ প্রচারিতে তোহ্মার আচার ॥

পশ্চিমে তপস্যা বলে পুণ্য স্থলি মাজ।
পাত্রমিত্র লই তপ করে সত্য রাজ ॥

নারদ বচন শুনি লম্ফিল পাপ সেন।
বহু যোধ কুপণেহ ভাল বোলে তেন ॥

নারদের বুদ্ধি ভাল বোলন্ত সকল।
ভীত সেন প্রাণ ভএ হইল সকল ॥

বোলএ সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ নহে ভাল।
ধর্মশীল বীর সব বিক্রমে বিশাল ॥

তপস্যা করএ সত্য রাজ্যে নাহি মতি।
তাক খেদি যুদ্ধ যুক্ত নহে নরপতি ॥

কুপিত কপট কেতু ভীত বাণী শুনি।
বোলে ভএ পাইলে না বুঝিঅ পুনি ॥

এথ শুনি হাসন্ত কলীন্দ্র মহারাজ।
তখনে সসৈন্য চলে করি যুদ্ধ সাজ ॥

অশ্ব গজ রথরথী পদাতি বিশাল।
কলি সৈন্য পদভরে পৃথিবী যাএ তল ॥

চরমুখে শুনি বার্তা সত্য নরপতি।
যুক্তি বিমর্ষিলা পাত্র-মিত্রের সঙ্গতি ॥

আহ্মারে মারিতে আইসে কলি পাপমতি।
কি করিব কও এবে ভাবি নিজ মতি ॥

॥ সত্য রাজের পরামর্শ সভা ॥

এথ শুনি বোলে মিত্রকণ্ঠ পুরোহিত ।
শুন সত্য নরনাথ তো'ত কহি হিত ॥
তুহ্মি ধর্ম নরনাথ পুরুষ প্রধান ।
তোহ্মার কীর্তির কথা জগতে বাখান ॥
যথাযোগ্য ধর্ম কৈলা লেখিতে না পারি ।
যথেক দেবতা তোর দানের ভিখারী ॥
মেঘে যেন বরিখএ ঘনজল কণা ।
তোহ্মার দানের জান তেহেন তুলনা ॥
বলিরাজা দাতা হৈল তোহ্মার প্রসাদে ।
হিরণ্য কশিপু মৈল তোহ্মার বিবাদে ॥
তোহ্মার দেশের লোক সব ধর্মশালী ।
শান্তদান্ত গুণবন্ত বিক্রমে বিশালী ॥
যথদিন আছিল তোহ্মার রাজ্য ভোগ ।
রাজ্যে প্রবেশিতে না পারিল কলি যোগ ॥
তুহ্মি বুধ হৈলা দেখি প্রভু নৈরাকার ।
তৃতীয়াত[ত্রেতা] সমর্পিলা সবরাজ্য ভার ॥
তৃতীয়ার হোন্তে রাজ্য দ্বাপরে পাইল ।
দ্বাপরে জিনিয়া রাজ্য কলিএ পাইল ॥
কলি নরপতি হৈল ধর্ম পাইল নাশ ।
যুগ হৈল পাপকারী অধর্ম প্রকাশ ॥
তপস্যা করহ তেকারণে তোহ্মা ইচ্ছিল ।
নিরঞ্জন তপস্যা করিতে আজ্ঞা কৈল ॥
তপোবনে আসি কলি পাতএ বিরোধ ।
পাপজনে ধর্মের নাহিক উপরোধ ॥
তোহ্মি হৈলা তপস্বী নিত্যাহি সত্য ধর্ম ।
তপস্বীর কর্ম নহে দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর্ম ॥

শত্রু বা মিত্র বা পাত্রপুত্র বা দুহিতা ।
সমতুল তপস্বীর জানহ নিশ্চিতা ॥
এথ জানি কোপ তেজি শান্ত কর মতি ।
সন্ধি করি পাঠাও কলীন্দ্র পাপমতি ॥
মিত্রভাব হোন্তে আর কর্ম নাহি ভাল ।
শত্রুভাবে মনদুঃখ পরম জঞ্জাল ॥
মিত্রকণ্ঠ বচনে সকলে বোলে ভাল ।
তপস্যার কালে যুঝনা হএ জঞ্জাল ॥
এথ শুনি বীর্যশালী বোলে কোপমতি ।
এ সকল বচন না রুচে মোর মতি ॥
শৃগালের ভএ কথা[<কোথা]সিংহের বিমুখ ।
শরীরে না সহে হীন পরাভব দুখ ॥
কি করিব ধর্ম কর্ম সত্যব্রহ্ম ছাড়ি ।
দুষ্ট বধে মহাধর্ম দেখহ বিচারি ॥
যে হৌক সে হৌক যুদ্ধ উপেক্ষা না কর ।
বীর্য স্মরি ধনু ধরি ক্ষেত্রি ধর্ম স্মর ॥
বীর্যশালী বাক্য কবি ছন্দে বোলে ভাল ।
বিস্তর প্রশংসে সত্যকেতু মহাপাল ॥
পুনি বোলে পুরোহিত শুনহ রাজন ।
যুদ্ধ শ্রধা[শ্রদ্ধা] কদাপি না করে মহাজন ॥
বহু বহু নষ্ট হৈল বাদে পরিবাদে ।
সবংশে রাবণ মৈল রামের বিবাদে ॥
আগে সন্ধি করিঅ না হৈলে কর রণ ।
যদি যুদ্ধ করিবা করিঅ প্রাণ পণ ॥
আগে আমি যাই দূত কলীন্দ্রের পাশ ।
ভালমতে বুঝিব তাহার কোন্ আশ ॥

নিষেধ না মানে যদি কলীন্দ্র দুর্মতি।
সবংশে বধিমু তাকে আপনা শকতি ॥
নরপতি বোলন্ত মোর না রুচএ মন।
পাপিষ্ঠ কলির পাশে তোহ্মার গমন ॥
শ্বেতবাসে কাজল লাগিলে কালি ধরে।
দুষ্ট সভা মাঝারে না শোভে সন্ন্যাসীরে ॥
কূপ মাঝে পদ্ম যেন না করে শোভন।
তেন দুষ্ট মধ্যে না শোভএ শ্রেষ্ঠজন ॥
দুষ্টজনে সাধুরে বোলএ ক্ষুদ্রমতি।
দুষ্টকে বোলন্ত সাধু পাপিষ্ঠ দুর্মতি ॥
সত্যের মিথ্যা সনে না হএ মিলন।
দুষ্টজন সঙ্গে না মিলএ সাধুজন ॥
তুমি যদি কহ হিত বাম লৈব তার।
দুগ্ধ সিঞ্চে মল কভু না তেজে অঙ্গার ॥
তোহ্মারে না মানিব গুরু পাপ কলিরাজ।
তোহ্মারে বলিব মন্দ শুনিব সমাজ ॥
এথেকে না রুচে মনে তুহ্মি যাইবার।
আজ্ঞা কর গুণনিধি যুদ্ধ করিবার ॥

মিত্রকণ্ঠে বোলে তুহ্মি না বোল অসক্য।
আহ্মা মন্দ বলিতে কলির নাহি সক্য ॥

দুষ্টজন মন্দে নষ্ট নহে সাধুজন।
রাহু যে নাশিতে আছে রবির কিরণ ॥

রাহু গ্রাসি দিবাকর উদরে নিঃসরে।
দুষ্টে নষ্ট না করএ উত্তম জনেরে ॥

যদ্যপি করএ দ্বন্দ্ব কথা মাত্র কহে।
পাছে সত্য জ্বলএ অসত্য মাত্র দহে ॥

যে হৌক সে হৌক আহ্মি যাইব অবশ্য।
শাস্ত দান্ত কহিয়া করিব তাকে বৈশ্য ॥

এথ শুনি সত্যকেতু দিল অনুমতি।
মহা মহা পাত্র সব দিলেক সঙ্গতি ॥

রথে চড়ি চলিল সত্যের পুরোহিত।
কলির আশ্রমে গিয়া হৈল উপস্থিত ॥

মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালী পয়ার।
সত্যকেতু পঞ্চালিকা অমৃতের ধার ॥

॥ মিত্রকণ্ঠের দৌত্য ॥

(যমক ছন্দ)

মিত্রকণ্ঠ আইল শুনি কলীন্দ্র দুর্বার ॥
নিজপুত্র পাঠাইল বাড়ি আনিবার ॥
যুবরাজ পাপসেন পাত্রগণ সঙ্গে।
লৈয়া গেলা পুরোহিত অতি মনোরঙ্গে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
কলি পুছে কেনে গুরু এথা আগমন ॥

মিত্রকণ্ঠ বোলন্ত লোকের চাহি হিত।
দূত হই আইলুঁ আহ্মি যুদ্ধ নিষেধিত ॥
এ যে সত্য নরনাথ পুরুষ প্রধান।
জগতে ব্যাপিত যার ধর্মের বাখান ॥
ধৈর্য বীর্য গম্ভীর সকল গুণ নিধি।
সংসারের রক্ষা হেতু সৃজিলেক বিধি ॥

যখনে আছিল সত্য রাজ্য অধিপতি।
লোক সব ছিল ধর্ম ছিল যতি সতী॥
বহু যজ্ঞ করিল করিল বহু দান।
আজিহ সত্যের যশ জগতে বাখান॥
লোক হৈল পাপকারী অধর্ম গ্রাসিল।
আপনেহ সত্যরাজ তপস্যা ইচ্ছিল॥
তপস্যা করিতে আইলা পুণ্য তপোবনে।
তার সঙ্গে বিবাদ উচিত নহে রণে॥
যে যোধা সঙ্গতি যুদ্ধ যেবা আরম্ভএ।
সেথা যুদ্ধ দিলে যেন সপক্ষ কাটএ॥
আপনে পণ্ডিত তুহ্মি সুরাজ সুজন।
রসের সাগর সর্বগুণের নিদান॥
বহু বহু নষ্ট যোধ কৌরব পাণ্ডব।
নরনাথ পরিবাদ না কর আহব॥
বাদে বহু বহু নষ্ট, শুন মহীপাল।
বিবাদে পাণ্ডব কুরু গ্রাসিলেক কাল॥
মহাজনে তেজিবেক বাদ পরিবাদ।
বাদ পরিবাদে পুনি ঠেকএ প্রমাদ॥
স্থির কর মন রাজা বিবাদ না কর।
আহ্মি যুদ্ধ নিষেধিলুঁ হিত তত্ত্ব ধর॥
প্রিয় পুত্র পাত্রগণ করহ উদ্ধার।
নহে পুনি যুদ্ধে জান সভান সংহার॥
নিজের কীর্তি রাখহ লোকের কর হিত।
নারদের বোলে রাজা নহ বিপরীত॥
নিজমনে কল্পি এবে দেঅ প্রত্যুত্তর।
এ বলিয়া, নিঃশব্দে রহিল বিপ্রবর॥
ক্ষেণেক থাকিয়া বোলে কলি নরপতি।
যথ কহ পুরোহিত লএ মোর মতি॥
বিন্দুমাত্র যবে সত্য আছএ সংসারে।
তবেহ মোহর কীর্তি লোকে না প্রচারে॥
যদ্যপি জানহ সত্য-পুরুষ পুরাণ।
সত্য হিংসা মহাপাপ নরক প্রধান॥
তথাপিহ সত্য সঙ্গে করিমু সংগ্রাম।
পৃথিবীত লুকাইমু সত্য হেন নাম॥
অথবা শত্রুর বাণে কলি পাউক নাশ।
সুদৃঢ় করিলুঁ মনে শুন মহাখাস॥
সাহস করিলুঁ মনে না করিমুঁ ভীত।
সাহসেত ভজে লক্ষ্মী জানহ নিশ্চিত॥
সাহস করিব বীর যদ্যপি অসক্য।
ক্ষেত্রি ধর্ম স্মরিয়া সংগ্রামে হৈব দক্ষ॥
মিত্রকণ্ঠে বোলে নৃপ না চিন্তসি বাম।
সত্য-রণে মন দুঃখ পাইবা পরিণাম॥
এথ শুনি নারদে বোলন্ত কোপমতি।
কমল পতঙ্গ হএ সত্য নরপতি॥
তৃণরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ।
কলি যুদ্ধে সত্যধর্ম তেহেন বিনাশ॥
সহজে তপস্বী সত্য অশক্তি নির্বলী।
তেকারণে সন্ধি মাগে মনেত আকলি॥
নাহএ তপস্বী-যোগ্য পাট সিংহাসন।
এক হস্তে দুইকাম নহে সুলক্ষণ॥
কোথা বোল ব্রহ্মচর্য; কোথা যুদ্ধ ধর্ম।
ধ্যান জ্ঞান তপ জপ তপস্বীর কর্ম॥
তপস্বী হইয়া সত্য রাজা নাম ধরে।
তার শাস্তি দিব রণে কলীন্দ্রের শরে॥
যদি সে কপট কেতু কপট করএ।
সত্য বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধি তিলেকে হরএ॥

যদি মুখ্য যোধ বীর ইচ্ছএ সমর।
কলিচন্দ্র মুখ্য হএ মুখোর গোচর ॥
যদি সত্য চাহএ আপনা পরিত্রাণ।
ভজিয়া কলির পদ রাখউ[ক] পরাণ ॥
রাজসভা মাঝারেত সত্য না শোভএ।
যথাত নারদ মিত্র লাভ নাহি হএ ॥
চলি যাও মিত্রকণ্ঠ ছাড় উপদেশ।
কলি যুদ্ধে সত্যের সবংশে নাশ শেষ ॥
এথ শুনি কোপে মিত্রকণ্ঠ পুরোহিত।
সভা মধ্যে নারদক বহুল ভৎর্সিত ॥
শুনরে নারদ তুঞি পাপিষ্ঠ দুর্মতি।
দুই জনে দ্বন্দ্ব করে তোর রঙ্গ অতি ॥
না হও ব্রাহ্মণ তুঞি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
কলি সভা দেখি তোক না গ্রাসএ কাল ॥
সত্য সভা হৈত যদি তোহার বসতি।
তোর মাংস শৃগালে খাইত দিবা রাতি ॥
তুঞি হেন পাপিষ্ঠ দুর্মতি কুলাঙ্গার।
পুরোহিত যোগ্য নহে কলীন্দ্র রাজার ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম মিত্রভাব সর্ব প্রতি।
দেব যোগ্য ধ্যান জ্ঞান অভ্যাসিব নিতি[১] ॥
যেবা তুঞি মন্দ বোল বোলসি সত্যেরে।
গোময় লেপনে কি চন্দন গন্ধ হরে ॥
শুদ্ধজনে পাখালিলে হএ সুবাসিত।
মন্দজন বাক্য দোষে সাধুএ নিন্দিত ॥
যুদ্ধেত সমর্থ হএ সত্য নরপতি।
সন্ধিত বিমুখ নহে আপনা সম্মতি।
যেই ভাল দেখ সেই করহ সম্প্রতি।
আন বুদ্ধি হোন্তে দুষ্ট আপনা দুর্গতি ॥

ভএ শান্তি না মাগিএ সত্যকেতু বীর।
সত্য স্মরি সন্ধি মাগে নির্ভয় শরীর ॥
সত্যবন্ত আত্ম-প্রায় দেখএ সংসার।
আত্ম-দুঃখ ইচ্ছি করে পর উপকার ॥
তেকাজে চাহিল সন্ধি সত্য মহাজন।
তুঞি নারদের মূলে হইবেক রণ ॥
যথাত নারদ তথা অবশ্য জঞ্জাল।
যথাত নারদ শুভ নাহি চিরকাল ॥
সত্যকলি সংগ্রাম রুধিরে হৈব পঙ্ক।
নারদে ভক্ষিয়া নাচিবেক গৃধকঙ্ক ॥
কালুকা দেখিবা সত্য যুগান্তের কাল।
দশদিশ আবরিব সত্য শরজাল ॥
ক্ষুদ্র পশু ধরে যেন কেশরী প্রচণ্ড।
সত্য শরে কলি যে হইব খণ্ড খণ্ড ॥
যুবরাজ ধর্মকেতু রোষে যদি রণ।
পাপসেন বধিবেক দেখিবা নয়ন ॥
বীর্যশালী সংগ্রাম মাঝারে হৈব পাত।
কৃপণে পাইব লজ্জা দাতার সাক্ষাৎ ॥
মহাজন কর্ম নহে আপনা বাখান।
তেকাজে না করি গর্ব শুনরে দুর্জন ॥
যুদ্ধ কালে বুঝিবেক পুরুষ কোন্ লোক।
তুঞি পাপ নিমিত্তে কলিএ পাইব শোক ॥
যেন চন্দ্রদর্পে দুঃখ পাইলেক মন।
পাপিষ্ঠ দুঃশীল পাপ নারদ কারণ ॥
কলি বোলে কহ গুরু কেমন কাহিনী।
মিত্রকণ্ঠ পুরোহিতে কহে মনে গুণি ॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
যুগ-সংবাদের কথা অমৃতের ধার ॥

১ নীতি

।। চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতী উপাখ্যান ।।

(দীর্ঘ ছন্দ)

অচিন দেশের পতি চন্দ্রদর্প মহামতি
সর্ব অস্ত্র শাস্ত্রে অনুপাম।
রাজ চক্রবর্তী ছিল সব শত্রু পরাজিল
রঘু বংশে যেন ছিল রাম ।।
স্বর্গেত যাহার কীর্তি দেবলোকে ঘোষে নিতি
পাতালেত যাহার বাখান।
হেন চন্দ্রদর্পরাজ মৃগয়া করিতে কাজ
সৈন্য সঙ্গে করিল প্রয়াণ।
হাতে করি ধনুশর ,আরোহি তুরঙ্গবর
বন জন্তু করএ সংহার।
মহিষ দান্তাল মারে মৃগগণ কাটি পাড়ে
ভএ ধাএ জন্তু পরিবার ।।
হেন কালে বনে হেরি অচিনেক অধিকারী
এক মৃগ করিল নিধন।
শুদ্ধ সুবর্ণের কান্তি শরীর কোমল অতি
দেখিয়া বিস্মিত সর্বজন ।।
তাত পাত্র যশোধন বোলএ কৌতুক মন
এই মৃগ তনু পরিমল।
মনুষ্যের দেহতুল বোলএ শিরিষ ফুল
আর পাত্র মন কুতুহল।
কেহ বোলে, পটেশ্বর সম তনু মনোহর
কেহ বোলে কনক প্রতিমা।
তথা এক যোগী আসি সভামাঝে বোলে হাসি
এই সব তার নহে সীমা।
মহীরাম সুতা বালা ইন্দুমতী শশী কলা
যেন দেখি কোমল শরীর।
এই মৃগ দেহ তেন কোমলহ
শুন পাত্র যশোধন বীর।

যশোধন পুত্রধাম দোষন যাহার নাম
নৃপতির স্নেহের সেবক।
যোগীত পুছএ সার কোন্ দেশ হএ তার
যোগী বলে শুনহ বালক ।।
পাতালেত মহীরাম বিদ্যাধর অনুপাম
কনক যে যাহার নগরী।
তান সুতা ইন্দুমতী মদনের যেন রতি
সেরূপ কহিতে নাহি পারি ।।
শুনিয়া সে সব প্রতি কামভাব হৈল অতি
ঘরে গিয়া যোগীরূপ ধরে।
মায়াজালে বহুতর পবনে করিয়া ভর
চলি গেল কনকাক্ষ পুরে ।।
তথা গিয়া পাপমতি শুনিলেক ইন্দুমতী
হর গৌরী পূজে নিরন্তর।
চন্দ্রদর্প নরপতি বরিবারে মাগে পতি
বর মাগে পূজিয়া শঙ্কর ।।
না পুরিল মনোরথ চিন্তাযুক্ত পাপশত
তথা রহে কন্যা দেখিবার।
এথাত মৃগয়া করি অচিনেক অধিকারী
সৈন্য সঙ্গে গেলা নিজ ঘর।
দোষন নাহিক ঘর নিবেদিল পাত্রবর
চর নিযোজিল নরনাথ।
বিচারিয়া সর্ব দেশ না পাইল উদ্দেশ
না শুনিলা গেলেক কোথাত ।।
বাপ মাও বন্ধুজন কান্দিয়া বিষাদ মন
অনুশোচ করে নরপতি।
খান মোহাম্মদের বাণী অমৃত লহরী মানি
পঞ্চালি রচিল রঙ্গমতি ।।

॥ শুকমুখে ইন্দুমতীর রূপের বর্ণনা শ্রবণে রানী ভানুমতীর ঈর্ষা ॥

(পর্ণ ছন্দ)

দর্পণ চাহিয়া কন্যা সখীত পুছএ।
এহ সম রূপবতী নারী কি আছএ॥
সখী বলে এই রূপ সংসারেত নাহি।
তোর রূপ তুলনা পাবর্তী মাত্র কহি॥
কিন্তু দশ হস্ত ধরে গণেশ জননী।
তোর রূপ তুল সখী সেহ নহে পুনি॥
তোর মুখ বলি সখী চান্দের তুলনা।
কিন্তু সেহ চান্দ ধরে মৃগাঙ্ক লাঞ্ছনা॥
বলিতে পারিএ তোর নয়ন খঞ্জন।
কিন্তু সেহ পক্ষী নহে আঁখির তুলন॥
এইমতে বচাবচ দুই জনে করে।
অট্ট অট্ট হাসে শুকে থাকিয়া পিঞ্জরে।
শুকে যদি হাসিল কুপিল ভানুমতী।
নৃপতিক নিবেদএ করিয়া ভকতি॥
আহ্মি সখী সঙ্গে কহি রহস্য করিয়া।
কিসকে হাসএ শুক কি দোষ দেখিয়া॥
আর দিন সবে বসি আছে নরপতি।
নৃপতির পাশে আছে দেবী ভানুমতী।
হরিষে আহ্মাকে সখী করএ বাখান।
কিসকে হাসএ শুক পুছ তার স্থান॥
নৃপতি বোলএ শুক হাস কি কারণ।
সত্য করি কহ যদি রহিব জীবন॥
শুকে বোলে সখীবর কহে অনুচিত।
দেবীসম রূপ নাহি বোলে পৃথিবীত॥

পাতাল ভুবনে আছে কনকাক্ষ পুরী।
মহীরাম বিদ্যাধর তাত অধিকারী॥
তান সুতা ইন্দুমতী কামরতি সমা।
বিচিত্র[১] সৃজিল হেন কনক প্রতিমা॥
মুখ দেখি লাজ পাই রহিলেক শশী।
কেশ দেখি চামরী বনেত গেল পশি॥
লুক দিল খঞ্জন চঞ্চল দেখি আঁখি।
কাঞ্চন অগ্নিত দহে তনুকান্তি দেখি॥
বান্ধুলি নিন্দিত কৈল রাতুল অধর॥
দশন দেখিয়া মুক্তা মজিল সাগর॥
অমৃত সদৃশ বাণী মৃদু মৃদু হাসে।
মুচুকিত হাসি যেন বিজুলি প্রকাশে।
ভুরুধনু কটাক্ষ বিশিখ মারে শরি।
এই বাণে তেজে ধ্যান দেব ত্রিপুরারি॥
শ্রবণ দেখিয়া বনে রহিল গৃধিনী।
নাসা দেখি ঝরি গেল তিল কুসুম্বিনী॥
কুচকুম্ভ দেখি পদ্ম মজি গেল জলে।
বড় ভাগ্যে হেন নিধি মিলে করতলে॥
ক্ষীণ-মাজা যুগ-উরু ত্রিলোক মোহনী।
কিবা রূপ বাখানিব সহজে পদ্মিণী॥
ইন্দুমতী আগে যদি ভানুমতী যাএ।
পূর্ণচন্দ্র সমুখে তারক দেখি প্রাএ॥
তেকারণে হাসিছিলুঁ শুনহ নরপতি।
ক্ষেম অপরাধ মোর দেবী ভানুমতী॥

---

১ বিধাতা

।। যোগীবেশে চন্দ্রদর্পের রাজ্যত্যাগ ।।

শুকমুখে শুনি ইন্দুমতী বিবরণ।
যোগী যে কহিল রাজার হৈল স্মরণ ।।
কামভাবে চন্দ্রদর্প বিস্মরে আপন।
সেইক্ষণে ডাকি আনে পাত্র যশোধন ।।
যশোধন স্থানে রাজা কার্য সমর্পিল।
যোগীরূপ ধরি রাজা নিভৃতে চলিল ।।
পাছে শুনি ভানুমতী এথ বিবরণ।
অন্বেষিয়া না পাইল নৃপ দরশন ।।
পতির বিচ্ছেদে দেবী বহু বিলাপিল।
পুস্তক বাঢ়এ দেখি তাকে না লেখিল ।।
এথা দেশ এড়াইয়া অচিনেক পতি।
রহিয়া গঙ্গার তীরে চিন্তে মহামতি ।।
বিনি সমুদ্র মাঝে প্রবেশ না করি।
পাতালেত কনকাক্ষ যাইতে না পারি ।।
এথ চিন্তি গঙ্গা দেবী করি আরাধন।
জাহ্নবীরে গিয়া তবে কহিলা পবন ।।
উপবাস কোপে শয্যা অচিন নরপতি।
তোহ্মারে আরাধি দেবী চল শীঘ্রগতি ।।
শুনিয়া চলিলা তবে শিবের ঘরণী।
চন্দ্রদর্প আগে গেলা ভীষ্মের জননী ।।
শিরেত সিন্দূর শোভে কাজল নয়ন।
করেত কঙ্কন সাজে নূপুর চরণ ।।
সে কেশ বাহিয়া পরে মুক্তা পাঁতি পাঁতি।
অহঃদীপ্তি জিনি সে পুণ্যের নিশাপতি ।।
দেখি দণ্ডবৎ পড়ে চন্দ্রদর্প রথী।
দেবী বোলে কি বোল বাঞ্ছিত নরপতি ।।
নৃপে বোলে নেঅ মোরে কনকাক্ষ পুর।
গঙ্গা বোলে নিব তোর আজ্ঞা যথ দূর ।।
কিন্তু মাত্র কনকাক্ষ তটের উপর।
তথাত অধীন মোর নহে নৃপবর ।।
নৃপ বোলে নেঅ তুহ্মি পার যথ দূর।
পাইব সহায় আর প্রসাদে তোহ্মার ।।

।। ইন্দুমতীর সঙ্গে চন্দ্রদর্পের মিলন ।।

নৃপে লই গঙ্গা কৈলা সমুদ্রে প্রবেশ।
তথা নিয়া দিলা রাজা আঁখির নিমেষ।
গঙ্গা প্রণামিয়া পুনি চলিল রাজন।
কথদিনে পাইলেক এক বৃন্দাবন ।।
তথা সরোবর তীরে আছে নরনাথ।
হেনকালে দুইজন আইল সাক্ষাৎ ।।
নৃপতিক স্তুতি করি বোলে দুইজন।
আহ্মি দুই ভাই জান আএ মহাজন ।।
বাপের মরণে বিত্ত বিবর্তন করি।
যার যেই দ্রব্য নিলুঁ দ্বন্দ্ব পরিহরি ।।
কিন্তু দ্বন্দ্ব হএ চারি দ্রব্যের কারণ।
মীমাংসা করিয়া দেঅ আএ মহাজন ।।
নৃপে বোলে কি কি দ্রব্য কিবা গুণ শুনি।
এক ভাই বোলে হএ 'কুল্ল' একখানি।
যথ ধন মাগি তথ হস্ত দিলে পাই ।।
আর এক 'ঝুলি' যদি মাগি তার ঠাঁই।

নানামত ভক্ষ্য পাই বহু উপহার।
তৃতীএ 'পাতুকা' গুন ওর নাহি তার।
তাত চড়ি যাই তথা যথা পড়ে মন।
চতুর্থে অস্থির 'খড়গ' শুন মহাজন ॥
যেই শত্রু বলি বধ করএ নিধন।
যথা বলি হএ রাজা খড়গের কারণ ॥
এথ শুনি চন্দ্রদর্প আনন্দ অপার ॥
মনে ভাবে কার্য সিদ্ধি হইল আমার।
তবে রাজা সেই দ্রব্য তুই ভাগ করি।
কিন্তু হাসি বোলন্ত অচিন অধিকারী ॥
দূরে গিয়া তুই ভাই আইস বেগে।
আগে ভাগ ইচ্ছি লঅ যেবা আইস আগে ॥
কান্ধেত ঝুলি খড়্গ লই চন্দ্রদর্প রথী।
পাতুকাত চড়ি চলে অলক্ষিত গতি ॥
কার্য কালে কষ্ট করিলে কার্য হএ।
মহাজনে না করন্ত গুণি ধর্ম ভএ ॥
পর স্থানে আত্মদ্বন্দ্ব যেবা নিবেদএ।
যেন মইল তুই ভাই তেন মত হএ ॥
তুই ভাই নৈরাশ হইল দ্বন্দ্ব মূলে।
সহোদর সংগ্রামেত এথ দোষ মিলে ॥
এথ শুনি তুই ভাই চলি গেলা দূরে।
কার্য কালে রাজা হই পরদ্রব্য হরে ॥
কার্য কালে কপট করিলে কার্য হএ।
মহাজনে না করন্ত গুণি ধর্ম ভএ ॥
কনকাক্ষে গেল চন্দ্রদর্প নরপতি।
ঘরে ঘরে বেড়ায় দেখিতে ইন্দুমতী ॥
যোগী রূপে নগরে রহিল মহাবল।
হেন কালে ইন্দুমতী মন কুতুহল ॥

সহরিষে গজবরে করি আরোহণ।
নগর ভ্রমণ হেতু করিলা গমন ॥
তারাবতী চম্পাবতী সখীগণ সঙ্গে।
শতে শতে পাত্রসুতা চলি যাএ রঙ্গে ॥
কেহো নানা যন্ত্র বাহে কেহো গাহে গীত।
কেহো হাসে-খেলে কেহো নাচে আনন্দিত ॥
এই মতে যদি গেলা চন্দ্রদর্প আগে।
দূরে থাকি ইন্দুমতী দেখে মহাভাগে ॥
লোক মুখে শুনি রাজা পরিচয় পাই।
হাতে বাঁশি নাচে রাজা কামভাব হই ॥
ইন্দুমতী দেখি যোগী নব পঞ্চবাণ।
দীপ্তিমন্ত তনু দেখি নৃপতি সমান ॥
বাজায় মোহন বাঁশি করি নানা ছন্দ।
মুনি মন হরে আর যেন মকরন্দ ॥
তারাবতী সখীপ্রতি করিল আদেশ।
পুছ গিয়া কেন যোগী নাচে রঙ্গবেশ ॥
তারাবতী পুছে গিয়া কহরে সন্ন্যাসী।
কিবা কুতুহলে নাচ বাহ মধু বাঁশি ॥
যোগী বলে আজ হৈল সাফল্য জীবন।
ইন্দুমুখী ইন্দুমতী দিল দরশন ॥
যাকে দেখি হরি বিষধর ধ্যান ছাড়ে।
হেন রূপ দেখি ইন্দু গুরু-দার হরে ॥
কিবা বিধি কলানিধি হরিহর আদি।
হেন রূপ দেখি রাজা হৈলা অপরাধী ॥
যার লাগি দেশান্তর ভ্রমি মন তুঃখ।
হেন নিধি আনি বিধি দিলেক সমুখ ॥
তারাবতী বোলে হাসি যোগী ক্ষুদ্রমতি।
তোকে নি শোভএ জান অক্ষত যে রতি ॥

উচ্চ সঙ্গে নীচে যদি প্রেম আশা করে।
সূর প্রেমে কমল জলেত যেন মরে ॥
যেন কপি লম্ফ দিল ধরিবারে ভানু।
আপনে পড়িয়া তার ভাঙ্গি গেল জানু ॥
ইন্দুমতী প্রতি তোর কাম হাবিলাস।
রাহু যেন চান্দ চাহে করিতে গরাস ॥
যোগী বলে পর দুঃখ পরে নাহি জানে।
সে জানে বেদনা যার ভেদন মদনে ॥
যাহার মরমে হানে কাম পঞ্চবাণ।
রাজা-প্রজা যোগী-ভোগী তার হরে জ্ঞান ॥
এ চান্দ-মুখ হইল সমুদ্র মথনে।
ভাল চান্দ শিবশিরে রাখিল যতনে ॥
এই মুখ-সুধা পিয়া জীএ সুরপতি।
এই কুচযুগ হোতে মদন নৃপতি ॥
এই ভুরু ধনু ধরি রঘুর নন্দন।
বুঝিএ বধিল রাম রাজা দশানন ॥
কিবা এই ধনু ধরি ভৃগুপতি বীর।
কাটিল কার্তিক-বীর্য অর্জুনের শির ॥
এহি সে গাণ্ডীব ধরি বীর ধনঞ্জয়।
ভীষ্ম আদি কৌরব করিল পরাজয় ॥
বিনি গুণে ধনুত কটাক্ষে হানে বাণ।
এই বাণ ঘাএ আক্ষি তেজিব পরাণ ॥
তারাবতী কোলে ক্ষুদ্র যোগী কহি শুন।
এ ধনু না ধরে রাম না ধরে অর্জুন ॥
যদি হর পরাজিতে চলিল মদন।
করমূলে ধরিলেক এই শরাসন ॥
যেই ধনুর্বাণে মোহ হৈল ত্রিপুরারি।
সে বাণে মরমী যোগী কড়ার ভিখারী ॥
এথেক কহিতে যোগী পড়ে মুর্ছিত।
ভূত-দৃষ্টি হই গেল যেন আচম্বিত ॥
ভরমে দেখিএ যেন দংশি গেল ফণী।
মধুপানে অচেতন হই গেল জনি ॥[1]
ইন্দুমতী বোলে সখী যোগী ধরি তোল।
পাপিষ্ঠ কামের বাণে হইল বিভোল ॥
চন্দ্রদর্প ছাড়ি আক্ষি না জানিএ পর।
যোগী বধ রহি গেল মোহোর উপর ॥
হেন কালে উঠি যোগী বসিল আপনে।
ক্ষেণে কান্দে ক্ষেণে হাসে সজল নয়নে ॥
লীলাবতী বোলে যোগী কড়ার ভিখারী।
কোন্ মুখে চাহ ইন্দু রাজার কুমারী ॥
অমৃতের কুম্ভ সব নাগে ভরিয়াছে।
তাক পিতে[2] কাক যেন ধাই যাএ কাছে ॥
তেন যোগী মরিবারে তোর হাবিলাস।
চল ভিক্ষা কর গিয়া ছোড় মিছা আশ ॥
কোথাত অমৃত ফল কপির আহার।
যোগী হই চাহ রাজকন্যার শৃঙ্গার ॥
হরিতকী অমলকী তোহ্মার উচিত।
কনক শ্রীফল কুচ মাগ বিপরীত ॥
যোগী বোলে না জানহ বিরহ বেদন।
সহজে মুগদ সখী না ছিল মদন ॥
হেন যোগী দেখিয়া না বোল উচিত।
সেই পশু মনুষ্য বোলএ অনুচিত ॥

১ জনি-যেন, তুল: ব্রজবুলি ২ পিতে—পান করিতে।

হেন রূপ দেখি কামনা দগধে যাক।
মরণেহ তার মাংস না খাইব কাক॥
তবে কহে ইন্দুমতী যোগী শুন কহি।
বিরহ অনলে জান তনু যাএ দহি॥
বিরহ সমুদ্র জান তার নাহি অন্ত।
মহাজনে বলে তারে কর উপেক্ষন্ত॥
আপনা শোণিত পান করে বিরহিণী।
জ্ঞানবন্তে হেন কর্ম পরিহরে জানি॥
যোগী বোলে বিরহিণী না গুণে প্রমাদ।
মরএ জীঅএ মনে নাহি অবসাদ॥
যাহার মরম বনে মারিল অনঙ্গ।
ধ্যান জ্ঞান তপ-জপ সব কাজ ভঙ্গ॥
যাহাত বিরহ নাহি পাষাণ হৃদয়।
বিরহ পরম ধন না গণ সংশয়॥
না রুচএ উপদেশ বিরহিণী স্থান।
ত্রিভুবন সৃজিল বিরহ হেতু জান।
ইন্দুমতী ইন্দুমুখী অমিয়া বরিষ।
ইন্দু হোন্তে চকোরে না পিএ এক বিষ॥
যোগী বলি ঘৃণা মোক না করহ মনে।
পার্বতী বরিল দেখ যোগী ত্রিলোচনে॥
এই মতে বচাবচ যোগী ইন্দুমতী।
হেনকালে দোষন আইল দৈবগতি॥
ইন্দুমতী চাহিবারে আসএ সত্বর।
দূরে থাকি দেখে চন্দ্রদর্প নৃপবর॥
ধাই আসি পাএ পড়ি কহিল দোষন।
অচিনের পতি যোগীরূপ কি কারণ॥

তুহ্মি চন্দ্রদর্প রাজা জানে ত্রিভুবন।
যোগীরূপে এথাত আইলা কি কারণ॥
চন্দ্রদর্প নাম শুনি বালি ইন্দুমতী।
নম্রশিরে সলজ্জিত রহিলেক সতী॥
তারাবতী করজোড়ে বোলে মহারাজ।
ক্ষেম অপরাধ কৈলুঁ না চিনিলুঁ রাজ॥
এ বলিয়া কন্যা লই সব গেল ঘর।
নৃপস্থানে জানাইল এ সব উত্তর॥
শুনি মহীরাম ধাই চলিল পদাতি।
চন্দ্রদর্প চিনি যোগী আনিল সঙ্গতি॥
দূরে থাকি সেই যোগী চন্দ্রদর্প দেখি।
মহীরাম স্থানে দিল সত্য করি সাক্ষী॥
চন্দ্রদর্প আলিঙ্গিয়া কনকাক্ষ পতি।
কুতুহলে নিজ ঘরে নিলা শীঘ্র গতি॥
বহুল উৎসব করি মঙ্গল বিধান।
চন্দ্রদর্প স্থানে নিজ কন্যা কৈলা দান॥
ইন্দুমতী সঙ্গে রাজা গেল বাসা-ঘর।
শুতিলেক রত্ন সিংহাসনের উপর॥
বুঝি সময় সর্ব সখী হৈল অন্তর।
নিশীথে নিশিত বাণ হানে পঞ্চশর॥
প্রথম শৃঙ্গার বালা লাজ ভএ রঙ্গে।
কাঁপি কাপি উঠে বালা মদন তরঙ্গে॥
আড় আঁখি চাহে বালা নম্র করি শির।
কন্দর্পের দর্পে কম্পে চন্দ্রদর্প বীর।
মৃদু মৃদু বোলে বালা অমিয়া বরিষ।
বিপরীত মোহে বালা কাম ফণী বিষ॥
ফুল ধনু ধরি বাণে বিন্ধএ অনঙ্গে।
পঞ্চ বাণ বিষ জড়ে দোঁহ সর্ব অঙ্গে॥

॥ সম্ভোগ ॥

(বসন্তরাগ : লাচারী)

করে ধরি নিজ নারী তুলি লৈলা কোড়ে।
মুচুকিত হাসে বালা বিজুলী সঞ্চারে ॥
ভেজাই মোহন কেলি হাসএ অনঙ্গে।
ইন্দুমতী ইন্দুমুখী চন্দ্রদর্প সঙ্গে ॥
যেই ধনু ধরি সুরে বিজয় করিল।
সেই ভুরু চাপি বালা কটাক্ষে পুরিল ॥
আড় আঁখি চাহে বালা নম্র করি শির।
কন্দর্পের দর্পে কম্পে চন্দ্রদর্প বীর ॥
মৃদু মধু বোলে বালা অমিয়া বরিষে।
বিপরীত মোহে রাজা কাম-ফণী বিষে ॥
রাতুল অধরে রাজা করে মধু পান।
বিষ গেল আনদিশ রহিল পরাণ ॥
নয়নে বয়নে চুম্বে চাপিয়া অধরে।
ইন্দু আর বিন্দু মধু পিবএ ভ্রমরে ॥
গাঢ় আলিঙ্গন হৃদে হৃদে জড়ি কেলি।
শ্যাম অঙ্গে গৌরদেহ মেঘেত বিজুলি ॥
ঘন পীন কুচকুম্ভ জড়ি দিল হাত।
পুলকিত দেহ চমকিত নরনাথ ॥
লোহিত বরণ কুচ সঘন মথনে।
জয়পত্র রেখা দিল নখের লিখনে ॥
উরু উরু জড়ি করে ধরি কণ্ঠদেশ।
সঘন তাড়ন তরী জঘন বিশেষ ॥
কাম সিন্ধু মাঝে পড়ি না রহিল জ্ঞান।
উল্লাসি কুসুম ধনু হাসে পঞ্চবাণ ॥
নবীন শৃঙ্গারে বালা কম্পে থর থর।
বিষম সংগ্রাম দেখি হাসে পঞ্চশর ॥
কোলে করি ইন্দুমতী চন্দ্রদর্প হাসে।
যুগ-সংবাদের কথা অমৃত বরিষে ॥

॥ ইন্দুমতী সহ চন্দ্রদর্পের স্বদেশযাত্রা ॥

(খর্বছন্দ)

এই মতে কেলি নির্বহিল প্রতিনিতি।
চন্দ্রদর্প ইন্দুমতী যেন কাম রতি ॥
একদিন আসি ইন্দুমতীর ভগিনী।
মহীরাম অনুজের সুতা সুবদনী ॥
ঝুলি-কাঁথা দেখি হাসি পরিহাস কহে।
শুন ইন্দুমতী এই চন্দ্রদর্প নহে ॥
কিরীট কুণ্ডল হার বিচিত্র বসন।
নৃপতি যোগী-কাঁথা বহে কি কারণ ॥
রতনে মণ্ডিত মুষ্ট নৃপ অসি ধরে।
ধরএ অস্থির খড়গ দেখিতে ভুঙ্করে ॥
সুবর্ণ পাদুকা পাএ দেয় নৃপগণ।
কাষ্ঠের পাদুকা পাএ দেয় কি কারণ ॥
ভিক্ষুক সদৃশ্য কেনে রাখিয়াছে ঝুলি।
এথ শুনি চন্দ্রদর্প নৃপ নহে বলি ॥
এথ শুনি ইন্দ্রমতী রহিল চিন্তিত।
ঘরে আসি দেখে রাজা প্রিয়া বিষাদিত ॥

নৃপে যদি পুছিলা কহিলা ইন্দুমতী।
মোহোর কলঙ্ক তোহ্মা এহেন প্রকৃতি॥
হাসি চন্দ্রদর্প সব বৃত্তান্ত কহিল।
এথ শুনি ইন্দুমতী হরিষ হইল॥
তবে রাজা শ্বশুরেত মাগিল মেলানি।
বিস্তর কান্দিলা রাজা রাজার রমণী॥
বাপ মাও প্রণামিয়া ইন্দুমতী বালি।
কান্দিয়া কান্দিয়া গেল স্বামী কাছে চলি॥
চন্দ্রদর্পে বোলে তবে শ্বশুরের ঠাঁই।
সখীসব পাছে রাজা দেঅহ চালাই॥
চালাইয়া দিবা মোর পাত্রের নন্দন।
সখীগণ সঙ্গে চলি যাইব দোষন॥
শ্বশুর শাশুড়ী দুই করিলা প্রণাম।
আশীর্বাদ করিলা পুরউ [ক] মনস্কাম॥
পাদুকাত উঠি চলে লই ইন্দুমতী।
ঝুলি কাঁথা অস্থি খড়্গ লইলা সঙ্গতি॥
পবনে করিয়া ভর করিলা গমন।
মাক্ষিরূপ ধরি তাত পাপিষ্ঠ দোষন॥
নৃপতির বস্ত্র পরি চলিল সঙ্গতি।
সেই বৃন্দাবনে রাজা গেলা বাউ গতি॥
দুই ভাই দেখি রাজা করিয়া বিনয়।
ক্ষেম অপরাধ মোর দুই মহাশয়॥
কার্য হেতু তোহ্মারার দ্রব্য নিলুঁ হরি।
নিজ বস্তু লঅ এবে দোষ ক্ষেমা করি॥
দুই ভাই বোলে তবে তপস্বী রাজন।
তপ-বলে হেন বস্তু করিছ সৃজন॥
তোহ্মাক দিলুঁ দ্রব্য নেঅ কুতুহলি।
আর এক মন্ত্র কহি শুন মহাবলী॥

এ বলি নিভৃতে নিয়া মহামন্ত্র দিল।
পরঘট সঞ্চরের মন্ত্র শিখাইল।
নৃপতি সঙ্গতি মন্ত্র শিখিল দোষন॥
মাক্ষিরূপ দেখিয়া না চিনে কোন জন।
অচিন দেশের কাছে গেল লীলা গতি॥
শ্রম পাই বৃক্ষতলে বসিল রাজন।
নিজরূপ ধরি কাছে আইল দোষন॥
সবিস্মিতে পুছে রাজা আইলা কোন্‌মতে।
বোলএ তোহ্মার আগে আসিছি নিশ্চিতে॥
দোষনে বোলন্ত রাজা ক্ষুধা বড় লাগে।
দূরে দেখি মৃগ চল বধি আনি তাকে॥
শুনি রাজা বৃক্ষতলে রাখি ইন্দুমতী।
মৃগ ধরিবারে গেল দোষন সঙ্গতি॥
তাত এক মৃগ তথা মৃত পড়ি আছে।
দোষন সঙ্গতি রাজা গেলা তার কাছে॥
দোষনে বোলএ রাজা ভ্রমি দেশান্তর।
শিখিল বহুল বিদ্যা মন্ত্র বহুতর॥
মক্ষিকা হইতে পারি মন্ত্রের প্রভাবে।
নৃপে বোলে মাক্ষি হঅ রঙ্গ চাহি তবে॥
দোষন মাক্ষির রূপ হইল তখন।
নিজরূপ ধরি পুন বোলএ দোষন॥
আহ্মি কি শিখিছি তাকে দেখিলা নৃপতি।
তুহ্মি কি শিখিছ সত্য বোলহ সম্প্রতি॥
নৃপে বোলে মক্ষিকা তুহ্মি হইবা যেন পুনি।
পরঘট সঞ্চরিতে আহ্মি মন্ত্র জানি॥
দোষনে বোলন্ত প্রভু না করিলুঁ প্রত্যয়।
যদি জান কর দেখি আএ মহাশয়॥

॥ দোষনের রাজরূপ ধারণ ॥

এথ শুনি মৃগ দেহে নৃপ প্রবেশিলা।
শূন্যদেহ নৃপতির ভূমিত পড়িলা ॥
দৈবের নিবন্ধ জান না যাএ খণ্ডন।
নৃপদেহে প্রবেশিল দারুণ দুর্জন ॥
মৃগরূপ রাজা দেখি দোষন দুর্মতি।
প্রাণভয়ে বনে ধাই গেল শীঘ্র গতি ॥
হরষিতে গেলা পাপ ইন্দুমতী কাছে।
না দেখি দোষন বালা পতিস্থানে পুছে ॥
কোথা গেল পাত্র পুত্র তুহ্মি একসর।
বোলে বনে প্রবেশিল মৃগয়া অন্তর।
এ বলিয়া কন্যা লই করিল গমন।
গাঢ় গাঢ় করি পাপী দিয়া আলিঙ্গন ॥
বামপাশে কন্যা লই থাকে নরপতি।
লইয়া দক্ষিণ পাশে ফিরে পাপমতি ॥
পন্থমাঝে পরিহাস নৃপতি না করে।
সঘন চুম্বএ পাপ চাপিয়া অধরে ॥
ব্যথায় আকুল কন্যা ভাবে মনে মনে।
আজু বিপরীত যেন চন্দ্রদর্প কেহে ॥
হেনকালে প্রবেশিল রাজ অন্তঃপুর।
পাত্র মিত্র সব ধাই আইল সত্বর ॥
ভানুমতী শুনিল আইল নরপতি।
আনিআছে মহীরাম সুতাএ সঙ্গতি।
পাত্রমিত্র লই রাজা রহিলা বাহিরে।
ইন্দুমতী পাঠাইলা রাজ অন্তঃপুরে ॥
ভানুমতী ইন্দুমতী সম্ভাষা আছিল।
সতিনীতে ইন্দুমতী নিভৃতে কহিল ॥

মৃগয়া করিতে বনে গেল প্রাণেশ্বর।
সঙ্গতি দোষন গেল পাত্রের কুঙর ॥
নৃপতি আইল সঙ্গে নাহিক দোষন।
আহ্মা কোলে করি শীঘ্র করিল গমন ॥
রূপমাত্র দেখি রাজা কার্য বিপরীত।
বিপাকে ঠেকিছে হেন লএ মোর চিত ॥
রাজ্য হোন্তে আনে মোরে কোলে করি পতি।
টুকেক না পাই দুঃখ শুন ভানুমতী ॥
ক্ষেণেক আনিতে মোরে আলিঙ্গে নির্ভোর।
হৃদএ পাইল ব্যথা শরীর জর্জর ॥
বামপাশে আহ্মা লৈত প্রাণপতি নিত।
লইল দক্ষিণ পাশে আজু বিপরীত ॥
নৃপতিএ পরঘট সঞ্চারিতে জানে।
শুনিয়া নৃপতি ঘট সঞ্চরিল কোনে ॥
কেমতে বুঝিএ ভাল চরিত্র তাহার।
রোগ ছলে রাখিএ সতীত্ব আপনার ॥
এ বলি ইন্দুমতী কান্দে শোক মনে।
শিরে বজ্রঘাত হেন ভানুমতী মানে ॥
জ্বর বলি ভানুমতী ঘরে গেল চলি।
হাতেত কাটারী করি ইন্দুমতী বালি ॥
হেনকালে ঘরে প্রবেশিল দুরাচার।
ইন্দুমতী স্থানে মাগে দিবারে শৃঙ্গার ॥
বলে ধরিবারে চাহে কহে চাটু বাণী।
ইন্দুমতী বলিল না হএন্ত মণি ॥
ইন্দুমতী বোলে পাপ না পার সমর।
শূন্যঘরে প্রবেশ করিছ বুঝি চোর ॥

ভালমতে জানি আমি চরিত্র রাজার।
তুহ্মি নহ চন্দ্রদর্প মনে কৈলু সার॥
যেন শিবরূপে গৌরী-মহেশে ভাণ্ডিল।
নিজ দোষে বুকে হেন ফুটিয়া মইল॥
তেহেন আইলা আহ্মা ভাণ্ডিতে কারণ।
পাত্র সব স্থানে কহি করিমু নিধন॥
গলা কাটি দিয়া প্রাণ দিব আপনার।
যাবৎ চরিত্র ভাল বুঝিএ তোহ্মার॥
যদি সত্য হও তুহ্মি অচিনের পতি।
সহজেই আহ্মি তোর নারী ইন্দুমতী॥
হট যদি কর পুনি হইবা নিধন।
বামন মইল যেমন ব্রাহ্মণী কারণ॥
দেখিয়া কুমারী পাপ মনে পাই ভীত।
ভানুমতী ঘরে পাপ চলিল ত্বরিত॥
শুনিয়া কপাট দিল দ্বারে ভানুমতী।
দ্বারে থাকি পাপমতি করএ মিনতি॥
ভানুমতী বোলে মোর জ্বর উঠিআছে।
তুহ্মি যাও প্রেম-নারী ইন্দুমতী কাছে॥
হট করি যদি কর ঘরেত প্রবেশ।
খাইয়া মরিমু বিষ কহিলু বিশেষ॥
দুই জন না পাইয়া চিন্তে মনে মন।
বাহির ঘরেত গিয়া রহিল দোষন॥

এথা মৃগ রূপে নৃপে কান্দে বনে বনে।
আপনাক বহুত রোগ কহে আপনে॥
বোলে গোপ্ত কথা কহে যেই ভিন্ন স্থান।
মুই যেন দুঃখপাম পাউক অপমান॥
অনাহারে বনে বনে ভ্রমে মহাসৎ।
দেখে এক শুক পড়ি আছে মৃতবৎ॥
চিন্তি রাজা শুক দেহে প্রবেশ করিল।
আপনার ঘরে গিয়া উড়িয়া বসিল॥
প্রবেশিল যেই ঘরে আছে ইন্দুমতী।
হেন কালে আসিয়াছে দোষন দুর্মতি॥
বহুবিধ মায়া করি মাগএ শৃঙ্গার।
ইন্দুমতী চাহে নিজ দেহ তেজিবার॥
দোষন বাহিরে গেল না পাইল সুরত।
হাহা চন্দ্রদর্প বলি কান্দে ইন্দুমতী॥
এথ দেখি শোকে শুকরূপ নৃপবর।
ইন্দুমতী কোলে পড়ি কান্দে বহুতর॥
বনপশু কোলে পড়ি কান্দে আচম্বিত।
দেখিয়া শুকের কান্না পুছে সবিস্মিত॥
কেনে তুহ্মি শুকরূপ কান্দ কি কারণ।
আদি অন্ত সব কথা কহিল রাজন॥
শুনি মূহুশ্চিত কন্যা শুক কোলে করি।
শুক চন্দ্রদর্প কান্দে জ্ঞান পরিহরি॥
মোহাম্মদ খানে কহে শান্ত কর মন।
মুছিতে না পারে কেহ ললাট লিখন॥

॥ ইন্দুমতীর বিলাপ ॥

(লাচারী : বিলাপ)

শুক চুম্বি কান্দে ইন্দুমতী কেনে প্রভু তোর হেন গতি
শুক রূপ হইলা প্রাণপতি।
কহ প্রভু কি হইবে গতি॥
আহ্মি প্রাণ না রাখি সম্প্রতি প্রভু না লখি [ধুয়া]
আহ্মি মহীরাম নন্দিনী তুহ্মি চন্দ্রদর্পের ঘরণী
কিঙ্করে বোলএ দুষ্ট বাণী।
তেজিমু তেজিমু কাল প্রাণি॥ [প্রভু না লখি]
অস্ত্র শাস্ত্র জানিয়া বিফলে লীলাএ কি করে তোরে ছলে
বুদ্ধি নাশ হৈল দৈব বলে।
অকৃতি রহিল মহী তলে॥ [ধুঃ ঐ]
বিস্তর পূজিয়া গৌরীহর তোহ্মাকে পাইলুঁ প্রাণেশ্বর
মোর খণ্ড বক্ষের অন্তর।
তাত এথ পড়ে অথান্তর॥ [ধুঃ ঐ]
শুকরূপ হইলা প্রাণপতি অভাগী করিমু কোন্ গতি
সঙ্গে নাহি সখী তারাবতী।
বুদ্ধি করহোঁ তোর সঙ্গতি॥ [ধুঃ ঐ]
বাপ মাও বন্ধুজন এড়ি আইলুঁ তোহ্মার অনুসারি
তাহাত দোষন বৈরী।
তোহ্মারে রাখিল পশু করি॥ [ধুঃ ঐ]
এ বলিয়া হৈল অচেতন মূর্তিবৎ সজল নয়ন
কান্দে শুকে শোক পাই মন।
জ্ঞান লভি কান্দে দুই জন॥ [ধুঃ ঐ]
প্রাণ নাথ বুদ্ধি দেঅ মোকে কোন্ বুদ্ধি উদ্ধারিমু তোকে
তুহ্মি চন্দ্রদর্প হৈলা শুক।
বিদরে না পাই কাল বুক॥ [ধুঃ ঐ]
নৃপে বোলে শান্ত কর মন কান্দি প্রিয়া নাহি প্রয়োজন
বুদ্ধিএ বধ করহ রাহু দুর্জন।
মোহাম্মদ খানে এই ভন॥ (ধুঃ প্রভু না লখি)

।। চন্দ্রদর্পের স্বরূপ-প্রাপ্তি ।।

(খর্বছন্দ)

নৃপে বোলে কান্দি প্রিয়া কার্য নাই আর।
এখনে আসিয়া পাপ মাগিব শৃঙ্গার ॥

মায়া করি তার সঙ্গে হাসিয়া বিশেষ।
পর ঘট সঞ্চরিতে কহিবা আদেশ ॥

তবে আহ্মি নিজ দেহে করিব প্রবেশ।
এই বুদ্ধি হোন্তে পিয়া নাই আর বেশ ॥

এথ শুনি শুক ছাড়ি বোলে ইন্দুমতী।
ভাল বুদ্ধি বিমর্সিলা আএ প্রাণপতি ॥

হেন কালে দোষন আইল আরবার।
প্রাণ পণ করি পুন মাগএ শৃঙ্গার ॥

হাসি বোলে রাজসুতা শুন প্রাণপতি।
পর ঘট সঞ্চরিতে জান মহামতি ॥

পর ঘট সঞ্চরহ দেখিএ নয়ন।
প্রত্যয় করিব তোকে তবে স্থির মন ॥

না গুণি দোষনে বোলে চাহ আসি রঙ্গ।
ঘরের বাহিরে গেল ইন্দুমতী সঙ্গ ॥

হাতে শুক করিয়া চলিল ইন্দুমতী।
রাজ ঘরে গর্দভ মরিছে দৈবগতি ॥

কামভাবে দোষন গর্দভে প্রবেশিল।
যার যেই যোগ্যস্থান তাহাত মিলিল ॥

আপনার দেহে রাজা প্রবেশে সত্বর।
ধরহ গর্দভ বলি ডাকে উচ্চস্বর ॥

ভএ ধাএ দোষন ধাইতে নাহি পারে।
রাজার আদেশে বেঢ়ি ধরে অনুচরে ॥

বিস্তর লাঘব করি গর্দভ মারিল।
নিজ পাপে পাত্র সুত দুর্গতি পাইল ॥

ঈশ্বর-ঘাতক কর্ম করে যেই জন।
দুর্গতি হইবে যেন হইল দোষন ॥

তবে রাজা আলিঙ্গিয়া সতী ইন্দুমতী।
ভানুমতী ঘরে গেলা চলি শীঘ্রগতি ॥

ইন্দুমতী স্থানে শুনি সব বিবরণ।
ধাই আসি ভানুমতী পড়িল চরণ ॥

অন্যে অন্যে দুঃখ দেখি কান্দি তিনজন।
দুই নারী আলিঙ্গিয়া কান্দএ রাজন ॥

ভানুমতী বোলে সাধু সাধু ইন্দুমতী।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তুহ্মি হেন সতী ॥

তবে পাত্র আসি শুনি গুণ বিবরণ।
কহিল নৃপতি মূর্তিবৎ যশোধন ॥

কথ দিনে মহীরাম বহু সৈন্য সঙ্গে।
ইন্দুমতী চাহিতে আইল মনোরঙ্গে ॥

সখী সব দিল আনি কুমারীর পাশ।
লক্ষ লক্ষ দাসী দিল লক্ষ লক্ষ দাস ॥

গজ বাজী সৈন্য দিল রত্ন বহুতর।
ইন্দুমতী চাহি দেশে গেল বিদ্যাধর ॥

এ বলিয়া চলে মিত্রকণ্ঠ পুরোহিত।
রথে চড়ি নিজ দেশে চলিল ত্বরিত ॥

মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি সুছন্দ।
শরৎ শশীএ যেন ঝরে মকরন্দ ॥

।। রাজা সত্যকেতুর যুদ্ধযাত্রা ।।

(চন্দ্রাবলী ছন্দ)

আইল পুরোহিত বুঝি সমাহিত
সঙ্গিন হইল জানি।

কহে বিবরণ শুনহ রাজন
সত্যকেতু গুণমণি ।।

নিশি হৈল শেষ উদিত দিনেশ
অরুণ সারথি সঙ্গে।

কমল ভ্রমর হরিষে ঝঙ্কর
মধু পিতে মনোরঙ্গে ।।

বুঝি যুদ্ধ হেতু নৃপ সত্যকেতু
বাহিনী করএ সাজে।

বত্রিশ বিধান দুন্দুভি নিশান
বীর-জয় ঢোল বাজে।

রথ সারি সারি চলে আগুসারি
উপরে কনক ধ্বজ।

অলেখা তুরঙ্গ চলে মনোরঙ্গ
কোটি কোটি চলে গজ।

চলে পায়দল ভূমি টলমল
ঘন সিংহ নাদ ছাড়ে।

ঢাকি ব্যোমপুর আচ্ছাদিল সূর
পদধূলি অন্ধকার।

গজের গর্জন তুরঙ্গ হর্ষন
রথ নির্ঘোষ সার।

বীরসিংহ নাদ হইল প্রমাদ
সবে বোলে মার মার।

ধর্মকেতু নাম রণে অনুপাম
রাজপুত্র আগুসাজ।

নিজ রথে চড়ি হাতে ধনু ধরি
আইল সংগ্রাম মাজ ।।

গজ কান্ধে চড়ি চলে বীর্য স্মরি
করিয়া সিংহ নাদ।

সাজিল সুধীর অতি মহাবীর
রণে হত অবসাদ ।।

চলে বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধিএ অনন্ত
রথে চড়ি ধনু ধরি।

সাজে কবিচন্দ্র যেহেন উপেন্দ্র
নৃপ স্তুতি পড়ি পড়ি।

যুদ্ধার্থ সাজিল সংগ্রামে রুষিল
নৃপতি প্রসাদ লৈয়া।

যে জিনে সংগ্রাম তার হএ নাম
তুষিল প্রসাদ দিয়া ।।

বৈতালিক স্তুতি পাঠ আগে করি
মিত্রকণ্ঠ বেদ পড়ে।

আনি পুণ্য রথ সুরঙ্গ সারথ
নৃপতির আগে ধরে।

ধর্মশিরস্ত্রাণ শিরে শোভমান
বিজয় কম্বুক হাতে।

দানের কঙ্কন ধ্যানের কুণ্ডল
জ্ঞান-মণি শোভে মাথে।

চাহি শুভ ক্ষণ রথে আরোহণ
কৈল সত্য নরপতি।

লইয়া ধূপ দীপ হইয়া সমীপ
আগু দিল সত্যবতী।

চলে সত্যবতী ইন্দ্রে গাহে কীর্তি
পুষ্প ক্ষেপে দেবগণে।

কম্পে বসুমতী বাসুকী সঙ্গতি
সৈন্য পদ বিমর্দনে ।।

॥ কলিরাজের যুদ্ধ সজ্জা ॥

কলিএ শুনিয়া মনেত গুণিয়া
নিজ সৈন্য কৈল সাজে ।

বাজএ জয়ঢোল দুন্দুভি কল্লোল
বিবিধ বাদিত্র বাজে ॥

গজেন্দ্র সঞ্চারি মত্ত গজে চড়ি
চলিল পর্বত সার ।

যথ অশ্ববার কে লেখিব আর
ফুকারএ মার মার ॥

কথ লক্ষ লক্ষ চলিল অলক্ষ্য
ধ্বজ শোভে সারি সারি ।

পদাতির সৈন্য চলে অগ্রগণ্য
নৃপতির আগু সারি ॥

রাজার নন্দন বিপক্ষ তপন
পাপসেন যুবরাজ ।

লই ধনু শর চলএ সমর
নিজ রথে করি সাজ ॥

রণে মহা যোধ লইয়া আয়ুধ
সাজিল কপট কেতু ।

গজ কান্ধে চড়ি ভীতসেন বলী
চলিল সংগ্রাম হেতু ।

সাজিল কৃপণ সংগ্রামে প্রবীন
সাজে মিথ্যাসেতু বীর ।

সৈন্য পদ ধূলি সূর আচ্ছাদিল
পৃথিবী ভারে যায় চিড় ॥

ভাটে স্তুতি গাএ সাজে কলি রাএ
বেদ পড়ে পুরোহিত ।

কুবুদ্ধি সারথ আনিল হিংসারথ
যোগাইল আনন্দিত ।

কপট কিরীট শিরে শোভে মিট
উল্লসিত কলি চিত ।

কৃপণ কঙ্কন মায়া আবরণ
শরীর বেঢ়িল পাপে ।

পরদার হার গলে শোভাকার
রথেতে উঠিল লম্পে ॥

কলি দর্প শুনি মনে ভীত গুণি
আপনা বাহিনী কৈল সাজ ।

সসৈন্য সংগতি হইল নরপতি
আইল রথ ক্ষেত্র মাজ ।

মুখামুখি রণ হইল দুইজন
বিবিধ বাদিত্র বাজে ।

।। সমর ।।

মুখামুখি দুই সৈন্য বাঝিল সমর ।
বাসুকী বাসরে যেন যুদ্ধ ঘোরতর ।।
রথে রথে ঠেলাঠেলি রথ ভাঙ্গি পড়ে ।
গজে গজে বিমর্দন অস্ত্র মারিবারে ।।
নরোচ নালিকা গদা ভূসণ্ডি উস্বর ।
শূল শেল মুষল মুদ্গর কুন্ত শর ।।
আশি পাশ অঙ্কুশ ত্রিকণ্ঠ ভিন্দিপাল ।
সুটি মুখ শীল মুখ চক্র করবাল ।।
ঝারে ঝারে বিশিখ গগন ভরি পড়ে ।
ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী যেন গগনেত উড়ে ।।
মহা মহা রথী পড়ে পৃথিবীর সার ।
মহা মত্ত গজ পড়ে পর্বত আকার ।।
অশ্ববার সৈন্য পড়ে শুনি ধরমরি ।
ভাঙ্গিল কদলি বন যেন মত্ত করী ।।
অলেখা পদাতি পড়ে শুনি হাহাকার ।
গগনে কবন্ধ নাচে দেখি চমৎকার ।।
শোণিতের শ্রোত বহে মাংসে হৈল পঙ্ক ।
শুনিতে হরিষ তনু শিবা গৃধ কঙ্ক ।।
তবে মহারথী সবে পড়িছিল রণ ।
একে একে যুদ্ধ হৈল লোম হরিষণ ।।
যুবরাজ ধর্মকেতু হাতে ধনুর্বাণ ।
তাকে নিবারিলেক সুবুদ্ধি বলবান ।।
সুদাতা কৃপণে যুদ্ধ হইল ঘোরতর ।
মহাযুদ্ধ কবি-চন্দ্র যুঝে পরস্পর ।।
মিথ্যাসেতু সত্যবাদী সাজিল সংগ্রাম ।
দুই মহা ধনুর্ধর রণে অনুপাম ।।

গজে চড়ি বীর্যশালী এড়ে পঞ্চবাণ ।
দশবাণে ভীতসেন কৈল খান খান ।।
ভীতসেন দশবাণ এড়ে লঘু হাত ।
বীর্যশালী বিন্ধিলেক যেন বজ্র মাথ ।।
সহিয়া সে ঘাও বীর খরবাণ এড়ে ।
কাটিল ভীতের ধনু ভূমি তলে পড়ে ।।
আর ধনু ধরি ভীত বরিষএ শর ।
সব শর কাটে বীর্যশালী ধনুর্ধর ।।
অন্যে অন্যে কাটন্ত হানন্ত দুই বীর ।
পুষ্পিত কিংশুক যেন দোঁহান শরীর ।।
অন্যে অন্যে আস্ফালন্ত গর্জন্ত বিশাল ।
দুই বীর বীর্যবন্ত মূর্তিমন্ত কাল ।।
শিলমুখ নামে বাণ ভীত সেনে এড়ে।
মুহুশ্চিত বীর্যশালী গজের উপরে ।।
চৈতন্য পাইয়া বীর শরজাল এড়ে ।
গজ সঙ্গে ভীতসেন না দেখি অন্তরে ।।
অর্ধচন্দ্র ঘাএ গজকুম্ভ বিদারিল ।
পৃথিবী পশিয়া দন্ত গজেন্দ্র পড়িল ।।
ভীতসেন মর্ম চাহি নরোচ বিন্ধিল ।
মুহুশ্চিত ভীত সেন ভূমিত পড়িল ।।
রথে করি নারদে নিকালে তুরমান ।
সিংহনাদ ছাড়ে বীর্যশালী বলবান ।।
সত্যকেতু সন্যোত উঠিল জএ জএ ।
ভীতভঙ্গ কলি সৈন্য ধাএ পাই ভএ ।।
তা দেখি কপট কেতু সংগ্রামে রুষিল ।
শতলক্ষ বাণ মারি সুবুদ্ধি বিন্ধিল ।।

বুদ্ধিমন্ত সুবুদ্ধি হানিল তীক্ষ্ণ শর।
ধনু কাটি বিন্ধিল কপট কলেবর॥
আর ধনু ধরি পাপ কাটে সেই চাপ।
লজ্জিত কপট কেতু খণ্ডে বীর দাপ॥
রথ ধ্বজ কাটি পাড়ি কাটিল সারথি।
সংগ্রামে কপট কেতু হইল বিরথী॥
সত্যযুদ্ধে হারিয়া কপটে করে রণ।
নির্বলীয়া নিজ তনু লইয়া উঠিল গগন॥
চাহিতে না দেখে তাকে সুবুদ্ধি সুবীর।
অবিরত অলক্ষিত বিন্ধএ শরীর॥
কপটে কপট কৈল পাই পরিত্রান।
কন্টকে যে কন্টক খসএ হেন জ্ঞান॥
নিষ্কপট সুবুদ্ধি কপট নাহি জানে।
নিরন্তর কপটকেতু বিন্ধিল বাণে॥
সর্ব গাএ রক্ত পড়ে কম্পিত শরীর।
মুর্চ্ছিত হৈল সুবুদ্ধি মহাবীর॥
সুবুদ্ধি মুর্চ্ছিত সব বুদ্ধি পাইল নাশ।
সত্যকেতু সত্যশর ধাএ উর্ধ্বশ্বাস॥
আস্ফালএ কপটকেতু গর্জএ পুনি।
কলি সৈন্যে জয় জয় নানা বাদ্য ধ্বনি॥
সুদাতা কৃপণে তবে বাঝিল সংগ্রাম।
দুই মহাবীর্যবন্ত রণে অনুপাম॥
অন্যে অন্যে কাটন্ত হানন্ত অনিবার।
অন্যে অন্যে চাহন্ত নিধন করিবার॥
অন্যে অন্যে রথ ধ্বজ কাটিয়া পাড়ন্ত।
অন্যে অন্যে ধনু কাটি হৃদএ গাড়ন্ত॥
পুনি রথে উঠিয়া যুঝন্ত দুইজন।
জয়পরাজয় নাহি ঘোরতর রণ॥

কৃপণে কাটিয়া ধনু বিন্ধিল শরীর।
আর ধনু ধরি বাণ এড়ে মহাবীর॥
রথে চড়ি অশ্বকাটি কাটে রথ চক্র।
দৈবহি কৃপণ প্রতি বিধি হৈল বক্র॥
সুদাতাক শরে তবে কৃপণে বিন্ধিল।
ধ্বজ যষ্টি ধরি বীর ক্ষণেক আছিল॥
চৈতন্য পাইয়া কাটে কৃপণের ধনু।
শত লক্ষ বাণ কাটি বিন্ধিলেক তনু॥
খড়্গ চর্ম ধরি রহে কৃপণ দুর্মতি।
মুষ্টি দেশে খড়্গ কাটে সুদাতা সুমতি॥
রণেত তুলিয়া পাপসেনে যে উদ্ধারে।
কৃপণে পাইয়া দাও চলি গেল ঘরে॥
তবে মহাযোধ সঙ্গে করি মহাবীর।
ধনু ধরি যুদ্ধ করে নির্ভয় শরীর॥
ধনু কাটি কাটিল মুখের তনু-ত্রাণ।
অস্ত্র জালে মহা যুদ্ধ মাত্র কম্পমান॥
চৈতন্য পাইয়া আর ধনু হাতে ধরে।
তিনবারে কবিচন্দ্র বাণ কাটি পাড়ে॥
পুনি কবিচন্দ্র তার কাটিল সারথি।
রথধ্বজ কাটিলেক করিল বিরথী॥
কাটিল হাতের ধনু বিন্ধিল শরীর।
হাতে গদা ধরি যাএ সুখ মহাবীর॥
আত্মবল পরবল না করে বিচার।
হাজারে হাজারে সুখে করএ সংহার॥
কবিচন্দ্রে পঞ্চ গোটা নরোচ বিন্ধিল।
মুর্চ্ছিত সুখ যোধ ভূমিত পড়িল॥
চৈতন্য পাইয়া পুনি হাতে গদা ধাএ।
প্রচণ্ড কেশরী যেন সংগ্রামে উজাএ॥

সারিয়া সারিয়া[1] যুদ্ধ করে সুখ বীর।
চিন্তাযুক্ত কবিচন্দ্র হইলা অস্থির॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ পারে করিবার।
সুখ সঙ্গে পণ্ডিতে না পারে যুঝিবার॥
বেগে গিয়া মারে গদা রথের উপর।
রথ সঙ্গে সারথি পাঠাইল যম ঘর॥
মিত্রকণ্ঠ রথে চড়ি কবিচন্দ্র সারে।
কোথা গেল কবিচন্দ্র সে সুখে বিচারে॥
চারি দিকে বিচারিয়া না পাইল দর্শন।
গগনে উঠিল হেন করে অনুমান॥
কবিচন্দ্র উদ্দেশি গগন মেলি মারে।
নেউটি পড়িল গদা মাথের উপরে॥
আপনার ঘাএ পাপ হৈল মুহুশ্চিত।
আত্মঘাতে মরে সুখ জানহ নিশ্চিত॥
তবে মিথ্যা সেতু সত্যবাদী হৈল রণ।
অন্যে অন্যে গর্জন্ত তর্জন্ত দুই জন॥
সিংহনাদ ছাড়ন্ত করন্ত পরাক্রম।
দুই বীর বীর্যবন্ত মূর্তিমন্ত যম॥
পঞ্চ বাণে মিথ্যাসেতু কাটি পাড়ে ধ্বজ।
কোপে জ্বলে সত্যবাদী যেন মত্তগজ॥
খুরশ্রী (?)[2] তাহার ধনু কাটিয়া পাড়িল।
আর ধনু মিথ্যাসেতু তখনে ধরিল॥
পুনি সত্যবাদী আর কাটিল সারথি।
তীক্ষ্ণ করি শক্র রথ কাটে শীঘ্র গতি॥
কিরীট কুণ্ডল কাটে কাটে ধনুর্বাণ।
শত সংখ্য বাণে বিন্ধে বজ্রের সমান॥

হাতে গদা মিথ্যাসেতু ভএ চিন্তি মন।
মিথ্যা কথা কহি করে প্রাণের রক্ষণ॥
সত্যবাদী প্রতি বোলে না করহ কোপ।
কার প্রাণে সহিবেক তোহ্মারি আটোপ॥
সত্যকেতু পাত্র তুহ্মি সত্যবাদী বীর।
দেবঘরে সংগ্রামেত নির্ভয় শরীর॥
আহ্মিহ শরণ লৈলুঁ সত্যকেতু স্থান।
কলির সেবনে আর নাহিক সৈন্য মান॥
আহ্মার বচন যদি না কর প্রত্যয়।
হাত হোন্তে গদা লও শুন মহাশয়॥
এ বলিয়া গদা দিতে নিকটে আইল।
সত্যবাদী সত্যবন্ত প্রত্যয় জানিল॥
কাকের চরিত্র ভাল কাকে সে বুঝএ।
কাকের চরিত্র শুকে না বুঝএ নিশ্চএ॥
দুষ্টজন চরিত্র বুঝএ দুষ্টজন।
সাধুজন না বুঝএ কুপাত্র লক্ষণ॥
গদা লইতে সত্যবাদী হস্ত বাঢ়াইল।
ছিদ্র পাই মিথ্যাবাদী গদা ভ্রমাইল॥
ভ্রমাই মারিল গদা মাথের উপরে।
মুহুশ্চিত সত্যবাদী রথ 'পরি পড়ে॥
মিথ্যাসেতু মারিতে সত্যের সৈন্য ধাএ।
মার মার করি সব অতি বেগে যাএ॥
দুই সৈন্য তুমুল উঠিল কোলাহল।
পদ ভরে পৃথিবী পাতালে যাএ তল॥

১ সারিয়া সারিয়া—আত্মরক্ষা করিয়া করিয়া ২ শূরশ্রী ?

কাক কেহ না সহন্ত করন্ত প্রহার।
নিমখ্যাকা (?) রণ হৈল উঠে হাহাকার॥
প্রাণ-নিরুৎসুক রণ কেহ নাহি সহে।
মাংসে হৈল কর্দম শোণিতে নদী বহে॥
এথ দেখি ধর্মকেতু সংগ্রামে তরাসে।
অনন্ত বাসুকী যেন পাতালেত পশে॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
শুনি গুণিগণ মনে মানে সুধাধার॥

॥ ধর্মকেতু ও পাপসেনের যুদ্ধ ॥

(দীর্ঘছন্দ : ধানশী রাগ)

যুদ্ধে যায় যুবরাজে বিবিধ বাদিত্র বাজে
ঘন ঘন করে সিংহনাদ।
অনিবার ক্ষেপে শর ছাই পড়ে দিগন্তর
কলি সৈন্য ভাবে পরমাদ॥
রথ পড়ে সারি সারি লক্ষ লক্ষ মত্ত করী
কোটি কোটি অশ্বে কৈল অন্ত।
কলি সৈন্য পাই ত্রাস ধাই যাএ চারি পাশ
সবে রোষে দ্বিতীয় যমন্ত॥[1]
সৈন্যের বিপদ দেখি নিজ বল উন লখি
পাপসেন কলির কুমার।
রথে চড়ি আগুসারে মহাসিংহনাদ করে
কোপে করে ধনুর টঙ্কার॥
মুখামুখি দুইজন হৈল ঘোরতর রণ
অস্ত্রজালে ভরিল গগন।
কাক কেহ নহি দেখে অস্ত্র পরে লক্ষে লক্ষে
দুই সৈন্যে কম্পে ত্রাস মন॥
ধর্মকেতু পঞ্চ বাণ এড়ে ধীরে সন্ধান
পাপসেনে দশ বাণে কাটে।
পাপসেনে দশ এড়ে ধর্মকেতু কাটি পাড়ে
অন্যে অন্যে সংগ্রাম না টুটে।
ধর্ম এড়ে খর বাণ কাটি পাড়ে ধনু খান
আর বাণে কাটি পাড়ে ধ্বজ।
পাপসেন লাজ পাইল আর ধনু হাতে লৈল
রথ দেখি দন্তহীন গজ।
বক্রবাণ সান্ধি এড়ে রথ চক্র কাটি পাড়ে
ক্ষুর বাণে কাটিল কোদণ্ড।
আর ধনু লভি কর ধর্মকেতু এড়ে শর
দুই বীর সংগ্রামে প্রচণ্ড।
এই মতে পরস্পর যুদ্ধ করে নিরন্তর
অন্যে অন্যে বরিষন্ত বাণ।
কাক কেহ নাহি দেখে অস্ত্র পড়ে লাখে লাখে
দুই সৈন্য ভএ কম্পমান।
দুই দিকে সৈন্যে পরে দুই যুবরাজ শরে
সৈন্যেত উঠিল হাহাকার।
প্রশংসন্ত দেবগণ সাধু সাধু দুইজন
দশদিক কৈল অন্ধকার।
তবে বীর পাপসেন যুগান্তের যম যেন
সান্ধি এড়ে উল্কামুখ বাণ।
হুঙ্কারি এড়িল শর পড়িল হৃদের পর
ধর্মকেতু যাএ কম্পমান॥

---

১ অনন্ত?

যুবরাজ মোহ পাইল রথ বাহু বাঢ়াই' নিল
সৈন্যে ক্ষেপে কলির নন্দন।
সৈন্যে উঠে হাহাকার শোণিত বহএ ধার
সত্যকেতু চিন্তাকুল মন॥
চৈতন্য পাইয়া পুনি পরাভব মনে গুণি
ধর্মকেতু বিন্ধে আর বার।
ধর্মে জন্মিল কোপ পাপে পাইল বুদ্ধি লোপ
শর জালে কৈল অন্ধকার॥
পঞ্চবাণে তনু ভেদী ক্ষুরবাণে ধনু ছেদি
সারথি কাটিল আর শরে।
পাপ সেনে পাইল তাপ শীঘ্র ধরি আর চাপ
মাথার কিরীট কাটি পাড়ে॥

খসি পড়ে শিরস্ত্রাণ ধর্মে পাইল অপমান
হুঙ্কারি এড়িল রৌদ্রবাণ।
মোহ পাইল কলিসুত লোকে দেখে অদ্ভুত
শিরে পড়ে বজ্রের সমান॥
কদাচিত রহে প্রাণ ঘাএ দেহ কম্পমান
পড়িল প্রসারি দুই হাত।
নারদ তুরিত আইল রথে তুলি লই গেল
কলি মারে মাথে বজ্রঘাত॥
ধর্মকেতু সত্য বাহে আনন্দিত সত্যরাএ
সৈন্যেত উঠিল জয়বাদ।
মোহাম্মদ খানে কহে ধর্মকেতু পাইল জএ
পাপীজনে পাইল অপবাদ॥

॥ সত্য-কলি যুদ্ধ: বিতর্ক ॥

(জমক ছন্দ)

পুত্রশোকে কলীন্দ্র সৈন্যেত প্রবেশিল।
শরজালে শত্রু সৈন্য রণে কম্পাইল॥
গজ সৈন্য কাটিল কাটিল অশ্ববার।
সারি সারি অশ্বকাটে পর্বতের সার॥
কার হস্ত কার পদ কার কাটে শির।
বাছি বাছি কাটি পাড়ে মুখ্য মুখ্য বীর॥
শোণিতের নদী বহে মাংসে হৈল পঙ্ক।
নর ভক্ষি কৃতার্থ আনন্দ গৃধ কঙ্ক॥
কলি-অস্ত্র-অগ্নিকণা ভরিল গগন।
অরুণ হইল হীন স্থকিত পবন॥
শ্রাবণের মেঘে যেন বরিষএ ধার।
কলি অস্ত্রে সৈন্যেত উঠিল হাহাকার॥

গজ যূথ ধাএ যেন সিংহের তরাসে।
সত্যকেতু সৈন্য ধাই যাএ চারিপাশে॥
রাখিতে না পারে সৈন্য সত্য পাইল লাজ।
আপনে যুঝিতে চলে সত্য মহারাজ॥
রাজে যাএ সংগ্রামে নেউটে সর্ববল।
বিবিধ বাদিত্র বাজে শুনি কোলাহল॥
বেদ পড়ে পুরোহিত ভাটে স্তুতি গাহে।
পুণ্য রথে ধনু হাতে চলে সত্য রাএ॥
সুযোগ্য সারথি রথ চলে বাউ গতি।
দশদিক ভরি অস্ত্র এড়ে নানা ভাতি॥
সিংহনাদ করি গেলা কলির সমুখ।
সত্যকেতু দেখিয়া কলীন্দ্র মনে দুঃখ॥

রথ বাঢ়াইয়া নিল

কুবুদ্ধি সারথি রথ চলে শীঘ্রগতি।
হিংসারথে চলি আইল কলি নরপতি॥
সিংহ দেখি সিংহ যেন পড়িছিল রণ।
মুখামুখি সংগ্রাম বাঝিল দুইজন॥
সত্যকেতু ধ্বজ শোভা করে দিবাকর।
কলি ধ্বজে শোভে চন্দ্র অধিক সুন্দর॥
দেবসিদ্ধ বিদ্যাধর তপস্বী ব্রাহ্মণ।
সত্যকেতু চাহন্ত ধর্মিক সাধুজন॥
অসুর রাক্ষস যক্ষ দুর্জন চণ্ডাল।
নারদ কৃপণে চাহে কলীন্দ্রের ভাল॥
সত্য দেখি হাসি কলি বোলে উচ্চস্বর।
পণ্ডিত নিন্দিয়া যেন হাসএ বর্বর॥
বুঝিল অসক্য সত্য তপস্বী আচার।
তেকাজে চাহিল আগে সন্ধি করিবার॥
ধাইতে না পারি পুনি পড়িছিলা রণ।
আজুকা প্রসন্ন তোর হইল শমন॥
কাল সর্প হেন জান মোর তিনঘ্ন বাণ।
তোর রক্ত ভেদিয়া করিমু রক্ত পান।
এথ শুনি হাসি বোলে সত্য নরপতি।
শুন কলি কুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ দুর্মতি॥
ভএ সন্ধি না মাগিএ জানহ নিশ্চএ।
লোকহিত চাহিল ধর্মের করি ভএ॥
কোপ হোন্তে পুরুষের বৈরী নাহি আর।
কোপ কালে নাহি দেখ ধর্মের বিচার॥
ঘটঅগ্নি সংসারেত শুন অগ্নি কহি।
এক অগ্নি নরকে পাতকী যাএ দহি॥
সেই প্রভু করতার কৃপার সাগর।
কৃপা কৈলে নিবাএ সে অগ্নি খরতর॥
আর অগ্নি সংসারেত দহে বৃক্ষ গণ।
জীবনে সে লৈতে পারি তাহার জীবন॥
আর অগ্নি উদরেত শরীর জ্বালএ।
অন্ন পাইলে শান্ত হএ সে অগ্নি নিশ্চএ॥
আর অগ্নিদহে বিরহের বিরহিণী।
প্রথম সঙ্গমে অগ্নি নিবাএ আপনি॥
আর অগ্নি চিন্তার চিন্তিত দহে মন।
মনোরথ সিদ্ধি হৈলে পাএ নিবারণ॥
আর ক্রোধানল হোন্তে ধর্মে পাএ নাশ।
ক্ষেমা হোন্তে নিবি যাএ সে পাপ হুতাশ॥
ধন হীন দাতার বিপদে মনে দুঃখ।
ধনবন্ত কৃপণে ভুঞ্জএ নানা সুখ॥
নির্ধনী হইলে লোকে জ্ঞাতি না আদরে।
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে॥
সভা মধ্যে নির্ধনীর বিষণ্ণ বদন।
জলহীন ঘট যেন না করে শোভন॥
সর্বকাল ধনীর সম্পূর্ণ চন্দ্রমুখ।
ধনী দেখি নির্ধনীর ফাটি যাএ বুক॥
ধন হীন স্বামী প্রতি প্রেম ছাড়ে নারী।
মধু হীন ফল যেন নালএ শুক শারী॥
বলে বীর্যে সব বৈরী পারে জিনিবার।
ক্ষেমা ধরি কোপ-বৈরী জিনিতে না পারে॥
ক্ষেমা সে পরম ধন ধর্মিকের জান।
ক্ষেমামূলে দুই কূলে বহএ কল্যাণ॥
তেকারণে সন্ধি করি ক্ষেমা কৈল তোক।
তুম্রি পাপমুখে 'থু' মারএ সর্বলোক॥
কলি বোলে সত্য তুম্রি তপস্বীর পতি।
বিনি দ্বন্দ্বে কোনে বা রাখিছে রাজ নীতি॥

ক্ষেমা-করে জনেরে না করে কেহ ভএ।
যদিবা উত্তম জন মহাবংশেত হএ ॥
নিকৃষ্টে করিলে কোন্দল বিক্রম নিশ্চএ।
মহাজনে দ্বন্দ্ব ভএ তাহাক শঙ্কএ ॥
ভ্রাতৃ বা পুত্র বা পাত্রমিত্র বা ঘরণী।
দ্বন্দ্ব করিব ভএ রাখিব পুনি পুনি ॥
দ্বন্দ্ব হোন্তে শত্রু নাশ মিত্রের উজ্জ্বল।
দ্বন্দ্ব করি নৃপতি শাসিব মহীতল ॥
সত্য বোলে তোর বুদ্ধি কহি শুন হিত।
পুত্র তুল্য প্রজাকে পালিব প্রতিনিত ॥
দ্বন্দ্বকালে দ্বন্দ্ব করি ক্ষেমা সর্বকাল।
নিতি দ্বন্দ্ব কৈলে রাজা রাজ্যেত জঞ্জাল ॥
দ্বন্দ্ব হোন্তে সম্পদেত ক্ষেমা করে সর্ব।
বিপদেত সকলে হারে টুটি যাএ গর্ব ॥
প্রীতি করি নৃপতি সবে রাখিব মন।
পুত্র বা পাত্র বা ভার্যা কিবা ভৃত্যগণ ॥
দানে ধর্মে রাখিবা আপনা যশকৃতি।
সমদণ্ডে শাসিব সকল বসুমতী ॥
দাতার সকল বন্ধু প্রসন্ন বদন।
দানে মিত্র করিতে পারিএ শত্রুগণ ॥
সংসারেত যশ মিলে স্বর্গে বাস হএ।
পরের নিমিত্তে ধন কৃপণে সঞ্চএ ॥
নারী হই লজ্জাহীন হএ যেইজন।
দিষ্টি না থাকিলে যেন না শোভে দর্পণ ॥
নৃপতি হইয়া যদি না আদরে ধর্ম।
বৃষ্টিহীন মেঘ যেন নাহি ক্রোধ কর্ম ॥
পুরুষ না হএ যদি সত্যবন্ত ধীর।
চক্ষু না থাকিলে যেন না শোভে শরীর ॥
প্রীতি বাক্য না থাকএ যাহার বচন।
মধুহীন ফল যেন না রুচএ মন ॥
শাস্ত্র কর্ম জানি যেবা ধর্ম না আচারে।
ফলবন্ত বৃক্ষ যেন ফল নাহি ধরে ॥
পাখহীন পক্ষী যেন হীন বলবন্ত।
বুদ্ধিএ শশক মারে কেশরী দুরন্ত ॥
যে মিত্রে বিপদে ছাড়ে দেখিয়া সংশএ।
গুণহীন ধনু যেন কার্যে না লাগএ ॥
ধনবন্ত হই দাতা নহে যেই জন।
জলহীন নদী যেন নাহি প্রয়োজন ॥
কলি বোলে কর বুদ্ধি সত্য নরপতি।
বুদ্ধিমন্ত কৃপণ ভাবিয়া দেখ মতি ॥
ঘর শূন্য যার ঘরে নাহিক জননী।
দেশ শূন্য নিরানন্দ বা হএ যেই পুনি ॥
সহজে হৃদয় শূন্য বিদ্যা নাহি যার।
সর্বশূন্য দরিদ্রতা মহাদুঃখ তার ॥
ধনমানে সংসারেত সম্মান পাওএ।
অপমানে নির্ধনীর বিদরে হৃদএ ॥
মহাকবি পণ্ডিত নির্ধনী পাএ দুখ।
ধনবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক ॥
ধন সে পরম বন্ধু সংসার ভিতর।
ধন হোন্তে মান্য জন যদ্যপি বর্বর ॥
সত্যে বোলে শুন কহি না চিন্তহ বাম।
ধন হোন্তে মনদুঃখ পাএ পরিশ্রম ॥
বিদ্যাএ পণ্ডিত হএ সর্বত্রে কল্যাণ।
ধনিক মূর্খেরে লোকে না করে বাখান ॥
ধন হোন্তে শত্রু হএ সবে হিংসে নীতি।
বিদ্যাবন্ত লোককে সকলে রাখে প্রীতি ॥

স্বদেশে রাজাক পূজে বিদেশে উদাস।
সর্বস্থানে পণ্ডিতের যেহেন প্রকাশ ॥
ধনবন্ত সংসারে সম্পদ কয় দিন।
শাস্ত্রা পরলোক পাএ হএ প্রভু-লীন ॥
মরণ সঙ্গতি ধন নিতে কেহ নারে।
শাস্ত্র পুণ্য ফলে পুনি নরক উদ্ধারে ॥
নপুংসক হস্তে যেন সুন্দরী নাগরী।
না ভুঞ্জিল শৃঙ্গার আছিল রূপ হেরি।
তিন কার্য হোন্তে নিত্য চিন্তা পাএ নর।
শুন কহি তোর স্থানে কলীন্দ্র বর্বর ॥
ধন সঞ্চিবারে চাহে যে পাপ অজ্ঞান।
বটে বটে সঞ্চিতে চিন্তিতে যাএ প্রাণ ॥
বহু ভার্যা যাহার সে চিন্তে অহোরাতি।
নিজ কার্যে যেই জনে ব্যক্তে কহে নীতি ॥
বিমর্সি না কহি কথা পাএ অপমান।
বহু বাক্যে মুখ দোষে চিন্তা পাএ জান ॥
যে বাণ এড়িল সন্ধি তেন মত পাড়ে।
মুখে নিঃসরিলে কথা সম্বরিতে নারে ॥
কলি বোলে সত্যকে যে সদৃশ ছাওয়াল।
শাস্ত্র নাহি জানসি না চিন মন্দ ভাল ॥
শাস্ত্র নাহি জানিলে পণ্ডিতে মূর্খ তুল।
বৃক্ষ যেন না শোভে না হৈলে ফলফুল ॥
শাস্ত্র জানিয়া যদি ভাল কথা কহে।
সভা মধ্যে তার বাক্য বেদ তুল্য হএ।
নানা ভাষ জানিব কহিব নানা ভাতি।
সেই পুরুষোত্তম সত্য নরপতি ॥
সত্য বোলে কহিতে কহিব সুধামএ।
কার্যকালে নিঃশব্দে রহিব নিরন্তএ ॥
যদি সে অযুত সম হএ তার বাণী।
বহুত কহিতে তিক্ত কর্ণে লাগে পুনি ॥
তিন কার্যে মনুষ্যের সঙ্কট পড়এ।
বহু ভোগ বহু নিদ্রা যে বহুক হএ ॥
বহু কথা কহিতে অবশ্য মিথ্যা কহে।
তিল এক ধর্ম পন্থে মিথ্যা নাহি সহে ॥
সত্য বাক্যে স্বর্গ বাস মিথ্যাএ নরক।
মিথ্যা যেন ফোঁটা সত্য চন্দন তিলক ॥
প্রাণান্তেহ মিথ্যা না কহিব সাধুজন।
যদি বিপর্যয় হএ বিধির ঘটন ॥
যদ্যপি পশ্চিম দিকে উদয় তপন।
সুমেরু চলএ যদি অসক্য কথন ॥
যদ্যপি শীতল হএ প্রচণ্ড আনল।
যদি পর্বতের উপরে বিকাশে কমল ॥
সূচ্যাগ্রহ তথাপি না টলে সাধু বাণী।
সত্য হোন্তে সম্পদ মিথ্যাএ সব হানি ॥
কলি বোলে সত্য তুমি পণ্ডিত বর্বর।
সর্বস্থানে সত্য কহি পাড়ে অথান্তর ॥
যেবা মিথ্যা কহিলে লোকের হএ ভাল।
তাত মিথ্যা কহি সত্য সত্য মহীপাল ॥
মিথ্যা কহি শত্রুকে জিনিতে পাপ নাহি।
দ্রোণকে বধিল ধর্ম মিথ্যা কথা কহি ॥
চারি কর্ম মনুষ্যে করিব ধর্ম ছাড়ি।
সত্য ছাড়ি ছিদ্র পাই মারিবেক বৈরী ॥
মিথ্যা কহি প্রাণ রক্ষা করিব নিশ্চএ।
অভক্ষ্য ভক্ষিব যদি রোগ নাশ হএ ॥
সঙ্কটে পলাই যদি প্রাণরক্ষা পাএ।
লজ্জা ছাড়ি প্রাণরক্ষা করি সর্বথাএ।

সত্য স্মরি যুদ্ধ করি যদি তেজে প্রাণ।
পুত্র-দারা শক্র হরে অযশ বাখান॥
পলাইয়া যুদ্ধ করি সঙ্কট জিনিব।
আত্মরক্ষা মহাধর্ম নিশ্চএ জানিব॥
সত্যকেতু বোলন্ত কলীন্দ্র পাপমতি।
যুদ্ধেত বিমুখ হৈলে নরকে বসতি॥
আগে বা পাছেত জান অবশ্য মরণ।
যুদ্ধে মৈলে কীর্তি রহে স্বর্গেত গমন॥
ক্ষত্রিকুলে জন্মিয়া যে প্রাণের কাতর।
নিষ্ফল জীবন তার সংসার ভিতর॥
নিজ কুল-ধর্ম ছাড়ে যেই দুরাচার।
গন্ধহীন পুষ্প যেন নাহি প্রতিকার॥
এথেক জানিয়া লোকে কীর্তি সে আচরিব।
প্রাণান্তেহ নিজ কুল-ধর্ম না বর্জিব॥
সর্প কি তেজএ মণি সিংহ কি বিক্রম।
কুল-কর্ম-ধর্ম কভো না তেজে উত্তম॥
শুদ্ধভাবে সত্য-যুদ্ধ করিব সুজন।
অসত্য কপট করি না করিব রণ॥
কপটির কণ্ঠ শ্বাস পাছে পাএ লাজ।
সর্ব কর্মে যুদ্ধ-কর্ম ভাল কলিরাজ॥
কলিএ বোলন্ত শুন সত্য নরপতি।
যথ কিছু কহিলে না রুচে মোর মতি॥
সাধু সঙ্গে সাধু বৃত্তি করএ সুজন।
কপটেত শুদ্ধ ভাব করে মূঢ় জন॥
কপটেত কপটে পাইব পরিত্রাণ।
বিষেত হরএ বিষ সত্যকেতু জান॥
সত্যভাবে যুধিষ্টিরে হারে রাজ্যধন।
শকুনি জিনিল পাশা কপট কারণ॥
কপটে ব্রাহ্মণ দেখ বালক ছলিল।
মন্দ প্রতি ভাল কৈলে ঠেকএ জঞ্জাল॥
অসুরক দিয়া বর যেন ভূতনাথ।
শক্রশিরে হস্ত দিলে হৈবে ভস্মপাত॥
শিব শিরে হস্ত দিয়া চাহে পরীক্ষিতে।
আকুল অম্বিকা পতি আপনা রাখিতে॥
কপটে গোবিন্দ তাকে করিল নিধন।
তার হস্ত তার শিরে করি আরোহণ॥
মন্দ প্রতি ভাল কৈলে ভুঞ্জএ সন্তাপ।
ভাল প্রতি মন্দ কৈলে যথ হএ পাপ॥
কপট না কৈলে যুদ্ধ জিনিতে না পারে।
পাণ্ডবে কপট করি কৌরব সংহারে॥
সত্যকেতু বোলন্ত কপটে কোথা জএ।
জএ পরাজএ দৈব নিবন্ধ নিশ্চএ॥
বল বীর্য কপটে বিক্রমে নহে কর্ম।
বিধাতার নিবন্ধ যে করে জান ধর্ম॥
মৃত্যুকালে ঔষধে নাহিক প্রয়োজন।
দুঃখকালে কপটে না আর্জে কেহ ধন॥
কোনে বা জিয়াইব কেবা মারিবেক কাক।
সন্ধি-বিগ্ন জীবন-মরণ দৈব পাক।
রজ্জুএ বান্ধিয়া যেন পোতলি খেলাএ।
তেহেন সংসার লোক প্রভুর আজ্ঞাএ॥
আজ্ঞা বিনি এক তরু-পত্র নাহি পড়ে।
মিছা দ্বন্দ্ব তুহ্মি আহ্মি সব প্রভু করে॥
কলি বোলে যথ কহ পশুর বচন।
মনুষ্য করিয়া কেনে করিছে সৃজন॥
প্রাণ পণ করিব যে কার্য হএ সিদ্ধি।
ভাগ্যফলে তাত যেবা মিলাএ যে বিধি॥

চেষ্টা না কৈলে লোক নিবন্ধ বহুতর ।
নিজ দোষে কাপুরুষ হএ অধান্তর ।।
চেষ্টা কৈলে তাক লোকে নিন্দএ অনেক ।
চিন্তিলে না হএ কার্য দৈব পরিপাক ।।
মথিলেসে দুগ্ধে ঘৃত পাইন্ত গোয়াল ।
চেষ্টিলে সে কার্য সিদ্ধি ঘুচএ জঞ্জাল ।।
কলি বলে অসত্য কর্ম অসত্যে সাধিব ।
যশ কীর্তি নিজ বাহু বলে যে অর্জিব ।।
সহজে তপস্বী তুহ্মি যুদ্ধে নাহি লাজ ।
ধনু এড়ি তপস্বী চলহ বন মাজ ।।
তপস্বী হইয়া কর রাজ্য অভিলাষ ।
ব্রহ্মচর্য বিরলে সদৃশ তোর আশ ।।
এক হস্তে দুই কর্ম করিতে চাহসি ।
অবোধ শৃগাল প্রাএ চিন্তিয়া মরসি ।।
মৎস্য লোভে মাংস এড়ি মৎস্যকে ধাইলা ।
সে মাংসে হরিল মৎস্য কিছু না পাইলা ।।
সত্যবতী না হএ তোহ্মার উপযোগ ।
কোথাত অমৃতের ফল বানরের ভোগ ।।
চারি বস্তু বিষম কহিএ শুন তোক ।
গুরুগৃহ দূরে হৈলে শিষ্যের বিপাক ।।
বিশেষ অর্জিলে ভোগ বিষ সমতুল ।
যার গুষ্ঠী দরিদ্র সে নিশ্চিত আকুল ।।
তাহাত বিষম জান বৃদ্ধের তরুণী ।
তেন তুহ্মি বৃদ্ধ স্থানে সতী সুবদনী ।
আনকে সতীক দিয়া যাও তুহ্মি বন ।
শুন সত্য হিত তত্ত্ব রাখহ জীবন ।।
সত্যকেতু বোলন্ত পেচক নহে শুক ।
যদ্যপি পেচারে রাখে উল্লুকা উল্লুক ।।
হিত তত্ত্ব কহিতে তোহোত লএ আন ।
চোরেত না রুচে যেন ধর্মের বাখান ।।
আপনার স্বভাব না ছাড়ে কভো হীন ।
শত ধোতে না তেজএ অঙ্গার মলিন ।।
স্বর্গে যদি রোপে নিয়া সহস্র-লোচন ।
যদিবা অমৃত তাত সিঞ্চে দেবগণ ।।
তথাপি নিমের বৃক্ষ তিক্ত নাহি ছাড়ে ।
আপনার স্বভাব দুর্জনে নাহি এড়ে ।।
দোচারণী পত্নী তোর নিষ্ফল জীবন ।
পরের উচ্ছিষ্ট নিতি করহ ভোজন ।।
চোরে সাধু দেখিয়া যে না বোলএ চোর ।
তেনমত দেখি কলি ব্যবহার তোর ।।
ভৃত্য পাশে নিজ নারী দেওসি নিতি নিতি
তেন আন স্থানে মোরে দিতে বোল সতী ।।
গুরু তোর নারদ কপট তোর দাস ।
মিত্র ভৃত্য হোন্তে তুহ্মি পাইবেক নাশ ।।
চারি শত্রু ঘরে রাখি থাকে যেই জন ।
অবশ্য দুর্গতি তার বিকৃত মরণ ।।
দুষ্ট দোচারণী নারী মিত্র যার শঠ ।
উত্তরদায়ক ভৃত্য পায়এ সঙ্কট ।।
সর্প যেবা ঘরে রাখি নিঃশঙ্ক ।
এই চারি শত্রু হোন্তে সংশয় জীবন ।।
তেহেন তোহর জান নিকট মরণ ।
দোচারণী মূলে পাপ নারদ কারণ ।।
হীন অকুলিনী উপদেশ নাহি ধরে ।
লবন ভূমিত যেন পুষ্প বৃক্ষ মরে ।।
কলি বোলে সত্য তুহ্মি বুদ্ধি বড় হীন ।
বাল বুদ্ধি ভাগ্যে সে কুলিনী অকুলীন ।।

যুদ্ধকালে কেহ জাতি-কুল না বিচারে।
ভাগ্য বলে জিনে শত্রু বাহুবলে মারে।।
কথ অকুলীন হোন্তে কুলিনী জন্মএ।
সুগন্ধি কস্তুরী দেখ মৃগে উপজএ।।
সুরভি গোময় হোন্তে জন্মএ লাদন।
রাজ বীর্য হোন্তে হএ সংসার পাতন।।
একহি সমরে হৈল অমৃত গরল।
কুল অকুলিনী তুহ্মি বোলসি নিষ্ফল।।
বাহুবলে পারো মুই জিনিবারে সক্র।
মোর ভএ স্বর্গেত কম্পিত দেব চক্র।।
মহারাজা নলকে ভ্রমাইলুঁ বনে বন।
দময়ন্তী হারাইল মোহর কারণ॥
রাম হোন্তে লক্ষ্মণকে করিলুঁ বিমন।
অভিমানে প্রাণ দিল সুমিত্রা নন্দন॥
ভ্রাতৃশোকে রঘুপতি তেজিল শরীর।
হেন সব কর্ম কৈলুঁ আমি মহাবীর॥
ধর্মরাজা যুধিষ্ঠির পুণ্য কলেবর।
মায়া করি লজ্জা দিলুঁ সভার ভিতর॥
গোমাংস ভক্ষিছে করি তাকে দিলুঁ বাদ।
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরে পাইল অপবাদ॥
উদ্‌গার করিলুঁ তাক সভার ভিতর।
মায়া করি গোমাংস দেখাইলুঁ বহুতর॥
মোহোর প্রসাদে বলি ইন্দ্রপদ পাইল।
পাএ ধরি ভীমে মোরে রাখিতে নারিল॥
কি করিব মোকে ভীম অর্জুন দুর্জএ।
ত্রিভুবন মধ্যে মোর কাক নাহি ভএ॥

আহ্মাকে নিন্দসি সত্য অশক্তি নির্বলী।
আজি যুদ্ধে তোহ্মারে যমেরে দিমু ডালি॥
এথ শুনি হাসি বোলে সত্য নরপতি।
যুদ্ধে নাহি জিনিতে কি গর্জসি দুর্মতি॥
আপনাক বাখানসি করি অহঙ্কার।
নিকৃষ্টের চরিত্র তোহোর কুলাচার॥
সিংহ মারি অহঙ্কার উত্তমে না করে।
অধমে শূকর মারি সিংহনাদ ছাড়ে॥
কোকিলে না করে গর্ব চুতাঙ্কুর পাই।
ভেককুল গর্বএ কর্দম জল খাই॥
গর্ব যেই করে তার অবশ্য লাঘব।
অহঙ্কার করে লোক পাএ পরাভব॥
নম্রভাবে পুরুষের শাস্ত্রেত বাখানি।
নম্র হএ ডাল-বৃক্ষ ফল ধরে পুনি॥
নিষ্ফল সিমুল বৃক্ষ ছুঁইল আকাশ।
অহঙ্কার গর্ব কৈলে অবশ্য বিনাশ॥
নম্রভাবে শত্রু মনে কৃপা উপজএ।
অহঙ্কারে মিত্র সব শত্রুতুল্য হএ॥
উন্মত্ত মনুষ্য সম আপনা বাখানসি।
ভাল মন্দ ধর্মাধর্ম কিছু না জানসি॥
বচাবচে কার্য নাহি ধর ধনুর্বাণ।
যুদ্ধকালে বুঝিবা কে বিক্রমে প্রধান॥
এ বলিয়া সত্যকেতু ধনুত টঙ্করে।
মহাবীর কলীন্দ্রে যে সিংহনাদ ছাড়ে॥
সত্যকেতু বিবাদ বাঝিল মহারণ।
সরস পঞ্চালি ভণে মোহাম্মদ খান॥

॥ যুদ্ধারম্ভ ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

এই মতে দুই জন   বাঝিল বিষম রণ
অন্যে অন্যে ধনুর টঙ্কারে।
গুহা মধ্যে দুই পড়ি   দুই সিংহ জড়াজড়ি
অন্যে অন্যে সিংহনাদ ছাড়ে॥
সত্যকেতু এড়ে শর   ছাই পড়ে দিগন্তর
ঢাকি গেল রবির প্রকাশ।
কলি এড়ে দিব্যবাণ   যেন অগ্নি খান খান
জ্যোতির্ময় হইল আকাশ॥
সত্য এড়ে দশবাণ   কলি কৈল খান খান
পুনি কলি এড়ে দ্বাবিংশতি।
পঞ্চবাণ কাটি পাড়ে   সত্যকেতু ধনুর্ধরে
পুনি বাণে বিন্ধে শীঘ্রগতি।
কাটিয়া কলির ধনু   পুনি পুনি বিন্ধে তনু
আর ধনু কলি লৈল হাতে।
সুযোগ্য সারথি বিন্ধি   দিব্যবাণ এড়ে সান্ধি
সত্যধর্ম 'পরে বজ্রঘাত।
সহিয়া সে ঘাও পুনি   কোপে সত্য গুণ-মণি
সান্ধি এড়ে উগ্রশিখা বাণ।
শোনিতে মজিল তনু   খসিল হস্তের ধনু
রথেত পড়িল কম্পমান॥
চৈতন্য পাইল যবে   ধনু ধরি উঠে তবে
ক্ষুরবাণে কাটিল কোদণ্ড।
পুনি ধনু সান্ধি এড়ে   সূর্য ধৈর্য কাটি পাড়ে
কলি রাজা বিক্রমে প্রচণ্ড॥

কাঞ্চনে মণ্ডিত পুর   জ্যোতি উঠে ব্যোমপুর
পৃথিবীত খসিয়া পড়িল।
ধ্বজহীন হৈল রথ   অপমানে মৃত বৎ
সত্যকেতু লজ্জায় জরিল॥
কোপে এড়ে ভল্লুবাণ   কাটি পাড়ে শিরস্ত্রাণ
দিব্যবাণে বিন্ধিল সারথি।
কুবুদ্ধির বুদ্ধি নাশ   অশ্ব ধাএ চারিপাশ
মুহুশ্চিত সারথি দুর্মতি॥
রথ যাএ চারিপাশ   সত্যকেতু উপহাস
কলিএ পাইল অপমান।
সারথি চৈতন্য পাইল   পুনি বাহু বাঢ়াই আইল
কোপে সান্ধি এড়ে ভিন্দিবাণ॥
সত্যকেতু সৈন্য দহে   দেবগণ কম্পে ভএ
প্রজ্বলিত প্রচণ্ড হুতাশ।
চিন্তে সত্য ধনুর্ধর   সান্ধিল আবরি শর
মেঘচয় এড়িল আকাশ॥
আবর্ত সমর্থ দোন   প্রখর আদি মেঘসম
মুষল ধারাএ ক্ষেপে জল।
ঘন ঘন বজ্রঘাত   কলি সৈন্য হৈল পাত
নিবাইল দারুণ আনল॥
নিজ মনে আবকলি[১]   বাউ বাণ এড়িল কলি
মেঘচয় কৈল খান খান।
সত্যকেতু এড়ে গিরি   কলি ইন্দ্র অস্ত্র জড়ি
পর্বত কাটিল তুরমান॥

১ আবকলি—আকলি

কলি এড়ে তম শর অন্ধকার দিগন্তর
কার কেহ নাহি পরিচএ।
গর্জে তর্জে কলি বীর অস্ত্র ক্ষেপে অনিবার
সত্যকেতু সৈন্য মনে ভএ ॥
সত্যকেতু এড়ে শর অন্ধকার হৈল দূর
কলিএ এড়িল নাগ-বাণ।
ফণীগণে ফণা ধরি রহে সত্যকেতু বেঢ়ি
সত্যকেতু বিযে কম্পমান ॥
গুরু অস্ত্র সান্ধি এড়ে নাগ সৈন্য কাটি পাড়ে
কলিএ এড়িল উল্কা মুখ।
সর্ব গাএ বহে লহু সত্যকেতু পাইল মোহো
সুযোগ্য সারথি পাইল দুঃখ ॥
সারথি বোলএ কাজ উঠ সত্য মহারাজ
পাপিষ্ঠ কলিএ পাইল বল।
সারথির শুনি কথা মনে উপজিল ব্যথা
চৈতন্য পাইল মহাবল ॥
অপমানে কম্পে তনু ধরিয়া বিজয় ধনু
লঘু হস্তে বাণ সান্ধি এড়ে।
সান্ধিতে এড়িতে বাণ সত্যকেতু মহীয়ান
কলীন্দ্র না পারে লক্ষিবারে ॥
দশ বাণে বিন্ধে তনু ক্ষুরপ্রিয় কাটিল ধনু
ইন্দ্রবাণে কাটে চন্দ্র ধ্বজ।
নানা রত্ন বিভূষিত খসি পড়ে পৃথিবীত
যেন পড়ে দন্তহীন গজ ॥
কলি পাই অপমান ধরি আর ধনুর্বাণ
জুতি বাণ এড়ে শীঘ্র গতি।
সপ্ত সাল বাণ এড়ি কাটে খণ্ড খণ্ড করি
চিন্তিত কলীন্দ্র পাপমতি ॥

সূচিমুখ বাণ পুনি এড়ে কলি কোপ গুনি
সত্যের হাতের কাটে চাপ।
আর ধনু ধরি হাতে যুঝে সত্য নর নাথে
মহাসত্য প্রচণ্ড প্রতাপ ॥
বাছি এড়ে দিব্যবাণ কাটি পাড়ে শিরস্ত্রাণ
আর বাণে কাটি পাড়ে ধনু।
করি তিল পরমাণ কাটি পাড়ে তনুত্রাণ
উগ্রশিখা বাণে বিন্ধে তনু ॥
কলি হৈল অচেতন সত্য উল্লসিত মন
নারদে ভাবএ মন দুঃখ।
পরাভব মনে গুনি কলীন্দ্র উঠিল পুনি
কোপে অগ্নি বর্ণ হৈল মুখ ॥
সত্যকেতু সেইক্ষণ বিন্ধে শত লক্ষ বাণ
পুনিহ কাটিল শরাসন।
ভএ কলি মায়া কৈল সংগ্রামেত লুক দিল
অন্ধকার করিল সৃজন ॥
অলক্ষিতে এড়ে শর চিন্তে সত্য ধনুর্ধর
দশদিক চাহি নাহি দেখে।
ঊর্ধ্ববাহু ক্ষেপে শর দীপ্তি কৈল দিগন্তর
জ্যোতির্ময় অস্ত্র লাখে লাখে ॥
তবে কলি ধনুর্ধর সান্ধিল ভৈরব শর
মন্ত্রে তন্ত্রে হুঙ্কারি এড়িল।
অলক্ষিতে আসে বাণ সত্যকেতু নাহি জান
বজ্রতুল্য হৃদএ পড়িল ॥
সর্ব গাএ পড়ে লহু সত্যকেতু পাইল মোহ
ধ্বজ ধরি হৈল অচেতন।
কুবুদ্ধি সারথি তথি কলিক বোলএ নীতি
ঝাটে কর সত্যের নিধন ॥

শক্রবধে মহাকর্ম তাত না বিচার ধর্ম
যদি চাহ আপনা নিস্তার।
ছিদ্র পাই ক্ষেম যবে মন দুঃখ পাইবা তবে
নারিবা সত্যকে মারিবার॥
কুবুদ্ধির বুদ্ধি শুনি কলি ভাল বোলে পুনি
দুষ্টেত দুষ্টের কথা রহে।
যেহেন গোমএ কীট গোময়কে বলে মিঠ
ভ্রমর কুসুম গন্ধে মোহে॥
তবে কলি পাপাশয় ধর্মকে না করি ভয়
শেল পাট এড়ি বিন্ধে বুক।
ঘাএত লবন দিল সত্যবর মোহ পাইল
অনুশোচ করে দেব লোক॥
পুণ্যফলে রহে প্রাণ ঘাএ দেহ কম্পমান
মৃতবৎ রথের উপর।
সুযোগ্য সারথি বীর রথ বাঢ়াইয়া[1] নিল
তাত অস্তাম্বিত দিবাকর॥
প্রকাশিত মহীতল সত্যবন্ত দিবাকর
কাল গেলে সেহ পাএ শেষ।
গুরুপত্নী হরে শশী সংগ্রাম ভূমিত আসি
তম অস্ত্রে ঢাকি দিল দেশ॥

পুনি হানে সিত বাণ ঘাএ সূর্য কম্পমান
রক্তে লালবর্ণ হৈল তনু।
কলির বিজয় জানি অরুণে সারথি পুনি
রথে করি লই গেল ভানু॥
সত্য বিনে সতী দুঃখ তেহেন পদ্মিনী মুখ
সুর বিনু গুণে পরমাদ।
সুরগুরু মহীসুত বধে বীর অদ্ভুত
চান্দ বৈরী করে জয়বাদ॥
তারকমণ্ডল মাজ শোভা করে দ্বিজরাজ
চকোর শোভএ যার হাত।
উল্লসিত কুমুদিনী নেহালএ পুনি পুনি
দেখিয়া আপন প্রাণনাথ॥
দিন হৈল অবশেষ বিধুপত্নী পরবেশ
গর্জে কলি করি সিংহনাদ।
নৃত্য-গীত কুতুহল বাদ্য ভাণ্ড কোলাহল
সৈন্যেত উঠিল জয়বাদ॥
কহে মোহাম্মদ খান শুনি গুনিজনগণ
আনন্দে পূর্ণিত হৈল মন।
সত্যকলি আচরণে প্রসঙ্গের ছলে ভণে
কৌতুকে করিল বিরচন॥

---

১ বাহুরাই—বাহুবাঢ়াই

॥ সত্যকেতুর পরাজয় ॥

(ভ্রমক ছন্দ)

সত্যকেতু রণে সৈন্য সব দিল ভঙ্গ।
মৃগ যেন ধাএ পাই সিংহের আতঙ্ক ॥
নৃপতির ভঙ্গে সৈন্য ধাএ চারি পাশ।
কাণ্ডারী বিহনে নৌকা যাএ আন পাশ ॥
যুবরাজ ধর্মকেতু নারে রাখিবার।
সেনাপতি বীর্যশালী সম্ভাষে সভার ॥
সত্যবাদী নিঃশব্দ উজর[1] নাহি মুখে।
কবিচন্দ্র সুবুদ্ধি স্তম্ভিল মহাদুঃখে ॥
অপমানে সুদাতাএ কচলএ হাত।
মিত্রকণ্ঠ মারএ শিরেত বজ্রঘাত ॥
যার যেই শিবিরে গেলা দুই বল।
সত্যকেতু মুহুশ্চিত কলি কুতূহল ॥
ঘরে নিয়া সত্যকেতু করাইলা শয়ন।
পাত্রমিত্র বন্ধুগণ করন্ত ক্রন্দন ॥
কাঙ্কলি কহিল গিয়া সতীর গোচর।
হৃদএ পড়িল যেন লোহার মুদগর।
সুমেরু ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথাত।
কর্ণপন্থে লাগি গেল বজ্রের নির্ঘাত ॥
চর মুখে শুনিয়া সত্যের বিবরণ।
প্রভু প্রভু করে দেবী হৈল অচেতন ॥
চৈতন্য পাইয়া ধাএ আউদল কেশ।
সভা মধ্যে আইল দেবী উন্মত্ত বেশ ॥
চরণে পড়িয়া দেবী করএ বিলাপ।
মোহাম্মদ খানে কহে মধুর আলাপ ॥

॥ সত্যবতীর বিলাপ ॥

বিলাপএ সত্যবতী শোকাকুল দুঃখমতি
ঘন ঘন করে অঙ্গঘাত।
কুররী কুহরে যেন উচ্চস্বরে কান্দে তেন
সম্বোধিয়া নিজ প্রাণনাথ ॥
ধরিয়া প্রভুর পদ নিগদএ গদ গদ
নয়নে গলএ জলধার।
উঠ প্রভু ছাড়ি মোহ মোছলো অঙ্গের লহু
অভাগিনী করোঁ পরিহার ॥
তুহ্মি সত্য নরপতি আজিহ তোহ্মার কীর্তি
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ঘোষণ।
সিদ্ধাদের বিদ্যাধর যথ সাধু সত্য নর
তোহ্মাকে ভাবন্ত এক মন ॥
রিপু মর্ম খণ্ড খণ্ড শুনিয়া প্রচণ্ড দণ্ড
তোহ্মারে কোদণ্ড চন্দ্রধ্বজ।
স্বর্গ-মর্ত পাতালেত কেবা আছে হেনমত
না মানএ সত্য সুরধ্বজ ॥

১ উজর>ওজর—অভিযোগ, আপত্তি

সত্য যক্ষ পিতাশ' ভএ গেল বনবাস
তোহ্মার বিক্রম কথা শুনি।
ধৈর্যবন্ত বীর্যবন্ত বিক্রমের নাহি অন্ত
কৃতান্ত একান্ত কোপ গুনি ॥
না বুঝি কি দৈব হেতু তুহ্মি হেন সত্যকেতু
পাপিষ্ঠ কলিএ যাএ জিনি।
উঠ প্রভু লভ জ্ঞান এ দুঃখ না সহে প্রাণ
হীন জন পরাভব দুঃখ ॥
প্রেমানলে দহে দেহ কি দিয়া নিবাই কহ
দয়া হোন্তে উদ্ধারহ মোক ॥
এ বলিয়া ততক্ষণ হৈল দেবী অচেতন
মৃতবৎ ভূমিতলে গড়ে।
কোন সখী ধরে গাও কেহ হস্ত কেহ পাও
অস্তে ব্যস্তে সব সখী ধরে ॥
বোলে সখী শুদ্ধমতী উঠ দেবী সত্যবতী
হের তোকে সত্যকেতু ডাকে।
শুনি নিজ নাথ নাম শোকাকুলি গুণধাম
গেল প্রাণ আইল দৈবপাকে ॥
মুকুলিত কেশ ভার ছিণ্ডিল গলার হার
করঘাতে হৃদএ হৈল সুর।
সিন্দূর লুকিত হৈল কেশে মুখ আচ্ছাদিল
রাহু গ্রাসিলেক চন্দ্রসুর ॥
ধূলি ধূসরিত দেহা গুণি প্রাণ নাথ নেহা
উঠিল ধরণী চাপি হাত।
দেখি প্রভু মুহুশ্চিত বিলাপএ বিষাদিত
উষ্ণ স্বরে ডাকি প্রাণ নাথ ॥

সখীক সম্বোধি বোলে নয়ন ভরিয়া জলে
শুন সব মোর নিবেদন।
ফুটিল দারুন শেল হৃদয় ভেদিয়া গেল
প্রভু মোর তেজিল জীবন ॥
পুনি প্রাণ নাথ আসি মোক না বোলাইব হাসি
না শুনিমু মধুর বচন।
মুঞি বড় অভাগিনী পাপিনী দুঃখিনী ধনী
কেনে রহে এ পাপ জীবন ॥
সে মুখ ভুলিতে নারি মৃগাঙ্ক কলঙ্ক ছাড়ি
নয়ন চকোর তার পাশে।
ভুরুর ভঙ্গিমা করি মোর প্রাণ নিল হরি
জগমোহে যদি মৃদু হাসে ॥
এহেন প্রাণের পতি যদি হএ হেন গতি
যৌবনে জীবনে কোন ফল।
গলে দিয়া কাতিমান সখী মোর সত্য জান
প্রাণ দিমু ভক্ষিয়া গরল ॥
মোহোর প্রাণেশ্বর শ্যাম নব জলধর
বলে বীর্যে সম হৈল যোধ।
হরিচন্দ্র সম জ্ঞান রঘুর সদৃশ মান
গাণ্ডিবে অর্জুন সম যোধ ॥
ধর্মরাজা যুধিষ্ঠির পৃথিবীর সম স্থির
সব অস্ত্র শাস্ত্র অনুপাম।
সর্ব সিদ্ধি কল্প তরু জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু
সংগ্রামে বিজএ সম রাম ॥

যার সিংহনাদ শুনি ভুবন কম্পিত পুনি
শক্রু কুল মর্ম যাএ চিড়।
ধনুর টঙ্কার যার বজ্রের নির্ঘাত মার
মোর পতি রণে মহাবীর॥
হেন সত্য মহামতি জিনে কলি পাপমতি
অশক্ত নিধর্মী দুরাচার।
না বুঝি বিধির কাজ হেন জনে দিল লাজ
দৈবে বিধি তুলিল সংসার॥
কপটে সে পাই লাজ ভীত হৈল সর্বকাজ
কৃপণের কীর্তি ঘোষে লোকে।
হেন দৈব বিপরীত দুঃশীলার কৈল হিত
অভাগিনী সতী মরে শোকে॥
শৃগালে সিংহ মারে এ দুঃখে কি প্রাণ ধরে
দৈব কলে বিপর্যয় হৈল।
কোপে যুগান্তের কাল সত্যকেতু মহীপাল
পাপিষ্ঠ কলিএ পরাজিল॥
সুধা ফেলি বিষ নিল বিজয় বলি কল্লিল
বিপদেত বুদ্ধি পাইল নাশ।
সত্যবাদী আদি বীর কলি যুদ্ধে ভঙ্গ দিল
লোকেত করিল উপহাস॥
মিত্রকণ্ঠ হেন গুরু সাক্ষাৎ কল্পতরু
সেহ বিসর্জিল জ্ঞান জাপ।
বীর্যশালী ভঙ্গ দিল পরাক্রম না করিল
মিছারে সে করি বীর দাপ॥
কোন্ কাজে কবিচন্দ্র শিখিআছ মন্ত্র তন্ত্র
বিপদেত সে না হৈল মত।
সর্ব জন সঙ্গে ছিল কলি সত্য পরাজিল
দৈবে বিধি দুঃখ দিল তাত॥

পুত্র মোর ধর্মকেতু জন্মিলেক কোন্ হেতু
না আইল আপনা বাপ কর্মে।
তাহা বা কি করি রোষ মোর বা করম দোষ
তেকারণে বিড়ম্বিল ধর্মে॥
সহস্র পুরুষ মন সন্তোষএ যে কারণ
অসতী দুঃশীলা ভাগ্যবতী।
সেই পুণ্য ফলে কলি সংগ্রামেত হৈল বলী
জিনিল মোহর প্রাণপতি॥
মুঞিঃ পাপী সত্যবতী এক ধ্যান এক মতি
স্বপনেহ দুই নহি জানি।
বিরহ সন্তাপ দুঃখ সকোপে শাপিল মোক
তেকাজে সত্যের হৈল হানি॥
এ বলিয়া তৎক্ষণ পুনি হৈল অচেতন
পুনি উঠি করএ বিলাপ।
শিষের সিন্দূর মোর কেনে বিধি করে দূর
কেনে পাপ হেতু এত তাপ॥
মুঞি বড় ভাগ্যবতী সত্যকেতু বীর পতি
যশ কীর্তি রৈল দুই কুলে।
আহ্মি কুলকেতু সুতা সত্যকেতু বিবাহিতা
সাফল্য জন্মিলুঁ মহীতলে॥
এবে বিধি হৈল বাম ছাড়ি যাএ গুণ ধাম
সর্ব দিন না যাএ ভাল।
কাল হৈল বিপরীত সতীর যে মূর্তি হিত
প্রাণ দিমু ঘুচাউ জঞ্জাল॥
শুন সব বন্ধুগণ জ্বাল আনি হুতাশন
প্রভু সঁপি প্রচণ্ড আনলে।
প্রভু আগে প্রাণ দিমু তান মৃত্যু না দেখিমু
কীর্তি রাখি যাইমু জগতলে॥
এ বলিয়া সত্যবতী দহিবারে করে মতি
নিষেধ করন্ত পুরোহিত।
বিলাপিয়া বন্ধুগণ নিবারন্ত শোক মন
সখী শুদ্ধমতী বোলে হিত॥

॥ যোগী-সত্যবতী সংবাদ ॥

[প্রথম পর্যায়]

(ঝুমক ছন্দ)

সবে মিলি নিবারি রাখিল সত্যবতী।
নৃপতিক অকুশল করহ যে সতী ॥
এথ শুনি সত্যবতী নিঃশব্দে রহিল।
বৈদ্য আনিবারে পাত্র সুবুদ্ধি চলিল ॥
তপোবনে আছিলেক যোগী ধন্বন্তরী।
মহা বৈদ্য সর্বসিদ্ধি মনি দেশান্তরী ॥
তথা গিয়া পাত্র মনি বোলে করজোড়।
অবধান কর প্রভু নিবেদন মোর ॥
কলিএ হানিল শেল বজ্রের দোসর।
দৈবে জিয়এ প্রভু সত্য নরবর ॥
সত্য বিনে সংসারে গ্রাসিয়া যাইব পাপ।
সত্যবন্ত সাধুজন মরিবেক তাপ ॥
তোহ্মারে নিবারে আহ্মি আইলুঁ তেকারণ।
সত্যধর্ম রক্ষা হেতু কর আগমন ॥
সত্য হানি শুনি বৈদ্য চলিল তুরিত।
তথা গিয়া দেখে সত্য আছে মুহুশ্চিত ॥
যোগী পুস্তকেত চাহি ঔষধের বড়ি।
ত্রিপিনি তিহরি,[*] মধ্যে যোগী ধন্বন্তরী ॥
গুরুভক্তি করি শিব-শক্তি এক লৈল।
উর্ধ্বাননে বাউ ভক্ষি তাত ফুক দিল ॥
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলিল প্রসন্ন দিগন্তর।
ধ্যান বলে জ্ঞান অগ্নি জ্বলিল সত্বর ॥
যেন জুতি প্রকাশিত তম পাইল ক্ষএ।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে উঠিল জএ জএ ॥

জ্ঞান-বড়ি নিয়া যোগী দিল সত্যমুখে।
পুষ্প-বৃষ্টি আকাশে করন্ত দেবলোকে ॥
জ্ঞান-বড়ি খাই সত্য সংজ্ঞা হৈল তনু।
যুদ্ধ স্মরি উঠিয়া ধরিতে চাহে ধনু ॥
কৈ গেলা কৈ গেলা কলি ডাকে উচ্চস্বর।
সকল কহিল মিত্রকণ্ঠ বিপ্রবর ॥
গুরু মুখে শুনি সত্য বাড়িলেক লাজ।
অপমানে নম্রশির হৈল সত্যরাজ ॥
জয় জয় করি উঠে সত্যকেতু বল।
বিবিধ বাদিত্র বাজে শুনি কুতূহল ॥
দেবগণে পুষ্প-বৃষ্টি করে আনন্দিত।
বিদ্যাধর নাচাএ গন্ধর্বে গাহে গীত ॥
পতির বিষাদ দেখি দেবী সত্যবতী।
যোগী ধন্বন্তরী স্থানে জিজ্ঞাসন্ত সতী ॥
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন।
ধর্মবন্ত সত্যরাজা জানে ত্রিভুবন ॥
অধম পাপিষ্ঠ কলি কেনে পাইল জএ।
সত্য করি কহ মোত আএ মহাশএ ॥
হাসিয়া বোলন্ত শুন যোগী তত্ত্ব সার।
চারি যুগ সংসারে সৃজিল করতার ॥
সত্য আর ত্রিতিয়া (ত্রেতা) দ্বাপর কলি যুগ।
যার যেই সমএ সেই করে রাজ্য সুখ ॥
তিন যুগ গঞ্জি গেল কলি পাইল দেশ।
পাপে গ্রাসিলেক লোক ধর্ম হৈল শেষ ॥

[*] যোগ শাস্ত্রীয় শব্দ—ত্রিবেণী-ত্রিপ্রহরী

একের সময়ে আর লঙ্ঘিতে না পারে।
তেকারণে কলি জিনে সত্যকেতু হারে ॥
হেমন্তকালেত যেন না শোভে নিদাঘ।
ফাগুনে হেমন্ত হৈলে ঠেকএ বিপাক ॥
তেনমতে কলি যুদ্ধে সত্য পরাজএ।
তথাপিহ মহাসত্য সত্য না ছাড়এ ॥
সত্যকে জিনিতে শক্তি কভো নহে কলি।
কপটে জিনিল যুদ্ধ সত্যবন্ত ছলি ॥
সব পক্ষী মারে জান শিকারী বহরী।
রাত্রিকালে তাহাকে উল্লুকে মারে ধরি ॥
কিন্তু মাত্র কলির সম্পদ দুই দিন।
পরিণামে সত্য জএ কলি হৈব হীন ॥
অবিলম্বে দেখিবেক তোর পতি জএ।
সবংশে পাপিষ্ঠ কলি পাইবেক ক্ষএ ॥
দোচারণী দুঃশীলা নরকে পাইবে দুঃখ।
পতি সঙ্গে সত্যবতী স্বর্গে পাইব সুখ ॥
পুনি বোলে সত্যবতী শুন তপোধন।
কিসেরে কলিরে বিধি করিল সৃজন ॥
যদি কলি না থাকিত সংসার ভিতর।
সত্যবন্ত ধর্মবন্ত হৈত সব নর ॥
পুনি বোলে শুন দেবী কহি তত্ত্ব সার।
সৃজিল নরক স্বর্গ প্রভু নৈরাকার ॥
আজ্ঞা কৈলা দোঁহস্থানে রাখিবারে নর।
সাধুজন স্বর্গে পাপী নরক ভিতর ॥
যদি কলি না হইত পাপ না জন্মিত।
নরক রহিত শূন্য সব স্বর্গে যাইত ॥
আপনার প্রতিজ্ঞা না লঙ্ঘে নৈরাকার।
তেকারণে সৃজিলেক কলি দুরাচার ॥

কোনে বা বুঝিতে পারে প্রভুর চরিত।
যেই কিছু পারি মাত্র কহিলুঁ কিঞ্চিত ॥
সত্যবতী বোলে মৃত্যু কহ তপোধন।
সাধু সে নির্ধনী কেনে দুর্জনেত ধন ॥
মুনি বোলে সবাকে সৃজিল নিরঞ্জন।
পুণ্য ফলে স্বর্গপুরে নিব সাধুজন ॥
পাপ হোন্তে পাতকী নরকে পাইবে দুঃখ।
তেকারণে সংসারে কিঞ্চিৎ ভুঞ্জে সুখ ॥
সর্বস্থানে কাহারে নৈরাশ নাহি করে।
সেবক বৎসল প্রভু কৃপার সাগরে ॥
আর এক কথা প্রতি কহি শুন পুনি।
আপনার দোষে লোক হয় নির্ধনী ॥
পরদার করে যেবা মিছা কথা কহে।
শৃঙ্গার ভুঞ্জিয়া যেবা স্নান না করএ ॥
বাপ মাও গুরুক অসন্তোষ করে।
অবজ্ঞাএ নাম ধরে ডাকে উর্ধ্বস্বরে ॥
বাপের ভগিনী কিবা মাএর ভগিনী।
যথ গুরুজনকে যে দুঃখ দেএ পুনি ॥
আপনার সন্ততিরে নিত্য গালি পাড়ে।
অভ্যাগত আইলে যেবা মন দুঃখ করে ॥
মিথ্যা দিব্য ধরে যেবা না করিয়া ভএ।
প্রভাতে সন্ধ্যাএ যেবা নিদ্রা সে যাএ ॥
স্বামী হোন্তে চুরি করি যে ধন সঞ্চএ।
সেই নারী থাকিলে সে নির্ধনী হএ ॥
পুত্র বোল না ধরএ পড়শী দুর্জন।
আপনে আলস্য লোভ করে সর্বক্ষণ ॥
ভৃত্যগণ বিমতি মনেত নাহি প্রীতি।
এ সকল চরিত্রে নির্ধনী হএ অতি ॥

ভাণ্ডেত কুণ্ডেত যেবা জল করে পান।
তপ্ত অন্নে ফুকে যেবা না করিয়া জ্ঞান ॥
পাদুকার তল যেবা চাহে নিরন্তর।
মর্কটিক থাকে যেন ঘরের ভিতর ॥
পিন্দন বসনে হস্তমুখ যে পোছএ।
পড়িয়া থাকএ অন্ন যেবা না তোলএ ॥
দ্বারের সাঙ্গিছেত যেবা বৈসে না গুণিয়া।
না পাখালি পাত্র অন্ন খাএ না জানিয়া ॥
না পাখালি পাত্র রাখে ঘরের ভিতর।
যে শুকায় বসন নিজের গাএর উপর ॥
যথা মুখ ধোএ তথা পশ্রাব করে।
ভূমিত ঘসিয়া হস্ত পাখালে যে নরে ॥
ভিক্ষুকের তণ্ডুল কিনিয়া যেবা খাএ।
ফুক দিয়া প্রদীপ যে জনে নিবাএ ॥
সুকাটি কাটিলে তার গণ্ডি যেন পড়ে।
চরণের তলে তাক করে যেই নরে ॥
কাটারি এড়ি দন্ত যেবা নক কাটে নিতি।
থিয়াই আঁচড়ে চুল যেবা ক্ষুদ্র মতি ॥
ভাঙ্গা ফণী দিয়া যেবা কেশ আচরএ।
এথেক প্রকারে জান নির্ধর্মী হএ ॥
সত্যবতী বোলে নির্ধর্মীর নাই সুখ।
যদি সে ধর্মিকে পাছে পাইব সুরলোক ॥
কিন্তু এক দুঃখ মোর না সহে জীবন।
ধর্মিকে করএ অধর্মিকের সেবন ॥
যোগী বোলে শুন দেবী কহি ইতিহাস।
কলি শেষে হইব জান প্রলয় প্রকাশ ॥

প্রলয়ের আগে হৈব কাল বিপরীত।
পণ্ডিত হৈব মূর্খ মূর্খ সে পণ্ডিত ॥
হীন অকুলীন হৈব রাজ্যের ঈশ্বর।
কুলীন উত্তম হৈব জানহ কিঙ্কর ॥
যার পিতামহ জান বাস নাহি করে।
করিব উত্তম গৃহে সে সকল নরে ॥
কুলীনে পাইবে তার আঙ্গিনাত ঠাঁই।
সাধুজনে দুর্জ্জনক সেবিবেক যাই ॥
লম্পট আছিল যেবা রাখিব গোধন।
পিন্ধিব বিবিধ বস্ত্র নানা আভরণ ॥
লোক মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৈব ধনবন্ত ভোগী ॥
রাজা হৈব ধনহীন কাঙাল হীন যোগী ॥
তপস্বীর ক্ষেমা যাইব উত্তমের বুদ্ধি।
শাস্ত্র জানি কেহ না করিব ধর্ম সুদ্ধি ॥
শাস্ত্র শিখিবেক লোকে অর্জিবারে ধন।
সে হইবে পণ্ডিত যার উত্তম বসন ॥
বৃদ্ধ হৈব নির্লজ্জ বালকে না মানিব।
গুরুজন বলি কেহ মান্য না করিব ॥
সাধু সব কপটে হরিব, পর বিত্তি।
ধনদান না করিব, না অর্জিব কীর্তি ॥
লজ্জাহীন হৈব সংসারের নারীগণ।
দাসীর উদরে হৈব ঈশ্বর নন্দন ॥
বিবাহিতা নারী-প্রেম পুরুষে এড়িয়া।
দাসীত হৈব মগ্ন মর্যাদা ছাড়িয়া ॥
এক পুরুষেরে বহু নারীএ মাগিব।
মোকে পরিণয় কর তাহাকে বলিব।

লভ্যধন[১] খাইব করিব সুরাপান।
পরপ্রাণ বধিবেক না থাকিব জ্ঞান॥
মিথ্যা দোষ ধরি দ্বন্দ্ব হৈব পরস্পর।
সত্যবাদী মিথ্যা হৈব সভার ভিতর॥
সত্যবাদী হৈব যে কহে মিথ্যা কথা॥
ইষ্ট বান্ধবের কেহ না থাকিব ব্যথা॥
পণ্ডিত দেখিয়া লোক হইব অন্তর।
শাস্ত্র কথা না শুনিব পাপের অন্তর॥
পণ্ডিতেহ সভাকে না দিব উপদেশ।
আপনে অধর্ম কর্ম করিবা বিশেষ॥
বড় ঘর বড় বাড়ি করিব সকলে।
না স্মরিব মৃত্যু হৈলে যাইব মহীতলে॥
অধর্মিক হৈব লোক পাপে মগ্ন হৈয়া।
প্রভু স্থানে অপরাধ না লৈব মাগিয়া॥
সংসারের মায়া মোহে মুগ্ধ হৈব লোক।
না চিন্তিব কেমনে পাইব পরলোক॥
আয়ু গর্বে না চিন্তিব নিয়ড়ে শমন।
মায়া মোহে কেহ না ভাবিব নিরঞ্জন॥
রাজা হৈব সিংহ ব্যাঘ্র হৈব পাত্রগণ।
শৃগাল সদৃশ হৈব পাপিষ্ঠ দুর্জন॥
অজার সদৃশ হৈব সত্যবস্ত লোক।
সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল দেখিয়া পাইব শোক॥
কলিকালে হইবেক এথ বিবরণ।
দুগ্ধ হীন হৈব গাভী, বৃক্ষ ফল হীন॥
শস্য না ফলিব ফলে না থাকিব স্বাদ।
নিদাঘে বরিষা হৈব বড় পরমাদ॥
বিনি রোগ মরিবেক সংসারের লোক।
দুর্ভিক্ষ দুর্দিন হৈব বাঢ়িবেক শোক॥
তবে এক দীর্ঘ রাত্রি হইব তখন।
জাগিয়া জাগিয়া লোকে করিব শয়ন॥
সে রাত্রি থাকিব বন্দী সূর শশোদর।
প্রভাত হৈলে হৈব বড় অপান্তর॥
পশ্চিমেত চন্দ্র সূর্য একত্রে উঠিব।
মধ্যাহ্ন সমএ আসি পুনি নেওটিব॥
তবে ধূম্র উপর্জিব দশদিক ভরি।
দুর্জনক দুঃখ দিব সাধুজন ছাড়ি॥
বৎসর হৈব তবে মাসের সমান।
মাস হইবেক সপ্ত দিনের প্রমাণ॥
সপ্তদিন হৈব তবে একদিন সম।
দণ্ডেক হইব তবে দিনের নিয়ম॥
যথেক লক্ষণ হৈব কহিবেক কোনে।
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ মাত্র ভাবি নিজ মনে॥
তবে ভূমিকম্প হৈব বড় খরতর।
দিনে দিনে বাঢ়িবেক পবন প্রখর॥
পৃথিবী হইব চিড় পর্বত ভাঙ্গিব।
চন্দ্র সূর্য তারা আদি খসিয়া পড়িব।
সব সৃষ্টি নাশ হৈব হৈব জলময়।
এই মতে সত্যবতী হইব প্রলয়॥
সত্যবতী বোলে তবে এহেন লক্ষণ।
কোন্ কর্ম করিয়া থাকিব সাধুজন॥
যোগী বোলে ভাবিব নৈরূপ নৈরাকার।
সত্যধর্ম স্মরিয়া রাখিব কুলাচার॥

১। সুদ।

সংসারের সুখ ভোগ না বাঞ্ছিব মনে।
তপস্যা করিব গিয়া পুণ্য তপোবনে॥
সত্যবতী বোলে যদি তপস্যা করিব।
প্রভু স্থানে কহ গুরু কি বাঞ্ছিত মাগিব॥
মুনি বোলে মাগিবেক সর্বত্রে কল্যাণ।
সত্য ধর্ম জাতি রক্ষা মাগিব নিদান॥
দেবী বোলে কোন্ কর্মে গোঁয়াইব কাল।
মুনি-শাস্ত্র শিক্ষা হোন্তে নাহি কোন ভাল॥
দেবী বোলে শাস্ত্র হোন্তে কোন্ ফল ধরে।
মুনি বোলে নিকৃষ্টেরে মান্যোত্তম করে॥
নির্ধনীর ধন হএ দুই কুল রহে।
যদ্যপি না করে ভাল মন্দ না করএ॥
দেবী বোলে কবি বোলে সংসার নিন্দএ।
মুনি বোলে সব যথা কার্য না আইসএ॥
দেবী বোলে যোগপন্থ কোন্ কর্মে পাই।
কহ মোত তপোধন মনে পরিভাই[১]॥
মুনি বোলে পঞ্চ বৈরী যে পারে জিনিতে।
মায়া মোহ লোভ কাম কোপ নিবারিতে॥
দেবী বোলে কোন্ কর্মে জিনিবেক বৈরী।
মুনি বোলে অল্প ভোগী হৈব দেশান্তরী॥
দেবী বোলে অল্প ভক্ষি কেমতে রহিব।
মুনি বোলে অল্পে অল্পে অভ্যাস করিব॥

দেবী বোলে কহ মোত পুরুষ উত্তম।
কি হোন্তে সংসারে লোক হএ মান্যোত্তম॥
মুনি বোলে সব জান ধর্ম হোন্তে হএ।
সত্য ধর্মবন্ত হৈলে সকলে মানএ॥
ধন হোন্তে মান্যতম হএন্ত দুর্জন।
সভা মধ্যে মহাজন যার থাকে ধন॥
দেবী বোলে কি কর্মে সন্তোষ করতার।
মুনি বোলে বাপ মাও প্রীতি থাকে যার॥
দেবী বোলে কার সঙ্গে যুক্তি মীমাংসিব।
মুনি বোলে বুদ্ধিমন্ত সঙ্গতি করিব॥
দেবী বোলে বুদ্ধিমন্ত বলি কোন্ গুণে।
মুনি বোলে যেবা অল্প কহে বহু শুনে॥
দেবী বোলে যুক্তি কা'ত[২] রাখিব লুকাই।
মুনি বোলে না কহিঅ চারি জন ঠাঁই॥
দুষ্ট নারী, বালক, কিঙ্কর, শত্রু স্থান।
যুক্তি না কহিব ভাঙ্গি যদি থাকে জ্ঞান॥
যেহেন কিম্মিক রাজা গোপ্তের কা'ন।
পাত্র স্থানে কহি হৈল আপনে নিধন॥
পাত্রহ কহিয়া যুক্তি নিজ নারী স্থান।
গোপ্ত ব্যক্ত করি মূর্খ তেজিল পরাণ॥
সত্যবতী বোলে কহ কোন্ কথা শুনি।
যোগী বোলে শুন কথা পূর্বের কাহিনী॥

১ পরিভাই—প্রতিভাত করিয়া? ২ কা'ত—কাহা'ত

॥ কিম্মিক রাজার পরিণাম ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

কিম্মিকের রাজনারী যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী
উর্বশী শাহের চন্দ্রমুখী ।
মধুবাণী মৃদু হাসি ভুবন মোহন বাঁশী
চঞ্চল খঞ্জন দুই আঁখি ॥
কটাক্ষ মদন বাণে ভুরু ধনু যদি হানে
শিব উন্মত্ত হইব মানি ।
হেমকুম্ভ পয়োধর ঘন পীন মনোহর
দেখিলে ধৈর্যতা ছাড়ে মুনি ॥
হেন হৈল দৈব গতি কোতোয়াল পাপমতি
উর্বশীত মগ্ন হৈল চিত ।
মালিনী ইস্তকে বাণী নিবেদএ পুনি পুনি
প্রাণ দিতে চাহন্ত নিশ্চিত ॥
পাপিষ্ঠ নারীর চিত তেজিয়া স্বামীর ভীত
ভজিলেক কিঙ্করের স্থান ।
অধম বর্বর মূঢ়ে নরীক প্রত্যয় করে
নারী প্রতি রহ সাবধান ॥
পাপিষ্ঠ দুর্জন নারী সিংহের শরণ ছাড়ি
পড়িলেক শৃগালের পাএ ।
কোতোয়ালের সুক্ষণ সফল জীবন ধন
হস্তে চন্দ্র পাইলেক প্রাএ ॥
নির্জনেত দুই জন ক্রীড়া করে অনুক্ষণ
একদা নৃপ পাইল ইঙ্গিত ।
নিভৃতে নৃপতি আগে সকল কহিল তাকে
শুনি রাজা কোপে প্রজ্বলিত ॥

নির্জনেত পাত্র আনি কহিলেক নৃপমণি
পাত্রে বোলে স্থির কর মন ।
ব্যক্ত করি কৈলে কাজ পাইবে অযশ লাজ
অকীর্তি ঘুষিব জগজন ॥
গঞ্জিলে প্রহর রাত্রি আসিব শীঘ্রহ গতি
দুইজন বধিবা নির্জনে ।
এথ কহি পাত্র বর চলিলা আপন ঘর
নৃপতি রহিল কোপ মনে ॥
মন দুঃখে পাত্র বর সচিন্তিতে গেল ঘর
তা দেখিয়া পুছে তার নারী ।
কি বলিল রাজন কেনে বিষাদিত মন
কহ প্রভু মোত সত্য করি ॥
নারীক প্রত্যয় মানি সব কহে পাত্রমণি
উর্বশীর যথ বিবরণ ।
শুনি তার দুষ্টমতি পাত্রের ঘরণী সতী
উর্বশীক ভস্মে কোপমন ॥
ভোজন করিয়া তবে পাত্র মিত্র আইল যবে
হেনকালে আইল এক নারী ।
সেই নারী নিরন্তরে যাই তার অন্তপুরে
সেবএ উর্বশী দুরাচার ॥

সেইদিনে দৈবগতি উর্বশীএ কোপমতি
বিস্তর দিয়াছে অপমান।
কান্দি কহে যথ সব এ। পাইল পরাভব
পাত্র ঘরে গেল বিদ্যমান ॥
পাত্রের ঘরণী শুনি সান্ত্বাইয়া বোলে পুনি
মনোত্বঃখ না ভাবিঅ আর।
নিজ দুষ্টমতি কাজ উর্বশীএ পাইল লাজ
প্রভাতে পাইবা বার্তা তার ॥
এথ শুনি সেই নারী পুছে বহুযত্ন করি
পাত্র নারী কহিল সকল।
শুনিয়া আনন্দ মতি সেইক্ষণে শীঘ্রগতি
অন্তপুরে গেল কুতুহল ॥
আপনা সখীর স্থান কহে সব বিবরণ
কুতুহলে হাসে দুইজন।
উর্বশীর এক সখী শুনএ নিভৃতে থাকি
আদি অন্ত যথ বিবরণ ॥
এ। শুনি ধাই গেল হৃদএ হানিয়া শেল
উর্বশীর মাথে বজ্রঘাত।
জীবন নৈরাশ হৈল কুবুদ্ধি মন্ত্রণা কৈল
পাপে পাপ জন্মি অকস্মাৎ ॥
নৃপতিএ করে পান সেই জলে তুরমান
বিষ দিয়া দিল নিজ হাতে।
ঘরে আসি নরপতি সেই জল দৈবগতি
না জানিয়া খাইল নরনাথে ॥
ঘুমাইয়া পড়িলা শুতি প্রাণ দিলা নরপতি
কৃষ্ণবর্ণ হইল শরীর।
কান্দে সব পরিজন আইল পাত্রমিত্র গণ
রাজপুত্র যুবরাজ বীর ॥
প্রথম মহিষী সুত অস্ত্র শস্ত্রে অদ্ভুত
বিচার করএ কোপমন।
পাপ কথা গুপ্ত নহে অবশ্য প্রচার হএ
ব্যক্ত হইল গুপ্ত বিবরণ ॥
বন্দি কোতোয়াল পাপ স্মরিয়া বাপের তাপ
উর্বশীর বিদারি হৃদএ।
নিজ দোষ মনে গুণি বিষ খাএ পাত্রমণি
বিষাদএ নৃপতি তনয় ॥
বিস্তারিয়া দেচ্ছা কৈল পাত্র ভাল নাহি হৈল
নৃপহেতু তেজিল জীবন।
এথ শুনি পাত্র নারী সেই বিষ পান করি
প্রাণ দিল কীর্তির কারণ ॥
গোপ্ত কহি পাত্র স্থান নৃপতি হারাইল প্রাণ
পাত্রহ মরিল নারী পাকে।
কহি ভিন্ন জন স্থান পাত্র নারী দিল প্রাণ
গোপ্ত কথা না কহিব কাকে ॥
সিদ্দিক বংশেত জন্ম যেন মূর্তিমন্ত ধর্ম
মাহি আছোয়ার জান নাম।
তাহান বংশের সুত রচিলেক অদ্ভুত
পঞ্চালিকা রস অনুপাম ॥

॥ যোগী-সত্যবতী সংবাদ ॥

[দ্বিতীয় পর্যায়]

(খর্ব ছন্দ)

সহরিষ সত্যবতী শুনিয়া কাহিনী।
পুনিহ পুছএ সতী নিজমনে গুণি ॥
দেবী বোলে সংসারেত ভাগ্যবন্ত কোন্।
মুনি বোলে ভাগ্যবন্ত দাতা যেই জন ॥
দেবী বোলে দাতা কোন্ কহ গুণবান।
মুনি বোলে হাস্য মুখে যেবা করে দান ॥
কান্দিয়া যেজনে জলধারা বরিষএ।
হাস্য মুখে দাতাএ যাচক সন্তোষএ ॥
দেবী বোলে থাকিবেক কেমন সভাএ।
মুনি বোলে পণ্ডিতের সভাত জুয়াএ ॥
দেবী বোলে পণ্ডিত বলিএ বোল কা'ক।
মুনি বোলে পণ্ডিত যে চিনে আত্মাক[১] ॥
সত্যবতী বোলে কেবা আত্মা চিনএ।
কহ গুরু কোন্ মতে পাইব পরিচএ ॥
মুনি বোলে যে জনে করে পর উপকার।
আত্মপ্রাণ পরপ্রাণ সমতুল যার।
যে জনে আত্মা চিনে সত্যবতী জান।
দুঃখ সুখ সমতুল যার হএ জ্ঞান ॥
দেবী বোলে মনুষ্য চিনিব কোন্ মতে।
মুনি বোলে কার্য যদি পড়ে তার হাতে ॥
কার্য কালে চিনে শত্রু মিত্র কোন্ জন।
সম্পদে চিনিতে পারি সুজন দুর্জন ॥
দেবী বোলে দুষ্ট মিত্র সমস্যা কেমত।
মুনি বোলে ষটাঙ্গুলি হস্তেত যেমত ॥
কাটিয়া ফেলিলে গাএ না লাগে বেদনা।
রাখিলে সংসার মাঝে অযশ ঘোষণা ॥
দেবী বোলে দুষ্ট নারী সমস্যা কি বলি।
মুনি বোলে বিষ যেন হস্তে খাএ তুলি ॥
দেবী বোলে দুষ্ট ভৃত্য সমস্যা কি কহি।
মুনি বোলে ঘরে যেন সর্প থাকে রহি ॥
দেবী বোলে দুষ্ট মিত্র সমস্যা কি বোলে।
মুনি বোলে অক্ষি যেন নৈতে চাহে খুলে ॥
সত্যবতী বোলে দুষ্ট হৈলে স্বামী জন।
তবে কি তুলনা কহ গুরু তপোধন ॥
বোলে দুষ্ট স্বামী অশ্বত্থের বৃক্ষ প্রাএ।
ছায়ামাত্র থাকে ফল খাইতে না পাএ ॥
দেবী বোলে নারীর অধিক গুরু কোন্।
মুনি বোলে স্বামী হোন্তে নাহি গুরুজন ॥
দেবী বোলে স্বামী কোন্ কর্মে দয়া করে।
মুনি বোলে সতী পতিব্রতাক আদরে ॥
দেবী বোলে কোন্ কর্মে স্বামীর বিমতি।
মুনি বোলে স্বামী কোপে দ্বন্দ্ব করে নিতি ॥
দেবী বোলে লোক মধ্যে অন্যে অন্যে প্রীতি।
কি কর্ম করিলে প্রেম বাঢ়ে মহামতি ॥
মুনি বোলে দোষ দেখি যেজন ঢাকএ।
সেই দুই জনের মাঝে মিত্রতা বাঢ়এ ॥
দেবী বোলে কোন্ কর্মে অপ্রীতি বাঢ়এ।
মুনি বোলে ধার হোন্তে মিত্রতা ভাঙ্গএ ॥

---

[১] আত্মাক

দেবী বোলে কোন্ কর্মে সব মিত্র হএ।
মুনি বোলে যেই জনে মিছা না কহএ॥
দেবী বোলে সত্যবাদী কোন্ জন হএ।
মুনি বোলে শুদ্ধ অন্ন যে জনে ভক্ষএ॥
দেবী বোলে শুদ্ধ অন্ন কেমতে চিনিব।
মুনি বোলে আপনে অর্জিয়া ধন খাইব॥
দেবী বোলে কি কর্মে অর্জিলে পুণ্য পাএ।
মুনি বোলে ক্ষেতি চাষ করিব সদাএ॥
দেবী বোলে পাপ হএ কি কর্মে অর্জিলে।
মুনি বোলে পাপ হএ মদ্য বেচি খাইলে॥
দেবী বোলে কহ গুরু কাপুরুষ কোন্।
মুনি বোলে আলস্য করএ যেই জন॥
সত্যবতী বোলে অমনুষ্য কোন্ হএ।
মুনি বোলে লোভী হই বহুল ভক্ষএ॥
দেবী বোলে অভ্যাগত কেমতে পূজিব।
মুনি বোলে শুনিলে যে বাঢ়িয়া আনিব॥
নানা ভোগ ভুঞ্জাইব করি পরিহার।
বাঢ়াই দিবেক সে যাইতে আরবার॥
অভ্যাগত যাচক পণ্ডিত গুণিগণ।
যার দ্বারে আসে পাত্র করে যেইজন॥
এই সকল যার দ্বারে সেই ভাগ্যবন্ত।
তাক মনে দুঃখ দিলে লক্ষ্মীএ ছাড়ন্ত॥
দেবী বোলে সত্যকথা কোথা মিথ্যা হএ।
কহ মো'ত ধন্বন্তরী গুরু মহাশএ॥
মুনি বোলে বৃদ্ধ কালে যৌবনের কথা।
দুঃখেত সম্পদ কথা নাহিক সর্বথা॥
মিথ্যা কথা কহিলেহ্ মিথ্যা বোলে লোক।
সত্যকথা কহিতে মনেত বাড়ে দুঃখ॥

দেবী বোলে বৃদ্ধ কে যুবক কোন্ জন।
কহ মো'ত ব্রহ্মচারী গুরু তপোধন॥
মুনি বোলে বৃদ্ধ সেই রোগ যার নিতি।
নিরুগী যুবক দেবী জান সত্যবতী॥
দেবী বোলে সর্ব রোগে ঔষধ আছএ।
পাপ রোগে কি ঔষধ বোল মহাশএ॥
মুনি বোলে পাপ কভু জানি না করিব।
অজ্ঞানে করিলে পুনি সভাত কাঁদিব॥
প্রভু স্থানে অপরাধ মাগিয়া লইব।
পাপের ঔষধ এই সুজনে জানিব॥
দেবী বোলে কোন্ পাকে স্বর্গে বাস হএ।
কহ গুরু কোন পাকে পুণ্য সে যায়এ॥
মুনি বোলে যেই পাপ কৈলে ভাবে দুঃখ।
অপরাধ মাগি লএ প্রভুর সমুখ॥
হেন পাক করি যাএ লোক স্বর্গ পুর।
যেই গর্ব করি পুণ্য করএ প্রচুর॥
লোক দেখাইতে দান ধর্ম যে করএ।
সেই পুণ্য হোন্তে পুনি নরকেত যাএ॥
দেবী বোলে মন্ত্র মধ্যে কোন্ মন্ত্র সার।
কহ গুরু তপস্বী করে'। পরিহার॥
মুনি বোলে প্রভু নাম যেই ভাবে নিতি।
সেই যে পরম মন্ত্র দেবী সত্যবতী॥
দেবী বোলে কোন্ কর্মে ঘুচে মন ধন্ধ।
জন্ম মৃত্যু সম হএ কিবা ভাল মন্দ॥
মুনি বোলে প্রভু ভাবে হৈব বিরহিণী।
আত্ম বিস্মরিয়া তাত মগ্ন হৈব পুনি॥
সত্যবতী বোলে বিরহিণী বলি কা'ক।
কহ গুরু কেমতে পাসরি আপনাক॥

মুনি বোলে যদিসে আছে পাছে পাছে।?
আপনাক পাসরিতে কি সহায় আছে॥
জলেত উঠিলে বিন্দু অবশ্য মজিব।
এথ জানি পুণ্যবন্তে আত্ম বিস্মরিব॥
প্রদীপে পতঙ্গ যেন বিরহে দহএ।
তেন প্রভু ভাবে মগ্ন হইব নিশ্চএ॥
তাহাক বিরহ বলি সত্যবতী জান।
স্বপনেহ না দেখে প্রতিমা ছাড়ি আন॥
প্রভু নাম ছাড়ি মুখে না আইসএ বাণী।
যথ শুনে সে মধু-বচন শুনে পুনি॥
সূর্য হোন্তে কিরণ যেহেন নহে ভিন।
যদ্যপি কিরণে হেন হএ তার চিন॥
এক মন এক ধ্যান একহি ভাবিব।
আত্মপর মিত্রামিত্র দুই বিস্মরিব॥
অনাথের নাথ প্রভু নির্ধনীর ধন।
আঁখির পোতলি হৈব লীন সর্বক্ষণ॥
সমুদ্রেত ঢেউ যেন না থাকএ চিন।
আকাশেত ধূম্র যেন হই যাএ লীন॥
হেন মত হইব যাহার ভাগ্য থাকে।
জন্ম-মৃত্যু পাপ-পুণ্য কি করিব তাকে॥
ধন্য ধন্য সত্যবতী কুলকেতু সুতা।
সত্যের ঘরণী বালা সর্বগুণ যুতা॥
তোহোর জিজ্ঞাসে মোর আনন্দ জন্মিল।
সমুদ্র মথনে যেন অমৃত উঠিল॥
তুহ্মি হেন সতী নাহিক ত্রিভুবন মাঝ।
তোর সত্য পুণ্য ভাগ্যবন্ত সত্যরাজ॥
অবিলম্বে দেখিবা কলিএ পাইব নাশ।
বিজয় লভিব সত্যকেতু মহারাজ॥
এ বলিয়া নিঃশব্দে রহিল মহামুনি।
সতী-যোগী সম্বাদ সমাপ্ত হৈল পুনি॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
শুনিতে উদ্‌গরে যেন অমৃতের ধার॥

॥ সত্যকেতু কর্তৃক সত্যবতীর প্রশংসা ॥

(খর্ব ছন্দ)

তবে রাজা সত্যকেতু হরিষ অন্তর।
সত্যবতী প্রশংসিয়া সভার ভিতর॥
সাধু সাধু সত্যবতী কুলের দামিনী।
নিজকুলে বিমল অমল কমলিনী॥
মহামুনি সঙ্গে তোর শুনিয়া সম্বাদ।
খণ্ডিল মনের সাধ গেল ধন্ধ বাদ॥
চাঁদের উদএ যেন সমুদ্র উঝল।
তোর কথা শুনি মন আনন্দ বিভোল॥
দর্পণের মল যেন ঘুচএ মঞ্জনে।
মন ধন্ধ দূর হৈল তোমার কারণে॥
এ বলিয়া সত্যকেতু মুনিক স্তবএ।
তুমি ব্রহ্মচারী ধর্মগুরু মহাশএ॥
তোমার নিমিত্তে পুনি দেখিএ সংসার।
গোবিন্দ নিমিত্তে যেন পাণ্ডব উদ্ধার॥
শতমুখে তোহ্মাগুণ কহিতে না পারি।
দীক্ষাগুরু কল্পতরু জ্ঞানে ত্রিপুরারি॥

এইমতে ইষ্টলাভ গঞ্জিল রজনী।
হইল প্রভাত কাল উঠে দিনমণি ॥
সত্যবস্ত সূর্য দীপ্তি কৈল দিগন্তর।
অধর্মী কলঙ্কী চন্দ্র চিন্তিত অন্তর।
অরুণ সারথি রথ বাউবেগ বাজী।
অন্ধকার মারিতে মিহির আইল সাজি ॥
কিরণাস্ত্র এড়ি রাজ্য তম কৈল নাশ।
ধাইল নক্ষত্র কুল মনে পাই ত্রাস ॥
বিমনা উন্মনা সোম বুধ অরুন্ধতী।
ধাইল নক্ষত্র কুল ছাড়ি নিশাপতি ॥
কিরণাস্ত্র ঘাএ চন্দ্র বদন পাণ্ডুর।
কলঙ্ক লজ্জিত মুখ জরিল অন্তর ॥
চারিপাশে চাহে চান্দ না দেখে ভগন।
অপমানে চাহে চান্দ তেজিতে জীবন ॥
বিষাদিত কুমুদিনী দেখি নিশাপতি।
মায়া করি রথ ছাড়ে চকোর সারথি ॥
রথ ধ্বজ লুকাইয়া চন্দ্র নিল দূর।
'জয়সত্য' নাদ করে প্রভাবন্ত সূর ॥
প্রভু মুখ দেখি সুখ-নলিনী বিকাশে।
কাম দেখি রতি যেন পদ্ম-মুখে হাসে ॥
বৈতালিক ষট পদ করে স্তুতি পাঠ।
সূর্য আগে কমলী-ভ্রমরী করে নাট ॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালির ছন্দ।
শুনিতে শ্রবণে যেন ঝরে মকরন্দ ॥

॥ **সত্য-কলির যুদ্ধ** ॥

হইল প্রভাতকাল সাজে দুই বল।
প্রলয়ের কালে যেন শুনি কোলাহল ॥
অতি কোপে সত্যকেতু রথেত উঠিল।
অর্ধ কলা শিব[১] যেন সমুখে রুসিল ॥
বজ্রহস্তে সাজি যেন বীর বধে ধাএ।
কলি বধে সসৈন্য চলিল সত্য রাএ ॥
বিবিধ বাদিত্র বাজে জএ জএ ধ্বনি।
গর্জিয়া তর্জিয়া উঠে সত্যের বাহিনী ॥
এথা সৈন্য সঙ্গে করি কলীন্দ্র নিঃসরে।
কলি সৈন্য সিংহনাদে পৃথিবী বিদরে ॥
মুখামুখি দুই সৈন্য বাঝিল তুমুল।
দেবাসুর সংগ্রামে দিবারে নাহি তুল ॥
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্বে রণ।
মিশামিশি পেশাপেশি ঘোর দরশন ॥
গজ বাজি রথরথী কাটি কাটি পড়ে।
রুধিরে কর্দম হৈল রথ যে সাঙ্করে ॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রোষে মুখ্য যোধ।
লীলায় কাটিয়া পাড়ে শতে শতে যোধ ॥
সুখ-যোধ পূজন্ত বিক্রম সর্বজন।
হাতে ধনু বীর্যশালী ধাইল তখন ॥
সুখ বীর্যশালী যুদ্ধ আছিল তুমুল।
বীর্যশালী ঘাএ সুখ হইল আকুল ॥
সুখ যুদ্ধ দেখিতে কপটকেতু ধাএ।
হাতে ধনু সত্যবাদী তাহাকে রাখএ ॥
সত্যবাদী কাটি পাড়ে কপট সারথি।
রথ ধ্বজ কাটি রণে করিল বিরথী ॥
কপটে কপটে অলক্ষিতে এড়ে বাণ।
ঘাএ মুহুশ্চিত সত্যবাদী বলবান ॥

১ অর্ধকলা শিব—চন্দ্রচূড় শিব

কপটে বধিতে তবে সুবুদ্ধি ধাইল।
আগু হই মিথ্যাসেতু তাক নিরোধিল ॥
সুবুদ্ধির ধ্বজ কাটি কাটিল কোদণ্ড।
শেল পাট হানিলেক সুবুদ্ধি প্রচণ্ড ॥
মুহুশ্চিত মিথ্যাকেতু রথেত পড়িল।
অতি কোপে সংগ্রামেত কৃপণে রুষিল ॥
কৃপণে এড়িল বাণ বজ্রের সমান।
সুবুদ্ধি বিবুদ্ধি হৈল ঘাএ কম্পমান ॥
তবে বীর সুদাতাএ কৃপণে জিনিল।
সুদাতা বধিতে ভীত সংগ্রামে রুষিল।
আগে হই ধর্মকেতু পড়িছিল রণ।
ভীতকে বিন্ধিল বাণে হইল অচেতন ॥
কলি নিয়োজিল সৈন্য ধর্ম মারিবারে।
একসর কুমার সকলে বেড়ি মারে ॥
একে একে জিনিল সকল সেনাপতি।
ভঙ্গ দিল সর্ব সৈন্য ভয় পাই অতি ॥
সৈন্য ভঙ্গ দেখি পাপ-সৈন্য আগু হৈল।
শরজালে সত্যকেতু সৈন্য কম্পাইল ॥
সেইক্ষণে ধর্মকেতু এড়ে দিব্যবাণ।
মুহুশ্চিত পাপসেন পুনি পাইল জ্ঞান ॥
ধনুর্গুণ সান্ধি এড়ে উগ্রশিখা শর।
মুহুশ্চিত ধর্মকেতু রথের উপর ॥
রাজপুত্র রাখিবারে কবিচন্দ্র আইল।
দিব্য দিব্য বাণ হানে পাপকে কম্পাইল ॥
নানা মন্ত্রে আমন্ত্রিয়া এড়ে অস্ত্রগণ।
মুহুশ্চিত পাপসেন কলির নন্দন ॥
এথেক দেখিয়া কলি প্রবেশিল রণ।
মণ্ডলী করিয়া তাকে বেড়ে বীরগণ ॥

ধর্মকেতু সুবুদ্ধি সুদাতা সত্যবাদী।
মহাবাদী বীর্যশালী কবিচন্দ্র আদি ॥
সবে বেড়ি এড়ে অস্ত্র যেন অগ্নি শিখা।
অর্ধচন্দ্র, ক্ষুরবল্ল, নরোচ, নালিকা ॥
শক্তি শূল মুষল মুদগর কুন্ত পাশ।
ভূসণ্ডি তুম্বুর চন্দ্র ভ্রমএ আকাশ ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বিশিখ পড়এ অনিবার।
রথ সঙ্গে না দেখি কলীন্দ্র মহাবীর ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে আবারিল কলীন্দ্র নৃপতি।
পুনি সবে বেড়ি মারে হই এক মতি ॥
দশবাণে ধর্মকেতু সপ্ত বীর্যশালী।
পঞ্চবাণে সুবুদ্ধিএ বিন্ধিলেক কলি ॥
কৃপণেক দশ বাণে সুদাতা বিন্ধিল।
সত্যবাদী পঞ্চবাণে কলিক বিন্ধিল ॥
মহাবীর করিচন্দ্র এড়িলেক দশ।
অর্ধ পন্থে সব অস্ত্র কলি কৈল তস ॥
দিব্য দিব্য বাণে পুনি বিন্ধএ সভাক।
কলীন্দ্রের বাণ চলে বিজুলি ছটক ॥
ধর্মকেতু বিন্ধি পুনি কাটিল সারথি।
রথ কাটি সুবুদ্ধিরে করিলা বিরথী ॥
বীর্যশালী বিন্ধিয়া করিল মুহুশ্চিত।
ধ্বজ কাটি সুদাতাক বিন্ধিয়া তুরিত ॥
কবিচন্দ্র পরাজিয়া করে সিংহনাদ।
ভঙ্গদিল সর্ব সৈন্য পাই অবসাদ ॥
তারক তাড়নে যেন ধাএ সুরলোক।
কলি ভএ ধাএ সত্য মনে পাই শোক ॥
পদ্মাকূল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ।
উলটিয়া চাহি সৈন্য সব দিল ভঙ্গ ॥

জলরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ।
কলি অস্ত্রে দহে সৈন্য ধাএ উর্ধ্বশ্বাস॥
সৈন্য জিনি গেল কলি সত্যকেতু আগে।
সমুদ্রের জল যেন পর্বতেত লাগে॥
পূর্ব অপমান গুণে সত্য নরনাথ।
কোপে তুলা জ্বলি যেন ধনু ধরে হাথ॥
জ্বলন্ত আনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
সিংহনাদ করি উঠে সত্য মহাবল॥
সত্যকেতু সংগ্রামে বাঝিল দুর্নিবার।
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার॥

॥ সত্যকেতু সংগ্রাম ।

(দীর্ঘছন্দ : ধানশ্রীরাগ)

কোপে সত্য এড়ে বাণ যেন অগ্নি খান খান
গগনে বিজুলি যেন চলে।
কলীন্দ্রএ এড়ে শর সৈন্য কাটে নিরন্তর
হাহাকার উঠে পর-বলে॥
কলীন্দ্রেহ এড়ে শর ছাইল যে দিগন্তর
আচম্বিত তারা যেন ছুটে।
গগনে সঞ্চরি বাণ বাউবেগে তুরমান
সত্যকেতু মর্মে গিয়া ফুটে॥
এই মতে পরস্পর এড়ন্ত কাটন্ত শর
পরস্পর করন্ত বিক্রম।
দোঁহ বীর শিক্ষাবন্ত সংগ্রামেত মূর্তিমন্ত
আবর্ত নিবর্ত অনুপাম॥
কলি এড়ে দিব্যবাণ ঘাএ সত্য কম্পমান
স্থকিত আছিল মহাবীর।
সুস্থ পাই এড়ে বাণ ধনু কৈল দুইখান
পুনি বিন্ধে কলির শরীর॥
আর ধনু ধরি করে ভল্লুবাণ সান্ধি এড়ে
সত্যের কাটিয়া পাড়ে ধ্বজ।
সত্য এড়ে দিব্যবাণ কাটি পাড়ে শিরস্ত্রাণ
কোপে কলি মূর্তিমন্ত গজ॥
সিলাত নানা শিলা শর বাছি এড়ে নিরন্তর
সত্যের মর্মেত গিয়া ফুটে।
শোনিত স্রবএ গাএ না চিন্তএ সত্য রাএ
তিল এক বিক্রম না টুটে॥
দশবাণে বিন্ধে তনু ক্ষুরএ কাটিল ধনু
আর বাণে ধ্বজ কাটি পাড়ে।
সত্য পাইল মনস্তাপ খসিল হাতের চাপ
মুহুশ্চিতে রথেত পড়িল।
কলি যাএ ধরিবার দেবলোক হাহাকার
রথে রথে মিশিত করিল॥
তবে কলি দুরাচারে ধনু এড়ি খড়্গ ধরে
সত্যরথে দিতে চাহে লম্ফ।
যেহেন সাঁচন পক্ষী নর হস্তে মাংস দেখি
না চিন্তএ দিতে চাহে ঝম্ফ॥
দেখি শত্রু দুর্নিবার অধার্মিক দুরাচার
মনে চিন্তে সত্য নরনাথ।
দেখিয়া কলির দর্প কোপে যেন ক্রূর সর্প
শীঘ্র উঠি ধনু ধরে হাত॥

অষ্ট অষ্ট এড়ে বাণ খড়্গ কৈল খান খান
আর বাণে চর্ম কাটি পাড়ে।
সারথি বিন্ধিল শরে রথ ধাএ চারিধারে
দশবাণে কলি কম্পে গড়ে ॥
কোপে কলি গদা লৈল রথ হোন্তে লম্প দিল
ভ্রমাই এড়িল সত্য মাথে।
ভুবন দুর্লভ বীর সত্যকেতু রণে স্থির
সেই গদা ধরে বাম হাতে ॥
সেই গদা মেলি মারে কলির মাথের 'পরে
শোনিতে মজিল সর্ব তনু।
নারদ রথেত তুলি মুহুশ্চিন্ত নিল কলি
সত্যকেতু হাসে হাতে ধনু ॥
জ্ঞানলাভ আইল পুনি পরাভব মনে গুণি
সুরঙ্গ বিন্ধিল পঞ্চ শরে !
সারথি পাইয়া মোহ সর্ব গাএ বহে লহু
রথ অশ্ব ধাএ চারিধারে ॥
লাজে সত্য জ্যোতির্বাণ করি বীর সান্ধান
কলিক বিন্ধিল পঞ্চ শরে।
কদলীর পত্র যেন কলীন্দ্র কম্পএ তেন
মুহুশ্চিত পাইল দুর্বার।
সুরঙ্গ চৈতন্য লভি কহে নিজ মনে ভাবি
শুন সত্য হিত তত্ত্ব সার ॥
কন্টকে কন্টক খসে পাপে ধর্ম না প্রকাশে
কপটে সে ধরা যাএ চোর।
সত্য ছাড়ি দুষ্ট মারি ধর্ম তাত না বিচার
বড় পুণ্য, পাপিষ্ঠ সংহারে।
স্বামীত হারিয়া রণ কপট চিন্তিয়া মন
কেশে তুল সেহ যেন হরে ॥?

ঝাটে কলি কাটি পাড়ে ধর্মাধর্ম না বিচারে
নহে পুনি সংশএ বিজএ।
এক পাপ বধি যবে শত পুণ্য পাই তবে
শুন সত্য না ভাব সংশএ ॥
শুনিয়া সারথি বাণী হাসি সত্যে বোলে পুনি
সুযোগ না বোলে অব্যভার।
সত্য কি অসত্য করে পৃথিবী কি ভার ধরে
কেনে নহে প্রলয় প্রচার ॥
কাহারে মারিব কোনে সব মারে নিরঞ্জনে
মিছা সে দুর্জনে করে পাপ।
যদি শত কলি মারে তবে ধর্ম নাহি ছাড়ে
সুযোগ্য না কহ মনস্তাপ ॥
হেনকালে জ্ঞান লভি উঠে কলি দুখ ভাবি
এড়িল শার্দূল নামে বাণ।
শার্দূলাস্ত্র ঘাএ বীর ক্ষেণেক স্তম্ভিত ছিল
পুনি সত্য লভিলেক জ্ঞান ॥
কোপে সত্য ধনুর্ধর বাছি বাছি এড়ে শর
লঘু হস্তে বাণ বরিষএ।
সান্ধিতে এড়িতে বাণ সত্যকেতু বলবান
কলীন্দ্র লক্ষিতে না পারএ ॥
করি তিল পরমাণ কাটিলেক তনুত্রাণ
সত্য বিন্ধে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরে।
রুধির স্রবএ গাএ ইন্দ্রের বজ্রের ঘাএ
পর্বত গৌরিক যেন ঝরে ॥
ফাফর হইল কলি নিজ মনে আবকলি
সান্ধি এড়ে কোপে অগ্নিবাণ।
কোপে অগ্নি প্রজ্বলিত সত্য সৈন্য ভাবে নিত
দেবগণ ভয়ে কম্পমান ॥

তবে সত্য ধনু ধরে ক্ষেমাবাণ সান্ধি এড়ে
ক্ষেমা হোন্তে মেঘ উপজিল।
ক্ষেমা মেঘে বৃষ্টি কৈল কোপে অগ্নি নিবারিল
চঞ্চলাস্ত্র কলিএ এড়িল ॥
হৈল চঞ্চল রাত সত্য সৈন্য উৎপাত
বাউ মেঘ কৈল খান খান।
সত্যে এড়ে স্থির শর উপজিল ধরা ধর
তেজিল চঞ্চল পরশন।
তবে কলি ধনুর্ধর সান্ধি এড়ে পাপ শর
পাপ ভূমে কৈল অন্ধকার।
পুণ্য সূর্য এড়ে সত্য দীপ্তি কৈল স্বর্গ মর্ত্য
পাপ হোন্তে পাইল উদ্ধার।
এড়িল কৃপণে বাণ নাগ হইল বিদ্যমান
ধন বলে সর্ব জিনি যাএ।
সত্যদাতা অস্ত্র এড়ে হর্যক্ষ আইল পরে
দাতা সর্ব আরাধিলে পাএ ॥
গরুড়ে এড়িল ফণী কৃপণের বুদ্ধি হানি
দাতার সমুখে পাইল লাজ।
সত্যের বিক্রম দেখি নিজ বীর্য উন লখি
অধিক চিন্তিত কলিরাজ ॥
সম্ভ্রমেহ মহাবাণ কলি কৈল সান্ধান
মোহ পাইল সত্যকেতু বলে।
সংজ্ঞাবাণ সত্য এড়ে মহাবাণ তনু করে
জ্ঞান লভে বীরেন্দ্র মণ্ডলে ॥

কলিএ এড়িল শেল সত্য মর্মভেদি গেল
বজ্রে যেন বিদারিল গিরি।
শোনিতে মজিল তনু কোপে সত্য ধরি ধনু
দিব্য বাণ সান্ধে যত্ন করি ॥
বাণ মুখে পুণ্য দিয়া মন্ত্রে তন্ত্রে আহুতিয়া
জ্ঞান-বাণে জোড়ে রুদ্রবাণ।
বাণে অগ্নি জ্বলে উঠে কলির বিক্রম টুটে
রাক্ষস অসুর কম্পমান ॥
বাণ জুতি দীপ্তি কৈল স্বর্গে জএ জএ হৈল
পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ।
হুঙ্কারি এড়িল বাণ কলি হৈল কম্পমান
নিবারিতে চাহে এক মন।
যথ অস্ত্র কলি এড়ে বাণ তেজে ভস্ম করে
কলির হৃদয় ভেদি গেল।
দুই সৈন্য কোলাহল রথ হোন্তে ভূমিতল
পড়ি কলি মুহুশ্চিত ভেল ॥
কিঞ্চিৎ আছএ প্রাণ ঘাএ দেহ কম্পমান
পড়িল প্রসারি দুই হাত।
বদনে রুধির এড়ি ভূমিতলে রহে গড়ি
জয় শঙ্খ বাহে সত্যনাথ ॥
মোহাম্মদ খান কহে সর্বত্র সত্যের জএ
কলির সম্পদ চারি দিন।
দুর্জন কলির ভেক সত্য জুতি পরতেক
সত্যকলি যেন রাত্র দিন ॥

।। সত্যের জয় ।।

(সুহিরাগ)

হেনকালে সন্ধ্যা আসি দিন হৈল শেষ ।
প্রভুর আজ্ঞায় অস্ত যায়ন্ত দিনেশ ।।
দিনে চরে পক্ষী সব রহে ডালে ডালে ।
রাত্রি চরে বিহঙ্গম খেলে কুতুহলে ।।
গগনে উদিত চন্দ্র সঙ্গে তারাগণ ।
আন্ধারে প্রদীপ দিল প্রভু নিরঞ্জন ।।
সূর্য হোন্তে তেজমন্ত নাহি অন্য জন ।
চন্দ্র হোন্তে জ্যোতির্ময় আছে কোন্ জন ।।
সে সবেহ প্রভু-আজ্ঞা তিল নাহি নড়ে ।
রাত্রদিন ভ্রমন্ত প্রভুর আজ্ঞা 'পরে ।।
কথ শাস্ত্রে চন্দ্র-সূর্য পূজে না জানিয়া ।
সেবা করে, ঈশ্বর বোলন্ত না ভরিয়া ।।
এথেক জানিব লোকে এক করতার ।
নিশ্চয়ই নিদোষী নিরঞ্জন নৈরাকার ।।
সন্ধ্যাকাল হৈল কলি পাইল পরাজএ ।
ভঙ্গ দিল কলি সৈন্য মনে পাই ভএ ।।
শিশু মৃগ ধাএ যেন সিংহের তরাসে ।
সত্যকেতু ভএ সৈন্য ধাএ চারি পাশে ।।
সত্যকেতু সৈন্য 'জয় জয়' ধ্বনি শুনি ।
ঢাক ঢোল কাড়া শিঙ্গা নানা বাদ্য ধ্বনি ।।
অনেক দুন্দুভি বাজে শুনি কোলাহল ।
আনন্দে শিবিরে গেল সত্যকেতু বল ।।
কলি সৈন্য বিষাদিত মুখে নাহি বাণী ।
রথে করি কলিক নিলেক রাজধানী ।।
কলীন্দ্র মরিব হেন বোলে সর্বলোক ।
নারদ প্রভৃতি সব বিলাপন্ত শোক ।।
চরে গিয়া কহিলেন্ত দুঃশীলার স্থান ।
ঘাএ মোহ কলীন্দ্র কিঞ্চিৎ আছে প্রাণ ।।
চরমুখে শুনি বালা ধাএ শোকাকুলি ।
বুকে মারে করাঘাত আউদল চুলি ।।
পতির চরণে ধরি বিলাপএ বালা ।
পৃথিবীত উগে যেন নব চন্দ্রকলা ।।
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার ।
দুঃশীলার বিলাপে পাষাণ বহে ধার ।।

।। দুঃশালার বিলাপ ।।

পাপিনী ! হাহা প্রাণপতি কি হৈল দৈব গতি
তপস্বীএ জিনি যাএ রণ ।
তুহ্মি মহাবলী তারক সম বলী
জীবএ সমন্যু পালন ।।
বাল কুম্ভকর্ণ জিনিয়া সম্পূর্ণ
তোহ্মার রথের গতি ।
এ দুঃখ রইল মনে তোহ্মাকে সত্যএ জিনে
দৈবে বিধি বাম মতি ।।
হিরণ্য-কশিপু সদৃশ বিক্রমে যে কুলিশ
গাণ্ডীব সদৃশ তার বাণ ।
ধনুর টঙ্কারে তার ভুবন কম্পিত আর
দেবেন্দ্র ভএ কম্পমান ।।
শুক্র-সম জ্ঞান মানে দুর্যোধন
বুদ্ধিএ শকুনি তুল ।
যুগান্তের যম কোপে অগ্নি সম
দহন্ত তৃণ রিপুকুল ।।

অতুল্য যে পতি মোর সত্যএ সংহার
কি ফল জীবনে আর।
গরল ভক্ষিমু কাল প্রাণ দিমু
যৌবন হৈল মোর ভার ॥
অচৈতন্য বালা দুঃশীলা সুবদনী
নয়নে ঝরে জলধার।
ধূলি ধূসরিত সুন্দর শরীর
ধরিল সখী পরিবার ॥
চৈতন্য পাইয়া পুনি কান্দে সুবদনী
ধরিয়া নিজ প্রাণনাথ।
উঠ প্রাণেশ্বর ডাকি উচ্চস্বর
এ বলিয়া করে অঙ্গপাত ॥
শুনি সখাগণ প্রসন্ন বদন
নয়ন চকোর জোড়।
ভুরুর ভঙ্গিম কামিনী মোহন
কলীন্দ্র প্রাণপতি মোর ॥
ঈষৎ মধুর হাসি বিজুলি প্রকাশি
হরন্তি যুবতী-চিত।
রঙ্গিম অধরে অমিয়া বচনে
জগৎ মোহন রীত ॥
মোর প্রাণেশ্বর প্রাণের দোসর
রতিপতি যেন কাম।
রসের নাগর ভোগে পুরন্দর
সকল গুণের ধাম ॥
হেন পতি মোর প্রাণে কি দুঃখ ধর
গলে দিমু কাতিদান।
জলেত পশিমু জীবন তেজিমু
জীবন তেজি দিমু জান ॥
এ বলি দুঃশীলা পুন মুর্চ্ছিলা
পুনি বহু বিলাপিল।
খান মোহাম্মদ যুগ সংবাদ
পঞ্চালিকা বিরচিল ॥

॥ সখী দুষ্টমতী কর্তৃক দুঃশীলাকে প্রবোধ দান ॥

(খর্ব ছন্দ)

রাজসুতা দুঃশীলার শুনিয়া বিলাপ।
সখী দুষ্টমতী তাকে বুঝায়ন্ত আপ ॥
যদি কলি জীএ তুহ্মি তার পাটেশ্বরী।
যদ্যপি মরএ তবে শোক নাহি করি ॥
সত্যবতী না জানে কটাক্ষ হাস-লাস।
তোহ্মা আগে সত্যবতী সহজে উদাস ॥
তোহ্মার কটাক্ষে সত্য সহজে মোহিব।
সত্যবতী এড়ি সত্য সহজে গ্রাসিব ॥
তোর লাস-রভসের কেবা দিব সীমা।
বিধিএ সৃজিল তোকে রূপের প্রতিমা ॥
দেখি রবি-রথ রহে, মুনি-মন ভোলে।
লীলাএ মোহিব সত্য মৃদু মধু বোলে।
বিশেষ যে কলি হোন্তে সত্য হএ ঠিক।
নবীন স্বামীর প্রেম নারীর অধিক ॥
সর্বত্রে কল্যাণ সখী ধর মোর বাক।
প্রত্যয় না কর যদি পুছ চপলাক ॥
চপলাবতী বোলে ভাল বোলে সখী।
কলি হোন্তে শতগুণ সত্যধিক দেখি ॥
দুষ্টের বচনে গ্রাহী হৈল দুষ্টমতী।
কলিরে সমুখে থুই সত্যে ভাবে পতি ॥
শ্বেতবাসে কজ্জল বাঝিলে কালা ধরে।
দুষ্ট সঙ্গে থাকিলে দুষ্টতা মন পুরে ॥
এই মতে বচাবচ করে তিনজন।
কপটে চলিল বৈদ্য আনিতে কারণ ॥

॥ ভোগী ধন্বন্তরীর আগমন ॥

ভোগ দেশে আছে এক ভোগী ধন্বন্তরী।
তথা গিয়া কহন্ত কপট আগুসারি ॥
সত্যবাণে মুহুশ্চিত কলি নরনাথ।
চিকিৎসা করিতে বৈদ্য চলহ তথাত ॥
মদ্য-মাংস ভোগ দিমু নানা উপহার।
বিচিত্র বসন দিমু নানা অলঙ্কার ॥
শৃঙ্গার করিতে দিমু দিব্য দিব্য নারী।
কলিহ চাহিতে চল ভোগী ধন্বন্তরী ॥
ভোগে মোহ হৈল বৈদ্য চলিল তুরিত।
কলির নিকটে গিয়া হৈল উপস্থিত ॥
ভোগী বোলে ক্ষুধাএ আকুল মোর গাও।
মদ্য-মাংস নানা ভোগ সম্মুখে যোগাও ॥
নারদে বোলন্ত হেন নহে কদাচন।
আগে রাজ ভাল কর পাছে যে ভোজন ॥
এথ শুনি ক্ষুধাতুর ভোগী ধন্বন্তরী।
আপন' উদরে আনি করিল তিহরি ॥
যদি ক্ষুধাতুর অগ্নি ধৈর্য-কাষ্ঠ পোড়ে।
লোভের লাকড়ি দি ঔষধ-বড়ি লাড়ে ॥
সত্যধর্ম মারিবারে নাড়ে বাহু ছুটি।
হুরুকা লাগিল যেন লঙ্কার কপাটি ॥
নারদে বৃত্তান্ত সব একে একে কহে।
কোপে অগ্নিমুখ কলি নিঃশব্দে রহে ॥
ভোগী ধন্বন্তরী ভোগ ভোগিবারে মাগে।
পাত্রমিত্র সবে ভোগ দিল আনি আগে ॥
মদ্য-মাংস দধি-দুগ্ধ নানা উপহার।
ঘৃত মধু শর্করা বিবিধ ফল হার ॥
আম্র কণ্টকারী(?) মধু ছোলঙ্গ শ্রীফল।
বদরিকা দাড়িম্ব যে গুয়া-নারিকল ॥
মত্তমান কদলিকা লাউ মিষ্ট-নাড়ু।
যথ বৃক্ষ ফল আদি দেখিতে সুচারু ॥
হস্ত পাখালিয়া ভোগী গ্রাস চাপি ধরে।
চারিদিকে হাসে লোক ভোগী ভোগ করে ॥
বড় বড় গ্রাস ধরে ফাড়ি যায় গাল।
এথেকে সে ভোগীর সঙ্কট সর্বকাল ॥
মধুমত্ত হইয়া ভোগী অট্ট অট্ট হাসে।
ঘৃত-মাংস এক করি আনন্দে গরাসে ॥
দধি-দুগ্ধ মধু-মিষ্ট করিয়া ভক্ষণ।
ভোগী বোলে হৈল আজি সাফল্য জীবন ॥
মত্তমান কদলিকা আম্র মিষ্ট পাই।
ভোগী বোলে স্বর্গভোগ মিলাইল গোঁসাই ॥
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চারি পরকার।
ভোগ করি করে ভোগী নানা ফল হার ॥
ভোগ করি কর্পূর তাম্বুল দিল মুখ।
ভোগী বোলে এহাত সংসারে নাহি সুখ ॥
হৃষ্ট-পুষ্ট হই ভোগী তুষ্ট হৈল যবে।
ভোগী সম্বোধিয়া দুঃশীলাএ পুছে তবে ॥

॥ ভোগী-দুঃশীলা সংবাদ ॥

কহ মো'ত ধন্বন্তরী স্বরূপ বচন।
অকালে কলিকে সত্য জিনে কি কারণ ॥
একের সমএ আর লজ্ঘিতে না পারে।
কোন্ হেতু সত্যকেতু জিনে কলি হারে ॥
ভোগী বোলে সত্য করি কহিব কথন।
কেহ রুষ্ট না হইবা পাত্র-মিত্রগণ ॥
কলির সঙ্গতি ছিল কুপাত্র দুর্জন।
তেকারণে কলি হারে সত্য জিনে রণ ॥
দুঃশীলা বোলন্ত সব মহাপাত্র আছে।
ধনবন্ত বলবন্ত আছিলেক কাছে ॥
বোলে ধনবন্ত ভৃত্য না মানে ঈশ্বর।
বল হৈলে শূকরে ঠেলএ ধবাহর ॥
কন্যা বোলে কিঙ্করের ধন নিজ ধন।
ধনবন্ত ভৃত্য মন্দ বোল কি কারণ ॥
ভোগী বোলে শুন কহি রাজার কুমারী।
দুষ্ট ভার্যা হএ যদি পরম সুন্দরী ॥
নিদয়া ঠাকুর সুখ দুষ্ট ভৃত্য ধন।
ভিন নিজ কার্য নাহি পরের কারণ ॥
কন্যা বোলে দাস তবে কেমতে রাখিব।
নির্ধনী হইলে দুঃখ পাইয়া মজিব ॥
ভোগী বোলে ভুঞ্জাইব উদর ভরিয়া।
কিঞ্চিৎ বসন দিব থাকিতে পরিয়া ॥
দঢ় করি রাখিবেক নিযোজিব কর্ম।
দুষ্ট ভৃত্য মারিয়া যে রাখিবেক চর্ম ॥
কন্যা বোলে যথ কহ গৃহস্থের কথা।
কেমতে করিব রাজা পাত্রের ব্যবস্থা ॥

ভোগী বোলে পাত্রক রাখিব দঢ় করি।
যেই পাত্র দুষ্ট হএ ফেলিবেক মারি ॥
দুঃশীলাএ বোলে স্বামী কি কৈলে আদরে।
কোন্ কর্ম কৈলে নারী স্বামী কৃপা করে ॥
ভোগী বোলে স্বামী মন ব্যবসাএ পাএ।
সতীহ না পাএ মন বিনি ব্যবসাএ ॥
ব্যবসা করিয়া ভুঞ্জাইব স্বামী জন।
না ভুঞ্জাইলে সতীএ না পাএ স্বামী মন ॥
পুনি করজোড়ে পুছে রাজার কুমারী।
কি হোন্তে ব্যবসা হএ কহ ধন্বন্তরী ॥
ভোগী বোলে ধন হোন্তে ব্যবসাএ হএ।
দারিদ্রোত ব্যবসা না রহে সর্বথাএ ॥
বাপ মাও না সম্ভাষে স্বামী কৃপা ছাড়ে।
পুত্রে না করএ কৃপা জ্ঞাতি না আদরে ॥
ঈশ্বরে না করে দয়া ভীত ছাড়ে ভএ।
নির্ধনী পড়শী দেখি সকলে হিংসএ ॥
অর্থ সে ব্যবসা সর্বলোকে দয়া করে।
বুদ্ধিমন্ত হইলে নির্ধনী বুদ্ধি হরে ॥
কন্যা বোলে ধনবন্ত কোন্ মতে হএ।
ভোগী বোলে বণিজ করিলে ধন রহে ॥
বটেকে বটেকে খাইলে ফুরাএ ভাণ্ডার।
বটেকে অর্জিলে হএ পর্বত আকার ॥
বণিজ করিতে যদি নারে কদাচন।
সুখেতে করিব কৃষি অর্জিবেক ধন ॥
কন্যা বোলে কোন্ মতে করিবেক খেতি।
ভোগী বোলে কহি শুন তাহার প্রকৃতি ॥

প্রথমে প্রভু স্থানে মাগিব ফলিতে।
শক্তি অনুমান ভূমি করিব নিশ্চিতে ॥
মন্দ ভূমি বহু ছাড়ি অল্প করি ভাল।
যোগাযোগ বুঝিয়া থাকিব সর্বকাল ॥
ভাল মতে চাষ দিয়া করিব নানা খেতি।
প্রাণ দিয়া রাখিবেক জাগি অহোরাতি ॥
বিকিয়া করিব ধন ভুঞ্জিবেক সুখে।
কৃষি হোন্তে সম্পদ করন্ত সর্ব লোকে ॥
কন্যা বোলে নিচিন্তা কেমনে হএ নর।
ভোগী বোলে ভাগ্যবন্ত থাকে যার ঘর ॥
শত্রু ভয় না থাকে অরুগী হএ অঙ্গ।
এ তিন প্রকারে চিন্তা না থাকিবে সঙ্গ ॥
কন্যা বোলে চিন্তা বাঢ়ে বোল কি কারণ।
ভোগী বোলে যার থাকে বহু শত্রুগণ ॥
যার বহু ধার হএ চিন্তা বাঢ়ে অতি।
আপনা শোণিত পান করে প্রতি নিতি ॥
যার অল্প অর্জন বহুল হএ পোষ।
নিরন্তর চিন্তা পাএ মন অসন্তোষ ॥
পাপ হোন্তে চিন্তা বাঢ়ে শুন রাজ সুতা।
শরীর দহএ নিত্য মৃত্যু দেএ চিন্তা ॥
কন্যা বোলে কোন্ কর্মে আয়ু-বল বাঢ়ে।
ভোগী বোলে শুনিলে সুশব্দ নিরন্তরে ॥
চন্দ্রমুখী প্রিয়া মুখ যে নিতি দেখএ।
ধন প্রাণ লাগি যার না থাকএ ভএ ॥
মনোবাঞ্ছা পুরে নিতি ঘুচএ জঞ্জাল।
এ চারি প্রকারে আউ বাড়ে সর্বকাল ॥

দুঃশীলাএ বোলে আউ টুটে কি কারণ।
ভোগী বোলে দীর্ঘ রুগী হএ যেই জন ॥
বৃদ্ধকালে নির্ধনী পরের করে আশ।
থাকিতে টুটিব আউ হইয়া নৈরাশ ॥
অবিরত মিথ্যা-অঙ্গ[১] দেখে যেই জন।
নিরন্তর শত্রু ভএ থাকে তার মন ॥
নারীগণ নাভি-হেটে যে জন দেখএ।
এ পঞ্চ প্রকারে আউ টুটএ নিশ্চএ ॥
কন্যা বোলে আউ হোন্তে মৃত্যু ভাল করে
ভোগী বোলে হীন সেবা করে যেই 'ছারে'।
হীন জন অপমান শরীরে না সহে।
হীন সেবা হোন্তে ভাল যদি মৃত্যু হএ ॥
স্বামী সোহাগিনী নারী বিফল জীবন।
যার নারী অসতী সে জিএ অকারণ ॥
যে জনে ধনীর ঘরে মাগে নিরন্তর।
ভুঞ্জএ নরক দুঃখ সংসার ভিতর ॥
এ চারি জনের পুনি মরণ সে ভাল।
মৈলে সে ঘুচএ দুঃখ পাতকী জঞ্জাল ॥
দুঃশীলাএ বোলএ শুনিয়া কুতুহল ॥
কোন্ কোন্ কর্ম কৈলে গাএ থাকে বল।
ভোগী বোলে ঘৃত মাংস করিলে ভোজন।
সুগন্ধি আমোদ গন্ধ পাইলে তমুক্ষণ।
অনুদিন স্নান নব বসন পরিলে।
গাএ বল বাঢ়ে অর্থ গঠিত থাকিলে ॥
দুঃশীলাএ বোলে বল টুটে কি প্রকার।
ভোগী বোলে বহুতর চিন্তা থাকে যার।

[১] মিথ্যা-অঙ্গ—ছায়া

বল টুটে যে অমূল্য যাএন্ত বিশেষ।
বহু নারী সম্ভোগে বহুল হএ শেষ ॥
এই কথা শুনি কলি রঙ্গ হৈল মনে।
কৌতুকে পুছএ ভোগী ধন্বন্তরী স্থানে ॥
কোন্ কোন্ দিন নারী না করি সম্ভোগ।
কহ ভোগী ধন্বন্তরী সত্য করি মোক ॥
ভোগী বোলে প্রতিপদে অষ্টমী দশমী।
অমাবস্যা পূর্ণিমাত নারীক না রমি ॥
প্রভাত সমএ যদি সম্ভোগ করএ।
সেই ক্ষণে জন্মে পুত্র কাল ঘোর হএ ॥
লেঙ্গটা হইয়া যেই করএ রমণ।
ভূত-দৃষ্ট হএ সেই শাস্ত্রের বচন ॥
রোগ-বিকার ঘোরে করিলে শৃঙ্গার।
উন্মত্ত পুত্র হএ চঞ্চল বেভার ॥
শৃঙ্গারেত যেবা পুনি দ্বারে নিরীক্ষএ।
সেক্ষণে জন্মিলে পুত্র নির্লজ্জ হএ ॥
শৃঙ্গারেত না চাহিব গম্ভীর নয়ন।
অন্ধ পুত্র উপজএ জন্মিলে সেক্ষণ ॥
শৃঙ্গারেত নারী সঙ্গে না কহিব কথন।
নির্লজ্জ বালক পুত্র হএ সেকারণ ॥
বিন্দুপাত পাছে যদি করএ রমণ।
থিহা[1] হৈয়া রমএ যে পাপিষ্ঠ দুর্জন।
শেষ হএ নিজ তনু পুত্র খোর[2] হএ।
শয্যাত বহুল মূতে বালকে নিশ্চএ ॥
শৃঙ্গার করিয়া যদি একহি বসনে।
নিজ তনু পবিত্র করন্ত দুই জনে ॥

এই সে প্রকারে হএ কলহ জঞ্জাল।
পতি পত্নী মধ্যেত না থাকে প্রীতি ভাল।
শয়নে যুবতী সঙ্গে রমণী রমিলে।
ডাকাইত পুত্র হয় সে ক্ষণে জন্মিলে ॥
যে দিনে প্রবাসে যাই সে রাত্রি রমিলে।
পাপকারী পুত্র হএ সে রাত্রি জন্মিলে ॥
বুধ রবি রাত্র দিনে যে জনে রমএ।
তাত পুত্র জন্মিলে অধর্মী পাপী হএ ॥
সোম শনি গুরুবারে যে জনে রমএ।
সত্যবাদী ধর্মিক মঙ্গল উপজএ ॥
সোম শুক্র গুরু রাত্রি রমিবেক নারী।
জন্মিব চিরাউ পুত্র শুদ্ধ ধর্ম চারী ॥
পশুর গোচরে কিবা মনুষ্যের আগে।
না রমিব সূর্যের কিরণ যথা লাগে ॥
প্রথম প্রহর মন্দ দ্বিতীয় মধ্যম।
তৃতীয় প্রহর রাত্রি রমিলে উত্তম ॥
অধিক উত্তম জান চতুর্থ প্রহরে।
সন্ধ্যা কালে কদাপিহ না রমিব নরে ॥
এক কালে পতি-পত্নী বিন্দুপাত হৈলে।
নপুংসক পুত্র হএ সেক্ষণে জন্মিলে ॥
কলিএ বোলএ মোত কহ ধন্বন্তরী।
সমযোগ নহে হেন কোন মতে করি ॥
ভোগী বোলে নারী পাশে করিলে গমন।
কাম মোহ না হইব স্থির রহে মন ॥
শৃঙ্গারের আগে ভোলাইব নারী মন।
সঘন চুম্বন দিব গাও আলিঙ্গন ॥

১ থিহা—(চট্টগ্রামী বুলি)-স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া ২ খোর—নেশাকু

নখরে ঘা দিয়া কুচ করিব মর্দন।
নাভি উরু স্থলে হস্ত মথিব সঘন।

যদি কাম ভাবে নারী হইল মোহিত।
সাবধানে শৃঙ্গার করিব আনন্দিত॥

এই মতে যার আগে বীর্য নহে পাত।
কহিলুঁ নিভৃত কথা কলি নর নাথ॥

কলি বোলে যথেক কহিলুঁ হিত বাণী।
প্রতি দিন কেমতে রাখিব এথ পুনি॥

ভোগী বোলে প্রতি দিন যে নারে রাখিতে।
রাখিব দ্বাদশ দিন কহিলুঁ চিন্তিতে॥

ঋতু স্নান তিন দিনে করিলে যুবতী।
গর্ভাধারে নরে যোগ দিব শুন রতি।

এই যে দ্বাদশ দিনে হৈব সাবধান।
প্রতিদিন রাখএ যাহারা অবধান॥

কলি বোলে কন্যা পুত্র হএ কি কারণ।
কহ মো'ত ধন্বন্তরী চিন্তি নিজ মন॥

ভোগী বোলে তিন দিনে কৈলে ঋতু স্নান।
তার পাছে দ্বাদশ দিবস দঢ় মান॥

শৃঙ্গার করিলে নারী গর্ভবতী হএ।
শুন কহি পুত্র কন্যা যেহেতু জন্মএ॥

এক, তিন, পঞ্চ, সপ্তে, নব, একাদশে।
ঋতু আপেক্ষএ যদি এসব দিবসে॥

পুত্র উপজএ যদি হএ গর্ভবতী।
যে যে দিনে কন্যা হএ শুন নরপতি॥

দুই চারি ছয় অষ্ট দশম দ্বাদশে।
ঋতু আপেক্ষএ যদি এসব দিবসে॥

গর্ভবতী হএ যদি কন্যা উপজএ।
কহিলুঁ কন্দর্প কথা শুন মহাশএ॥

শুক্র সোম শনি গুরু দক্ষিণে পবন।
এদিনে স্রবিলে ঋতু জন্মএ নন্দন॥

রবি ভোর বুধ বামে শ্বাসে-বাউ বহে।
তাত ঋতু আপেক্ষিলে কন্যা উপজএ।

দক্ষিণে করিয়া শ্বাস করিব রমন।
তবে পুত্র উপজিব জান বুধ জন।

তবে বোলে দুঃশীলাএ শুন মহাশএ।
গর্ভবতী কোন মতে থাকিব নিশ্চএ॥

ভোগী বোলে গর্ভবতী হইলে সুন্দরী।
ক্ষুধাতুর উপবাস না থাকিব নারী॥

আমলকী ফল গর্ভবতী না খাইব।
আমলকী কাষ্ঠ অগ্নি ঘরে না জ্বালিব॥

অম্ল লবন আনি না খাইব সুন্দরী।
বহু রৌদ্রে বসি না থাকিব হেলা করি॥

শীত বলি অগ্নি জ্বালি ধিক না বসিব।
উঞ্চ নীচ পন্থ দেখি বুঝিয়া হাঁটিব॥

অশ্বে গজে না চড়িব না চাহিব কাক।
কোপ করি মন দুঃখে না দিবেক বাক্॥

না চাহিব গর্ভবতী কূপ অভ্যন্তরে।
জাতিভ্রস রাজসুতা সত্য বলি তোরে॥

দুঃশীলাএ বোলে ভোগী পুছিএ তোহ্মার।
কোন্ কর্মে সম্ভ্রম ভাঙ্গএ আপনার॥

ভোগী বোলে ঈশ্বরেত যে করে বড়াই।
আপনা সম্ভ্রম ভাঙ্গে যাএ লজ্জা পাই॥

নির্লজ্জ হইয়া যেই করে অনাচার।
সভা মধ্যে সম্ভ্রম না থাকে সত্য তার ॥
স্থাব্য[১] ধন খাইলেহ না থাকে সম্ভ্রম।
পর ঘর উৎসবেত যে নর অধম ॥
অবোলনে[২] খাইবারে লোভে চলি যাএ।
আপনা সম্ভ্রম ভাঙ্গে লজ্জা বড় পাএ ॥
দুঃশীলাএ বোলে ভোগী মূঢ় বলি কা'ক।
ভোগী বোলে যে না শুনে মিত্র জন বাক ॥
বর্বর সঙ্গতি যুক্তি করে যেই জন।
কুপাত্র দুর্জন আনি যে করে পালন ॥
নারীক প্রত্যয় করি বেড়াইতে বোলে।
সেই মূঢ় জন জান এ মহা মণ্ডলে ॥
কন্যা বোলে বৃদ্ধ কিবা অবলা কুমারী।
তার কি তুলনা দিএ বোল ধন্বন্তরী ॥
ভোগী বোলে কপি যেন ঝুনা নারিকলে।
খাইতে না পারে জল নাচে কুতুহলে ॥
কন্যা বোলে যুবকেত অতি বৃদ্ধ নারী।
তার কি সমস্যা দিএ বোল ধন্বন্তরী ॥
ভোগী বোলে শুক সঙ্গে যে হেন উল্লুক।
অবশ্য পেচক হস্তে প্রাণ দিব শুক ॥
শুক সঙ্গে শুক সে করএ শোভাকারী।
শুক কাক মিলি হৈলে শুকের সংহারি ॥
বৃদ্ধ নারী যুবকের প্রীতি নাহি হএ।
যদ্যপি হএ চিরদিন নাহি রহে ॥

দুঃশীলাএ বোলে আজ্ঞা কহ মহাশএ।
কোন্ কোন্ কর্মে চিরদিন নাহি রহে ॥
ভোগী বোলে রাজ্যে যদি রাজা বল করে।
চিরদিন না রহে আপনা রাজ্য হরে ॥
দুষ্ট নারী প্রীতি নাহি রহে চিরকাল।
অবশ্য কলহ বাঝে ঠেকএ জঞ্জাল ॥
পতি সঙ্গে সতীর কলহ চিরদিন।
না রহএ জলে জল নহে যেন ভিন ॥
চিরদিন না রহে মিত্রের কোপমন।
কদাপি না তেজে যেন সুগন্ধি চন্দন ॥
কন্যা বোলে পর চিত্ত কেমনে হরিব।
সত্বরে সঙ্কটে আত্ম কেমতে রাখিব ॥
ভোগী বোলে পর চিত্ত হরে যেই জন।
তার রসে রসিক থাকিব সর্বক্ষণ ॥
ভাল বা মন্দ বোলে সেই বোলে ভাল।
যে মাগে সে আনিয়া যোগাএ সর্বকাল ॥
আর পর চিত্ত হরে মন্ত্র তন্ত্র বলে।
দেবতাহ বশ্য হএ বশ্য মন্ত্র ফলে ॥
যেহেন ব্রাহ্মণ বড়ু বশ্য মন্ত্র করি।
বাবিল রাজার সুতা লৈয়া গেল হরি ॥
দুঃশীলাএ বোলে কহ শুনি এ কাহিনী।
ভোগী ধন্বন্তরী কহে নিজ মনে গুনি।

১ স্থাব্য—আমানত ২ অবোলনে—বিনা নিমন্ত্রণে, বিনা ডাকে

॥ ব্রাহ্মণ-রাজকন্যা কাহিনী ॥

পশ্চিমে বাবিল নামে আছে এক দেশ।
বিস্তর কুমন্ত্র টোনা সে রাজ্যে বিশেষ ॥
তাত রাজা ভরত মাধবী তার সুতা।
ত্রিলোক মোহিনী কন্যা রূপে অদ্ভুতা ॥
একদিনে বৃন্দাবনে রাজার কুমারী।
প্রমোদ বিহারে গেল লৈয়া সহচরী ॥
দৈবগতি মধু নামে ব্রাহ্মণ নন্দন।
কুতুহলে প্রবেশিল সেই বৃন্দাবন ॥
আচম্বিত দেখি বড়ু[1] রাজার কুমারী।
মুহুশ্চিত পড়ে বড়ু আপনা পাসরি।
জ্ঞান লভি বোলে বড়ু লখি বিপরীত।
স্বর্গ ছাড়ি বিদ্যাধরী আইল আচম্বিত ॥
কিবা রাহু ভএ চান্দ ছাড়িল গগন।
পলাইতে আসিয়াছে এই বৃন্দাবন ॥
কিবা দেবী ভাব করি চান্দের সঙ্গতি।
অপমানে এড়ি তথা আইল লজ্জামতি ॥
কিবা গঙ্গা সঙ্গে কেলি কৈল ত্রিলোচন।
কোপে গৌরী এথাত আইল তেকারণ ॥
ভুরুরে ভঙ্গিমা করি নয়ন নাচএ।
বুঝিল এহেন রূপে শিবকে মোহএ ॥
মৃদু মৃদু হাসি অঙ্কি বঙ্ক বঙ্ক করি।
এই রঙ্গে ধ্যান ভঙ্গ হৈল ত্রিপুরারি ॥
থাউক প্রসিদ্ধি কুচ তাল ফলধিক।
দেখি মনমথ মত্ত হএ যে অধিক ॥

এ বলিয়া স্তব্ধ বড়ু চিত্রপট প্রাএ।
অনিমিখ নয়নে মাধবী রূপ চাহে ॥
কন্যা বোলে দেখি বড়ু দীপ্তিমন্ত তনু।
আচম্বিত উপগত যেন ফুল ধনু ॥
সখী প্রতি বোলে সখী অহি কোন্ জন।
হর ভএ পলাইছে বুঝিএ মদন ॥
নতু রঘুপতি বনে ভএ বাসি মন।
পলাইতে জায়ন্ত আইল বৃন্দাবন ॥
নতু সক্র-শাপে ভ্রষ্ট হই বিদ্যাধর।
বৃন্দাবনে পড়ি স্তব্ধ চিন্তিত অন্তর ॥
এ বলিয়া রাজকন্যা সমদৃষ্টে হেরে।
অন্যে অন্যে প্রেম-রসে মগ্ন হৈয়া রহে।
নৃপ ভএ সখী বোলএ উচ্চস্বর।
কোথায় ব্রাহ্মণ বড়ু হঅরে অন্তর ॥
রাজার কুমারী মুখ কেনে নেহালসি।
আকাশের চন্দ্র হস্তে ধরিতে চাহসি ॥
নাগমণি ধরিয়া চাহসি মারিবার।
কামভাব মাধবীক হএ বিপ্রছার ॥
এ বলিয়া কন্যা লই সব গেলা ঘর।
কামভাবে রাজকন্যা মৃত সমসর ॥
এথা বিপ্র ছিল তিনদিন অচেতন।
জ্ঞান লভি ধাএ উন্মত্তের লক্ষণ ॥
'মাধবী মাধবী' মাত্র ডাকে উচ্চস্বর।
আউদল কেশ ভ্রমে নগরে নগর ॥

১ বড়ু—ব্রাহ্মণ কুমার

শিশুগণে মারন্ত-হাসন্ত সর্বলোক।
কেহ বোলে হইছে উন্মাদ বাউরোগ ॥
এইমতে গেল এক ওঝার দুয়ার।
সে যে ওঝা তন্ত্র-মন্ত্র জানএ অপার ॥
মৃতবৎ হই পড়ে ওঝার সম্মুখে।
'মাধবী মাধবী' মাত্র স্মরে নিজ মুখে ॥
সকরুণ হই ওঝা বোলে শান্ত বাণী।
কেমত বাঞ্ছিত বিপ্র বোল সত্য বাণী ॥
মোর মন্ত্র-তেজে পারোঁ সূর্য আনি দিতে।
মন্ত্র বলে পারোঁ সক্র আনি দেখাইতে ॥
যদি মাগ দিব আনি স্বর্গ বিদ্যাধরী।
যেই মনোবাঞ্ছা তোর দিমু সে অধিকারী।
কহ বা মাধবী কেবা সত্য কহ মোক।
আজি হোন্তে গৃহ পুত্র বলি যুত হোক ॥
শুনি বড়ু সকরুণ ওঝার চরণ।
কহিলেক আদি অন্ত যথ বিবরণ ॥
হাসিয়া ওঝাএ বোলে কিবা কর্ম তাক।
আজি মাধবীর কাছে নিবাম তোহ্মাক ॥
এ বলিয়া এক মন্ত্র লেখি তাম্র পাতে।
ব্রাহ্মণের মুখে দিল আপনার হাতে ॥
মন্ত্রগুণ বলে বড়ু হৈল নারী রূপ।
মুখ কণ্ঠ সম কুচ নারীর স্বরূপ ॥
কিন্তু অভ্যন্তরে আছে পুরুষ আকার।
ওঝা বোলে এই মন্ত্র এ হেন আকার ॥
নারী হএ পুরুষ পুরুষ হএ নারী।
কিন্তু পুনি লিঙ্গ মাত্র ঘুচাইতে নারি ॥
এথ কহি গেল ওঝা রাজার সভাত।
স্ত্রীরূপ বড়ু লই দাণ্ডাইল সাক্ষাৎ ॥

নৃপতি বোলন্ত বিপ্র কেনে আগমন।
ওঝা বোলে আহ্মি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজন ॥
এই মোর পুত্র বধূ ব্রাহ্মণ কুমারী।
পুত্রেত বিবাহ দিলুঁ বহু যত্ন করি ॥
এহি মোর পুত্র বধূ, ছন্ন তার নাম ॥
সতী-পতিব্রতা বধূ সর্ব গুণ ধাম ॥
তাত কর্মদোষে পুত্র উন্মত্ত হৈয়া।
কোথা গেল নাহি জানি আহ্মাক ছাড়িয়া ॥
পুত্র অন্বেষিতে আহ্মি করিব গমন।
তোহ্মা স্থানে দিলুঁ বধূ রাখিতে যতন।
ব্রহ্মস্ব জানিয়া রাজা যতনে রাখিবা।
নিজকন্যা স্থানে মোর বধূ সমর্পিবা ॥
ব্রাহ্মণের বোলে রাজা কৈলা অঙ্গিকার।
বলিলেন্ত যাও বিপ্র পুত্র চাহিবার ॥
একশত তঙ্কা রাজা ব্রাহ্মণক দিল।
মাধবীক আনিয়া ব্রাহ্মণী সমর্পিল ॥
ওঝা ঘরে চলি গেল ছন্নকে এড়িয়া।
মাধবী ছন্নকে নিল সঙ্গতি করিয়া ॥
বৈদ্য ঘরে গেল রুগী রোগ হৈল নাশ।
মৃত্যুকালে পাইলেক অমৃত সন্দেশ ॥
না জানি ভরত রাজা অপকর্ম কৈল।
বিড়ালের হস্তে নিয়া মাংস সমর্পিল ॥
মাধবী বাপের আজ্ঞা ধরি নিজ মন।
কৃপা করি ছন্নকে সন্তোষে ততক্ষণ ॥
কন্যাকে বোলএ ছন্না বিবিধ প্রকারে।
দিনে দিনে প্রীতি ভাব হৈল দোঁহানেরে ॥
যেদিনে দেখিল মধু রাজার কুমারী।
কামানলে দহে কন্যা সেইদিন ধরি ॥

মর্ম চাহি মারে বাণ ধরি ফুল ধনু।
ঘন শ্বাস বহে কন্যা কম্পমান তনু ॥
দিনে দিনে কৃশ দেহ হইল কুমারী।
কাহাত না কহে কিছু মনে লজ্জা করি ॥
ছন্নাএ বুঝিয়া তার বিরহ বেদন।
নিভৃতে আপনা কার্য করে নিবেদন ॥
ছন্না বোলে কহ সত্য নৃপতি নন্দিনী।
কোন্ চিন্তাযুক্ত তুহ্মি বিষণ্ন বদনী ॥
কন্যা রোগ আছে জান মোহর শরীরে।
ছন্না বোলে রাজকন্যা ভাণ্ডসি আহ্মারে ॥
সঘন নিঃশ্বাস তোর বদন পাণ্ডুর।
অভিপ্রাএ বুঝিএ দগধে পঞ্চশর ॥
সত্য কহ কা'ক দেখি হইলা ভাবিনী।
মন্ত্র বলে আনি দিমু আজুকা রজনী ॥
ছন্নার শুনিয়া হেন সুহৃদ বচন।
গদ গদ কহে কন্যা সজল নয়ন ॥
যেনমতে দেখিলেক ব্রাহ্মণ কুমার।
আদি অন্ত কহিলেক দুঃখ আপনার ॥

ছন্না বোলে দেখিলে নি চিনিবা এখন।
কন্যা বোলে সেইরূপ মোর প্রাণধন ॥

কেনে না চিনিমু তাকে বোল প্রাণ সখী।
যার হেতু সংশয় জীবন হৈল দেখি ॥

হাসি মধু প্রদীপ আনিল তুরমান।
মুখ হোন্তে মন্ত্র কাঢ়ি[১] রহে বিদ্যমান ॥
আচম্বিত দেখি কন্যা নিজ প্রাণনাথ।
সলজ্জিত রাজসুতা নম্র কৈল মাথ ॥
সবিস্ময়ে পাছে কন্যা পুছে ধীরে ধীর।
আদি অন্ত কহিলেক ব্রাহ্মণ কুমার ॥

রাজকন্যা সম্ভাসিলা বিস্তর ওঝারে।
এহেন অসক্য কর্ম কেহ নাহি করে ॥

তবে মধু মাধবীরে ধরি লৈল কোলে।
অনঙ্গের রঙ্গে নাচে মন কুতুহলে ॥

মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
শুনিতে উদ্গরে যেন অমৃতের ধার ॥

॥ যুগল মিলন ॥

(ছহিরাগ-লাচারী)

নাচে মধুরস সিন্ধু মাঝে যুতি
মাধবী হইল কোড়ে।
পূরব জনমে গৌরী আরাধিলুঁ
তেকাজে পাইলুঁ তোরে ॥

গাঢ় আলিঙ্গন সঘন চুম্বন
চুম্বিয়া কাজল দেশ।
ধরি কুচ ঘন স্থাবর জঙ্গম
নখরে ঘাও বিশেষ ॥

• ১ কাঢ়ি> কাডি = কাড়িয়া, উচ্চারণ করিয়া

মধুএ অধর পিবএ মধুর
সরোজে যেহেন অলি।
নয়নে নয়নে বয়নে বয়নে
কণ্ঠে কণ্ঠে জড়ি কেলি ॥
মধুশ্যাম তনু যেহেন ফুল ধনু
গৌরাঙ্গ মাধবী রতি।
যেহেন রাধে-হরি কিবা হর-গৌরী
কিবা নল-দময়ন্তী।
শ্যাম গৌর অঙ্গ রঙ্গে রহে সঙ্গ
মেঘেত বিজুলি খেলে।

হেম লতা মণি মরকত জড়ি
কিএ রাহু শশী গিলে ॥
বিপীন[1] জঘন তাড়িয়া সঘন
পীড়িয়া মোহন স্থলি।
যার যথ যথ ছিল মনোগত
বিধি মিলায়লি ভালি।
বিষম সরম ভঙ্গ পঞ্চশর
ছাড়িয়া কুসুম ধনু।
খান মোহাম্মদ এহু রস ভণ
অমিয়া উদগরে জনু ॥

॥ মারুতের অনুরাগ ॥

(খর্ব ছন্দ)

এইমতে কেলি নির্বহিল প্রতিনিতি।
কেহ চিনিবারে নারে ছন্নার প্রকৃতি ॥
আরদিন সেই ছন্ন দৈবের ঘটনে।
নারীরূপে স্নান করে হরষিত মনে ॥
দূরে থাকি রাজসুত মারুতে দেখিল।
মূহুশ্চিত কুমার ভাবেত মগ্ন হৈল ॥
কিবা রম্ভা তিলোত্তমা মদনের পতি।
হেমকুম্ভ কুচভার ঘন পীন অতি ॥
কুমারী ছন্নার স্থানে পাঠাইল দূতী।
শুনিয়া ত্রাসিত ছন্না ভয় পাইল অতি।
নারী যদি হইত শুনিত পাপ বাণী।
সহজে পুরুষ ছন্না ত্রাসযুক্ত পুনি ॥
ছন্না বোলে মারুত পাপিষ্ঠ দুরাচার।
ব্রহ্মস্ব হরিতে চাহে মাগে পরদার ॥

দূতী বোলে প্রাণ দিব রাজার কুমার।
কৃপা কর বিপ্রবধূ করি পরিহার ॥
ছন্না বোলে মরি যাউক মারুত দুর্মতি।
এ পুত্রেথু মুলুকে হৈব রাজার অকৃতি ॥
আশ্রিত ব্রাহ্মণ-কন্যা সতী পতিব্রতা।
এক পতি ছাড়ি আন না জানি সর্বথা ॥
এ বলিয়া ধাই গেল মাধবী নিকট।
মনে মনে চিন্তে মধু পড়িল সঙ্কট ॥
দূত মুখে শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল রাণী।
ভাবে মোহ মারুত তেজিতে চাহে প্রাণি।
মুহুশ্চিয়া কুমার পড়িল ভূমিতল।
বোলাই না পাএ 'বোল' কিঙ্কর সকল ॥
রাজপুত্র সঙ্কট দেখিয়া শোক মন।
নৃপস্থানে জানাইল এই সব বচন ॥

১ বিপীন—বিশেষ স্থূল

শুনিয়া চিন্তিত রাজা গুণে মনে মন।
ব্রহ্মস্ব হরিলে পাপ আরো স্থাব্য ধন।
হেন অপকর্মে কর্ম কেমতে করিব।
সংসারে অযশ পাছে নরকে পড়িব ॥
যদি ভএ ধর্মকন্যা পুত্রক না দিএ।
দারুণ মদন বাণে পুত্র নাহি জিএ ॥
কি রাখিমু নিজ পুত্র কিবা রাখি ধর্ম।
হাহা বিধি কর্মদোষে হৈল হেন কর্ম ॥
সেইক্ষণে আর এক কিঙ্কর আসিয়া।
নৃপস্থানে কহে পুত্র দেখহ আসিয়া ॥
দৈবে সে মারুত জিএ কণ্ঠাগত প্রাণ।
না পাইলে ব্রাহ্মণী নাহিক পরিত্রাণ ॥
পুত্রের সেনেহ বড় ভরত নৃপতি।
ধর্ম ছাড়ি পুত্রস্নেহ মনে হৈল অতি ॥
এক দাসী পাঠাইল ব্রাহ্মণীর স্থান।
দৈবে গেল তোর পতি পাগল ব্রাহ্মণ ॥
মোর পুত্র তোর ভাবে তেজএ জীবন।
পুত্র দান কর মোরে না হৈঅ বিমন ॥
সহজে মারুতে নিজ দেব ধর্ম নাশে।
তোর ভাবে নরকের ভয় নাহি বাসে ॥
বিশেষ কি কহিব আপনা অপরাধ।
তুহ্মি মূলে আহ্মার ঠেকিল পরমাদ ॥
দাসী গিয়া কহিলেক রাজার বচন।
মাথে বজ্রঘাত মধু ত্রাসে কম্পমান ॥
সচকিত মাধবী মুখেত নাহি বাণী।
কপট রচনা মধু বোলে মনে গুণি ॥
কহিঅ মারুত স্থানে মোহর ভকতি।
নিশ্চএ মরিল যদি মোর প্রাণপতি ॥

কথদিন ক্ষেমা কর শ্রাদ্ধ করোঁ তার।
সহজেই পাছে আহ্মি শরণ তোহ্মার ॥
হরষিতে কুমারেত কহে গিয়া দাসী।
মৃত অঙ্গে অমৃত সিঞ্চএ হেন বাসি ॥
শুনি আনন্দিত হৈল মারুত কুমার।
ভাবিয়া সঙ্কেত কাল রহে তার ঘর ॥
এথা মধু মাধবীএ যুক্তি কৈল সার।
আজি যাইব পলাইয়া ওঝার মন্দির ॥
তবে কন্যা বিষ লাড়ু গঠিয়া লইল।
প্রভুকে সম্বোধি কন্যা কান্দিয়া কহিল ॥
যদি সে ধাইতে নারি ধরে কোনজন।
এই বিষ লাড়ু খাই তেজিব জীবন ॥
রাত্রি নিশাভাগে তবে দেব ধর্ম স্মরি।
মধু সঙ্গে নিঃসরিল রাজার কুমারী ॥
দ্বার হোন্তে নিকলিতে দেখে কোতোয়াল।
ধর ধর বলিয়া যেহেন আইসে কাল।
ভএ মুহশ্চিত মধু না স্ফুরে বচন ॥
চিন্তএ কপট বুদ্ধি কুমারী তখন।
নারীর কপট বুদ্ধি পুরুষে না জানে।
শীঘ্রে উক্তি করি ভাণ্ডে কপট বচনে ॥
কন্যা বোলে কোতোয়াল সহজে বর্বর।
সখি সবে শুনিব না কর কোলাহল ॥
আহ্মি যে মাধবী জান রাজার কুমারী।
এথ রাত্রি আইলুঁ তোহোর রূপ হেরি ॥
এথ শুনি কোতোয়াল আনন্দ বিভোল।
পাইয়া অমৃত ফল কপি উল্লোল ॥
হাতে ধরি কন্যাক লইতে চাহে কোলে।
হাসিয়া মাধবী তাক মৃদ মধু বোলে ॥

বুঝি কোতোয়াল তুহ্মি ভুখিল কেশরী।
হাস-রস না জান খাইতে চাহ ধরি ॥
আগে ভুঞ্জ কোতোয়াল অমৃত সন্দেশ।
পাছে আহ্মি তুহ্মি রতি ভুঞ্জিব বিশেষ ॥
এথ শুনি কোতোয়াল করজোড় কৈল।
অস্তে ব্যস্তে মাধবীএ বিষ লাড়ু দিল ॥
কামভাবে খাএ পাপ না কৈল বিচার।
বিষে মুর্চ্ছিত কোতোয়াল দুরাচার।
দারুণ বিষের জালে তেজিল জীবন।
ওঝার ঘরেত গেল চলি দুই জন ॥
মধু-মাধবীকে দেখি ওঝা কুতুহল।
আদি অন্ত কথা মধু কহিল সকল ॥
তবে ওঝা মধু হোন্তে সে-মন্ত্র লইল।
মাধবীর মুখে নিয়া সে-মন্ত্র রাখিল ॥
মন্ত্র-বলে কৈল কন্যা পুরুষ আকার।
মধু-মাধবীর মনে আনন্দ অপার ॥
প্রভাত সমএ রাজা শুনি বিবরণ।
ছন্না সঙ্গে নাহি ঘরে কুমারী রতন ॥
লাজে শোকে বোলে রাজা কান্দিয়া আকুল।
স্থাবা ধন লোভ করি হারাইলুঁ মূল ॥
স্থাব্য হরি লোভে যেন চিন্তা পাই শোক।
এমত মরিব সব স্থাব্য হরি লোক ॥
পাপ পুত্র হোন্তে দুই কুল মজাইলুঁ।
রহিল অযশ নিজ সুতা হারাইলুঁ ॥
এইমতে অনুশোচ করন্ত রাজন।
ঘরে ঘরে চর সবে করে নিরীক্ষণ ॥
ওঝার ঘরেত গিয়া করন্ত বিচার।
মাধবী পুরুষ রূপ দেখিল গোচর ॥

মাধবীত মাধবীর লয়ন্ত উদ্দেশ।
কন্যা বোলে রাজ সুতা গেল কোন্ দেশ ॥
তবে ওঝা ব্রহ্ম রূপে মধু সঙ্গে লই।
নৃপ আগে গিয়া কথা কহে আগু হই ॥
তোহ্মার প্রসাদে রাজা পাইলুঁ নন্দন।
বধূ মোর কোথা আছে দেঅহ রাজন ॥
ঘাএত লবণ যেন কেহ দিল আনি।
করজোড়ে সকল কহিল নৃপমণি ॥
শুনি বিপ্র কান্দি বোলে মাথে মারি ঘাত।
ব্রহ্ম বধ ভাগি হৈলা আএ নরনাথ ॥
এ বলি কাটারি দিল গলের উপরে।
কান্দিয়া ভরত রাজা বিপ্র পাএ ধরে ॥
পাত্র মিত্র সবে বেঢ়ি বিপ্রক সান্ত্বাএ।
এক লক্ষ সুবর্ণ দিলেক নর রাএ ॥
কান্দি কান্দি সুবর্ণ লইল বিপ্র বর।
'মনে সুখ' ওঝা 'মুখে দুঃখ' গেল ঘর ॥
মাধবীক ধন দিয়া ওঝা হাসি বোলে।
এ ধন ভাঙ্গিয়া খাও মন কুতুহলে।
অবিলম্বে কার্য সিদ্ধি করিব নিশ্চিতে।
না কান্দিঅ বাপ মাও পাইবা দেখিতে ॥
এথা ছন্না হারাইয়া মারুত কুমার।
উনমত্ত হইয়া কান্দএ অনিবার ॥
ছন্না বলি ডাক ছাড়ি মৃতবৎ হাল।
ঘাএর উপরে যেন লাগি গেল শেল ॥
সহস্র সহস্র বৈদ্য চিকিৎসা করিল।
কেহ রাজপুত্র ভাল করিতে নাড়িল ॥
তবে সভা মধ্যে রাজা বোলে উচ্চস্বর।
যে করিতে পারে ভাল রাজার কুঞোরা।

প্রতিজ্ঞা করিলু˜ যেই মাগে সেই দিমু।
না দিলে 'গোবধ' লাগে নরকে পড়িমু॥
এথ শুনি বোলে ওঝা করি করজোড়।
করিব কুমার ভাল মন্ত্র বলে মোর॥
আজ্ঞা কৈলে দিব আনি মাধবী কুমারী।
কিন্তু সত্য করহ বাবিল অধিকারী॥
মাধবী যাহাকে বরে দিবা তারে দান।
নৃপে বোলে সত্য কৈলু˜ সভা বিদ্যমান॥
সত্য ভঙ্গে পঞ্চ মহাপাতক লাগএ।
এথ শুনি গেল ওঝা আপনা আলএ॥
আর এক মন্ত্র লেখি মধুমুখে দিল।
যেই ছন্না সেই ছন্না পুনি সে হইল॥
মাধবী পুরুষ রূপ লইল সঙ্গতি।
ছন্ন লই গেল যথা আছে নরপতি॥
কুমারে ধরিয়া ছন্না তুলিয়া লইল।
প্রিয়া দেখি মারুতে বুদ্ধি স্থির হৈল॥
পাত্রগণ সঙ্গে রাজা চাহে বিষাদিত।
ছন্না মুখ হোন্তে মন্ত্র লইল তুরিত॥
কথার ব্রাহ্মণী হৈল ব্রাহ্মণ কুমার।
দেখিয়া লজ্জিত হৈল মারুত অপার॥
তবে ওঝা মাধবী থু মন্ত্র লৈল কাড়ি।
আচম্বিত দেখে রাজা আপনা কুমারী॥
সলজ্জিত পড়ে কন্যা বাপের চরণ।
চিত্র পট প্রাএ স্তব্ধ পাত্র মিত্র গণ॥

[পাঁচটি পত্র নাই]

॥ রাজ-নীতি ॥

···চতুর্থে ভূমিক চাষা রাজ্যের জীবন।
ভূমি চষি খাএ দেখি মৃত্তিকা তুলন॥
যদি বুদ্ধিমন্ত হএ রাজ্য অধিকারী।
পরস্পর রাখিবেক ভিন্ন ভিন্ন করি॥
জলে অগ্নি মিশাইলে নিবাএ আনল।
দ্বন্দ্ব করিবেক কাকে কেহ কৈলে বল॥
দ্বাপরে বোলন্ত সভা করিব পালন।
বীর্য বুদ্ধি বাঢ়াইব সেনাপতি গণ॥
ধনুর্বাণ কবচ সৈন্যক চাহি দিব।
বিক্রম করএ জন প্রসাদে তুষিব॥
যুদ্ধ করি ধন পাই লেলাইব কাঢ়ি।
বিবর্তিয়া[১] দিব ধন মনে কৃপা করি॥
মন্ত্রী পাত্র কায়স্থবর তিন কর্ম রাখি।
প্রথমে বাঢ়াইব গুণ সব বুদ্ধি দেখি।
যার যেই যোগ্য কর্ম বুদ্ধি নিয়োজিব।
কার্য কৈলে তাহাকে যে প্রসাদে তুষিব।
দরিদ্র হইলে পাত্র নৃপতির ধন।
দরিদ্রতা হোন্তে নত হৈব পাত্রগণ॥
বিস্তর না দিব ধন আলস্য হইব।
ধন লোভে ঈশ্বরের কার্য না করিব॥

• ১ বিবর্তিয়া > বিবণ্টন ?

সাধুগণ পালিবেক দুই পরকার।
প্রথমে নৃপতি কৃপা করিব সভার ॥
মধুর শীতল জল পক্ষী পড়ি খাএ।
লবণ জলেতে পড়ি তিক্ত পাই ধাএ ॥
দ্বিতীয় ডাকাইতে পন্থে করিব নিধন।
গতাগত করিতে পড়িব সাধুগণ ॥
চাষাকে আপনে রাজা পালন করিব।
ভিন্ন জনে দ্বন্দ্ব কৈলে আপনে দণ্ডিব ॥
ধনিক রাজার চাষা যুদ্ধে সৈন্য হএ।
বল কৈলে যুদ্ধ কালে সৈন্য না যুঝএ ॥
সত্য বোলে যে সকলে সেবন্ত রাজারে।
নৃপতি বহুল কৃপা করিব তাহারে ॥
কিন্তু এথ কৃপা দেবে না করিব তাকে।
যে সহায় করিবারে পারএ রাজাকে ॥
সভএ রাখিব পুনি কৃপাহ করিব।
পরস্পর সেবকের প্রীতি করাইব ॥
পরিবাদ লোকভেদ কভো নাহি ধরি।
হএ ভাল হএ দোষ যাবত বিচারি ॥
দুই কর্ম করি রাজা রাখিবেক দেশ।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ হএ সবিশেষ ॥
দুই কর্মে এক জন না দি কদাচন।
এক হস্তে না শোভএ দুই শরাসন ॥
এক কর্ম দুইএ দিলে নিতি দ্বন্দ্ব হএ।
এক খাপে দুই খড়্গ যেন না শোভএ ॥
তৃতীয়া[ত্রেতা]বোলন্ত কিন্তু রাখিবেক চর।
সভানেক বার্তা যেন পাএ নিরন্তর ॥
সত্যবাদী দেখি চর রাখিব রাজন।
চরকে যে পুত্র তুল্য করিব পালন ॥
চর সে রাজার চক্ষু সব বার্তা কহে।
চর বিনে নৃপ ভাল-মন্দ না শুনএ ॥
এক মন্ত্রী রাজাকে কহিল উপদেশ।
নিতে কর্ম হোন্তে রাজা নষ্ট করে দেশ ॥
পাত্রগণ বার্তা যদি না শুনে নৃপতি।
পাত্রগণ লোক হিংসা করে প্রতিনিতি ॥
অকুলিনী দুষ্ট পাত্র রাজ্যে রাজ্য করে।
না বুঝিয়া দ্বন্দ্ব করে উত্তম জনেরে ॥
অহঙ্কারে রাজধানী ন্যায় না বুঝএ।
এ নীতি প্রকারে দেশ ভাঙ্গএ নিশ্চএ ॥
দ্বাপরে বোলন্ত আগে গুণ বিচারিব।
ক্রমে ক্রমে পাত্রগণ নৃপে বাঢ়াইব ॥
একেবারে সম্পদ হইলে গর্ব করে।
পুনি সেই সেবা করে ভাঙ্গএ ঈশ্বরে।
বাঢ়াইয়া টুটাইলে লোকে উপহাস।
উপহাস হএ কর্ম কিবা অবিনাশ ॥
রাজাকে যে দ্বন্দ্ব করি করিব প্রত্যয়।
পুরান সেবক বুলি না হৈব নির্ভয় ॥
দণ্ড করি কথদিন সভাএ রাখিব।
শুদ্ধভাব দেখিলে সে পুনি বাড়াইব ॥
শুদ্ধপাত্র মধ্যে এক হএ দুর্মতি।
তাহাকে বধিলে সব হয়ন্তি সুমতি ॥
অবশ্য বধিব তাকে দয়া পরিহরি।
এক দুষ্ট হোন্তে সব কুল যাএ চলি।
কিন্তু মহাপাত্রে যদি রাজা দোষী ভাবে
রাজ্য রক্ষামাত্র তার বাহুর প্রতাপে।
বন্দী করি রাখি তাক না বধি জীবন।
তাহাকে বধিলে বল পাএ শত্রুগণ ॥

বন্দী হোন্তে যদি পাপ নাহি শুদ্ধ মন।
তবে সে লইব রাজা তাহার জীবন ।।
সত্যকেতু বোলন্ত যে হএ সেনাপতি।
নৃপতিক সেবিব বুঝিয়া শাস্ত্র নীতি।
শাস্ত্র না বুঝিয়া যদি থাকে নৃপসঙ্গ।
অগ্নিতে পড়িয়া যেন দহএ পতঙ্গ ।।
প্রথমেহ নিরঞ্জন আজ্ঞা না এড়িব।
প্রভু যার ভাগ্য হরে নৃপ কি করিব।
প্রাণপণ করিবেক নৃপতি কারণ।
প্রাণ ভএ কভো ভঙ্গ না করিব রণ ।।
চরমুখে শত্রু বার্তা লৈব নিরন্তর।
নৃপতিক জানাইব সে সব উত্তর ।।
নৃপতি কহিতে কথা না হৈব বিমন।
এক মনে এক ধ্যানে শুনিব বচন ।।
শীঘ্রে শীঘ্রে এক করি নৃপতির আগে।
দুইজনে কথা না কহিব কোন পাকে ।।
এক আগে দুই জন কহিলে কথন।
ভাঙ্গএ মিত্রতা রুষ্ট হএ অকারণ ।।
একস্থানে নৃপতিএ কহিতে বচন।
আর জনে উত্তর না দিব কদাচন ।।
যদি বোলে নৃপতিএ না পুছিএ তোকে।
উত্তর দিবারে নারি মরিবেক শোকে ।।
পাত্রগণ সঙ্গে যুক্তি করিতে নৃপতি।
আগে না কহিব বুঝি সভার প্রকৃতি ।।
সভানের মর্ম বুঝি পাছে কহে গুণী।
আগে কহে লোকেরে যে শত্রু হিংসে পুনি ।।
না পুছিতে নৃপতিএ না কহে বচন।
পুছিলে সংক্ষিপ্ত করি কহে নিবেদন ।।

যে কথা লুকাএ রাজা না লইব ওর।
আপনা সম্পদ দেখে না হৈব ভোর ।।
নৃপতিএ বাঢ়াইলে গর্ব না করিব।
আপনারে সর্ব হোন্তে নিকৃষ্ট জানিব ।।
পূর্বপাত্র সকলেরে অবজ্ঞা না করি।
ইতর জানিয়া কোপে রাজ্য অধিকারী ।।
নৃপতি সমসর গিয়া কর্ম না করিব।
ভক্ষণে বাহনে জান তাহাকে শঙ্কিব ।।
সুসজ্জা করিয়া সৈন্য রাখিব যতনে।
ইঙ্গিত হইলে যেন ধাই যাএ রণে ।।
এক নৃপ মন্ত্রীস্থানে পুছিল যখন।
সৈন্য সজ্জা করিবে কি সঞ্চিবেক ধন ।।
পাত্রে বোলে ধন সঞ্চ ধন হোন্তে লোক।
নৃপ বোলে প্রত্যক্ষ দেখাও তবে মোক ।।
পাত্রে তবে মধু আনি দিল নৃপ আগে।
মধু দেখি মক্ষিকা আইল লাখে লাখে ।।
এক রাত্রি নৃপতিএ মন্ত্রীক জিজ্ঞাসে।
ধন কি অর্জিব সৈন্য রাখিব কি পাশে।
বোলে সৈন্য সজ্জা কর ধনে নাহি ফল।
নৃপে বোলে সমস্যা দেখাও মহাবল।
মন্ত্রী আনি মধু রাখে নৃপতি সাক্ষাত।
রাত্রি দেখি এক মাক্ষি না আইল তথাত ।।
নৃপ হোন্তে সৈন্য যদি মন দুঃখ পাএ।
বাম বুদ্ধি হএ সব রাত্রি তম প্রাএ ।।
যুদ্ধকালে ধন দিলে করএ যে রণ।
যুদ্ধ জিনি শত্রুএত হরএ সব ধন ।।
সৈন্য করে রাজ্য রক্ষা ধনে রাখে সৈন্য।
ধনে সৈন্যে সর্ব ধন রাখে অন্যে অন্য ।।

তৃতীয়াএ[ত্রেতাএ]বোলে আগে মন্ত্রী-পাত্রগণ।
এক মনে স্মরিবেক প্রভু নিরঞ্জন ॥
প্রভু সেবা আগে ভএ নৃপে না সেবিব।
যাকে প্রভু না বখিব নৃপে কি করিব ॥
এক মহামন্ত্রী স্থানে পুছিলা নৃপতি।
পাত্র-মিত্র যোগ্য কিবা বোল মহামতি ॥
মন্ত্রী বোলে চারি নীতি তুই এক কর্ম।
যাবত থাকএ সেই মূর্তিমন্ত ধর্ম ॥
নৃপে বোলে মহামন্ত্রী করহ বাখান।
কহিতে লাগিল মন্ত্রী নৃপতির স্থান ॥
চারি কর্মে এক কর্ম হৈব সাবধান।
কর্ম কৈলে হএ যেন পশ্চাতে কল্যাণ ॥
যে কার্য সঙ্কট তাত হৈব অচেতন।
শাস্ত্রেত সাধুক কর্ম করি সাবধান ॥
দাতা হৈয়া সন্তোষিব তপস্বী ভিক্ষুক।
দানে বিঘ্ন যাএ আশীর্বাদ করে লোক ॥
এই তিন কর্ম জান পরীক্ষিয়া চাহিব।
কার্যেত কুশল যেই আগে বাঢ়াইব ॥
কাল বুদ্ধি অনুসারী দিব প্রত্যুত্তর।
যে শত্রু পিষুন করে প্রবন্ধে তাড়িব।
রাজ্য উপলক্ষ্যে বলে যেন উফারিব।(?)
তুই কর্মে এক কর্ম করি প্রাণ পণ।
কার্য সাধি বাঢ়াইব নৃপতির ধন ॥
না হিংসিব প্রজাক পালিব পুত্রতুল।
রাজা প্রজা সন্তোষি রাখিব তুই কুল।
এ কর্ম যে করিলে শুনহ কহি সার ॥
কভো নাহি পাসরিব প্রভু নৈরাকার।

যথ কর্ম করে দেখিএ জানিব।
এই তুই পরকারে শত্রু পরাজিব ॥
লোক ‘পরে ‘কর’ নিতি নাহি বাঢ়াইব।
সংসারে অযশ মৈলে নরকে পড়িব ॥
ভাল ছাড়ি নৃপ স্থানে মন্দ কহে যবে।
সে পাত্র জীবন হোন্তে মৃত্যু ভাল তবে ॥
লোক হিত করিবেক মেঘের তুলন।
সর্ব স্থানে জল যেন বরিখএ ঘন ॥
উত্তম অধম প্রতি করিবেক হিত।
সূর্যের কিরণ যেন লাগে পৃথিবীত ॥
যথ কিছু ভাল করে সব আপনার।
ভাল কৈলে ভাল পাএ মন্দে মন্দ তার ॥
তুঃখিতেরে কৃপা করিবেক ভাল মতে।
তার তুঃখে কৃপা যেন করে আন মতে ॥
সব রাত্রি না থাকিব চন্দ্র হোন্তে দীপ্তি।
অর্দ্ধেক না হইলুম অমাবস্যা রাত্রি ॥
তুষ্টজন হিংসা হোন্তে প্রজাক পালিব।
গোধন সদৃশ প্রজা নিশ্চএ জানিব ॥
রক্ষক সদৃশ প্রাএ নৃপতি ঈশ্বর।
সিংহ-ব্যাঘ্র-সম জান তুর্জন বর্বর ॥
সেই সে তুর্জন মূঢ় পড়ি নিদ্রা যাএ।
গোঠে পশি শার্দূলে গোধন ধরি খাএ।
ঈশ্বরে লাঘব করে পাএ অপমান।
যেন প্রজা না পালিয়া পাত্র হএ জান ॥
ভিন্ন জনে ভাল মতে না করি বিচার।
নৃপ স্থানে না কহিব প্রশংসা তাহার ॥
না বিচারি তাক যদি নৃপক ভেটাএ।
পাছে সেই মন্দ হৈলে পাত্র লজ্জা পাএ।

যেই বস্তু উপরে রাজার যাএ মন।
সে বস্তু আপনে না রাখিব কদাচন॥
নৃপ আগে আপনাক এমত জানিব।
ইঙ্গিতেহি ধন-প্রাণ নৃপ আগে দিব॥
নৃপতির ধন লোভে না করিব মন।
ধন পত্নী সমতুল জানে বুধজন॥
ধন খাই অন্যায় কদাপি না বুঝিব।
নৃপেহ দণ্ডিব মৈলে নরকে পড়িব॥
যদি কেহ নৃপ চর্চা কহে আসি আগে।
সেই ক্ষণে শীঘ্রগতি দণ্ডিব তাকে॥
যদিবা না দণ্ডে তাকে নিষেধ করিব।
যদ্যপি না পারে এহ তথা না থাকিব॥
কাক যদি নৃপতির কোপ থাকে মন।
নহে অপবাদী হই থাকে সেইজন।
তান সঙ্গে হাসি-রসি কথা না কহিব।
না বসিব পাশে, তাকে নাহি প্রশংসিব॥
নৃপ মন বুঝিয়া করিব নিবেদন।
যে না বুঝি মন বোলে অকারণ॥
নৃপকার্য লক্ষ্যে নিজ কার্য নিবেদন।
যে করিতে পারে তাকে বোলে বুধজন॥
বহুলোক নিবেদনে না করিব দুঃখ।
ভাগ্যবন্ত দেখি তাক নিবেদিব লোক।
বিষয় জানিবা জান নিশির স্বপন॥
শীঘ্রে বাঢ়াইব ইষ্ট মিত্র বন্ধুগণ॥
যদি তোর হস্ত হোন্তে বিষয় খণ্ডিল।
যাবৎ জীবন মনে এ দুঃখ রহিল॥

যদি নৃপ নহে-যুক্তি কহে কদাচন।
সে যুক্তিএ রাজ্য নষ্ট নষ্ট হএ ধন॥
তথাপি সভার মাঝে না বলিব ভাল।
গোহারী[১] করিলে পাছে ঠেকএ জঞ্জাল॥
বিরলেত ভক্তি করি নিষেধ করিব।
বলাবল কথা নৃপ স্থানে না যাইব॥
পুত্র সম মিত্রজন রাখিবেক কাছে।
পুত্র হোন্তে খিক মিত্র মিত্র হৈলে সাঁচে॥
নিজ কার্য হেতু রাজ-কার্য না এড়িব।
যে কার্য দিয়া থাকে প্রাণান্ত করিব॥
এক পাত্র স্থানে পুছে একেক উত্তর।
কিসেরে না কর পাত্র উঞ্চ দিব্য ঘর॥
পাত্রে বোলে দুই ঘর আন্ধার সংসারে।
সম্পদের ঘর মোর জান রাজ-দ্বারে।
যথাত করিব বসি লোকের বিচার।
এহা হোন্তে ভাল ঘর কিবা আছে আর॥
বিপদের ঘর যে কহিতে বাঢ়ে দুঃখ।
যে ঘরেত বন্দী থাকে অপরাধী লোক॥
ত্রেতাএ কহিল যদি এ সব বচন।
দ্বাপরে কহন্ত তবে ভাবি নিজ মন।
নৃপতির পরিবার যথ পাএ গণ।
তার উপদেশ কহি শুন সর্বজন॥
নৃপতিক সন্তোষিতে আন মন না করিব।
নিরঞ্জনে কুপিলে নৃপতি কি করিব॥

---

১ গরিহ

প্রাণ সম পাত্র মিত্র রাখিবেক কাছে।
পাত্র হোন্তে অধিক মিত্র মিত্র হৈলে সাঁচে॥
যেন 'সূর্যবীর্য' 'বুদ্ধিমন্ত' দুই জন।
প্রাণপণ কৈল প্রাণ-মিত্রের কারণ॥
সত্যকেতু পুছে কহ অপূর্ব কাহিনী।
ত্রেতাএ কহন্ত পুনি নিজ মনে গুণী॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
শুনিতে উদ্‌গরে যেন অমৃতের ধার॥

॥ সূর্যবীর্য ও চন্দ্ররেখা উপাখ্যান ॥

সূর্য বংশে ভগীরথ অযোধ্যার পতি।
তান ভার্যা রূপবতী যেন কামরতি॥
স্রোত নামে হৈল তান মুখ্য-পুত্র বর।
শৌর্যবন্ত বীর্যবন্ত মহা ধনুর্ধর॥
হইল কনিষ্ঠ পুত্র সূর্যবীর্য নাম।
বলবন্ত বীর্যবন্ত রূপে জিনি কাম॥
সুবুদ্ধি পাত্রের সুত 'বুদ্ধিমন্ত' নাম।
কুমারের অনুরূপ মিত্র অনুপাম॥
উপাধ্যার স্থানে রাজা দিলা পঢ়িবার।
পঢ়িল বিবিধ শাস্ত্র বাক্য অলঙ্কার॥
একদিন নৃপতিএ করিল আদেশ।
রূপবতী করি শ্লোক রচিতে বিশেষ॥
নম্রশির লাজে কিছু না দিলা উত্তর।
কোপে গালি পাড়ে ভগীরথ নৃপবর॥
শাস্ত্র না জানিলে মূঢ় কুপত্র জন্মিলে।
সূর্য বংশে মোহর যে অকীর্তি অর্জিলে॥
মৃত্যুকালে পণ্ডিতে বিবিধ কাব্য করে।
সভা মধ্যে উত্তর না দিলে ভুঞ্জি মরে॥
পণ্ডিত হইয়া যদি না জানে উত্তর।
দীপ্তিহীন মণি যেন না লাগে সুন্দর॥
না পারে যে নর ঠাঁই উত্তর দিবারে।
কাঁচেত সুবর্ণ বেঢ়ি রত্ন যেন জড়ে॥

এ বলিয়া ঘরে পশিল নরনাথ।
কান্দি কান্দি গেল বীর সখার সাক্ষাৎ॥
শুন সখা বিদেশ-দণ্ড হৈল আহ্মি।
কহ সখা মোর সঙ্গে যাইবা কিবা তুহ্মি॥
বুদ্ধিমন্ত বোলে যে বাপধিক গুরুজন।
বাপ বোলে মাতৃ রাম করিল নিধন॥
বাপ গালি হোন্তে না ভাবিঅ দুঃখ মন।
বাপ মাও সন্তোষ, সন্তোষ নিরঞ্জন॥
পুনি বোলে প্রতিজ্ঞা করিল বীর মনে।
হরে গৌরী দান করে প্রতিজ্ঞা কারণে॥
রাজা হৈয়া যাহার প্রতিজ্ঞা নাহি রহে।
অশুদ্ধ সুবর্ণ যেন দহে নাহি সহে॥
নিশ্চএ যাইব আহ্মি শুন সখা সার।
যাইবা কি না যাইবা দেঅ যে উত্তর॥
বুদ্ধিমন্ত বোলে যবে কণ্ঠে থাকে প্রাণ।
সখা আহ্মি তোকে না ছাড়িব দঢ় জান॥
তবে দুই সখা করি অশ্বে আরোহণ।
হাতে ধনুর্বাণ প্রবেশিল মহাবন॥
হেথা পুত্র হারাইয়া নৃপ ভগীরথী।
বিস্তর কান্দিলা নিজ পত্নীর সঙ্গতি॥
পাত্র সব আদেশিলা চাহিবারে বন।
এথা বহুদূরে গেলা সেই দুইজন॥

ভ্রমিতে দণ্ডক বন গেলা এক দেশ।
মণিপুর নামে লঙ্কা-সম সবিশেষ॥
মণিচন্দ্র নামে রাজা সে দেশে আছিল।
ভীষণ রাক্ষস মণিচন্দ্রকে বধিল॥
রাজ্যের সকল লোক করিল নিধন।
রাজ-মাতা দেখি মনে চিন্তিয়া ভীষণ॥
সতী নারী সুভদ্রাক মনে করি ভএ।
মাও করি রাখিলেক ভীষণ দুর্জএ॥
রাজকন্যা চন্দ্ররেখা অতি সুকুমারী।
নন্দিনী করিয়া রাখে মনে কৃপা করি॥
আন রাজ্যে গেল চলি ভীষণ দুর্মতি।
চন্দ্ররেখা থাকে পিতামহী সঙ্গতি॥
বৎসরেত একবার আসি নিশাচর।
দুইজনা চাহি পুনি যাএ দেশান্তর॥
শিশুকাল গঞি কন্যা সম্পূর্ণ যৌবন।
বন মধ্যে আছে যেন অমূল্য রতন॥
তথা গিয়া দুই সখা ভ্রমি সর্বদেশ।
শূন্য দেশ দেখি মনে উদ্বেগ বিশেষ॥
রাজপুরী প্রবেশিয়া দেখে বৃদ্ধতমা।
বৃদ্ধকালে দেখে যেন কনক প্রতিমা॥
নিকটে চলিয়া গেলা সখা দুইজন।
দেবী কহে যেন মতে রাজার নিধন॥
খাইলেক রাক্ষসে রাজ্যের যথ লোক।
পৌত্রী সঙ্গে দয়া করি রাখিলেক মোক॥
বৎসরে বারেক আসি চাহে নিশাচর।
কিসকে আইলা বাছা এদেশ ভিতর॥
প্রণামিয়া দুই সখা বলে করজোড়।
বধিব রাক্ষস দেবী প্রসাদে তোহর॥

এথ শুনি সুভদ্রাএ হরষিত মন।
ভুঞ্জাইল সখা দুই বিবিধ ব্যঞ্জন॥
ভোজন করিয়া তবে সখা দুইজন।
ক্ষণেক যাইয়া নিদ্রা লভিল চেতন॥
দেশ ভ্রমিবারে যাএ অশ্বে আরোহিয়া।
কহন্ত সুভদ্রা দুই সখা সম্বোধিয়া॥
তিনদিকে বেড়াইও নৃপতি নন্দন।
না যাইবা দক্ষিণ দিকেত কদাচন॥
দক্ষিণেত এক যোগী মায়াবীত আছে।
মন্ত্রবলে দর্পণের নারী সৃজিআছে॥
সহজেই মায়াবীত নানা মায়া করে।
যে দেখে সে-রূপ ফিরি আসিতে না পারে॥
রাজপুত্র আইল সেই নারীক দেখিতে।
দেখিয়া মুছিচত হৈল নারিল আসিতে॥
পাইতে খেচর সিদ্ধি যোগী পাপাশএ।
বন্দী করি থুইল সেই রাজার তনয়॥
আর এক রাজপুত্রে যোগী পাএ যবে।
সব বলি দিয়া হর পূজিবেক তবে॥
যদি সে দক্ষিণে যাও সে কন্যার পাশ।
মায়া মোহি রহিবা হইব সর্বনাশ॥
সুভদ্রাক প্রণামিয়া সখা দুইজন।
সর্বদেশ বেড়ায়ন্ত হরষিত মন॥
উত্তর-পশ্চিম-পূর্ব বেড়াইলা যবে।
সখা প্রতি সূর্যবীর্য বলিলেক তবে॥
চল সখা দক্ষিণে দেখিএ কি আছএ।
আছএ সুন্দর কন্যা মোর মনে লএ॥
আপনার পৌত্রী মোকে দিবারে বোলএ।
সুভদ্রা ভাণ্ডিল মোকে হেন মনে লএ॥

দর্পণের মনুষ্য বা কেমনে সৃজিব।
যত্তপি প্রবালে করে সে কেনে হাসিব।
বুদ্ধিমন্ত বোলে সখা না হএ উচিত।
সতী সুভদ্রারে বাক্য এহি নাহি হিত॥
সখা-বাণী না আদরি রাজার কুমার।
চাহিতে দক্ষিণ দিকে চলিল সত্বর॥
সচিন্তিতে পাছে যাএ মন্ত্রীর নন্দন।
দক্ষিণে ভ্রমিতে দেখে এক বৃন্দাবন॥
তার মাঝে এক ঘর সুবর্ণ নির্মিত।
ঘর মধ্যে সিংহাসন রত্নে বিরচিত॥
সিংহাসনে বসি আছে সুন্দর কুমারী।
ত্রিলোক মোহিনী কন্যা রূপে বিদ্যাধরী॥
কামভাবে গেল তার কাছে নৃপবর।
মরমে মারএ সান্ধি কাম পঞ্চশর॥
অশ্ব এড়ি বসিল কুমার সিংহাসন।
ঈষৎ হাসএ বালা সভঙ্গ নয়ন॥
কামভাবে ধরিবারে চাহএ কুমার।
ধরিতে অন্তর হএ নারে ধরিবার॥
হাসি হাসি মায়ামতী খেলে পাশা সারি।
মুহুশ্চিত কুমার রহিল মুখ হেরি॥
বুদ্ধিমন্ত পাত্র সুত না যাএ নিকট।
অশ্বের নিকট থাকি চিন্তএ সঙ্কট॥
সখা সখা বলি ডাকে মন্ত্রীর নন্দন।
উত্তর না দেয়ন্ত নৃপ ভাবে অচেতন॥
বুদ্ধিমন্ত বোলে স্মর সুভদ্রা বচন।
এই সে মায়ার কন্যা ভাবি চাহ মন॥
এথেকেহ নৃপ সুত না দিল উত্তর।
পুনি গজ্জি পাত্রবর ডাকে উঞ্চস্বর॥

নৃপে বোলে যাও সখা যথা তোর মন।
না পাত জঞ্জাল সখা ধরহোঁ চরণ॥
পুনি পুনি পাত্র সুতে বহুবিধ কহে।
না কহে সিদ্ধান্ত বীর ফিরিয়া না চাহে॥
প্রভাতে আইল বেলি শেষ হই গেল।
মনে মনে গুণে পাত্র পরমাদ ভেল॥
সন্ধ্যাএ আসিয়া যোগী করিব নিধন।
এ বুলিয়া কান্দে পাত্র শোক ভাবি মন॥
নিকটে না যাএ রূপ-মোহ হএ করি।
তেকারণে সখাক আনিতে নারে ধরি॥
বুদ্ধি করি বুদ্ধিমন্ত চলিল সত্বর।
সুভদ্রার আগে গিয়া কান্দে উঞ্চস্বর॥
তোহ্মার আদেশ দেবী করিয়া লঙ্ঘন।
মায়াএ মোহিত হৈল নৃপতি নন্দন॥
সুভদ্রাএ বোলে পাত্র ছোড় মিত্র আশ।
দৈবহি যোগীর হাতে হইল বিনাশ॥
সুভদ্রার বাক্য জান ঘাএত লবণ।
মিত্র মিত্র বলি পাত্র হারাল চেতন॥
অস্তে ব্যস্তে সুভদ্রাএ গাএ বাউ করে।
কন্যাকে ডাকিল জল আনিয়া দিবারে॥
পিতামহী হাতে জল কন্যা আনি দিল।
জ্ঞান লভি পাত্র সুতে কুমারী দেখিল॥
আচম্বিত চন্দ্র যেন দেখে মহী তলে।
দেহকান্তি দেখিলেন্ত ধরণী উঝলে॥
চিন্তি পাত্রে মোহে ধরি সুভদ্রার পাএ।
তোহ্মার প্রসাদে দেবী মিত্র রক্ষা পাএ॥
ভগীরথ পুত্র বীর সূর্য বংশোদ্ভব।
তান সঙ্গে সম্বন্ধ না হএ অসম্ভব॥

যোগী হোন্তে করিয়া তাহান পরিত্রাণ।
নিজ পৌত্রী চন্দ্ররেখা তাত কর দান॥
যোগীর মায়ার কন্যা যেন রূপবতী।
দশগুণ হএ রূপ চন্দ্ররেখা সতী॥
আজ্ঞা কর তথা লই রাজার কুমারী।
দেখিলে আসিব কন্যা মায়াবতী ছাড়ি॥
এথ শুনি সুভদ্রাএ কৈলা অঙ্গিকার।
আজ্ঞা দিলা তথা চন্দ্ররেখা যাইবার॥
যখনে দেখিল কন্যা রাজার কুমার।
সেই ধরি দগধে পাপিষ্ঠ পঞ্চশর॥
আর পিতামহী আজ্ঞা দিলেক যাইতে।
অশ্বে চড়ি চন্দ্ররেখা চলিল তুরিতে॥
কামভাবে রাজকন্যা অশ্ব চালাএ বেগে।
কান্দিয়া কান্দিয়া বুদ্ধিমন্ত ধাএ আগে॥
দেখিলেক গিয়া কন্যা বিরলে বসি সঙ্গে।
হাসি হাসি পাশা খেলে অতি মনোরঙ্গে॥
ধরিতে মায়ার কন্যা অন্তরীক্ষ[১] হএ।
দেখিয়া কুমার দেহ কামানলে দহে॥
কাছে গিয়া বুদ্ধিমন্তে ডাকে উঞ্চস্বর।
হের আহ্মি ডাকি সখা অবধান কর॥
না কহে সিদ্ধান্ত বীর কান্দে পাত্র মণি।
বিস্তর পাড়িয়া গালি গর্জে পুনি পুনি॥
রম্ভা-ভাবে দেখ মধুকৈটভ বিনাশ।
গৌরী হেতু মহেশ সর্বাংশে হএ নাশ॥
ইন্দ্র-চন্দ্রে লজ্জা পাএ নারীর কারণ।
নারীরূপে মগ্ন নহে বুদ্ধিমন্ত জন।

মায়াবীত ছাড়িয়া সখারে চাহ ফিরি।
চন্দ্ররেখা চন্দ্রমুখী রাজার কুমারী॥
এথ শুনি চাহে বীর আড় আঁখি করি।
দেখিল সুরূপ কন্যা রূপে বিদ্যাধরী॥
অর্ধচন্দ্র ললাট সিন্দূর যেন সূর।
অপরূপ বিশেষক[২] যেন রাহু কর।
বেঢ়িয়া কানড় খোপা কুন্তল রচিত।
মেঘে ঝাপি তারাগণ রহে বিপরীত॥
খোপা বেঢ়ি মুক্তা দাম ঝিলি-মিলি করে।
তমসী রজনী মেহু বিজুলি সঞ্চারে॥
অপরূপ ভুরু ফণী ধরিল গরুড়।
গজ মুক্তা শোভে নাশা খগচঞ্চু তুল॥
মুখ দীপ নয়ন খঞ্জন ভুরু ফণী।
দেখি শুভদিন হেন মানে নৃপমণি॥
বান্ধুলি অধর পরে মুকুতা দশন।
তাত অপরূপ ঝরে অমিয়া বচন॥
অনেক তিলেক গণ্ডে শোভে পত্রবলি।
চন্দ্রে ভেল কলঙ্ক কমলে শোভে অলি॥
অপরূপ কম্বুকণ্ঠে শোভে মুক্তা হার।
সুরুচির অলি বীর রহে গঙ্গা ধার॥
সুবলিত বাহুলতা রক্ত করতল।
অপরূপ মৃণালেত এ থল কমল॥
অপরূপ থল-কমলেত পঞ্চবাণ।
কাম পঞ্চবাণে জিনে অঙ্গুলির ঠাম॥
তাত অপরূপ বড় চান্দ পাঁতি পাঁতি।
সলজ্জিত প্রবাল দেখিয়া নখ জুতি॥

১ অন্তরীক্ষ—'শূন্য বা অদৃশ্য' অর্থে ২ বিশেষক—তিলক

হেম লতা সমতুল কুচ গিরি ধরে।
অপরূপ ক্ষীণ মাজা ভারে ভাঙ্গি পড়ে॥
নাসা বলি সর্ব জনে মনে ভাএ ভএ।
নাভি সরোবর বলি অনঙ্গ এড়ি ধাএ।
ধাইতে না পারে ভএ গিরি মাঝে গড়ে।
বিষ ভএ খগপতি নাগ নাহি ধরে॥
নিঃসর নিশুম্ভ বাম সিংহাসন চারু।
বিপরীত সে রাম-কদলি উরু চারু॥
অঙ্গুলি চরণ কলী চম্পক কমল।
হেম-কান্তি দেহ মৃগমদ পরিমল॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করেত কঙ্কন।
পরিধানে পাটাম্বর নানা আভরণ॥
নূপুর চরণে বাজে সে গজ-গামিনী।
মৃদু মধু ভাষে কন্যা ছটকে দামিনী॥
ভুরু ধনু অঞ্জনে রঞ্জিত চাপগণ[১]।
হানএ কটাক্ষ বাণ হাসি পুন পুন॥
অপরূপ দেখি ধান্ধা রাজার কুমারী।
কিবা রতি সীতা সতী হরের যে গৌরী॥
দেখি রবি-রথ রহে, মুনি তপ ছাড়ে।
দেখি মুহুশ্চিত বীর আপনা পাসরে॥
ধৈর্য ধরি সূর্যবীর্য শুন প্রাণ মিত।
আপনে আনিলা নারী তোহ্মার উচিত॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে আহ্মি যোগ্য নহি তার।
কোথাত অমৃত ফল কপির আহার॥
আপনার পত্নী সখা করহ গ্রহণ।
ছোড় মায়াবীত সখা ধরহোঁ চরণ॥
একে চাএ আরে পাএ মৃত কণ্ঠে সুধা।
অচাখা[২] অমৃত ফল জাত থাকে হুধা[৩]॥
অস্তে ব্যস্তে গেল বীর চন্দ্ররেখা পাশ।
নাচে বুদ্ধিমন্ত মনে কুতুহল হাস॥
পাত্রে বোলে দিন গেল না ভেল চেতন।
এথ দূর চন্দ্ররেখা আনিতে কারণ॥
নৃপে বোলে তিলেক আছিল মনে লএ।
তোহ্মার প্রসাদে সখা ঘুচিল সংশয়॥
কন্যা লই অশ্বে তবে আরোহে কুমার।
বুদ্ধিমন্ত উঠিল তুরঙ্গে আপনার॥
সুভদ্রা গোচরে চলি গেলা তিনজন।
প্রণমিয়া কহিলা সকল বিবরণ॥
তবে দেবী সুভদ্রা চাহিয়া শুভক্ষণ।
চন্দ্ররেখা দান কৈলা কুমারের স্থান॥
চন্দ্ররেখা সঙ্গে নৃপ গেলা বাসা ঘরে।
বুদ্ধিমন্ত রহিলেক সুভদ্রা গোচরে॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
যুগ-সংবাদের কথা অমৃতের ধার।

১ চাপগণ—ধনুরাশি ২ এচকি ৩ হুধা—শুধু, অনর্থক

॥ সম্ভোগ ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

প্রথম শৃঙ্গার বালা চন্দ্ররেখা শশীকলা।
লাজে অবনত নম্রশির।
করে ধরি নৃপবর বৈসাএ উরুর পর
কামবাণে হইল অস্থির ॥
হৃদএ হৃদএ জড়ি গাঢ় আলিঙ্গন করি
বিমুড়িয়া কুচ ঘন পীন।
যেন হেমগিরি' পরে গৈরিক নির্ঝর ঝরে
আলখ (অলক্ত) নখের দিল চিন ॥
অধরের মধু পিএ যে স্বাদে রমএ প্রিএ
পদ্মে জেন ভুখিল ভ্রমর।
দশন মুকুতা কারি তোষএ সত্বর আড়ি
এক করি অধরে অধর ॥
চন্দ্ররেখা গৌর দেহা দেখি দেখি বাড়ে নেহা
নৃপসুত নবঘন শ্যাম।
হৃদএ হৃদএ এক করি মোহন অনঙ্গ কেলি
নীলমণি জড়িল কাঞ্চন ॥
চুম্বিল কজ্জল কেশ চুম্বএ কপাল দেশ
রাহুএ গ্রাসিল শশী কলা।
কুমারী মধুর ভাষে ঈষত ঈষত হাসে
যেন চলে চঞ্চল চঞ্চলা ॥
পুনি চন্দ্ররেখা বালি ভুরুধনু করি বালি
কটাক্ষ বিশিখ ঘন হানে।
উল্লাসি কুসুম ধনু কামবাণে পুন পুন
দোঁহকে বিন্ধএ পঞ্চবাণে ॥
কামে বিচলিত মন নৃপসুত অচেতন
উরু উরু জড়ি কেলি করে।
বসিয়া মদন খাটে যাইয়া বিরহ ঘাটে
মজ্জি গেল রসের সাগরে ॥
জঘন জঘন আড়ি হৃদে হৃদে এক করি
অন্তে অন্তে চুম্বএ বদনে।
ক্ষেণে রাহু পিএ শশী ক্ষেণে বিপরীত হাসি
চান্দে গিলে শৃঙ্গার নন্দনে ॥
পাএ ধরি নরপতি কাকুতি করএ অতি
কর প্রিএ রতি বিপরীত।
চন্দ্ররেখা চন্দ্রমুখী পতির আদেশ রাখি
বিপরীত করে আনন্দিত ॥
বিপরীত রণ ভেল লাজ-ভএ দূরে গেল
স্বামী মুখ চুম্বএ সঘন।
যেন অভিনব শশী রাহুএ গিলএ আসি
বিপরীত বিধির ঘটন ॥
সঘন তাড়নে রামা চন্দ্ররেখা অনুপামা
শ্রম পাই বহে ঘন শ্বাস।
শ্রমপুরে ঘর্মবিন্দু সুধা ক্ষেপে মুখ ইন্দু
দেখি মন অধিক উল্লাস ॥
হৃদের কাঞ্চুলি ফাড়ি করে কুচ কুম্ভ মুড়ি
কুমারে করএ আলিঙ্গন।
ছিণ্ডিল মুকুতাহার খসিল কুন্তল ভার
কেশ আগে ঝরে পুষ্পগণ ॥
বিপরীত রণ দেখি সহজে চকোর পাখী
একেবারে রাহুএ গরাসে।
সিন্দুর দিনেত শশী বদন ঝাঁপিল আসি
চিকুর-রাহুএ চারিপাশে।

চকিত চঞ্চল অক্ষি সহজে চকোর পক্ষী
মিত্র শোকে জগমগি ভেল।
চান্দ দেখি রাহু কোলে কেশে পুষ্প মুদ্রা উলে
ভএ ঠাঁই ঠাঁই হই গেল ॥
তাত অপরূপ বরে হেমলতা গিরি ধরে
হেমলতা কুচগিরি সরে।
ভার দোলে নিরন্তরে ক্ষীণ মাজা ভাঙ্গি পড়ে
কাঞ্চুলি বিহীন কুচ ভারে ॥
দেখি বিপরীত রণ ভঙ্গ দিল সে মদন
তেজিয়া কুসুম ধনুর্বাণ।
ঊনবিলা গিরিবালা চন্দ্ররেখা শশীকলা
শিখিনীত দেহ কম্পমান ॥

কঙ্কন বিজএ গাজে চরণে নূপুর বাজে
বিপরীত জয় জয় ধ্বনি।
ভঙ্গ দিল কামরাএ বিজয় বাদিত্র বাহে
বিপরীত বিপরীত পুনি ॥
সিন্দুরে ভাসিয়া গেল কজ্জল লোলিত ভেল
চান্দ মুখে কলঙ্ক পরশে।
অধর বিরস ভেল বেশ সব দূরে গেল
অভিমানে পাটাম্বর বাসে ॥
সন্তোষে হরিষ মতি পাখালিয়া শীঘ্রগতি
পুনি সব করাইল বেশ।
মোহাম্মদ খানে ভণে শুনি গুণিগণ মনে
আনন্দে আনন্দ সবিশেষ ॥

॥ সূর্যবীর্যের স্বদেশ যাত্রা ॥

(পয়ার ছন্দ)

এই মতে কেলি নির্বহিল প্রতিনিতি।
চন্দ্ররেখা সূর্যবীর্য যেন কামরতি ॥
শুভক্ষণে চন্দ্ররেখা হৈল গর্ভবতী।
দশমাস দশ দিন হইল পূর্ণিতি ॥
প্রসবের কাল যদি হইল নিকট।
বোলন্ত সুভদ্রা দেবী শুনিয়া সঙ্কট ॥
বৎসরেক পূরিল আসিব নিশাচর।
চল নিজ দেশে যাও নৃপতি কুমার ॥
সূর্যবীর্য বোলে মোক কা'ক নাহি ভএ ॥
বধিব রাক্ষস দেবী না গুন সংশএ ॥
দেবী বোলে বালক না বুঝ বলাবল।
বহু সৈন্য সাজিলে হারএ আখণ্ডল ॥

বহু পিপীলিকা নাগ পারে ধরিবার।
যুক্ত নহে যুদ্ধ চল দেশে আপনার ॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে যদি নিষেধঅ রণ।
আপনা নাত্নী সঙ্গে চলহ আপন ॥
দেবী বোলে যাবৎ না বধি পুত্র বৈরী।
শুন বুদ্ধিমন্ত আহ্মি যাইতে না পারি ॥
ক্ষেত্রীকুলে জন্মি বৈরী যে নাহি উদ্ধারি।
ক্ষেত্রীকুল মহাজনে তাক না আদরি ॥
পুনি পুনি দুই সখা বিস্তর কহিল।
প্রতিজ্ঞা করিল দেবী আনিতে নারিল ॥
আজ্ঞা দিলা চন্দ্ররেখা সঙ্গে যাইবার।
তবে পিতামহীরে করিলা পরিহার ॥

মুখে চুম্বি সুভদ্রাএ কহে বহু নীতি।
কথঞ্চিৎ পতি সঙ্গে চলিলেন্ত সতী ॥
দেবী প্রদক্ষিণ করি চলে তিনজন।
কন্যা সঙ্গে অশ্বে উঠে নৃপতি নন্দন ॥
নিজ অশ্বে আরোহিল পাত্রের কুমার।
রাজ্য এড়ি প্রবেশিল বনের মাঝার ॥
সর্বদিন হাটন্ত রহন্ত রাত্রিকালে।
নিদ্রা যাএ রাজপুত্র কন্যা লই কোলে ॥
হাতে খড়্গ অর্ধরাত্রি জাগে পাত্রবর।
শেষ অর্ধরাত্রি জাগে পুনি পাত্রবর ॥
এই মত উদ্দেশি যায়ন্ত নিজ দেশ।
আর দিন পন্থশ্রম পাইয়া বিশেষ ॥
দিনশেষে রহিলেক বট-বৃক্ষ তলে।
নিদ্রা যাএ রাজপুত্র কন্যা লই কোলে ॥
বাসা করি রহিয়াছে মন কুতুহলে।
তাত রাজপুত্র-বর বধূ করি কোলে ॥

।। গৃধ-গৃধিনীর কথোপকথন ।।

গৃধিনী বোলএ গৃধ দেখ মিত্র লাগি।
সাধু পাত্র একসর বনে রহে জাগি ॥
ঘোর অন্ধকার রাত্রি জাগে একসর।
মিত্র চারি পাশ ফিরে হাতে ধনুশর ॥
গৃধ বোলে এথ দুঃখ করে অকারণ।
রাখিতে নারিব মিত্র হইব নিধন ॥
গৃধিনী বোলএ কেনে মরিব কুমার।
গৃধ বোলে দেশে যদি যাএ আপনার ॥
শুনি তার বাপ ভগীরথ নরপতি।
দিয়া পাঠাইব অশ্ব পবনের গতি ॥
যদি সেই অশ্বে উঠে কুমার দুর্জএ।
অশ্ব হোন্তে পড়ি বধ হইব নিশ্চএ ॥
গৃধিনী বোলএ গৃধ কৃপা কর মোরে।
কহ কোন্ বুদ্ধিএ কুমার নাহি মরে ॥
গৃধে বোলে যদি মিত্রে এক কর্ম করে।
যাবৎ কুমার সেই অশ্বেত না চড়ে ॥
শীঘ্রে গিয়া কাটিব অশ্বের চারিপদ।
রহিব কুমার তবে ঘুচিব আপদ ॥
কিন্তু এই কথা সব যদি কদাচন।
আর মনুষ্যেরে কহে পাত্রের নন্দন ॥
অঙ্গের চতুর্থভাগ পাষাণ হইব।
জানু-সম শিলা হই চলিতে নারিব ॥
এথ কহি দোন পক্ষী নিঃশব্দে রহিল।
একমনে পাত্র সুতে সকল শুনিল ॥
দ্বিতীয় প্রহর জাগে লই অস্ত্র পাণি।
বনজন্তু মারে দিব্য দিব্য বাণ হানি ॥
এই মত নিশাভাগ গঞি গেল যবে।
গৃধে সম্বোধিয়া শীঘ্রে গৃধিনী বোলে তবে ॥
দেখ প্রভু সাধু সাধু মন্ত্রীর নন্দন।
মিত্রের নিমিত্ত নিজ প্রাণ করে পণ ॥
গৃধ বোলে এথ দুঃখ নিষ্ফল হইব।
রাখিতে নারিব তবে নিধন হইব ॥
পুছিল গৃধিনী যদি কহে গৃধবর।
যদি অশ্ব কাটিয়া যে পাড়ে মিত্রবর ॥
পুত্রবধূ ঘরে নিয়া নৃপ ভগীরথী।
ভুঞ্জিতে 'ভুঞ্জন' দিব হরষিত মতি ॥

খাইলে প্রথম গ্রাস কুমার মরিব।
কিন্তু মিত্র এক কর্ম তখনে করিব ॥
খাইতে প্রথম গ্রাস রাজার কুমার।
করঘাত হানি মিত্রে ফেলিব সত্বর ॥
বুদ্ধিমন্তে পারে যদি এথ করিবার।
রাখিতে না পারে কেনে মিত্র আপনার ॥
কিন্তু এক কথা যদি কার স্থানে কহে।
অর্ধ অঙ্গ পাষাণ নিশ্চএ তার হএ ॥
এথ শুনি পাত্র-পুত্র সচিন্তিত মন।
তথাপিহ সূর্যবীর্য না ভেল চেতন ॥
পন্থশ্রম নিদ্রা যাএ নৃপতি সন্ততি।
স্নেহভাবে না চেতাএ পাত্র শুদ্ধমতি ॥
তৃতীয় প্রহর আগে বনে একসর।
সিংহ-ব্যাঘ্র ভএ মনে অতি ঘোরতর ॥
গৃধিনী বোলে মোর কথা শুনহ প্রাণনাথ।
হেন মিত্র ভাব বোল শুনিছ কোথাত ॥
সাধু সাধু বুদ্ধিমন্ত ধন্য তার কুল।
সংসারেত মিত্র নাহি তার সমতুল ॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভএ মনে জাগে একসর।
সেহভাবে না জাগাএ নৃপতি কুমার ॥
নৃপে বোলে এথ দুঃখ করি নাহি কাজ।
তথাপি মরিব সূর্যবীর্য যুবরাজ ॥

গৃধিনী বোলএ প্রভু করি পরিহার।
কি হেতু মরিব বোল কেমতে উদ্ধার ॥
গৃধী বোলে দুই দশা এড়াইল যবে।
নৃপতিএ বাসাঘর নির্মি দিব তবে ॥
সেই ঘরে প্রবেশিতে নৃপতি নন্দন।
গৃহ দহি নারী সঙ্গে পাইব নিধন ॥

যদি মিত্র আগে গিয়া দহে সেই ঘর।
তবে সে এড়াএ সূর্যবীর্য ধনুর্ধর ॥
এথ সব কথা যদি পাত্রের কুমার।
নরলোক স্থানে কহে না করি বিচার ॥
কণ্ঠ সম শিলা তার হইব নিশ্চএ।
দেবতুল্য মোর বাক্য কভো না লড়এ ॥
এথ শুনি বুদ্ধিমন্ত কান্দে শোক মন।
দুঃখের উপরে দুঃখ ঘাএত লবণ ॥
চতুর্থ প্রহর পুনি জাগে এক সর।
ঘূর্ণিত যুগল আঁখি শরীর ঝামর ॥
পুনি বোলে গৃধিনীএ গৃধ সম্বোধিয়া।
দেখ মিত্র বলি' মিত্র রহিল জাগিয়া ॥
গৃধ বোলে সঙ্কট তথাপি বড় আছে।
যদি মিত্র রাখিবারে না পারএ পাছে ॥
গৃধিনী বোলএ কহ ধরম চরণে।
রাখিতে পারিব মিত্র কিসের কারণে ॥
গৃধ বোলে তিন দশা এড়াইল যবে।
আর গৃহ নির্মি দিব নৃপতিএ তবে ॥
সেই গৃহে কুমার কুমারী দুইজন।
সিংহাসনে শুতিবেক নিদ্রা অচেতন ॥
নিশা ভাগ কালে এক নাগ আচম্বিত।
ফটিকের স্তম্ভ বাহি নামিব তুরিত ॥

নাগে দংশি কন্যা সঙ্গে বধিব কুমার।
গৃধিনী বোলএ কহ কেমনে উদ্ধার ॥
গৃধ বোলে খড়্গ লই গরুড় আকৃতি।
শিহরে রহিব জাগি মিত্র সেই রাত্রি ॥
স্তম্ভেত নামিতে নাগ সেই খড়্গ ধরি।
সত্বরে কাটিব নাগ সপ্ত খণ্ড করি ॥

বুদ্ধিমন্ত এথ যদি পারে করিবার।
রাখিব আপনা মিত্র রাজার কুমার ॥
আহ্মার যথেক কথা বুদ্ধিমন্তে শুনে।
এসব বৃত্তান্ত যদি কহে কার স্থানে ॥
সর্বাঙ্গ পাষাণ তান হইব নিশ্চএ।
এ বলিতে হই গেল প্রভাত সমএ ॥
তবে চেতাইয়া সূর্যবীর্য ধনুর্ধর।
সলজ্জিতে মিত্রক গঞ্জিলা বহুতর ॥
পন্থশ্রমে তোহ্মার যে নাহিক চেতন।
বনে আসি এথ দুঃখ পাও কি কারণ ॥
তবে তথা হোন্তে সূর্যবীর্য দুইজন।
দিনে দিনে লঙ্ঘি যাএ দণ্ডক কানন ॥
আর বৃন্দাবনে গেলা সরোবর তীরে।
সখা সঙ্গে রহিলেক সূর্যবীর্য বীরে ॥
গর্ভের সম্পূর্ণকাল যদি সে হইলা।
হইল প্রসবকাল কুমারী কহিলা ॥
শুভদিনে শুভক্ষণে প্রসবিল বালা।
পুত্র এক উপজিল যেন চন্দ্রকলা ॥
চন্দ্রবীর্য হেন নাম জনকে ধরিল।
মাস এক বৃন্দাবনে কৌতুকে রহিল ॥
বন-মৃগ মারি মাংস আনে পাত্রবর।
ফলাফল আনিয়া জোগায় নিরন্তর ॥
কন্যা যদি সুস্থ হৈল চলিলেন্ত পুনি।
কথকালে পাইলা অযোধ্যা রাজ্য ধনি ॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
যুগ-সংবাদের কথা অমৃতের ধার ॥

॥ বুদ্ধিমন্তের অদ্ভুতাচরণ ॥

(খর্ব ছন্দ)

চরমুখে শুনি ভগীরথ নরপতি।
বিস্তর উৎসব কৈলা হরষিত মতি ॥
পাত্রমিত্র পাঠাইল বাড়ি আনিবার।
আপনেহ পাছে চলি যাএ নৃপবর ॥
উচ্চৈশ্রবা বংশোদ্ভব পবনের গতি।
হেন অশ্ব দিয়া পাঠাইলা নরপতি ॥
পাত্র সব গিয়া সূর্যবীর্য প্রণামিল।
বেগবন্ত অশ্ব আনি আরোহিতে দিল ॥
এথ দেখি বুদ্ধিমন্ত হাতে খড়্গ করি।
ছেদিলা অশ্বের পদ মিত্র আগুসারি ॥
সবিস্মিতে চাহে সব যথ পাত্রগণ।
স্নেহ ভাবে কুমারে না কোপে কদাচন ॥
হেনকালে আইল ভগীরথ নরপতি।
পুত্র-পৌত্র-বধূ ঘরে নিলা শীঘ্রগতি ॥
বাপ প্রণামিয়া বীর ভাই প্রণামিলা।
অনুযোগ ধরি স্নেহে আলিঙ্গন দিলা ॥
পাছে শুনি নরনাথ অশ্বের নিপাত।
পুত্র স্নেহে কিছু না বলিলা নরনাথ ॥
ঘরে গিয়া মাও সৎমাও প্রণামিলা।
আশীর্বাদ করি মাও বধূ ঘরে নিলা ॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে সখা করোঁ নিবেদন।
দশদিন কাছে মোরে রাখিবা যতন ॥
তবে রাজ অন্তঃপুরে কুমার ডাকিল।
বুদ্ধিমন্তে সঙ্গে করি সূর্যবীর্য নিল ॥

নৃপতির যোগ্য ভোগ নানা উপহার।
আজ্ঞা কৈলা নৃপতিএ ভুঞ্জিতে কুমার ॥
ধরিল কুমারে গ্রাস প্রথমে খাইতে।
করে করাঘাত পাত্র হানিল তুরিতে ॥
কর হোন্তে পড়ে অন্ন ভূমির উপর।
না গুণে মিত্রের দোষ রাজার কুমার ॥
তা দেখিয়া নৃপমণি অতি অসন্তোষ।
পাত্রক নিমিত্তে রাজা ক্ষেমে এই দোষ ॥
কুমার নিমিত্তে নির্মিয়াছে এক ঘর।
ঘর সঞ্চরিতে আজ্ঞা দিলা নৃপবর ॥
ঘরে নাহি সঞ্চরিতে রাজার কুমারে।
বুদ্ধিমন্ত অগ্নি দিয়া বাসা ঘর পোড়ে ॥
মিত্রভাবে মিত্র দোষ মিত্রে নাহি গুণে।
শুনি অসন্তোষ রাজা কোপ বাঢ়ে মনে ॥
কোতোআল ডাকি তবে বোলে নরপতি।
দেখ কোতোআল বুদ্ধিমন্ত পাপ মতি ॥
প্রথমে কাটিল অশ্ব ক্ষেমিলুম দোষ।
পুত্র মিত্র বলি মনে না করিলুঁ রোষ ॥
পুত্রের হস্তের অন্ন করঘাতে হানি।
মোহর সমুখে ফেলে মোকে নাহি মানি ॥
এথ দোষ ক্ষেমি সূর্যবীর্যের অন্তর।
আর মোর দহিল বিচিত্র বাসাঘর ॥
আজু হোন্তে তার পাশে নিযুজহ চর।
ভোজন করিয়া সূর্যবীর্য যুবরাজ।
নারী সঙ্গে নিদ্রা যাএ সিংহাসন মাজ ॥
শিয়রে ফটিক স্তম্ভ অধিক উঝল।
প্রদীপ আলোকে পুনি দেখি নিরমল ॥

গরুড় আকৃতি লেখি খড়গের উপর।
হাতে খড়্গ বুদ্ধিমন্ত জাগএ শিয়রে ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে এক মনে স্তম্ভ নিরীক্ষএ।
নিশাভাগ হই গেল এহেন সমএ ॥
আচম্বিত স্তম্ভ বাহি এক বিষধর।
কুমার দংশিতে বেগে নামএ সত্বর।
লঘুহস্তে বুদ্ধিমন্তে কাটে সপ্তবারে ॥
এথ দেখি বুদ্ধিমন্তে তুরমানে মারে ॥
অস্তব্যস্তে কাটে পাত্র করি খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে পড়িল সর্প বিক্রমে প্রচণ্ড ॥
ফণা ধরি যাএ ফণী দংশিতে কুমার।
লঘু হস্তে বুদ্ধিমন্ত কাটে সপ্তবার ॥
নাগ বধি বুদ্ধিমন্ত 'ধিক আনন্দিত।
হেন কালে প্রমাদ ঠেকিল আচম্বিত ॥
নাগ-রক্ত-বিন্দু পড়ে কুমারীর গাএ।
কেমতে মুছিব রক্ত মনে চিন্তা পাএ ॥
বসনে ঢাকিয়া চক্ষু অঙ্গুলি ইঙ্গিতে।
কন্যার গাএর রক্ত পুছিলা তুরিতে ॥
এহ ছিদ্রে কোতোআলে ধরে তুরমানে।
অচেতন সূর্যবীর্য তাকে নাহি জানে ॥
হস্তে গলে বান্ধি বুদ্ধিমন্ত পাত্রবর।
নৃপতির আগে নিল পাপ নিশাচর ॥
শুনিয়া কুপিত রাজা ডাকে পাত্রগণ।
আদি অন্ত সব কথা কহিল রাজন ॥
মুখ্য পাত্র স্রোত স্থানে বিমর্ষিয়া কাজ।
বুদ্ধিমন্ত কাটিতে বলিল মহারাজ ॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি সুছন্দ।
শরদিন্দু বিন্দু যেন ঝরে মকরন্দ ॥

॥ বুদ্ধিমন্ত-মহারাজ সংবাদ ॥

(তথা ছন্দ—সিন্দুরাগ)

বুদ্ধিমন্তে বোলে হের শুন মহারাজ।
এথ অপরাধ কৈলুঁ মিত্র হিত কাজ॥
নৃপতি কহিব কহ কি করিলে হিত।
বুদ্ধিমন্তে বোলন্ত রাখিলুঁ প্রাণ-মিত॥
কিন্তু সে সকল কথা ভাঙ্গি কহি যবে।
সর্বাঙ্গ পাষাণ মোর হইবেক তবে॥
নৃপতি বোলএ মোরে ভাণ্ড পাপমতি।
ঝাটে নেও কোতোআল কাট শীঘ্রগতি॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে মোর সহজে মরণ।
অপযশ রাখিয়া সে মরিমু কি কারণ॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে রাজা শুনহ যে সার।
সহজেহি আজি মোর মুক্ত যম-দ্বার।
কন্যা লই দুই সখা আসি কুতুহলে।
নিশাকাল গোঞাইলুঁ এক বৃক্ষ তলে॥
গৃধিনী বোলএ গৃধ দেখ মিত্র লাগি।
একসর ঘোর বনে মিত্র রহে জাগি॥
গৃধ বোলে এথ দুঃখ পাএ অকারণ।
রাখিতে নারিব মিত্র হইব নিধন।
গৃধিনী বোলএ কহ কেমতে মরিব।
কি বুদ্ধি করিয়া মিত্র মিত্রক রাখিব॥
গৃধ বোলে দেশে গেলে রাজার কুমার।
এক অশ্ব দিয়া পাঠাইব নৃপবর॥
সেই অশ্ব হোন্তে পড়ি মরিব কুমার।
যদি চাহে মিত্র নিজ সখার উদ্ধার।
কুমারের আগে গিয়া সে অশ্ব কাটিব।
এহেন করিলে সূর্যবীর্য না মরিব॥
কেহ এথ কথা যদি কহে কার স্থান।
জানু সম হইবেক তাহার পাষাণ॥
তেকারণে অশ্ব কাটি সখাকে রাখিলুঁ।
মন ভএ অপরাধ কভো না করিলুঁ॥
হেন কালে জানু সম হইল পাষাণ।
কান্দে রাজা ভগীরথ সজল নয়ান॥
নৃপতি বোলএ বাপ না কহিঅ আর।
অজ্ঞাতে করিলুঁ পাপ ক্ষেম একবার॥
পুত্র তুল্য পালিবাম না কহিঅ আর।
তুহ্মি বিনে মরিবেক রাজার কুমার॥
বুদ্ধিমন্তে বোলে আগে না চিন্তিলা মনে।
এখনে নিষেধ রাজা কর কি কারণে॥
হেন কাপুরুষ কেবা ছার যে আছএ।
পরে পালিবেক করি জীবন রাখএ॥
শুন কহি আর যেবা আছে অবশেষ।
যে কারণে অপরাধ করিছি বিশেষ॥
দ্বিতীয় প্রহর যদি গেল মহারাজ।
গৃধ বোলে যদি ঘরে গেল যুবরাজ॥
ভোজন করিব গিয়া রাজার গোচর।
ভুঞ্জিলে প্রথম গ্রাস মরিব কুমার॥
একথা কহিলে হএ অর্ধাঙ্গ পাষাণ।
না নড়ে গৃধ-বাক্য বেদ পরমাণ॥
তেকাজে ফেলিলুঁ অন্ন করঘাত হানি।
তখনে অর্ধাঙ্গ শিলা হই গেল পুনি॥
সিংহাসন এড়ি রাজা কান্দিয়া চলিল।
বুদ্ধিমন্ত কোলে করি বহু বিলাপিল॥
নিষেধ না মানি বোলে শুন নরপতি।
তৃতীয় প্রহরে বোলে গৃধ মহামতি॥

তবে যদি বাসা ঘরে প্রবেশে কুমার।
গৃহ দহি সূর্যবীর্য হইব সংহার॥
সে গৃহ দহিয়া মিত্র মিত্রক রাখিব।
কিন্তু এথ কথা কার স্থানে না কহিব।
যদি কহে কণ্ঠ সম হইব পাষাণ।
তেকাজে দহিলুঁ গৃহে শুন মতিমান॥
তথনেহি কণ্ঠসম শিলা হই গেল।
দেখি রাজা ভগীরথ মুহুশ্চিত ভেল॥
পুনি নৃপক চেতাইয়া কান্দিতে কান্দিতে।
তবে শেষে বুদ্ধিমন্ত লাগিল কহিতে॥
চতুর্থ প্রহরে গৃধ গৃধিনীকে কহে।
শুন মোর প্রাণ যাএ শোকে তনু দহে॥
যদি গৃহ দহিবারে বুদ্ধিমন্তে পারে।
কুমারে রহিব গিয়া আর বাসা ঘরে॥
নারী সঙ্গে সিংহাসনে করিব শয়ন।
নিশাভাগে এক নাগ সাক্ষাৎ শমন॥
দংশিয়া বধিব নাগে কুমার কুমারী।
কিন্তু মিত্রে রাখিবেক এক কর্ম করি॥
হাতে খড়্গ শিয়রেত জাগিয়া রহিব।
গরুড় আকৃতি খড়্গে যতনে লেখিব॥
সপ্তখণ্ড করি নাগ কাটিব নির্ভএ।
এথেক করিলে রহে নৃপতি তনএ॥
কিন্তু এথ কথা যদি কহে কার স্থান।
তাহার সর্বাঙ্গ দণ্ডে হইব পাষাণ॥
আজু রাত্রি প্রাণসখা নারী সঙ্গে করি।
অচেতন নিদ্রা যাএ সিংহাসনে গড়ি॥
স্মরিয়া গৃধের বাক্য শোকে মন পোড়ে।
হাতে খড়্গ জাগি আছি কুমার শিয়রে॥
নিশাভাগে এক নাগ নামে আচম্বিত।
সপ্তখণ্ড করি তাকে কাটিলুঁ তুরিত॥

দৈবগতি নাগশির আএ নৃপবর।
পড়িলেক কুমারীর গাএর উপর॥
বসনে ঢাকিয়া করাঙ্গুলির ইঙ্গিতে।
গাও হোন্তে নাগশির ফেলিলুঁ তুরিতে॥
তাত না বিচারি ধরি আনে কোতোআলে।
ভালেরে করিলুঁ কর্ম ঠেকিলুঁ জঞ্জালে।
হেন মৃত্যু আছে মোর ললাট লিখন।
কহিঅ প্রণাম মোর সংসার চরণ॥
এ বোলিয়া বুদ্ধিমন্ত পাষাণ হইল।
দেখি মুহশ্চিতে রাজা ভূমিত পড়িল॥
বাপে ধরি কান্দে স্রোতে কান্দে পাত্রগণ।
কথক্ষণে ভগীরথে পাইল চেতন॥
উচ্চস্বর করি কান্দে অযোধ্যার নাথ।
পুত্রশোকে সুবুদ্ধি করএ অশ্রুপাত॥
নৃপতির কান্দনে কান্দএ সর্বজন।
অন্তপুরে মহারোলে উঠিল ক্রন্দন॥
কোলাহলে সূর্যবীর্য জাগিয়া উঠিল।
শিয়রেত চাহি প্রাণসখা না দেখিল॥
পরিজন মুখে শুনি এথ বিবরণ।
হাহা মিত্র বোলিয়া কুমার অচেতন॥
চৈতন্য পাইয়া ধাএ উন্মত্ত বেশ।
মিত্র মিত্র ডাক ছাড়ে আউদল কেশ॥
এইরূপে গেলা বীর বাপের গোচর।
লাজে শোকে ভগীরথ না দিল উত্তর॥
'কোথা মিত্র' বলি বলি কুমারে পুছিল।
কুমারেক প্রবোধিয়া যখনে কহিল॥
শুনি অচেতন বীর যাহে গড়াগড়ি।
চৈতন্য পাইয়া কান্দে সখা কোলে করি॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥

॥ সূর্যবীর্যের বিলাপ ॥

(ভাটিআল রাগ—লাচারী)

মিত্র ধরি কান্দএ কুমার।
উচ্চস্বরে কান্দে নয়নে বহে ধার ॥
শুন শুন আএ মিত্র আর
কেন হেন পরমাদ ভেল।
শোকে মন দহে
বুকে মারি গেল শেল। ধুঃ
তুহ্মি সঙ্গে ভ্রমি মহাবল
মণিপুরে পাইলুঁ সুভদ্রা দরশন ॥
লজ্ঘিলাম সুভদ্রা দেবীর বোল।
মুঞি দেখি মায়ার কন্যা
হই গেলুঁ ভোল।
তবে বুদ্ধি করি প্রাণ-সখা—
যোগী হোন্তে উদ্ধারিলা আনি চন্দ্ররেখা।
পুনি দেশে আসি তিনজন।
নারী সঙ্গে নিদ্রা যাই হই অচেতন।
তুহ্মি জাগ হাতে ধনুশর
সিংহ ব্যাঘ্র ভএ বনে অতি ঘোরতর।
গৃধ হোন্তে উপদেশ শুনি
নানা মতে কর আহ্মারে রাখিবারে পুনি।
তবু না বুঝিয়া মহারাজ
তোহ্মাকে বধিলুঁ আহ্মি পাপিষ্ঠের কাজ ॥
হাসি চাহ বোল মধুবাণী
বিদরে হৃদয় তোহ্মার প্রেম গুণি।

॥ বুদ্ধিমন্ত ও চন্দ্রবীর্যের প্রাণ লাভ ॥

(থর্ব ছন্দ)

বিস্তর বিলাপি তবে অশ্বে আরোহিয়া।
চলিল কুমার পুনি বন উদ্দেশিয়া ॥
বাউগতি যুবরাজ প্রবেশিল বন।
পাছে পাছে ধাই যাএ সব পাত্রগণ ॥
পুত্র সঙ্গে ভগীরথ গেল শোকাকুল।
বিচারিয়া সব বন চাহিলা বহুল ॥
না পাই কুমার কান্দে শোকাকুল মন।
সেই রাত্রি তথাত রহিলা সর্বজন ॥
এথা সূর্যবীর্য গেল অলক্ষিত গতি।
সেই বটতলে গিয়া রহে সেই রাতি ॥
প্রহরেক যদি তবে হইল রজনী।
গৃধ সম্বোধিয়া পুনি বোলএ গৃধিনী ॥
তোহ্মার আদেশে প্রভু পাত্রের কুমার।
সেইমত রাখিলেক মিত্র আপনার ॥
না বুঝিয়া ভগীরথ কাটিতে বলিল।
অকীর্তি নিমিত্তে পাত্র সকল কহিল ॥
গোপ্ত ব্যক্ত করি দেহ হইল পাষাণ।
না নড়ে তোহ্মার বাক্য বেদ পরমাণ ॥
পুনি সূর্যবীর্য মিত্র করিতে উদ্ধার।
একসর ঘোর বনে আসিছে কুমার ॥

ধন্য ধন্য সাধু সাধু দোঁহান মিত্রতা।
হেন মিত্রভাব বোল শুনিয়াছ কোথা॥
কহত কেমতে হএ পাত্রের উদ্ধার।
গৃধ বোলে যে হইল না ফিরএ আর॥
এথ শুনি সূর্যবীর্য কান্দিয়া ব্যাকুল।
গৃধ প্রতি স্তুতি পাঠ করিল বহুল॥
কৃপাকুল হই গৃধ বোলে নৃপ সুত।
উদ্ধারিবা মিত্র যদি করহ অদ্ভুত॥
নিজ পুত্র চন্দ্রবীর্য মিত্রের উপরে।
আছাড়ি মারিলে পুত্র পাইবা মিত্রেরে॥
পুনি সূর্যবীর্য হৈল হরিষ বিষাদ।
মিত্র কি পুত্র রাখিমু হৈকে পরমাদ॥
মনে মনে চিন্তে বীর পুত্রক পাইমু।
হইব অপর পুত্র মিত্রক রাখিমু॥
গৃধ প্রদক্ষিণ করি প্রভাত সমএ।
নিজ দেশে চলি গেলা রাজার তনএ॥

কুমারে পাইয়া সব আনন্দিত মন।
ঘরে গেলা ভগীরথ সঙ্গে সৈন্যগণ॥
ঘরে প্রবেশিয়া সূর্যবীর্য ধনুর্ধর।
কন্যাত কহিল গিয়া গৃধের উত্তর॥
চন্দ্রবীর্য কোলে করি সূর্যবীর্য যাএ।
কান্দি কান্দি চন্দ্ররেখা পাছু পাছু ধাএ॥
চরমুখে শুনি রাজা সব বিবরণ।
পাত্রগণ সঙ্গে গেলা শোকাকুল মন॥
ধাই গিয়া সূর্যবীর্য নিজপুত্র ধরি।
মিত্রের উপরে চাহে মারিতে আছাড়ি॥
না মার না মার করি ভগীরথে কহে।
সূর্যবীর্য মারে পুত্র মিত্র-পাকা-দেহে॥

না মার না মার করি ডাকে সর্বজন।
বধএ দুর্লভ পুত্র মিত্রের কারণ॥
না বধ না বধ করি ডাকে চন্দ্ররেখা।
বধিল দুর্লভ পুত্র রাখিবারে সখা॥
বদনে রুধির পড়ি মইল কুমার।
বুদ্ধিমন্তে পাইল শরীর আপনার॥
কুমারে লইল কোলে আপনার মিত।
মৃতবৎ শিশু দেখি পাত্র চমকিত॥
কান্দে রাজা ভগীরথ সঙ্গে নারীগণ।
স্রোত যুবরাজ কান্দে কান্দে সর্বজন॥
ভূমিত পড়িয়া কান্দে চন্দ্ররেখা বালি।
পুত্র পুত্র ডাক ছাড়ে আউদল চুলি॥
কন্যার বিলাপ শুনি যথ পরিজন।
শোকে মুর্চ্ছিত পাত্র নাহিক চেতন॥
চৈতন্য পাইয়া কান্দে মাথে মারি হাত।
মিত্র-পুত্র-বধে মান শিরে বজ্রঘাত॥
মিত্রক গর্জিয়া বহু লাগিল কহিতে।
শিশু হোন্তে জানি তুহ্মি উদার চরিতে॥
রূপ বর্ণিবারে আজ্ঞা দিলা নৃপবর।
শাস্ত্র জানি মূর্খ হই না দিলা উত্তর॥
বাপে গালি দিলা দেখি গেলা পরদেশ।
বনে বনে ভ্রমি দুঃখ পাইলা বিশেষ॥
মণিপুর গিয়া দেবী সুভদ্রা দেখিলা।
যাইতে দক্ষিণ দিকে দেবী নিষেধিলা॥
তাত তুহ্মি লজ্ঘি গেলা সুভদ্রা বচন।
ভাগ্যফলে যোগী হোন্তে রাখিলা জীবন॥
আর অপকর্ম কর লোকে উপহাসে।
বধিয়া দুর্লভ পুত্র রাখ পাপদাসে॥

পুত্র বিনে স্বর্গদ্বার খোলা নহে পুনি।
বধসি এহেন পুত্র শাস্ত্র নাহি জানি ॥
এ বলিয়া মৃত-শিশু কোলেত করিয়া।
পুনি বনে চলে পাত্র অশ্বে আরোহিয়া ॥
পাছে পাছে চলে সূর্যবীর্য ধনুর্ধর।
বাউগতি প্রবেশিল বনের ভিতর ॥
কথদিনে বটতলে গেলা দুইজন।
উচ্চস্বরে কান্দে পাত্র শোকাকুল মন ॥
তবে প্রহরেক রাত্রি গঞি গেল যবে।
কৃপাকুল গৃধিনী গৃধেরে বোলে তবে ॥
দেখ প্রভু মিত্র লাগি নৃপতি নন্দন।
প্রাণের দুর্লভ পুত্র করএ নিধন ॥
ধন্য ধন্য সাধু দোঁহান পীরিতি।
যবে চন্দ্র-সূর্য রহি গেল এই কীর্তি ॥
চরণে ধরহোঁ প্রভু কৃপা কর মন।
জিয়াইয়া দেঅ সূর্যবীর্যের নন্দন ॥
গৃধে বোলে মৃত কেবা জিয়াইতে পারে।
কাটা গেলে বৃক্ষ তবে ফল কোথা ধরে ॥
গৃধের মুখেত শুনি নিঠুর বচন।
বুকে খড়্গ হানি পাত্র তেজিল জীবন ॥
তা দেখিয়া সূর্যবীর্য পড়ে মুহুশ্চিত।
চৈতন্য পাইয়া কান্দে শোকে অতুলিত ॥
কান্দিয়া বোলএ বীর করিয়া কাকুতি।
শুন আএ কোন্ দেব গৃধের আকৃতি ॥
মিত্র-পুত্র হারাইলুঁ দৈবের ঘটন।
তোহ্মার গোচরে এবে তেজিমু জীবন ॥
না দেঅ জিয়াই যবে শুন গৃধবর।
তিনজন বধ হৈব তোহ্মার উপর ॥
এ বলিয়া চাহে খড়্গ বুকে হানিবার।
গৃধে বোলে শুন বলি রাজার কুমার।
যখনে অমৃত জান শুকনা হইল।
মুখ হোন্তে সুধা বিন্দু ভূমিতে পড়িল ॥
সেই বিন্দু হোন্তে এই লতা জন্মি আছে।
দেখ এহি লতে বট-বৃক্ষ জড়ি আছে ॥
এই লতা-মূল লৈয়া মৃত মুখে দিব।
অমৃত প্রভাবে জান জীব সঞ্চারিব ॥
এই পত্র-রস যদি গাএত লেপএ।
ঘাও গাএ না রহে বেদনা দূর হএ ॥
এথ শুনি সূর্যবীর্য হরষিত মতি।
সেই মত প্রকার করিল শীঘ্র গতি ॥
শিশু আর বুদ্ধিমন্ত লভিল চেতন।
মিত্র ধরি নাচে ভগীরথের নন্দন ॥
গৃধ প্রদক্ষিণ করি প্রণাম করিয়া।
প্রভাতে চলিলা দেশে অশ্বে আরোহিয়া ॥
ঘরে গিয়া বাপ সঙ্গে যথ গুরুজন।
প্রণামিয়া কহিলা যথেক বিবরণ ॥
চন্দ্ররেখা স্থানে নিয়া পুত্র সমর্পিল।
নৃত্য-গীত উৎসব বহুল আছিল ॥
কথ দিনে মণিপুর গেল সৈন্য সঙ্গে।
সবংশে ভীষণ মারিলেন্ত মনোরঙ্গে ॥
যোগী বধি উদ্ধারিলা সব নৃপ সুত।
ইক্ষ' বীর সূর্যবীর্য রণে অদ্ভুত ॥

ইক্ষ—ইক্ষাকু বংশীয়

সুভদ্রাক প্রণামিলা পরম ভকতি।
হরষিতে আশীর্বাদ করিলেক সতী ॥
কথ দিনে স্বর্গে গেলা নৃপ ভগীরথী।
স্রোতবীর হইলেক অযোধ্যার পতি ॥

মণিপুর রাজা হৈল সূর্যবীর্য বীর।
বুদ্ধিমন্ত পাত্র সঙ্গে নির্ভয় শরীর ॥
পাপে ভাগ্য হরিবেক ধর্ম পাইবে লোপ।
ভাল কথা কৈলে রাজা হইবেক কোপ ॥

॥ পাত্রের কর্তব্য ॥

নৃপতির মনে প্রীতি তবে সে রাখিব।
বাপ ভাই বন্ধু হোন্তে বিশেষ জানিব ॥
নৃপতির রোষ তুষ্ট হএ যেই কর্মে।
সে সকল বুঝিয়া লেখিয়া থুইব মর্মে ॥
যে যে কর্মে সন্তোষ সে করিব নিশ্চএ।
যদি আপনার মনে ভাল না লাগএ ॥
নৃপ সঙ্গে হুট যদি কোথাত পড়এ।
নৃপতির কথা সত্য কহিব নিশ্চএ ॥
লোক নষ্ট নহে শাস্ত্র-বহি রদ নহে।
এহেন মর্তবা জানি নৃপে যদি কহে ॥
যে কহে নৃপতি সেই কহিবেক পুনি।
দিবসকে জান রাজা বোলএ রজনী ॥
যদি কহে দিনে রাজা হইব রজনী।
পাত্রে কহিবেক সেই তত্ত্ব হেন জানি ॥
বলিব উগিছে চন্দ্র সঙ্গে তারাগন।
এই মতে রাখিবেক নৃপতির মন ॥
নৃপতির কথা না কহিব কার স্থান।
গোপ্ত ব্যক্ত করিলে হারাএ নিজ প্রাণ ॥
নৃপতির গোপ্ত কহি প্রাণ হএ নাশ।
নিরঞ্জন গোপ্ত কহি দুকূল নৈরাশ ॥
যদ্যপি কহিতে পারে বহু না কহিব।
মুখ দোষে দুঃখ পাএ নিশ্চএ জানিব ॥

ঘরেহ কাহারে নিতি গালি না পাড়িব।
কহিতে কহিতে মুখে অভ্যাস হইব ॥
বিস্মরিয়া আইসে যদি নৃপতি সম্মুখে।
নৃপতি লাঘব দিব মরিবেক দুঃখে ॥
নৃপতির প্রীতি দেখি না হৈব ভোর।
বর্বর সে বোলে যেন রাজা ভার্যা মোর ॥
নারীক পরশ করি না করে গমন।
তাহা হোন্তে সংসারেত নাহি ক্ষুদ্র জন ॥
কোতোয়াল মিত্র করি যে না করে ভিত।
উন্মত্ত থাকে সে যে সর্পের সহিত ॥
নৃপতি আপনা করি যে না করে ভএ।
অতি শীঘ্রে অগ্নি যেন ধরি কোলে লএ ॥
রাজার চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
ক্ষেণে দোষে হাসে ক্ষেণে স্তুতি কৈলে মারে।
সে বাক জানিব নিতি ঈশ্বর নবীন ॥
নৃপতি করিলে শাস্তি না করিব ঘিন ॥
মন দুঃখ না করি করিব আশীর্বাদ।
মনে মনে সন্ধি হৈব খণ্ডি বিসম্বাদ ॥
নৃপতি করিলে শাস্তি না কহিব কা'ক।
যার বুদ্ধি থাকে কভো না চটাএ রাজাক ॥
এক দুঃখে সর্বগুণ পাসরে দুর্জনে।
দুঃখ সহি গুণিগণে ক্ষেমে গুণী মনে ॥

এক রাজপুত্র গেল বনেত দেখিতে।
তিক্ত ফল পাই দিলা সেবকে ভক্ষিতে॥
সেবকে সে ফল খাএ আনন্দিত হই।
সবিস্মিতে রাজপুত্র পুছে তার ঠাঁই॥
অতি তিক্ত বিষ-স্বাদ ফল দিলুঁ তোক।
কিবা স্বাদ কুতুহলে খাও কহ মোক॥
হাসিয়া সেবকে বোলে শুন যুবরাজ।
তিক্ত ফল কুতূহলে খাই যেই কাজ॥
এই মিষ্ট-হস্তে দিয়াআছ নানা ভোগ।
ঘৃত মধু শর্করা অমৃত সংযোগ॥
চিরদিন নানা ভোগ দিএ যেই হাতে।
না যুয়ায় সেই হাতে তিক্ত উপেক্ষিতে॥
সর্বগুন গুণী তিক্ত মধু রস দিয়া।
অমৃত সদৃশ্য বিষ্ম জানি দিল বিষ।
তা শুনিয়া নৃপ সুত সদয় হইল।
মহা পাত্র করি তারে নিকটে রাখিল॥
দান-ধর্ম-বুদ্ধি দিব করিতে রাজাক।
লোক মন্দ কহিলে পাতক হৈব তোক॥
করিব যে মত পারে পর উপকার।
এথা অথা ঠিক পুণ্য কিছু নাহি তার॥
নৃপতির প্রীতি রাখি বোল ধরে যার।
লোক হিত না কহিলে অভাগ্য তাহার॥
নৃপ-ঘরে যথ নারী দেখএ জননী।
এক নৃপ স্থানেত কহিল পাত্রমণি॥

তুহ্মি যাকে প্রীতি রাখ শত্রু দেখি তাক।
নৃপে বোলে বিস্ময় জন্মিল তোর বাক॥
পাত্রে বোলে তোহ্মার প্রীতির নারীগণ।
শত্রুর সদৃশ দেখি ভএ বাসি মন॥
যাহার আলস্য বহু খাইবারে মতি।
সে সবে সেবিতে না পারএ নরপতি॥
সব পাত্র হোন্তে যে-সেবক পাএ দুঃখ।
নিরন্তর বসি থাকে অগ্নির সমুখ॥
বিধি শাস্ত্র না জানিলে না থাকিব বুদ্ধি।
কহিতে না পারি কার পরলোক শুদ্ধি॥
এক নৃপ লইয়াছে পাত্রের নন্দিনী।
হেনকালে সেবিতে আইল পাত্রমণি॥
পরীক্ষি বুঝিতে তাক বোলে নৃপবর।
মোহর পত্নীরে আসি চুম্বহ সাদর॥
শুনিয়া কম্পিত পাত্র চিন্তে মনে মন।
যদি আজ্ঞা লঙ্ঘিবহ মারিব অকারণ॥
কন্যাক চুম্বই যবে করিব নিধন।
কেমতে করিব আজি প্রাণের রক্ষণ॥
চিন্তি পাত্রে নিজ হস্ত বসনে ঢাকিল।
মাথেত লইয়া কন্যা পাএত চুম্বিল॥
নৃপতি বোলএ আজি রাখিলে জীবন।
হেন না করিতে যদি করিতু নিধন॥
এ থেকে সেবকে অতি পাওন্ত জঞ্জাল।
চক্ষুতে নাহিক লজ্জা শিয়রেত কাল॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার।
যুগ সংবাদের কথা অমৃতের ধার॥

॥ বৈদ্যের কর্তব্য ॥

(খর্ব ছন্দ)

সত্যকেতু বোলে যথা কান্ত পরিবার।
নৃপতির হিত চাহিবেক অনিবার॥
লোভ করি নৃপ ধন না করিব উন।
স্থির বুদ্ধি হই বজাইব সর্বগুণ॥
লোক সব অপকার কভো না করিব।
কিন্তু মাত্র বহু-দিক বুদ্ধি না লইব॥
নিজ বুদ্ধি হইলে যেন কাস্তের সংবাদ।
পাপ না করিব পাত্র না হৈব মুগধ॥
সঙ্কট কার্যের হিত কুপাচার রহে।
লোক সব অহিংসা কভো না যুয়াএ॥
আপনে অর্জিব যে সে করিব না ভোগ।
বিনি বুদ্ধি কি করিব তিনি সমযোগ॥
কভুকে না হএ কার্য না হৈলে চতুর।
পাখাহীন পক্ষী যেন বলহীন চোর।
ত্রিতিয়া[ত্রেতা]বোলন্ত বৈদ্য ধনিক ভজিব।
ধনিকের হস্তেত বিষ অমৃত হইব॥
না বলিব তুই রোগ করি দিমু ভাল।
না হইলে পাএ লাজ সে পাপ বিশাল॥
আগে নিরঞ্জন বলি কহিব বচন।
শেষে ভক্তি করিয়া চাহিব রুগীগণ॥
নির্ধনী দেখিয়া কভো নাহি উপেক্ষিব।
পুণ্যফলে সেই ধন নিরঞ্জনে দিব
রুগী করি ঘৃণাক্ষরে না করিব মনে।
জানিব সভাকে দিতে পারে নিরঞ্জনে॥
রুগীস্থানে ঔষধের নাম গ্রাম কৈলে।
দেরাতে খণ্ডএ রোগ ধন্বন্তরী হৈলে॥
দ্বাপরে বোলন্ত যথ দৈবজ্ঞ সজ্জন।
প্রতিনিতি চাহিবেক নক্ষত্র গমন॥
দঢ় হেন হৈব করি না করিব দাপ।
পাছে মিছা হৈব লাজ পাইব সন্তাপ।

॥ পাপীর পরিণাম ॥

বলিব কহিলে আম্মি শাস্ত্রের বিচারে।
ভূত ভবিষ্যৎ কিবা কহিবারে পারে॥
নররুচি হইয়া প্রথম বৈদ্যেতে ঘাটিয়া। (?)
লাজ পাইল নিজ পুত্র জলে বিসর্জিয়া॥
সত্যকেতু বোলে শুন ত্রিতিয়া[ত্রেতা]দ্বাপর।
সত্যএর লোক সব প্রভুর গোচর॥
বিংশ ভাগে এক ভাগ স্বর্গেত যাইব।
এক উনিশ ভাগ নরকেত পড়িব॥
প্রথমে যে সাধু সব মিথ্যা কহে নিতি।
উলটে ঠকাই পাপী হরে পর বিত্তি॥
উদর অন্তরে সব খসাই পড়িব।
নরক যাতনা পাই বহুত কান্দিব॥
দ্বিতীএত বাপহীন বালকের বিত্তি।
যেবা বলে হরে তার শুন যেন গতি॥
নাগ সব প্রবেশিয়া তাহার উদরে।
দংশিয়া যাতনা দিব নরক ভিতরে॥ ৭

তৃতীএত পড়শীক বল করি থাকে।
নরকেত হস্তপদ ছেদিবেক তাকে ॥
দূত সব যাতনা কান্দিব রোগ শোক।
এথ শুনি পড়শীক শঙ্ক মহালোক ॥
চতুর্থেত ধর্মবন্ত জন'ক যে নরে।
সম্ভাযে 'নারকী' কিবা উপহাস করে ॥
তৈলের কটাহে যেন সে সবের গাও।
হইবেক সিদ্ধ দহিবেক দুই পাও ॥
পঞ্চমেত যে সকল নিজ কুলাচার।
শাস্ত্র-নীতি না সেবএ প্রভু করতার ॥
সে সবের জিহ্বা মুখ হোন্তে নিকালিব।
কুকুর সদৃশ পাপী নরকে দহিব ॥
ষষ্ঠমেত স্থাব্য ধন যে করে ভক্ষণ।
পিষ্ঠে জিহ্বা নিকালিব করিব যাতন ॥
সপ্তমেত যে সকলে করে পরদার।
দূত সবে প্রহারিব অগ্নির মাঝার ॥
তার অঙ্গে দুর্গন্ধ রহিব অতিশএ।
পচিব নরক মধ্যে নাহিক সংশএ ॥
অষ্টমেত আরে[১] করি যে পাপিষ্ঠ নারী।
লোক ভএ গর্ভপাত করে অনাচারি ॥
পুনি দ্বারে অঙ্গ অঙ্গ শিরনী স্মরিব।(?)
নানা মতে পুনি অভ্যন্তরেত রহিব ॥
পরম বেদনা পাই কান্দিব সে সব।
দূত সবে পরাভবে পাইব লাঘব ॥
নবমেত যে সকলে করে মধু পান।
মধুমত্ত হই কিবা তেজিব পরাণ ॥
গোশৃঙ্গ সদৃশ দশন হৈব প্রবীন।
জিহ্বা ঝুলি পড়িবেক বিকটের চিন্ ॥
হৃদয় উপর লম্বি পড়িব অধর।
জানু সম নামিবেক দারুণ উদর ॥
নরকের বিষ্ঠা ক্রিমি করিব ভক্ষণ।
শরীরেত দুর্গন্ধ বহিব অনুক্ষণ ॥
দশমেত ধন খাই যে পাপিষ্ঠ ছার।
এক হেতু অন্যের করএ অপকার ॥
নরকে বরাহ রূপে ভুঞ্জিবেক দুঃখ।
এথ জানি অঙ্কুর[২] না খাএ মহালোক।
এক দেশে যে সকলে পরচর্চা করে।
কপি রূপে রহিবেক নরক অন্তরে ॥
কুঞ্চ মুখ দীর্ঘ মুখে নিঃস্মরিব।
পরস্পর ভক্ষি সব বহুকে উপারিব ॥
দ্বাদশে যে পাপ করে লোক অপকার।
ধর্মভীত করি লোকে করিল প্রচার ॥
ব্যাঘ্র রূপে সে সকল নরকে দহিব।
দূতের প্রহারে মাংস খসিয়া পড়িব ॥
ত্রয়োদশে লভ্য ধন খাএ যেই জন।
দহিব নরক অগ্নি সেই সকল জন ॥
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র পড়ি যেবা পাসরএ।
নরকেত অন্ধ হই রহিব নিশ্চএ ॥
পঞ্চদশে যে সকলে ন্যায় বুঝি নিতি।
ধন খাই অন্যায় করিল পাপ মতি ॥
কৃষ্ণবর্ণ হইবেক তাহার বদন।
দায় ধরি লোক সবে টানিব বসন ॥

১ আরে—অপরে, (উপপতি) ২ অঙ্কুর—রক্ত

ষষ্টমেত মিছা সাক্ষি দিল যেই জন।
উর্ধ কণ্ঠে হাঁটিবেক গর্ব করি মন॥
অগ্নির বসনে ঢাকি শরীর তাহার।
গলাএ শিকল বান্ধি করএ প্রহার॥
অষ্টদশে গৃহ কর্ম হেতু যেই জন।
সমএত না করএ প্রভুক সেবন॥
নিজ কেশে পদ বান্ধি ভুজ পৃষ্ঠে করি।
দূত সবে মারিবেক হাতে গদা ধরি॥
নবদশে যে আহুক[1] করে পাপ কর্ম।
সভাকে আদেশ করে করিবারে ধর্ম॥
তা সবার মুখে অগ্নি-কণা নিঃসরিব।
সেই অগ্নি জিহ্বা দেশে পাএত ধরিব॥
এই মতে দহিবেক উনবিংশ ভাগ।
যাতিব[2] দারুণ দূতে ছাড়ি অনুরাগ॥
বিংশ ভাগ যে সকলে শুনে একমন।
জ্ঞানবন্ত সুজন ধর্মিক মহাজন॥
প্রভুর গোচরে সব হরষিত মন।
শিরেত কিরীট গাএ নানা আভরণ॥
স্বর্গের বসন সব গাএত পৈঢ়এ।
রত্ন-সিংহাসন মাঝে আনন্দে বৈসএ॥
রত্নের কটোরা ভরি নানা উপহার।
স্বর্গে নারী সব দিব সমুখে তাহার॥
ত্রিতিয়া[ত্রেতা]বোলন্ত শুন নরপতি।
যে যে পাপ হোন্তে হএ নরকে বসতি॥
শৃঙ্গার করিয়া স্নান যেবা না করএ।
কুম্ভ পাক নরকেত সে সব পচএ॥

বেদন কালেতে ব্যক্ত নিরঞ্জন নাম।
পবিত্র হইলে মাগিবেক পরিণাম॥
আনমনে জ্ঞান যদি করে কদাচিত।
পবিত্র নাহএ তনু জানহ নিশ্চিত॥
অপবিত্রে জপতপ যজ্ঞ অকারণ।
অপবিত্রে পুণ্য করি নরকে গমন॥
অন্নগ্রাস নতু কিবা জল করে পান।
না লই প্রভুর নাম মহাপাপ জান॥
সে অন্নে সে জলে ভুত-দৃষ্টি জান হএ।
ভুত-দৃষ্টি বস্তু জান পাতকী খাওএ॥
যে করএ পুণ্য লোকে দেখিতে কারণ।
অসি-পত্র নরকে পড়এ সেইজন॥
অজ্ঞাতে করিলে পাপ মাগে অপরাধ।
বিপরীত পুণ্য পাএ খণ্ডে অবসাদ॥
মৃতকে পাড়এ গালি অপরাধ কহে।
শাস্ত্রের বিধানে জান মহাপাপ হএ॥
মৃতের বসন হরে যে পাপ দুর্মতি।
মৃত সঙ্গে রমে যেবা নরকে বসতি॥
পুণ্যবন্ত মৃত কাছে পাপকারী জন।
স্থান দিলে মহাদোষ শাস্ত্রের বচন॥
পাপীর তাড়না শুনি পাওন্ত জঞ্জাল।
কিন্তু পাপী পুণ্যবন্ত কাছে গেলে ভাল॥
মৃত কাছে কণ্ঠ ছাড়ি যে করে বিলাপ।
হেনপাপ মৃত হোন্তে পাএ মনস্তাপ॥
পুরুষের সঙ্গে যদি পুরুষে রমএ।
অঘোর নরকে জান সে পাপী পড়এ।

---

১ আহুক>আহুতক—আহ্বায়ক ২ যাতিব—যন্ত্রণা দিব

নারীগণ মলদ্বার যোনীদ্বার ছাড়ি ॥
যে রমে সে পচিবেক নরক মাঝে পড়ি ॥
পশুক যে রমে সেই পশুর সমান।
সহজে পাতকী সেই কি কহিব আন ॥
দ্বাপরে বোলন্ত শুন মোর নিবেদন।
নরকে পড়িব গুরু-নিন্দে যেই জন ॥
মাও বাপ হিংসে যেবা নাম ধরি ডাকে।
সে সকল পড়িব নরক কুম্ভ পাকে ॥
পুত্রে বাপ না মানে নারীক স্বামী জন।
তা সভান দান ধর্ম সব অকারণ ॥
না লই স্বামীর আজ্ঞা যদি নারীগণ।
ঘরের বাহিরে যাএ বেড়াইতে মন ॥
যথ পথ শঠে তথ আনলের ঘর।
সে নারী নিমিত্ত হএ নরক স্বামী ঘর ॥
রজস্বলা হই নারী গঞিল সমএ।
স্নান না করিয়া যদি শৃঙ্গার করএ ॥
সে নারী-পুরুষ কিবা নরকে গমন।
মহাপাপ উপজএ শাস্ত্রের বচন ॥

নারী সঙ্গে নারী যদি করএ শৃঙ্গার।
সহজে কুলটা পাপী বেশ্যার আচার ॥
থিহাহিয়া[1] জল পানে উপজএ রোগ।
জলে প্রস্রাব কৈলে পাপী হএ লোক ॥
থিহাই করিলে পুনি পাপ অতিশএ।
গাএত লাগএ ছিটা বস্ত্র নষ্ট হএ ॥
চিত্রপটে পোতলা খেলএ যেই জন।
অবশ্য জানহ তার নরকে গমন ॥
না লই স্বামীর আজ্ঞা যথ নারীগণ।
ভিন্ন বালকেরে দুগ্ধ দিলে অকারণ ॥
শূলে বান্ধি নরকেত প্রহারিব দূতে।
কহিল সম্বন্ধ কথা শুনহ অদ্ভুতে ॥
এক নারী দুগ্ধ খাএ যথ শিশুগণ।
দুগ্ধ সহোদর হএ শাস্ত্রের কথন ॥
কদাপিহ বিভা যদি হএ দোঁহানের।
ভ্রাতৃএ ভগ্নিএ জান হএ যাএ জোড় ॥
যথেক বালক হএ জারজ যে হএ।
এথেক বিচারে দুগ্ধ দিবেক নিশ্চএ ॥

॥ **পুণ্যবানের লক্ষণ** ॥

সত্যকেতু বোলে চারি কর্ম করিবেন।
পুণ্যবন্ত স্বর্গবাসী শাস্ত্রের বচন ॥
শেষ রাত্রি জাগি যেবা প্রভু নাম লএ।
প্রভু হোন্তে অপরাধ মাগিব নিশ্চএ ॥
মনোগত পাই তার তেজে প্রভু ভএ।
নিজ দোষ দেখে পর দোষ ঢাকি লএ ॥

ত্রিতিয়া[ত্রেতা]বোলন্ত পুণ্যবন্ত চারিজন।
যে করে সন্তোষ নিতি ভিন্ন জন মন ॥
নিজ মনে যে কহে না কহে বিপরীত।
সভাথু[2] আপনে হীন জানিব নিশ্চিত ॥
গুরু উপদেশ ধরে করি প্রাণ পণ।
মহাপুণ্যবন্ত জান এই চারি জন ॥

১ থিহাইয়া—স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া (চট্টগ্রামী) ২ সভাথু—সকল হইতে ; থু<থেকে

দ্বাপরে বোলন্ত চারিজন স্বর্গবাসী।
ধার্মিক নৃপতি আর নির্লোভ তপস্বী।
সত্যবন্ত পুরুষ যুবক সতী নারী।
স্বর্গবাসী চারিজন দেখহ বিচারি।
সত্য বোলে পঞ্চ কর্মে রোগ নাশ হএ।
কিছু ক্ষুধা রাখি অন্ন যে জনে ভক্ষএ।
বহু মিষ্ট না খাইব তিক্ত সে ভক্ষিব।
চক্ষুতে দিবেক জল কর্ণে তৈল দিব॥
প্রভাতে লবণ দিয়া মাজিব দশন।
বহু উপকার জান শাস্ত্রের বচন॥
প্রথমে সন্তোষ জান প্রভু করতার।
এহা হোন্তে পুণ্য বোল কিবা আছে আর॥
ধনবন্ত হএ মুখে সুগন্ধি নিঃসরে।
আর জান দশনের যথ রোগ হরে॥
দশন পবিত্র হৈলে শির-ব্যথা যাএ।
মাজিলে দশন উপকার সর্বথাএ॥
ত্রিতিয়া বোলন্ত জান পঞ্চকর্ম ভাল।
প্রতি ঋতু ফিরিলে যে করএ পাখাল॥

প্রথমে গলের মাঝে অঙ্গুলি সঞ্চারি।
উগলে অভ্যাস করি উপদেশ ধরি॥
অর্ধ প্রহর হইলে যে করে ভোজন।
বিস্তর অম্বল জল করে উপেক্ষণ॥
দ্বাপরে বোলন্ত নিদ্রা পঞ্চ পরকার।
প্রভাতে যে নিদ্রা যাএ বুদ্ধি হরে তার।
প্রহরেকে নিদ্রা গেলে নিরোগী হয়ন্ত।
মধ্যাহ্নে নিদ্রা ধনবন্ত ভাগ্যবন্ত॥
আঢ়াই প্রহরে নিদ্রা যাএ যেই জন।
উন্মত্ত বেশ হএ শাস্ত্রের বচন॥
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা গেলে দোষ অতিশএ।
চঞ্চল চরিত্র জান সেইজন হএ॥
দিবসের নিদ্রা এই পঞ্চ পরকার।
সহজে রাত্রির নিদ্রা জগতে প্রচার॥
বহু নিদ্রা যাএ জন পশুর আকৃতি।
বহু উজাগরে রোগ উপজএ তথি॥
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি সুছন্দ।
শরতের শশী যেন ঝরে মকরন্দ॥

॥ গার্হস্থ্য বিধি ॥

(দীর্ঘ ছন্দ)

॥ গৃহ নির্মাণ ॥

কহে সত্য নরনাথ সবে শুনে জোড় হাত
যদি গৃহ নির্মে কোন জন।
বৈশাখে উত্তম বড় যদি কেহ নির্মে ঘর
ধনে-জনে রাখে অনুক্ষণ॥
জৈষ্ঠ্যে মন্দ অতিশএ মিত্র সব শত্রু হএ
আষাঢ়ে না রহে চতুষ্পদ।

শ্রাবণে নির্মিলে ঘর রোগ-শোক নিরন্তর
সে ঘরেত বেঢ়এ আপদ॥
ভাদ্রে গৃহ নির্মে যবে গায়ে রোগ হএ তবে
আশ্বিনেত দ্বন্দ্ব বাঝে নিতি।
কার্তিকে উত্তম বড় মন সুখ নিরন্তর
শত্রুকে জিনএ লীলাগতি॥

অঘ্রানেত যে নির্মএ মনোগত সিদ্ধি হএ
ধনে-পুত্রে বাঢ়ে নিরন্তর।
পৌষে অতি মন্দ হএ সে গৃহ অনলে দহে
মাঘ মাসে যে নির্মএ ঘর॥
সে ঘরে সন্তোষ থাকে লোকে স্নেহ করে তাকে
নৃপ আগে পায়ন্ত সম্মান।
ফাল্গুনেত ধন বাঢ়ে পুত্র হএ সেই ঘরে
চৈত্রে কৈলে মনতোষ জান॥
আর এক শাস্ত্রে কহে চৈত্র মন্দ অতিশএ
এথ জানি করিব বিচার।
তৃতীএ[ত্রেতা]কহন্ত সার গৃহ নির্ম যে যে বার
সে সে দিনে গৃহের সঞ্চার॥

॥ স্নান ॥

কহন্ত দ্বাপর তবে শনি রবিবারে তবে
স্নান যে করএ রোগ ভএ।
সোমে-গুরু ধন বাঢ়ে মঙ্গলে যে স্নান করে
আউ টুটি চিন্তা উপজএ॥
বুধেত ঐশ্বর্য বাঢ়ে ধনী হএ গুরুবারে
শুক্রবারে স্নান করে লোক।
পুণ্য হএ অতিশএ পুরাণ শাস্ত্রেত কহে
সেই স্নানে খণ্ডে রোগ শোক॥

॥ রোগ ॥

সত্য কহে আরবার রোগ হৈলে শনিবার
ভূত-দৃষ্টি রোগ হএ জান।
সপ্ত সপ্ত দশ দিন রোগএ সঙ্কট জান
অজা কুক্কুটী আদি ক্ষীণ।
রবিবারে রোগ হএ সপ্তদিন মহাভএ
কিবা পঞ্চ দিবস সংশএ।
বৃক্ষতলে দিগম্বর হই থাকে যেই নর
রবিবারে রোগ উপজএ॥
শনিবারে হএ রোগ চারিদিনে দশা যোগ
কিবা তার জীবন সংশএ
লোক-দৃষ্টি হএ জান কিবা ভূত অধিষ্ঠান
অজা হংস তাতে দান হএ॥
মঙ্গলে হইলে রোগ নব দিন তাতে ভোগ
সপ্তদিন থাকে সংশএ।
উদর পেটেতে রোগ খণ্ডে পাই মন্ত্রযোগ
অজা দান তাহাত নিশ্চএ।
কৃষ্ণ কুক্কুটী দিব দানে বিঘ্ন খণ্ডাইব
বুধবারে রোগ হএ যার।
একাদশ দিন ভএ নবদশ দিন হএ
চিন্তা হোন্তে রোগের সঞ্চার॥
কোপ বহু হোন্তে হএ উদরে বেদনা রহে
শ্বেতবাস-জোড়া দিব দান।
গুরু বারে রোগ হএ তিন দিন মহা ভএ
বিংশ দিন পর্যন্ত নিদান॥
পন্থ মাঝে বৃক্ষ তলে যেন হএ দিগম্বরে
নিদ্রাকালে বাস হএ দূর।
ভূত-দৃষ্টে হএ জান অজা বৃষ দিব দান
পুরান ভাণ্ডার সমতুল॥
দৃষ্টি হোন্তে সরে রোগ ভূত-দৃষ্টি সমযোগ
অজা হংস তাত দিব দান।
কিবা মিষ্ট ফল মিষ্ট দান দিলে ঘুচে কষ্ট
চতুর্দশ সম কষ্ট জান॥
নতু একবিংশ দিন রোগ যথ হৈব ক্ষীণ
ভবিষ্যতি বিধি বলে জানে।

॥ বসন ॥

ত্রিতিয়া[ত্রেতা]কহন্ত তবে নববস্ত্র শনিবারে
পরিবারে শাস্ত্র পড়ি মনে ॥
প্রথম প্রহর ভাল শেষ দিন জঞ্জাল
সেই বস্ত্র দহিব আনল।
আর রবি মধ্যে জ্ঞান সোম শুভ অনুষ্ঠান
রোগ শোক খণ্ডএ সকল ॥
নববস্ত্র শুক্রবারে পিন্ধিলে উত্তম বারে
চিন্তা হোন্তে পরিত্রাণ মনে।
নব বস্ত্র ফাড়ি যবে এহি রবিবারে তবে
ফাড়িব শাস্ত্রের পরমাণে ॥
দ্বাপরে কহন্ত সার বস্ত্র দহে যেই বার
রবিবারে দহিলে বসন।
লোক সঙ্গে দ্বন্দ্ব হএ সোমে যদি বস্ত্র দহে
প্রবাসেত করন্ত গমন ॥
মঙ্গলে দহিলে রোগ বুধেত আনন্দ যোগ
গুরুবারে বাস দহে যবে।
বিদেশের বন্ধু জন মিলে দৈব নিয়োজন
মনে আনন্দ বাঢ়ে তবে ॥
শক্র মনে বাঢ়ে তোষ শনিএ দহিলে দোষ
রবিএ দহিলে শুভ যোগ।

॥ বিবিধ কর্ম ॥

যে যে বারে যে যে কাজ কহিআছে শাস্ত্র মাঝ
কহিতে লাগিল সত্য যুগ ॥
শনিএ মৃগয়া হএ রবিএ গৃহ নির্মএ
বৃক্ষ যদি রোপে ফলে অতি।
শনি পরবাস যাএ বণিজ্জেত লভ্য পাএ
মঙ্গলে সংগ্রাম ভাল অতি ॥
নাড়ী ছেদি রক্ত লৈব রোগ সব দূর হৈব
বুধে ভাল ঔষধ ভক্ষণ।
গুরু-বারে নৃপ আগে গেলে করে অনুরাগে
মনোগত মাগিলে পুরণ ॥
শুক্রেত বিবাহ কাজ অতি ভাল শাস্ত্র মাঝ
পুণ্য কর্ম শুক্রতে করিব।
ত্রিতিয়া[ত্রেতা]কহন্ত পুন যে যে দিনে আন
যথ কর্ম বুঝিয়া করিব ॥
সোম শুক্র বুধবারে উত্তম যে কর্ম করে
আর বারে কর্ম না যুয়াএ।
যদি কিবা বুধে করে যদি সে শুনিতে পারে
সংগ্রাম পড়এ সর্বথাএ ॥
দ্বাপরে কহন্ত তবে আগে সুখ যাএ যবে
পশ্চিমেত না পুরএ আশ।
সোম শনি পূর্বে নষ্ট গুরুএ দেখিলে কষ্ট
বুধে অঙ্গার উত্তরে বিনাশ ॥

॥ দেও-তাড়ন ॥

কহে সত্য নরপতি সবে শুন এক মতি
যে যে রাশি যে দেও[১] বাস।
যার যে ঔষধ বাণী ভুত খেদাইতে পুনি
সব কহে সত্য মহাশ্বাস ॥
মেষ রাশি দেও ধাম 'মহাদেও' যার নাম
পন্থে পাই মনুষ্য ধরএ।
মুখে না নিঃসরে বাণী চক্ষু হোন্তে পড়ে পানি
উন্মত্ত বচন কহএ ॥

---

১ দেও—দৈত্য

তাহার ঔষধ পুনি মউরের পুচ্ছ আনি
ধরিব শিরে তালপত্র সম।
অশ্বের কপাল লোম সেহ আনি দিব ধূম
ধূমে ধাইবেক ভুতাধম ॥

বস্ত্র ঢাকি রুগী মাথে ধূম আনি দিব তাতে
ধূম যেন শরীরে প্রবেশে।
সন্ধ্যাকালে হেন করি প্রভাতে গোবর ধরি
ভালে আনি দিব সবিশেষ ॥

কিবা শনি গুরুবারে নতু রবি শনি বারে
তিল-তৈল জলেত মিশাই।
স্নান দিব শীঘ্রে আনি মহামন্ত্র লেখি পুনি
বাহুমূলে বান্ধিবেক যাই ॥

বৃষে 'বৃধ' পাপাশএ নদী তীরে নিবাসএ
কূপ পুষ্করণী তীরে থাকে।
যেবা অপবিত্র গাএ জল ভরিবারে যাএ
অলক্ষিতে ধরে আসি তাকে ॥

দন্ত জিহ্বা কালা হএ তনু কম্পে স্থির নহে
দন্তে দন্তে করি কড়াকড়ি।
ক্ষেণে মুচুকিত হাসে দুই চক্ষু পরকাশে
নিদ্রা প্রাএ রহি থাকে গড়ি ॥

তাহার ঔষধ পুনি পুরুষ কুক্কুট আনি
বর্ণ তার হইলে লোহিত।
যার যে শাস্ত্রের নীতি তাকে বধি শীঘ্রগতি
সেই রক্ত লইব তুরিত ॥

কাঁচা মৃত্তিকার ভাঁড়ি সে রক্ত লইব ভরি
পূর্বে নিয়া দূরেত গাড়িব।
ছাগলের দুগ্ধ আনি রুগী শিরে লেপি পুনি
ভালমতে স্নান করাইব ॥

অগর[1] যে শস্য পুড়ি মধু দিব যত্ন করি
মহামন্ত্র বান্ধিবেক হাতে।
গুরুমুখে শিখিবেক ভুত-দৃষ্টি ঘুচিবেক
খণ্ডিব সকল উৎপাতে ॥

'মহানন্দ' পাপমতি মিথুনেত থাকে নিতি
সে কহিব আপনা চরিত্র।
থাকে সেই ঘর দ্বারে প্রভাতে ধরএ যারে
দেখিয়া শরীর অপবিত্র ॥

ক্ষেণে অচেতন হএ ক্ষেণে নানা কথা কহে
যে ঔষধে শুনি বিঘ্ন যাএ।
দাড়িম্বের পুষ্প আনি চাম্পা শতবর্গ পুনি
মর্দন রুগীর সর্ব গাএ ॥

সেই পুষ্প ক্ষেপি পূর্বে স্নান করাইব তবে
মহামন্ত্র বান্ধিব হস্তএ।
শিখিব গুরুর স্থান সেই মন্ত্র মহাজ্ঞান
মহানন্দ তবে দূর হএ ॥

কর্কটএ নিবাসএ অপবিত্র দেহ লএ
বৃন্দাবনে থাকে পাপমতি।
অপবিত্র রজঃ ধরে দুই পাশে ব্যথা করে
মধ্য দেশে ব্যথা করে অতি ॥

১ অগর—বিষনাশক

সে কহিল নিজ বাণী যে ঔষধে ধাএ পুনি
শ্বেত অজা শোণিত আনিয়া।
মন্ত্র লেখি সেই রক্তে সিদ্ধ করি ডান হস্তে
গুরু মুখে লইব জানিয়া॥
সিংহেত 'আদর' নাম নিবাসএ দেও ধাম
সে কহিল নিজ বিবরণ।
নিশা কালে যে মুগধ না পাখালে কর পদ
মুখ না ধোএ মলিয়া[১] বদন॥
অপবিত্র দেখি ধরে উদরে বেদনা করে
লিঙ্গদেশে বেদনা জন্মএ।
কহিব ঔষধ তার চাহি লোক উপকার
যে ঔষধে যে দেও ঘুচএ॥
ধরিয়া বোয়াল মৎস্য উফারি লৈব অবশ্য
শিরের পাছের চর্ম তার।
দহিয়া সেই মৎস্য চর্ম খাটের তলেত ধূম্র
দিব যেন শাস্ত্রের বিচার॥
সর্ব দেহ বস্ত্র ঢাকি খাটেত রাখিয়া রুগী
মন্ত্র-তন্ত্র পড়িয়া প্রকট।
গুরু হোন্তে মন্ত্র লেখি হস্তেত বান্ধিব দেখি
মন্ত্র বলে ঘুচিব সঙ্কট॥
কন্যাতে 'ছওদ' নাম নিবাসএ দেও ধাম
শেষে কহে আপনা কথন।
না ভাবিয়া করতার যেন শাস্ত্র ব্যবহার
প্রভাতে যে করএ শয়ন॥

অপবিত্র পাএ যবে তাহারে ধরএ তবে
কৃষ্ণ হএ শরীর তাহার।
সর্ব গাএ কণ্ডু হএ তিলেক বিশ্রাম নহে
সে ঔষধ কহি তত্ত্ব সার॥
চালে থাকে পক্ষীচএ তাত যে পুরুষ হএ
তাক নিছিবেক রুগী গাএ।
যারযেন শাস্ত্র নীতি তাকে বধি শীঘ্রগতি
চারি খণ্ড করিবেক তাএ॥
প্রথমে দক্ষিণ পাখে ক্ষেপিব দক্ষিণ দিকে
যেন মতে শাস্ত্র নীতি আছে।
তবে পুনি বাম পাখে ক্ষেপি উত্তর ভাগে
অঙ্গারের ধূম্র দিব গাএ॥
তিল তৈল-জলে স্নান করাইব পাছে জান
তবে চতুর্পদ পাপ ধাএ॥
গুরু হোন্তে মন্ত্র জানি ততক্ষণে লেখি পুনি
রুগী হস্তে বান্ধিবেক তাক।
তুলা রাশি কার হএ তাত দেও নিবাসএ
'কালা' তাকে বলি নিএ যা'ক॥
গুহার মাঝারে থাকে সে পাপিষ্ঠ ধরে যাকে
নয়নেত রোগ উপজএ।
টুটায় চক্ষুর দৃষ্টি ধূম্রাকার দেখে সৃষ্টি
ঔষধে শোষহ বিঘ্নচএ॥

১ মলিয়া—মাজিয়া, ঘষিয়া

কৃষ্ণ বিড়ালের বিষ্ঠা আনিব করিয়া চেষ্টা
হরিদ্রা গন্ধক সঙ্গে তার।
তার ধূম রুগী লৈব সে পাপিষ্ঠ দূর হৈব
হস্তেত বান্ধিব মন্ত্র সার।।
বিছাএ 'আজ্জিল' নাম নিবাসএ দেও ধাম
সে কহিল নিজ ব্যবহার।
নারীর উদরে বৈসে প্রকটএ সপ্তমাসে
নব মাসে সব দুরাচার।।
করিবারে গর্ভপাত করে নানা উৎপাত
গর্ভ হোন্তে শিশু হএ পাত।
পশ্চাতে চল্লিশ দিন থাকএ রোগের চিন
ঔষধে সে খণ্ডে পরমাদ।।
অম্ল দাড়িম্বের পাত হরিতাল গুড়ি তাত
জতুক হিঙ্গুল গুড়ি সঙ্গে।
কস্তুরী টুটেক দিয়া পোঁটলা নির্মি লৈয়া
মর্দিবেক সেই নারী অঙ্গে।।
সেহ মলা(?)এক করি মাটির বরুনা[১] ভরি
মুখামুখি দুই গোটা বান্ধি।
গাড়িব ধরণী তলে স্নান করি শুদ্ধ জলে
স্নান শেষে শ্বেত বস্ত্র পিন্ধি।।
অগর[২] শস্য পুড়ি সে ধূম্র লইব নারী
রক্তবর্ণ গোধন শোণিতে।
গুরু হোন্তে মন্ত্র শিখি সেহ রক্তে মন্ত্র লিখি
বাহুমূলে বান্ধিব নিশ্চিন্তে।।

'চিন্দ' নামে দেও ছার ধর্মুএ নিবাস তার
রন্ধনশালাত থাকে নিতি।
অন্নে তার দৃষ্টি পড়ে সে অন্ন খাএ যে নরে
দুর্ভোগ যে হএ তার অতি।।
রোগ হএ জ্ঞান ছাড়ে বচন কহিতে নারে
কম্প করে স্থির নহে অঙ্গ।
তাহার ঔষধ পুনি কুক্কুটীর বিষ্ঠা আনি
হরিদ্রাহ দিব তার সঙ্গ।।
চৌপথের[৩] মাটি আনি দহি ধূম দিব পুনি
যেমতে প্রবেশে রুগী গাএ।
গুরু হোন্তে মন্ত্র শিখি হস্তেত বান্ধিব লেখি
তবে জান চিন্দ পাপ যাএ।।
'কস্তুন' পাপিষ্ঠ মতি মকরেত বৈসে নিতি
যথা সব মৃত্ত গড়ি থাকে।
যে নারী মকর রাশি চিতাশালে দুখে আসি
বিলাপএ উচ্চস্বর ডাকে।।
প্রভু নাম যদি লএ ধর্ম শাস্ত্র যে পড়এ
তার কাছে যাইতে না পারে।
যদি শোকে বিলাপএ প্রভু নাম নাহি লএ
শীঘ্রগতি ধরএ তাহারে।।
হস্ত পদ নাহি নড়ে সংজ্ঞা তার রোগে হরে
তাহার ঔষধ শুন কহি।
আনিয়া গাভীর হাড় অসিত মৃত্তিকা আর
তাত ধূম্র দিব সব দহি।।

১ বরুনা—সরা ২ অগর—বিষনাশক ৩ চৌপথ—চৌরাস্তার মিলন স্থল

মন্ত্র বান্ধিবেক হাত খণ্ডিবেক উৎপাত
তবে সব বিঘ্ন নাশ হএ ।
কুম্ভে 'আচর্ম' বৈসে থাকএ জলের কাছে
যেবা যাএ জল আনিবারে ॥
অপবিত্র স্নান করে শীঘ্রগতি তাক ধরে
মুহুর্শিচত ভূমিত পড়এ ॥
হস্ত পদ আছাড়এ লোকে 'বায়ু' হেন কহে
সেই ক্ষণে মৃত্যু যোগ হএ ॥
শিয়রে মৎস্য আনি মস্তক লইব পুনি
অসিদ্ধ মৎস্যের পিত্ত আর ।
আর গোধনের মূত্র সব করিব একত্র
বরুনাত ভরিব সভার ॥
পন্থের মস্তকে গিয়া সে সব গাড়িব নিয়া
আর দিন পুষ্করণী জলে ।
সেই জলে স্নান দিব মহামন্ত্র লেখি লৈব
বান্ধিব রুগীর বাহু মূলে ॥
মীনেত 'কুঅরি' নাম নিবাসএ দেও ধাম
সে থাকএ পাতাল ভিতর ।
জড়িয়া বালক মুখে নিজ স্থানে নিয়া সুখে
পাপিষ্ঠে পাড়এ অথান্তর ॥
শিশু ভাণ্ডি বহু করে জননীর দুগ্ধ ছাড়ে
মৃত্যু যোগ দেখে সর্বজনে ।
তাহার ঔষধ বোলে সপ্তটি নদীর জলে
ঝারি ভরি আনিব যতনে ॥
সেই জলে স্নান দিব সে জল ভরিয়া লৈব
মৃত্তিকার পাতিলা ভরিব ।
ত্রিপন্থে ক্ষেপিব জল ঠামে থাকে পক্ষীবর
তাত এক পুরুষে ধরিব ॥
নিয়া শিশুর গাএ শাস্ত্র-নীতি বুঝি তাএ
দুই খণ্ড করিব সে তনু ।
পক্ষীর দক্ষিণ ভাগ ক্ষেপিব দক্ষিণ দিক
বাম ভাগে ক্ষেপিব উত্তর ॥
মন্ত্র বান্ধিবেক গলে কিবা বান্ধে বাহু মূলে
খণ্ডিব বালক উৎপাত ।
মোহাম্মদ খানে কহে গুরু বিনে কার্য নহে
শিখিবেক গুরুর সাক্ষাৎ ॥

যুগ-সংবাদ যদি সমাপ্ত হইল ।
হরষিতে মিত্রকণ্ঠে আশীর্বাদ দিল ॥
হরষিত পাত্র সব স্তবে জোড় হাত ।
যার যে দেশেত গেলা তিন নরনাথ ॥
সিদ্দিক বংশেত ভব নব-কল্পতরু ।
শাহা সোলতান পীর জ্ঞানে শুক্র-গুরু ॥

॥ কবির নিবেদন ॥

(গুর্জরী রাগ—জমক ছন্দ)

মোহাম্মদ খানে কহে শুন গুণিগণ।
গুণ লই দোষ তেজ না হও বিমন॥
মূর্খে যদি কথা কহে পণ্ডিতের আগে।
নানা অর্থে বর্ণে তাক শুনি শ্রধা লাগে॥
শুকনা কাষ্ঠেত যদি লেপএ চন্দনে।
সুগন্ধি আমোদ পাএ শুঁকিব যেই জনে॥
মৃত্তিকায় মৃগমদ মিশ্রিত করিলে।
কস্তুরীর গন্ধ হএ পাষাণে পিষিলে॥
পিতল অঙ্গুরী যদি নৃপ করে রএ।
সুবর্ণ অঙ্গুরী হেন লোকে বিমর্ষএ॥
দূর্বা যদি সিদ্ধ করে কেহো কদাচন।
খাইতে সুস্বাদ হএ উত্তম ব্যঞ্জন॥
আমলকী আনি মিষ্ট সিদ্ধ করে যবে।
খাইতে অমৃত ফল মুখে লাগে তবে॥
ফুল সঙ্গে কদলীর সূত্র শিরে রাখে।
অশুদ্ধ যে শুদ্ধ হএ পণ্ডিতের মুখে॥
এথেকে পণ্ডিত লোকে দোষ না লইবা।
আপনা মর্যাদা দেখি গুণ বিচারিবা॥
অশুদ্ধ করহ শুদ্ধ ক্ষেম অপরাধ।
পরনিন্দা মহাপাপ পাছে পরমাদ॥
সকলের প্রতি দোষ গণিবারে পারে।
সেই সে পণ্ডিত নিজ দোষ যে বিচারে॥
সহজে নির্গুণী আহ্মি জানিএ আপনে।
ঢোলের শবদ[শব্দ] যেন দূরে ভাল শুনে॥

চর্ম-কাষ্ঠে ঢাকি আছে তনু মাঝে শূন।
চাহিলে তেহেন আহ্মি অশুদ্ধ নিগুণ॥
ভর্ত-পুষ্প ডালে যেন দেখিতে সুরঙ্গ।
মুকুলে খসালে সেই গন্ধহীন অঙ্গ॥
আপনে মাগিএ দোষ দোষী হই নিত।
মহাজনে পরদোষ ঢাকিতে উচিত॥
নিজ দোষ দেখি লাগে তেজি এ জীবন।
ধরে প্রাণ রহে মাত্র কহি কি কারণ॥
কাহাত নাহিক দোষ ছাড়ি নিরঞ্জন।
চান্দেত কলঙ্ক দেখ তারার কারণ॥
কালী ধরে মুণ্ড-মালা ইন্দ্র পাএ লাজ।
সহস্র লোচন বন্দী হৈল সেই কাজ॥
মাধবে গোপিনী পরে করে[১] কুন্তী সতী।
সতী দ্রৌপদীএ বরে পাণ্ডু পঞ্চপতি॥
রাবণে হরিল সীতা রামক সমিত।
ভৃগুপতি মাতৃ বধে লোকে অবহিত॥
মিষ্ট আম্রে কীট কীটে মধুর উৎপত্তি।
দোষে-গুণে আছএ ভরিয়া দেখ ক্ষিতি॥
চন্দনে বৈসএ নাগ নাগে বসে মণি।
মৃগমদ শুনিতে শুঁকিতে ধন্ধ পুনি॥
এথেকে সে শান্ত করি আপনার মন।
নহে নিজ দোষ গুণি তেজিতুঁ জীবন॥
এথ সব কহি আহ্মি না নিন্দিএ কা'ক।
কিন্তু এথা মন শান্ত করি আপনাক॥

১ পরে করে—উপগত হয়, কৃষ্ণ এবং কুন্তীও ব্যভিচার করেন

রাত্রির প্রদীপ চন্দ্র তাকে কে নিন্দিব।
পরম সাধক পরনিন্দা না করিব॥
দশরথ সুত রাম সীতা মহাসতী।
মৃগমদ সুগন্ধি বাস সেবে সুরপতি॥
সহজে নির্মল গন্ধি অমৃত সুফল।
সর্বগুন সব আছে সকল উজ্জ্বল॥
এথেকেহ অপরাধ যদি থাকে মোর।
ক্ষেম ক্ষেম গুণিগন করোঁ করজোড়॥
গুণিগণে যথ কহে শির 'পরে ধরি।
হিত উপদেশ হেন তাকে মনে করি॥
কিন্তু মাত্র পিশুন যে নিন্দা করে নিতি।
তাহাকে না গুনি যার এহেন আকুতি॥
আহ্মি অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি শিশু অল্প জ্ঞান।
আহ্মাকে নিন্দসি সত্য-মিথ্যা নাহি জান॥
আছিল নেজামি[1] নাম কবি মহামতি।
আজিহ সংসার মাঝে আছে তার কীর্তি॥
হেন মহাসত্ত্বক নিন্দিল কথ লোক।
কিন্তু মাত্র শুক যেন নিন্দএ উল্লুক॥
শুক উল্লুকের চঞ্চু একাকৃতি পুনি।
কেহ পাড়ে ভ্রুকুটি কাহার মধুবাণী॥
খদ্যোতে নিন্দএ যেন দেব নিশাকর।
নিশি হৈলে জুতি ধরে দোঁহ কলেবর॥
দেখি চন্দ্র-কলঙ্কী সংসারে করে দীপ্তি।
খদ্যোতে আপনা গর্বে করিলেক জুতি॥
গোবরুয়া[গোবরে]কীটে যেন নিন্দল ভ্রমর।
কেহ পদ্ম 'পরে কেহ গোময় উপর॥

সহজে নেজামি সুর জগতে প্রকাশে।
রিপু তম কতক্ষণ থাকিব আকাশে॥
সহজে নেজামি যশ-মানের কাঞ্চন।
নাটিয়া (?) পিতল যেন ধরিব তুলন॥
সহজে নেজামি যেন কৃপার সাগর।
তাকে কি নিন্দিব কালী-নাগের সরোবর॥
করিব গন্ধ কিবা ঢাকএ বসনে।
চন্দনে কি তেজে গন্ধ হীন পরশনে॥
বিষ্ঠায় কি নষ্ট হএ সমুদ্রের জল।
মহাজন নিন্দা কৈলে দুর্জন নিষ্ফল॥
ক্ষেম সেই অপরাধ আএ গুণিগণ।
সদুপদেশ পড়িএ এসব বচন॥
মহা সাধু নেজামি যে পুরুষ প্রধান।
তাহাকে নিন্দিলে হৈব হীনমতি জান॥

বিশেষ রচিলুঁ উপরে যে পঞ্চালি।
যেন মতে যুদ্ধ কৈল সত্য সঙ্গে কলি॥
বাক্য উপদেশ হেতু বহুল যতনে।
তেকারণে বিরচিলুঁ ভাবি নিজ মনে॥
তাতে যদি অপরাধ ক্ষমা কর দোষ।
না বুঝিয়া গুণিগণ না করহ রোষ॥
যে যুদ্ধ সমাপ্ত হৈলে অগ্নিদাহ টুটে।
যুদ্ধ অগ্নি মাঝে জুতি প্রজ্বলিত বটে॥
সহজেই গুণিগণ যুদ্ধ-ধর্ম ছাড়ে।
এথেকে ক্ষমহ দোষ উচিত বিচারে॥

---

১ নেজামি—প্রখ্যাত ইরানি কবি নিযামী

ধর্ম কথা কউ[ক] সুখে পাপী মাত্র নাশ।
দাতার যশের কথা হউক প্রকাশ॥
পাপাশয় কৃপণ যাউক রসাতল।
সত্য সত্য হউক যে দহুক আনল॥
কপটের কণ্ঠ নাশ হৌক সর্বকাল।
সুবুদ্ধি সম্পদ পাউ[ক] ঘুচুক জঞ্জাল॥
বীর্যশালী ক্ষেত্রিএ সংগ্রামে পাউ[ক] জএ।
মরি যাউ[ক] যেবা যুদ্ধে ধাএ প্রাণ ভএ॥
সংসারেত পণ্ডিতের রহুক বাখান।
সভাতে বর্বর মুর্খে পাউ[ক] অপমান॥
শত উচ্চতা পাউ[ক] নবীদের শির।
শত কণ্ঠে মিত্রতা বাড়াউ[ক] ধরার॥
সত্য জয় লভউক কলি পাউ[ক] নাশ।
যবে চন্দ্র সূর্য রহে এই উপদেশ॥
মোহাম্মদ খানে কহে প্রভু নিরঞ্জন।
অনাথের নাথ পাপ করহ মোচন॥

॥ মুনাযাত ॥

(লাচারী)

প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিদান
হের করেঁা জোড় হাত।
জানি বা না জানি যে পাপ করিলুঁ
অপরাধ ক্ষেম মোর।
হউ নফর মেনে পাপ করিলুঁ বহু
লিখন নিরঞ্জন তোহর নিযোজন
বিনে সে ভাবিলুঁ
কিবা অপরাধ মোর।
অমিয়া গরল
অহি ছিল জল
ভুঞ্জি করায়সি ভোগ।
আঙ্খি লোভী তাই মো হোসি
গরল মরণ যোগ।
স্বরগ নরক যাহার বাখান
ধিকাধিক নাহি তাক।
খান মোহাম্মদ মাগে তুয়া পদ
পদরেণু করি রাখ॥

॥ রচনাকাল ॥

রসের শেষ সুরগুরু গঞি'দেও'গুরু পরবেশ।
দৈত্যগুরু শেষ হৈল অস্তে গেল সূর।
উজ্জ্বল করিল চন্দ্র নক্ষত্রের পুর॥
দশ শত বাণ শত বাণ দশ 'দধি'[১]।
রাত্রি হই[য়া] গেল সংসার অবধি॥
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম।
গুরুজন চরণে সহস্র পরণাম॥

॥ মালিক, লিপিকর ও লিপিকাল ॥

এহি পুস্তকাধিকারী শ্রীআব্বাস খলিফা পীং এআচমত খলিফা সাং হাজার বিঘা। খএরাত শ্রীবকসী হামিদ। লিখক শ্রীগোলাম আলী। সন ১১৪৪ মঘী। তারিখ ২ জমাদিল আখের। মাহে ২২ চৈত্র রোজ রবিবাসর। বেলি ১২ বাড়এ দণ্ড।*

.১ দস সত বান সত বান দস দধি

॥ সংযোজন ॥

১০৭-১০ পৃষ্ঠার আলোচনার আলোকে পঠিতব্য :

সৈয়দ সুলতানও তাঁর 'নবীবংশে'র উপক্রমে পরাগল খানের নামোল্লেখ করেছেন ঃ

"লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি।
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি॥"

এই নামই সুখ্যাত। মোহাম্মদ খানের তা অজানা থাকবার কথা নয়। কাজেই মিনা খান ও পরাগল খান অভিন্ন ব্যক্তি হলে মোহাম্মদ খান মিনা খানের বিকল্প-নামও উল্লেখ করতেন, যেমন করেছেন পীর শাহ্ ভিখারীর ক্ষেত্রে।

১১৪-১১৬ পৃষ্ঠার পাঠের আলোকে পঠিতব্য ঃ

সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের বন্দনাংশেই রচনাকালটি পাওয়া গেছে। কাজেই ওটি রচনা আরম্ভের তারিখ—সমাপ্তির নয়। এ বিরাট গ্রন্থ রচনা করতে কয়েক বছরই লাগার কথা। 'কিফায়তুল মুসল্লিন' (১৬৩৯ খৃঃ) রচয়িতা শেখ মুতালিবের পিতা কবি শেখ পরাণ 'নবীবংশের' উল্লেখ করেছেন। পিতা ও পুত্রের গ্রন্থ রচনাকালের মধ্যে ত্রিশ বছরের ব্যবধান ধরে নিলেও সৈয়দ সুলতান ১৬১০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে 'নবীবংশ' রচনা শেষ করেন বলে মানতে হয়। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে 'যুগ-সংবাদ' রচনাকালে মোহাম্মদ খান 'মুরীদ' হন নি। কাজেই ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের পরে এবং ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে মোহাম্মদ খান সৈয়দ সুলতানের সাগরেদ হন এবং 'মক্তুল হোসেন' রচনার নির্দেশ পান। সৈয়দ সুলতান তরুণ বয়সে নবীবংশ রচনা সুরু করেন বলে অনুমান করলেও ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর বয়েস প্রায় আশী বছর হয়েছিল।

—**আহমদ শরীফ** সম্পাদিত

* সম্পাদনার ও প্রকাশের প্রবর্তনা দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। আর কৃতজ্ঞ রইসাম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর সুকুমার সেন, দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, আলি আহমদ, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্য-রত্ন, ডক্টর আহমদ হাসান দানী প্রমুখ জীবিত ও মৃত শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতগণের নিকট—যাঁদের মোহাম্মদ খান বা সৈয়দ সুলতান সম্পর্কিত আলোচনা তথ্য ও সত্য আবিষ্কারের সহায়ক হয়েছে।

॥ সংশোধন ॥

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১০৪		২৪	সংশয়ের কথা এই নে	সংশয়ের কথা এই যে
১১১		৪	তিনটে পর্বাংশ	দুটো পর্বাংশ
		১২	পংক্তি শেষের '—'	চিহ্ন লোপ পাবে।
১১৭		১০	কোথাও আর	আর কোথাও
১২০		১	গুণগ্জাপক	গুণজ্ঞাপক
১২১	১	৫	রিপুকাল···	রিপুকুল তৃণসম দুর্জনের কাল
	২	৫	তরনী	তরণী
		৫	করি···সক্য	কিবা আছে শক্য
১২৩	১	৫	দুষ্টমতি	দুষ্টমতী
১২৪	২	১	দসনের	দশনের
	২	৬	কামগুণী	কাম কেলি
১২৭	১	২৫	তোষ্মি	তুষ্মি
১২৮	২	১০	বৈশ্য	বশ্য
১২৯	২	১১	অসক্য	অশক্য
	২	২১	নাহএ	না হএ
১৩২	২	২০	পদ্মিণী	পদ্মিনী
১৩৫	১	৫	ইন্দুমতী	ইন্দুমতী
	২	২১	অমলকী	আমলকী
	২	২৪	মুগদ	মুগধ
১৩৬	২	২২	কাপি	কাঁপি
	২	২৮	জড়ে	জরে
১৩৭	১	৬	চাপি	চাপ
	২	২১	ইন্দ্রমতী	ইন্দুমতী
১৪০	২	১৩	সুরত	সুরতি
১৪৩	১	২০	অন্ধকার	অন্ধকারে
১৪৫	১	৮	শীল	শিল
১৪৮	২	১৭	সৈন্যে পরে	সৈন্য পড়ে
১৪৯	১	১৬	অশ্বকাটে	অশ্ব কাটে
১৫০	১	১৩	অসক্য	অশক্য
	১	২২	চাহিল	চাহিলুঁ

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১৫৩	২	৪	ভস্নপাত্ত	ভস্মপাত্ত
১৫৪	২	২১	নিঃশঙ্ক	নিঃশঙ্ক মন
১৫৬	১	২	টঙ্করে	টঙ্কারে
	১	১৯	শোনিতে	শোণিতে
	১	২৩	সূর্য ধৈর্য	সূর্য-ধ্বজ
১৫৮	১	১১	লবন	লবণ
	২	১৭	গুনিজনগণ	গুণিজনগণ
১৫৯	১	১৫	উচ্চ স্বরে	উচ্চস্বরে
	১	১৯	মোছলো	মোছ লো
	২	৯	সিদ্ধাদের	সিদ্ধা দেব
১৬০	১	২৩	প্রাণ নাথ	প্রাণনাথ
	১	২৬	উচ্চ স্বরে	উচ্চস্বরে
	২	৩	দারুন	দারুণ
	২	২৩	কল্প তরু	কল্পতরু
১৬৪	১	১৭	দন্ত	দন্তে
১৬৮	২	১১	গুনি	গুণি
১৭৫	২	২৪	গৌরিক	গৈরিক
১৭৬	২	১২	নিবাতি	নিবারিতে
১৮৩	১	১	ঘাদিয়া	ঘা দিয়া
	২	৫	শ্বাসে-বাউ	শ্বাস-বাউ
	২	৭	রমন	রমণ
	২	১৫	লবন	লবণ
১৮৪	১	৫	খাইবারে	খাইবার
১৮৫	২	৮	জায়ন্ত	যায়ন্ত
	২	৯	সক্র	শক্র
	২	১৮	বিপ্রছার	বিপ্র ছার
১৮৬	১	১০	সক্র	শক্র
	১	২৪	আকার	প্রকার
১৮৭	১	১৯	মধু রস	মধুরস-
	২	১১	সম্ভাসিলা	সম্ভাষিলা
	২	১২	অসক্য	অশক্য
১৯৩	১	১১	শক্র	শক্রে

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১৯৪	১	২০	পিষুন	পিশুন
	২	১৬	হইলুম অমাবশ্যা	হইব অমাবশ্যার
১৯৫	২	৬	যাইব	কহিব
	২	২১	পাত্র গণ	পাত্রগণ
১৯৭	২	১২	পার	পারে
	২	১৫	খেচর সিদ্ধি	'খেচর-সিদ্ধি'
১৯৮	১	১৯	মায়ামতী	মায়াবতী
১৯৯	২	১২	নাশা	নাসা
	২	১৭	তিলেক	তিলক
২০০	১	৩	নাসা	নাগ
২০৪	২	২৬	রাত্রি	রাতি
২০৬	২	৭-৮	৮ম পংক্তি ৭ম পংক্তিরূপে	পঠিত হবে
২০৯	১	৭	মহাবল	মহাবন
২১১	১	১৩	সাধু	সাধু সাধু
২১৩	১	২০	এথা অথা ... নাহি তার	এথা অথা ধিক পুণ্য কিছু নাহি আর
২১৫	২	৫	বিষ্টা	বিষ্ঠা
	২	২১	চতুর্দ্দশ	চতুর্দশ
২১৬	২	২৪	মৃত হোন্তে	হোন্তে মৃত

॥ শব্দ-সূচী ॥

অথান্তর—বিপর্যয়
অশক্য—অসাধ্য, অবর্ণনীয়, অনুচিত, অশিষ্ট
আটোপ—সম্ভ্রম, গর্ব, গৌরব, আড়ম্বর
আনকে—অপরকে
ইস্তকে (ইস্তক—ইস্+তক হিঃ)—পর্যন্ত, অবধি, সমস্ত
উজাএ—অগ্রসর হয়, আগাইয়া যায়
উতল—<উতলা, চঞ্চল
উপেক্ষন্ত—উপেক্ষা করে
এড়ে—ছাড়ে
কঙ্ক—কাক
কাতিমান—কাতা, দড়ি
কাতিকবীর্য—কার্তবীর্য
কিসকে, কিসেরে—কি জন্য, কেন
কুল্ল—কুল্লা
কুঞোর—<কুঙর—কুমার
গোহারী—নালিশ, অভিযোগ, আবেদন, প্রতিকার প্রার্থনা
চান্দথু—চাঁদ থেকে, থু>থেকে
চিন্তসি—মধ্যমপুরুষে ক্রিয়া বিভক্তি 'সি' —চিন্তা কর, তুল : বাখানসি, করসি, দেখসি, বোলসি, নিন্দসি প্রভৃতি

চিন্তহ—মধ্যমপুরুষ অনুজ্ঞা—চিন্তা কর
চাপ—ধনু
চিরাউ—চিরায়ু, চিরজীবী
ডগমগি—অস্থির, কম্পমান, ডগমগ
জনু—যেন, দ্রঃ নুঃ
জাদ—ফিতা, বস্ত্র
ঝাটে—দ্রুত, শীঘ্র
টাঙ্ক্যবাণ—খস্তা বা অর্ধচন্দ্রমুখী বাণ
তস>তসনস—নষ্ট, বিচূর্ণ
তোহর, তোহার—তোমার
থল—স্থল
থিয়াই, থিতাই (<স্থিত) তুঃ থিতানো,
স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া
"থূ"—থুথু
থু<থেকে<থাকিয়া—হইতে, অপেক্ষা
দান্তাল—(দন্ত+আল)=দাঁতাল
দ্বিজরাজ—সূর্য
দেঅসি—(মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি-সি)
—দাও
দেঅহ—(মধ্যম পুরুষ অনুজ্ঞা)—দাও
দৈবহি—দৈবাৎ, দৈবেও
নির্বহন্ত, নির্বহিল—নির্বাহ করা, সম্পাদন করা,
সমাপ্ত করা, যাপন করা
নিয়ড়ে—নিকটে
নিরুৎসুক—ভীতিজনক, ত্রাসকর, উৎসাহ-
বর্জিত
নেউটে, নেওটি—ফিরিয়া আসা
নেহা—<স্নেহ, (তুঃ লেহ)—প্রেম
নেহালএ—<নেহারএ—দেখে
পটেশ্বর—পটাঙ্কিত ছবি
পাপশত—শত পাপী
পায়দল—পদাতি সৈন্য, পদব্রজে
ফাড়ি—ফাটিয়া, বিদীর্ণ হইয়া
বচাবচ—কথোপকথন, আলাপ
বরিখএ—বর্ষন করে
বক্ত—অদৃষ্ট, কপাল
বাউ—বায়ু
বাহ—বাজাও
বিমসিলা—বিবেচনা করিলা, চিন্তা করিলা
ভগন—ভগ্ন
ভাবিনী—প্রেমিকা
ভালি—ভাল
ভাণ্ড, ভাণ্ডিল—ভাঁড়ান, প্রতারণা করা,
বঞ্চিত করা
ভেজাইয়া—পাঠাইয়া, জ্বালাইয়া
ভেটাএ—দেখায়
ভেদন—প্রবেশন, বেঁধা, ভেদ করা, বিদারণ
ভুঞ্জন—ভোজ্যদ্রব্য, খাদ্য-অর্থে
ভুঞ্জি—ভুগিয়া, ভোগ করিয়া
ভ্রমাই—ঘুরাই
মইল—মরিল
মাঁস—মাংস
মিট—মিল, ক্ষীণ-দীপ্তি, তুঃ মিটমিট
মেহু—মেঘ
মোহি—মোহিত হইয়া, মুগ্ধ হইয়া
মুহুশ্চিত—মূর্ছিত
যুঝনা—যুদ্ধ
যুতি—যুক্ত করিয়া, জুড়িয়া
শক্য—সাধ্য, করা সম্ভব
শরি—শর
শাল—শেল
সভ্রমেহ—ঘূর্ণনের সহিত, ঘুরাইয়া
সমসর—সমান, তুঃ একসর, দোসর, সোসর
সমাহিত—সাবধান
সয়ম্ভু—শিব
সাঞ্জিছেত—দ্বার বা বাসগৃহ সন্নিহিত স্থান
সান্ধি—সান্ধান করিয়া, প্রবেশ করাইয়া, বিঁধিয়া
সিত—চন্দ্র
সিন্ধিল—প্রবেশ করিল
সেনেহ—<স্নেহ
হাবিলাস—অভিলাষ
রাই<রাধা—সুন্দরী তরুণী
রাজধ্বনি—রাজখ্যাতি
লখি—লক্ষ্য করিয়া, দেখিয়া, তুঃ পেখি
লুলিত, লোলিত—জড়িত, মাথামাখি

গ্রন্থ-পরিচয়

কবি পাগলা কানাই ঃ ডক্টর মযহারুল ইসলাম। বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী॥ দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা॥

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা সম্ভব কিনা, সম্ভব হলেও সে দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো উদ্যোগ, অন্তর্দৃষ্টি ও শ্রমনিষ্ঠা আমাদের চরিত্রায়ত্ব কিনা—এ পর্যায়ের প্রশ্ন বর্তমানে আর উত্থাপনযোগ্য নয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ গবেষণামূলক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তাঁদের অনুসন্ধানের ফলেই ক্রমশঃ বাংলা সাহিত্যের অনেক বিস্তৃত বা অনাদৃত অংশ সকল সাহিত্যপাঠকের গোচরাধীন হচ্ছে, অনেক পরিচিত অংশ সম্পর্কেও গতানুগতিক ধারণাদির বিকারমুক্তি ঘটছে। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ তাঁদের "সাহিত্যিকী" মুদ্রিত করে এই অনুসন্ধানমূলক অভিযানের প্রকাশ্য শরীক হলেন।

"কবি পাগলা কানাই" রাজশাহীর গবেষণামূলক পত্রিকা "সাহিত্যিকী"র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধরূপে ছাপা হয়। বর্তমানে তার গ্রন্থাকৃতিও শোভমানতায় বিশেষ প্রীতিকর হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ২৪০। আলোচনামূলক ভূমিকাটি ৪৭ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। ৪৮ পৃষ্ঠা থেকে ২৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কানাইয়ের ২৪০টি গানের সংকলন। এর পরের তিন পৃষ্ঠায় পাগলা কানাই সম্পর্কে কয়েকটি কিংবদন্তী উদ্ধৃত করা হয়েছে। শেষ দেড় পৃষ্ঠা গ্রন্থপঞ্জী।

পাগলা কানাইয়ের এতগুলো গান এক জায়গায় দেখবার সুযোগ করে দিয়ে ডক্টর মযহারুল ইসলাম আমাদের সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। পূর্ব বাংলার লোকসংস্কৃতির স্বরূপ নিরূপণে যাঁরা এযাবৎ নিষ্ঠার সংগে শ্রমস্বীকার করে আসছেন তাঁদের জন্যে এই গ্রন্থের তাৎপর্য আরো গভীর। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের (১৮১০—৯৫) একজন কৃতকর্ম পল্লীকবির এরকম ব্যাপক পরিচয়

তাঁর রচনাবলীর মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ইতিপূর্বে অন্য কেউ প্রচার করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। দুএকটি খণ্ডিত উদ্ধৃতির টীকাভাষ্য হিসেবে কিছু বিচ্ছিন্ন আলোচনা বা সাধারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয়তো আমরা লাভ করেছি, কিন্তু পূর্ণাংগ বিচার ও উপলব্ধির জন্য যে জাতীয় সংখ্যাসমৃদ্ধ সঞ্চয়ন আবশ্যক হয়, ডঃ ইসলামের 'কবি পাগলা কানাই' সেরূপ একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। এই বিরাট কর্ম সম্পাদনের জন্য আমরা তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করি।

পাগলা কানাইয়ের গানসমূহ ডঃ ইসলাম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন প্রধান গীতগুচ্ছের শিরোনাম রেখেছেন—বন্দনা বা হামদ ও নাত, মনকে, দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব, হেঁয়ালী, প্রেমের মহিমা, ইসলাম ধর্ম, অনিত্যতা ও মৃত্যু, ব্যক্তিজীবনের বর্ণনা ইত্যাদি। এর মধ্যে দেহতত্ত্বের গানই সংখ্যায় সর্বাধিক, ২৯ থেকে ১০৫ সংখ্যক গান সবই দেহতত্ত্ব-মূলক। এসকল গানে নানা রূপকে দেহের কথা বলা হয়েছে এবং দেহের রূপকে নানা গুহ্য সাধনপ্রণালীর কথাও ব্যক্ত হয়েছে। যেমন:

চারটি অংসুল দেহের মাঝে বেয়াল্লিশ হাজার দ্বার
এক হাজার মেরুদণ্ড রয়
কোন্ দরজায় কেবা থাকে সেই কথা কও আমায়
না বলিলে বয়াতীর ছাও ছাড়বো না তোমায়
নাভীর নীচে কোন্ জনা আছে
বাহাত্তর সেজদা তোমার দেহের মাঝে কোন্ জায়গায়॥ (৬৪নং গান)

পাগলা কানাই পল্লীকবি এবং সাধক কবি। হৃদয়ের বাণী রূপক আকারে গীতময় করে বলাই তাঁর স্বভাব। তাঁর কবিভাষা কোনো কোনো সার্থক চরণে বা স্তবকে তাঁর নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হলেও সেগুলোর সাধারণ উৎস কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা সাধন প্রণালীর বিধিবদ্ধ পরিভাষা। ভাবচিত্র বা রূপকল্পের যে বৈচিত্র্যের সন্ধান সেখানে পাই তার বৈশিষ্ট কাব্যিক নয় বাহ্যিক, তত্ত্বস্পর্শিত এবং বহুলাংশে গতানুগতিক। কোনো জনপ্রিয় স্বভাবকবির রচনা যখন সংখ্যাধিক্যে বিশালত্ব অর্জন করে তখন তার পক্ষে প্রথানুবৃত্তি বর্জন করা সম্ভব হয় না। কবি পাগলা কানাইয়ের গৌরব এই যায়গায় যে তাঁর অশিক্ষিত

পটুত্ব একাধিক গানে এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করেছে। প্রাণমনের সজীব স্পন্দন সেসব গানকে গ্রামোত্তর ও লোকোত্তর মহিমা দান করেছে। বিশেষ সাধন প্রক্রিয়ায় কেবল আন্তরিক প্রত্যয়বোধ নয়, তাকে স্থলবিশেষে রহস্যময় তীর্যক রূপক উপমার স্পর্শে মোহনীয় করে তুলতেও কবি প্রয়াস পেয়েছেন। 'কবি পাগলা কানাই'য়ের বিপুল সম্ভারের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত বহু না হলেও বিরল নয়। ডঃ মযহারুল ইসলামের দীর্ঘ ভূমিকাটি পাগলা কানাইয়ের এই কবিসত্বা ও সাধকসত্বার কোন পূর্ণ ও সাংলগ্নিক বিবরণ হিসেবে পাঠ্য নয়। কাব্যমূল্য বিচারের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের অনুচিত ও অস্থির ধারণাদিই এর জন্যে দায়ী। ডঃ ইসলামের আলোচনা-রীতিও গবেষণামূলক বর্ণনার সাধারণ শৃংখলা, মিতভাষিতা ও তথ্যানুগতির পরিপোষক নয়।

আমরা পাগলা কানাই সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্বেও গ্রন্থ-লেখক যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে স্তবস্তুতি নিবেদন করতে চান, তার সারবত্তা স্বীকারে অক্ষম। পাগলা কানাই ভাব-সাধক গ্রাম্য কবি, অশিক্ষিত কবি। এসকল কথা লেখক নিজেই বলেছেন। স্বীকারও করেছেন যে, "রবীন্দ্রনাথের সাথে পাগলা কানাইয়ের তুলনা একেবারে বাতুলতা।" (পৃঃ ৩১) কিন্তু এজন্যে ডঃ ইসলামের যে সংকীর্ণ ও মারাত্মক ক্ষোভ তা তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেন নি। একাধিক যায়গায় মধুসূদন, বংকিম, হেম, নবীন, বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথের প্রসংগ উত্থাপন করে প্রতিতুলনার আহ্বান জানিয়েছেন। 'যথার্থ মূল্য বিচার' করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "গ্রাম্য কবি হয়েও এবং উচ্চ শিক্ষার আলো না পেয়েও কবি পাগলা কানাই যা সৃষ্টি করে গেছেন—তার মূল্য বাংলা সাহিত্যের অনেক উচ্চশিক্ষিত কবির সাথে তুলনা করলে মৌলিক চিন্তা, শিল্প-সৃষ্টি ও ভাব-গাম্ভীর্যের দিক থেকে উৎকর্ষ বলে বিবেচিত হইতে পারে।" (পৃঃ ২৬) এরপর হেম কায়কোবাদের নিকৃষ্ট চরণ উদ্ধৃত করে পাগলা কানাইয়ের 'কাব্যব্যঞ্জনার' তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব নিষ্পন্ন করেছেন। (পৃঃ ২৯) প্রসংগতঃ আধুনিক কাব্য এবং আধুনিকা নারী সম্পর্কে তাঁর যে ব্যক্তিগত অনমুরাগ তাও লিপিবদ্ধ করেছেন। (পৃঃ ৩২, পৃঃ ৩৫) রবীন্দ্রনাথের সংগে পাগলা কানাইয়ের ভাবগত ঐক্য লক্ষ্য করেছেন। (পৃঃ ২৯) বলা বাহুল্য যে

বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের শিল্পরীতি ও জীবনচেতনার দুই সম্পূর্ণ বিপরীত পরিমণ্ডলের কবিবর্গের মধ্যে এ জাতীয় তুলনা অহেতুক এবং ঔচিত্যবোধহীন।

ডঃ ইসলামের এই পর্যায়ের কোন কোন অভিমত পরস্পরবিরোধী ভাবের দ্বারা গুরুতরভাবে পীড়িত। যেমন, "মধ্যযুগের সাহিত্যের যে রীতি তারই রেশ পাগলা কানাই তাঁর গানে টেনে ফিরেছেনে এ কথা ঠিক—মধ্য-যুগের সাহিত্যের সাথে কবির প্রাণের যোগ ছিল না।" (পৃঃ ৩১) অনাবশ্যক মুগ্ধবোধ নিয়ে তিনি যখন আরো একশেষ বিচারের অবতারণা করে বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ' যে 'ঘোরতর মানবমুখীনতা' পাগলা কানাই তার অংশীদার, "তাঁর সারা জীবনের সংগীতসাধনায় শুধু মানুষের কথাই বলে গেছেন। তাঁর গানের মূল বিষয়-বস্তু প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছিল মানুষ" (পৃঃ ৩৩) ইত্যাদি, তখন আমরা বিভ্রান্ত অনুভব করি।

ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার আদলে অসংলগ্ন প্রশংসা আরোপের প্রবণতা পাগলা কানাই সম্পর্কে একাধিক অপ্রমাণিত সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে। যেমন "তাঁর গানের মধ্যে এই নামাজ-রোজার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শরিয়ত মোতাবেক জীবনকে গড়ে তুলবার প্রেরণা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।" (২১)—এই উক্তিটি। পাগলা কানাইয়ের দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, প্রেম, গুরুবাদ এবং সর্বোপরি হেঁয়ালী শ্রেণীর গানগুলো পাঠ করে তাঁকে যতটা বাউলপন্থী কোনো বিশিষ্ট সাধনপ্রণালীতে আস্থাবান এক স্বতন্ত্র ভাব-সাধক কবি বলে প্রতীতি জন্মে ততটা কোনো সুনির্দিষ্ট সমাজগ্রাহ্য অস্থিতিস্থাপক ধর্মপ্রথার অনুসারী বলে মনে হয় না। ডঃ ইসলাম কর্তৃক ইসলামী গান বলে সম্মানিত একটি রচনায় আছে:

আমি সভাস্থলে যাই প্রকাশ করে
নব্বই হাজার পারা ছিল গো নূরনবী খোদার দীদারে॥
পঞ্চাশ হাজার গুপ্ত রল, বাকী চল্লিশ কোরআন হলো
নব্বই পারা ছিল কোরআন, হাদিসে পাওয়া গেল
ও তার দশ সেপারা কোন জায়গায় ছিল
পাক পঞ্জাতন হক নিরঞ্জন মিনকুল্লে
কোরআন কোন বস্তু হোল॥ (১৫৩ নং গান)

১৪৩ নং ও ১৪৫ নং গানদ্বয়ও এই প্রসংগে পরীক্ষাযোগ্য। অন্যত্র সাধন তত্ত্বের একটি গানে আছে ঃ

ওরে তোর কালি মা তার গুণপনা ভাল
সে স্বামীর বুকে পাও দিল
সেও কথাটি সভাতে বল।
আমার মা বরকত যিনি আলীর বুকে কি পাও দিছিল!
এমন বেজাইতা মা তোর কোন্ দেশে ছিল॥ (১২০ নং গান)

এসব পড়ে একথাই মনে হয়েছে যে, পাগলা কানাইয়ের শিল্পচাতুর্যের কল্পিত জটিলতা উন্মোচনের পরিবর্তে প্রয়োজন ছিল তার ধর্ম-সাধনার তত্ত্বকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা, তার মধ্যে গুহ্য-সাধন প্রক্রিয়ার যে সকল সংকেত রয়েছে —তার মর্মোদ্ধার করা এবং অপরাপর বাউলপন্থী জীবনচেতনার সংগে কানাইয়ের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও তৎকালীন সামাজিক ধর্মীয় চেতনার সম্পর্ক কি ছিল তার পুনর্বিচার করা। এ ব্যাপারে ডঃ ইসলাম উৎসাহহীন।

পাগলা কানাইয়ের কাব্যমূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে একবার মাত্র ডঃ মযহারুল ইসলাম একটি প্রাসঙ্গিক তুলনার উল্লেখ করেন। সে মন্তব্যটি হোলো— "পাগলা কানাইয়ের সমসাময়িক কবিদের কাব্যে ছন্দ সৃষ্টিতে বা কথার গাঁথুনি-নির্মাণে এমন অপরিসীম কৃতিত্ব এক লালন ছাড়া আর কারো মধ্যেই ছিল না।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিচার যথাযথ সম্প্রসারণ লাভ করল না, অন্যান্য বাউল কবিদের সুনির্দিষ্ট পরিচয়ও তথ্যসমৃদ্ধ রূপে উপস্থাপিত হোলো না। আমরা শুনেছি যে—"বাউল-গানের মূল বিষয়বস্তু একটি ধর্ম-তত্ত্ব ও সেই ধর্ম-সাধনার ক্রিয়াকলাপ। ইহার পরিধি সংকীর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন। ব্যক্তিগত অনুভূতির উৎসারণ বা কোনো বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগীর রূপায়ণের সম্ভাবনা ইহার মধ্যে নাই। …গুরু বন্দনার পদ, শরণগতির পদ, দেহ-তত্ত্বের পদ, মনের মানুষের পদ প্রভৃতি ভাব ও তত্ত্বের দিক হইতে মূলতঃ প্রায় সবই সমান—ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা হইলেও ভাবকল্পনার পার্থক্য ও নূতনত্ব বা দৃষ্টিভংগির মৌলিকত্ব বিশেষ বিশেষ কিছুই নাই।" (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ১০৯ ও ১১১) কিন্তু যেটুকু মৌলিকত্ব ও পার্থক্য আছে একজন কবির পরিচয় প্রদান-

কালে তা অবশ্যচিহ্নিত করে দেয়া প্রয়োজন ছিল। ভাবে ভাষায় ভংগীতে পাগলা কানাই ঠিক কোথায় কতখানি লালন শাহ, শেখ মদন, ভানু শাহ, আলীমুদ্দিন, ভোলা শাহ, হাসান, ইলাল শাহ, মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন প্রভৃতি সমধর্মী কবিবৃন্দ থেকে স্বতন্ত্র সেই জরুরী সংবাদটিই ডঃ মযহারুল ইসলাম পরিবেশন করেন নি, হয়তো অনুসন্ধানও করেন নি। এই জ্ঞানাভাব যে কতটা বর্তমান সংগ্রহের শুদ্ধপাঠ বিচারকেও দুঃখজনকভাবে প্রভাবান্বিত করেছে সে কথা আমরা গ্রন্থের সম্পাদনা-রীতি আলোচনাকালে পরে উল্লেখ করব। "বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা, ধর্ম-তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালীর বর্ণনার শুষ্কতা সত্ত্বেও গানগুলির মধ্যে সহজ কবিত্ব শক্তি ও সাহিত্য রসের" (উপেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১) যে সকল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় তার সম্যক উপলব্ধির জন্যেও প্রয়োজন ছিল পাগলা কানাইকে অন্যান্য বাউল সাধক কবিদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তাঁর কবি-কীর্তির পুংখানুপুংখ জরীপ করা।

নিছক তথ্য পরিবেশনের দিক থেকে পাগলা কানাইয়ের কালনির্ণয়ের অধ্যায়টি সতর্ক অনুসন্ধান নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। এই নয়া বিচারের ফলে পূর্বতন ধারণার মাত্র দশবিশ বছরের হেরফের হলেও, নির্ধারণ প্রণালীটি নিপুণ ও যুক্তিগ্রাহ্য বলে প্রশংসার্হ। তবে পাগলা কানাইয়ের কাল, তাঁর সঠিক নাম, তাঁর জীবন-কথা ইত্যাদি প্রসংগকে বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করার ফলে সমগ্র বক্তব্যে কিছু পরিহার্য শৈথিল্য, পুনরুক্তি ও অতিকথন প্রবেশলাভ করেছে। কবিজীবনীর বর্ণনা ও গান সংগ্রহ রীতির ব্যাখ্যায় অবিজ্ঞানসুলভ অনেক আলাপচারিতা এই ভূমিকায় প্রশ্রয় পেয়েছে। গানের তিল পরিমাণ উক্তিকে আশ্রয় করে পাগলা কানাইয়ের শৈশব ও কবিজীবনের উন্মেষকালের যে বিশদ চিত্র আঁকা হয়েছে পরিণত মানসের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তা অনাবশ্যক ছিল। স্বরচিত গানের সংকেতকে অগ্রাহ্য না করেও কানাই কেন পাগলা হোলো তার অপরাপর সংগত কারণ ভাবা যেতে পারে। যেমন উপেন্দ্রনাথের মতে "বাউলরা নানা কারণে সমাজের লোকের সংগে মেলামেশা করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের সাধনা ও আচার-ব্যবহার সাধারণ লোকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তাই তাহারা সর্বদাই আত্মগোপন করিয়া থাকে। সাধারণের জীবন-যাত্রার বাহিরে

অবস্থিত বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পাগল বা ক্ষেপা বলে। ইহা হইতেই এই ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে বাউল (পাগল বা ক্ষেপা) বলিয়া অভিহিত করা হয়।" (উপেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭) "কবি পাগলা কানাই"তে উদ্ধৃত আবদুল কাদির সাহেবের মন্তব্যটিও এই প্রসংগে পাঠ্য। (পৃঃ ৩৫) গান সংগ্রহের ব্যাপারে ডঃ ইসলাম নিজের বৈজ্ঞানিকতা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বলেছেন "গানগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে অশিক্ষিত মানুষের মুখ থেকে। সুতরাং মাঝে মাঝে শব্দ-বিকৃতি যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু যতদূর সম্ভব আমি এই বিকৃতি থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছি—যাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে যথার্থ শব্দ আবিষ্কার করতে প্রয়াস পেয়েছি।" কি প্রশ্নকলকে তিনি সত্য-শব্দ গেঁথে তুলেছেন তার স্বরূপ ব্যক্ত না করা পর্যন্ত আমরা নির্ভুল পাঠ সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতে অক্ষম।

পাগলা কানাইয়ের গান সম্পাদনায় এই অবৈজ্ঞানিকতা, অনুমাননির্ভরতা ও অতিপ্রত্যয়ের ঘোষণা আলোচ্য সংগ্রহের গৌরবকে গবেষণামূলক অনুসন্ধানের মর্যাদা লাভ করতে অংশত বাধা দিয়েছে। এক, সমগ্র সংগ্রহ সম্পাদনায় কোনো সযত্ন পরিচর্যার ছাপ নেই। ২৪০টি গানের মধ্যে মাত্র প্রথম ৩০টি গান টীকা সংবলিত, বাদবাকী দুশো বেটীক। যে পর্যন্ত টীকা যুক্ত হয়েছে সেখানেও লক্ষ্য করা যায় যে টীকার আয়তন ক্রমশঃ শীর্ণকায় হয়ে এসেছে। দুই, বেশীর ভাগ টীকায় কেবল মাত্র সারমর্ম লেখা আছে। তাও গূঢ় অর্থে নয়, মামুলী অর্থে। যেমন ১৭নং সংখ্যক গানের টীকার দুই বাক্যের এক বাক্য হোলো "মনকে সঠিক পথে চলার জন্য আবেদন জানিয়েছেন কবি।" ২১নং গানের টীকা হোলো "গুরুর চরণকে অমূল্য ধন বলে করে সাধনা করতে উপদেশ দিয়েছেন কবি।" ইত্যাদি। অর্থাৎ গানের যে তাৎপর্য অন্যমনস্ক শ্রোতার কাছেও বোধ্য তাকেই টীকায় ব্যক্ত করা হয়েছে, যে অংশ অবোধ্য বা দুর্বোধ্য টীকাকার তাকে নজরের মধ্যেই আনতে চান নি। যেমন ১৮নং গানের টীকা হোলো "কবি জীবন-নদীর ঘাটে কুম্ভীরের কথা বলেছেন—সে ঘাটে নামতে হলে গুরুভজনা করে কুম্ভীরকে বশ করতে হবে এবং তারপর নামতে হবে।" কবি যে কুম্ভীরের কথা বলেছেন তা হরফজ্ঞানী মাত্রেই লক্ষ্য করে থাকবেন কিন্তু সেই জ্ঞানালোকে কি ঐ গানের—

ঘাটে নামলে মরা মানুষ—কুম্ভীর হয় বেহুঁস
ও সেই কুম্ভীর খাইয়া কুম্ভীর খাইছে—ও তার কি
জরা মৃত্যু আছে?
তাই পাগল কানাই কয় সেই ঘাটে কুম্ভীর রয়
তাজা দেখলে ধইরা খায় মরা দেখলে দৌড়িয়া পলায়
পাগল কানাই কয় ও মন সাধু
আজ কেন হলি বুধু। (১৮ নং গান)

—এই স্তবকটির অর্থোপলব্ধি ঘটে? টীকায় যে সাহায্য প্রত্যাশিত ছিল তা অনুপস্থিত। তিন, কোনো কোনো টীকার নির্দেশিত অর্থ মূল গানের অপ-ব্যাখ্যাও বটে। ১৬নং গান দ্রষ্টব্য। চার, টীকায় শব্দার্থ-নির্দেশও সুশৃঙ্খল ও সামগ্রিক নয়। যেমন ১৯নং গানের টীকায় 'বাকসা' শব্দের অর্থ দেয়া আছে, কিন্তু চিনা, বুরুজ, কুমপুনী কিম্বা ১৯নং গানের বুধু শব্দের অর্থ কি তা বলে দেয়া নেই। হস্তে যে হইতে, সকুতলে যে সকৌতুহলে তা উল্লেখ না করলেও ততো ক্ষতি ছিল না, কারণ চরণের মধ্যে এগুলোর অর্থ আধুনিক পাঠকের কাছেও একেবারে অকল্পনীয় নয়। বিভিন্ন গানের 'মনরে রসনা', 'অধর চাঁদ', 'আগরাত খাগরাত', 'চানকা কাটা' ইত্যাদি বাক্যাংশের ভাষাগত ও তত্ত্বগত রূপ কি কারণে টীকায় আলোচনার অযোগ্য বোঝা গেল না। পাঁচ, টীকার দ্বিতীয় বাক্যটি অনেক সময়েই সংগৃহীত গানের শুদ্ধপাঠ সম্পর্কে লেখকের অপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যয়ের ঘোষণা মাত্র। যেমন—"আমার সংগৃহীত এ গানের সাথে মনসুরউদ্দিন সাহেবের সংগৃহীত গানে পার্থক্য রয়েছে প্রচুর—তাঁর গান মাঝে মাঝে অর্থহীন বলে মনে হয়।" (১৭নং গান), "এ গানও মনসুরউদ্দিন সাহেব সংগ্রহ করেছেন—কিন্তু আমার গানের সাথে তাঁর গানের পার্থক্য আছে। নিঃসন্দেহে আমার সংগ্রহকে আমি যথার্থ মনে করি।" (১৫নং গান)। আমরা কি করে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারি সে পরামর্শদানে টীকাকার সম্পূর্ণ উদাসীন। কচিৎ এক আধ স্থলে পাঠ নির্ণয়ে অনুসৃত নীতির যে উল্লেখ করেছেন তা ঘোষণীয় নয়। ভূমিকায় তার একটি দৃষ্টান্ত ছিল। আরেকটি উদাহরণ—"গানটা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করেছেন—কিন্তু আমার এ সংগ্রহের সাথে সে গানের পার্থক্য প্রচুর। শব্দ-চয়নের দিক থেকে এখানে উদ্ধৃত গানটাই অধিক সংগত।" শব্দ-চয়নের

কি বৈশিষ্ট কানাইকে চিনিয়ে দিল সে কথা ডঃ ইসলাম গোপন রাখলেন কেন? ছয়, কোনো কোনো গানের টীকায় কানাই সম্পর্কে এমন মন্তব্য আছে যা সহজেই অন্য গানের উদ্ধৃতির দ্বারা নাকচ করা চলে। ৩নং গানের টীকা "গানটা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করে ১৩৬৩ সনের আষাঢ় সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে (পৃঃ ৮০২) প্রকাশ করেন। কিন্তু আশ্চর্য, সেখানে সর্বত্র খেজ্‌র স্থান কালা (কৃষ্ণ) শব্দ রয়েছে। পাগলা কানাইয়ের গানে কোথাও এমন কৃষ্ণ প্রশস্তি নেই। বিশেষ করে কোরাণে আল্লাহ কৃষ্ণের প্রশস্তি করেছেন, পাগলা কানাইকে যতটুকু বুঝেছি, এ কথা কিছুতেই তিনি বলতে পারেন না। সুতরাং মুসলমানী গানও কি ভাবে হিন্দু আদর্শে রূপ বদলায় এ তারই এক নিদর্শন। এখানে আমার সংগৃহীত গানই যে আসল তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।" বর্তমান গানের অপর পাঠের মত না হলেও পাগলা কানাই যে কোনো কোনো গানে গভীর কৃষ্ণপ্রীতি ব্যক্ত করেছেন তা ডঃ ইসলামের সংগ্রহ থেকেও প্রমাণ করা যায়। যেমন,

পাগলা কানাই বলে ভাই সকলরে
প্রেম কেউ ছাড়ো না
কৃষ্ণ প্রেমের পদ বিনে কিছু হবে না
এই সংসার থাকতে মর্ম
এই সংসার থাকতে ধর্ম
প্রেম ছাড়া সাধন ভজন কিছুই হবে না। (১৩৫ নং গান)

সাত, গানের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ একাধিক ক্ষেত্রে অসম। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় বলে চিহ্নিত করা ১৪৩ নং, ১৪৫ নং, ১৪৬ নং, ১৪৭ নং, ১৫০ নং, ১৫১ নং, ১৫৩ নং গান এত স্পষ্টতই অনৈসলামিক যে শিরোনামে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে বলে ভ্রম হয়। দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও হেঁয়ালী পর্যায়ের অনেক গানের শ্রেণীকরণে যে পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে তার কার্যকারণ গানগুলো পাঠের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। আট, ভূমিকার কিছু কথা কিংবদন্তীর পরিচ্ছেদে যুক্ত হতে পারতো। নয়, সমগ্র গ্রন্থে তত্ত্ব ও তথ্যের আশানুযায়ী সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। অধিকন্তু যেটুকু আছে তার উৎস নির্দেশ নিতান্তই নিয়মবিরহিত। গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

অনেক উল্লেখযোগ্য প্রাসংগিক গ্রন্থ সে তালিকায় অনুপস্থিত; গ্রন্থোল্লেখ থাকলেও একাধিক ক্ষেত্রে তাদের সম্পাদক বা লেখকের নাম, প্রকাশের স্থান ও কাল বাদ পড়েছে। দশ, গ্রন্থের মুদ্রণ পারিপাট্যে চমৎকারিত্ব থাকলেও আমরা বলতে বাধ্য যে এর আন্তরসজ্জা আরো সুশৃংখল ও পরিচ্ছন্ন হলে পাঠসুখ বৃদ্ধি পেতো। কোন কোন পংক্তি যে কেবল অনাবশ্যক রকম বড় হরফে ছাপানো হয়েছে তাই নয়, সংগে নিম্নরেখও যুক্ত করা হয়েছে। যেমন— "যে গানগুলোর নীচে কোন নাম নেই সে সব আমার সংগৃহীত।" (পৃঃ ৪৭) বিভিন্ন শ্রেণীর গানের শিরোনাম কখনো পৃষ্ঠার উপরে কখনো নীচে এমন বেনিয়মে ছাপা হয়েছে যে তার সংকেত থেকে পাঠকালে ফয়দা ওঠানো কঠিন।

ত্রুটি বিচ্যুতির তালিকা হয়ত কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হোলো। কিন্তু তাই বলে গ্রন্থটিকে মূল্যহীন প্রমাণিত করা মোটেই আমাদের অভিপ্রায় নয়। লেখক সুপণ্ডিত এবং বহুজনমান্য। এজন্যে তাঁর সামান্য বিচ্যুতিও আমরা নজরের বাইরে ফেলে রাখতে রাজী হইনি। নতুবা বইটি যে অতিশয় মূল্যবান, এর সংগ্রহের অংশ যে কেবল পল্লী-সাহিত্য রসিকের জন্যে নয়, পল্লী-সাহিত্যের প্রকৃত গবেষকদের জন্যেও রত্নখনিস্বরূপ সেকথা আমরা আলোচনার সূচনাতেই স্বীকার করেছি।

মুনীর চৌধুরী

লেখক-পরিচিতি

॥ মুহম্মদ আবদুল হাই এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন)
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ আনিসুজ্জামান এম. এ. (ঢাকা)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এম. এ. (ঢাকা)
ফেলো, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ আহ্‌মদ শরীফ এম. এ. (ঢাকা)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ মুনীর চৌধুরী এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১২	৫	যাথর্থ	যাথার্থ্য
১৩	শেষ	ভ্রপরি	উপরি
১৬	৪, ১৯	জানিত	জনিত
৪৫	২৬	তোমার	তোমরা
৪৬	১	বোধ	বোধ হয়
৪৮	১০	জনকের কথা	জনকের
৬৫	৪	বয়োকনিষ্ঠা	বয়োকনিষ্ঠ
৭৬	৬	বাস্তুতা	বাস্তবতা
৭৯	৫	যে হোটেলে মাংস	হোটেলে যে মাংস

তৃতীয় বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত ঃ ১৩৬৬

সাহিত্য পত্রিকা

সম্পাদক
মুহম্মদ আবদুল হাই

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে দুবার প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং এ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা এতে ছাপা হয়। যাঁরা এ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের রচনা এ পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হবে।

সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য আড়াই টাকা। এর গ্রাহক হতে হলে বার্ষিক চাঁদার টাকা অগ্রিম নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের শতকরা ৩৩১/৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়া হয়। দশ কপির কম নিলে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টদের অগ্রিম টাকা জমা দিতে হবে। বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো হয় না।

অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
রমনা, ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান:

বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলা বাজার, ঢাকা

নলেজ হোম,
নিউ মার্কেট, ঢাকা।

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা

মুহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও রেনেসাঁস্ প্রিন্টার্স, ১০, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ-শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী

সূচীপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে প্রদত্ত
কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-উন্নয়ন তহবিল

তত্ত্বাবধায়ক-সমিতি

সভাপতি :

বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান,
বি. এ., এল-এল. বি, বার-অ্যাট-ল (লণ্ডন),
ভাইস-চ্যান্সেলর।

সদস্যবৃন্দ :

ডক্টর আবদুল হালিম, এম.এ., পি-এইচ. ডি. (ঢাকা),
ডীন, কলা বিভাগ।

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন,
এম.এ. (কলিকাতা), পি-এইচ. ডি. (ঢাকা),
ডীন, বিজ্ঞান বিভাগ।

জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই, এম.এ. (ঢাকা ও লণ্ডন),
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ।

জনাব মুনীর চৌধুরী, এম.এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

জনাব আহমদ শরীফ, এম.এ. (ঢাকা),
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ।

সাহিত্য পত্রিকা
তৃতীয় বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত, ১৩৬৬

বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ

(Word delimitation & Syllabification in Bengali)

মুহম্মদ আবদুল হাই

ভাষার দুটো রূপ। একটা তার লেখ্যরূপ, অন্যটা শ্রুত। লেখ্যরূপ দৃশ্যরূপের নামান্তর। এটিকে eye অথবা hand language বলা যায়। আর শ্রুত রূপটিকে ear language এর পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। মানুষের হৃদয়ানুভূতির আধার কিংবা ব্যবহার জীবনের বাহন হিসেবে ভাষা মানুষের মুখে কথা হয়ে ফুটে উঠলে দেখা যায় মানুষ বিচ্ছিন্ন ধ্বনি কিংবা শব্দ উচ্চারণ করেনা; উচ্চারণ করে ছোট বড়ো অগণিত বাক্য। এক একটি ছোট শব্দও স্থানবিশেষে জীবন্তহৃদয়ের ছোঁয়া পেয়ে এক একটি বাক্যে পরিণত হতে পারে। বাক্য ছোট হোক কিংবা বড়ো হোক তার অন্তর্নিহিত যে ধ্বনি সমন্বয়ে তা গড়ে ওঠে মানুষের মুখ দিয়ে তা নির্গত হ'তে গেলেই সেখানে অবিরল ধ্বনিস্রোতের সৃষ্টি হয়। সেগুলোকে হরফের সাহায্যে প্রতিবিম্বিত করতে গেলে এক একটি হরফ পৃথক পৃথক ভাবে দাঁড় করিয়ে তা করা যায় না। কয়েকটি হরফের সাহায্যে এক একটি শব্দের রেখাচিত্র নির্মাণ করা হয় এবং হাতের লেখা কি ছাপার হরফে মুখের ভাষাকে এ ভাবে চিত্রায়িত করতে হলে প্রতিটি ধ্বনিসমন্বিত এক একটি হরফের পরে না হোক অন্তত প্রত্যেকটি শব্দের পরে দুই শব্দের মাঝখানে একটু ফাঁক (inter word space) রাখা হয়। কিন্তু লেখা পড়তে কি বক্তৃতা করতে গিয়ে, কিংবা

কবিতা আবৃত্তি কি ভাবানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে কিংবা ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষ যখন কথা বলতে শুরু করে তখন দুই শব্দের মাঝখানে কোথাও ফাঁক দেখা যায়না। একটা মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না ক'রে কিংবা একটি প্রয়োজন না মিটিয়ে সে থামেনা। সেজন্যে একটি গোটাবাক্য (কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে বাক্যাংশও) ভাষার এক একটি ইউনিট হয়ে দাঁড়ায়। সেদিক থেকে বাক্যই ভাষার বৃহত্তম ইউনিট আর একটি অক্ষর (syllable) নিম্নতম ইউনিট। বাংলা ধ্বনির প্রকৃতি অনুসারে হয় একটি স্বরধ্বনি কিংবা স্বরধ্বনি সমন্বিত ব্যঞ্জনধ্বনিই এক নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত হয় দেখে (যেমন অ, ক, কি, যা ইত্যাদি) একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বরধ্বনি কিংবা একটি স্বরসংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিই ভাষার নিম্নতম ইউনিট গঠন করে। ভাষার এ নিম্নতম ইউনিটই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিভাষায় syllable বা অক্ষর হিসেবে পরিগণিত হয়। বাক্য এবং অক্ষরের মাঝখানের ইউনিটই এক একটি শব্দ। কতকগুলো ধ্বনি সমন্বয়ে মনের ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারলে তা হয় বাক্য। ধ্বনি প্রবাহে যেখানে মনোভাব পূর্ণতা লাভ করে কিংবা ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন অংশতও মেটানো যায় সেখানেই নিঃশ্বাসের বিরাম বা যতি পড়ে। এ ভাবে সার্থ এবং শ্বাসপর্ব হয় পৃথকভাবে না হয় একত্রে বাক্য কিংবা বাক্যাংশ গড়ে তোলে। এ ধ্বনি প্রবাহ থেকে শব্দ এবং অক্ষরকে কি ভাবে পৃথক করা যায়, সেটিই বড়ো প্রশ্ন।

ভাষার যেমন দৃশ্য ও শ্রুতিগত দুটি রূপ আছে, তেমনি ভাষা দেহের ধ্বনিরও শারীরগত (physiological) ও শ্রুতিগত (acoustic) দুটো দিক দেখা যায়। ধ্বনি নিজে উচ্চারণ করে নিজেও শোনা যায় আবার অপরকেও শোনানো যায়। তা সে যে-ই ধ্বনি উচ্চারণ করুক না কেন ফুসফুস্-তাড়িত বাতাসের সাহায্যেই তাকে তা করতে হয়। মানুষের ফুসফুসই একারণে ধ্বনি উৎপাদনের প্রাথমিক যন্ত্র, তার generator. কিন্তু ফুসফুস্ স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে গেলেই দেখা যায় সেখান থেকে ভু-স্ করে একবারে সব বাতাস বের হ'য়ে যায়না। তারও সীমিত শক্তির জন্যেই হারমোনিয়ামের বেলোর প্রকম্পনজাত বায়ুতাড়িত ছোট ছোট অসংখ্য সুরের ভাঁজের মতো, ফুসফুসের সমমাপের ছোট ছোট শ্বাসক্ষেপনের সঙ্গে নিঃসৃত এক একটি ধ্বনি কিংবা

Syllable
অক্ষর

ধ্বনিগুচ্ছই ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে এক একটি সিলেবল বা অক্ষরহিসেবে পরিগণিত হয়।* এ কারণেই বলা হয় নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে (by a single breath-pulse) যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একেবারে উচ্চারিত হয় তাকেই সিলেবল বা অক্ষর বলা যেতে পারে। যেমন, ও, এ, ই, আ কিংবা বা, যা, কি বাক্, হাত্, ক্লাশ, কি প্রাণ, ম্লান ইত্যাদি।

* "Phonetically, speech is always something more than a linear succession of sounds. Since these are mostly produced by air expelled from the lungs, the respiratory apparatus in the thorax necessarily breaks the sequence up into portions The most obvious of these is a breath-group. This is the chain of sounds produced on one breath. Its maximum duration is controlled by the necessity of periodic inhalation. A breath group does not, however, necessarily last as long as the air contained in the lungs might allow.

There are two partially independent mechanisms which control inhalation and exhalation of air. The first of these consists of the diaphragm and the abdominal muscles. These vary the volume of the thoracic cavity by moving its lower wall (the diaphragm) up and down. They seem to move more or less steadily throughout each breath-groups, normally reversing their action between breath-groups for inhalation. This constitutes, therefore, the physiological basis of breath groups.

The second breathing mechanism consists of the intercoastal muscles. These extend between successive pairs of ribs and increase or decrease the volume of the thoracic cavity by moving the side walls (the rib-case). In speech the activity of the intercoastal muscles does not continue steadily through the breath-group, but is subject to more rapid vibration. This correlates in the simplest case with the alternation of vowels requiring relatively large amounts of air with consonants requiring less. Speech is therefore, marked by a series of short pulses produced by this motion of the intercoastal muscles. These pulses are the phonetic **Syllables.** Typically a syllable centres around some vowel or other resonant and begins and ends in some sound with relatively closed articulation.

অক্ষর বা 'syllable' এর সঙ্গে ধ্বনি তথা 'sound' বা 'phone' এর পার্থক্য এই যে ব্যবহারিক দিক থেকে ধ্বনি স্বয়ং সম্পূর্ণ অবিভাজ্য (indivisible) একটা ছোট্ট ইউনিট মাত্র আর অক্ষর এক কিংবা একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত হয় দেখে তা আবারও বিভাজ্য (divisible) হ'তে পারে। ফুস্‌ফুস তাড়িত বাতাসের এক বারের ধাক্কায় এ, ও, ই, উ প্রভৃতি একটি ধ্বনি ওঠা যেমন সম্ভব তেমনি কয়েকটি ধ্বনি মিলে একটি শব্দ (word) (যেমন বাক্, হাত্, চোখ্, নাক্, কান্, ইত্যাদি) কিংবা শব্দের খণ্ডাংশ (যেমন আ/বার্, তো/মার্, বা/বা, প্র/মাণ ইত্যাদি) সৃষ্টি হতে পারে। যেখানে এ ভাবে শুধু একটি ধ্বনিই উদ্রিক্ত হয় সেখানে সেটি হয় ধ্বনি তথা sound বা phone (যেমন এ, ও, ক্, ব্, ল্ ইত্যাদি ; এভাবে গঠিত একটি স্বরধ্বনি ক্ষেত্রবিশেষে একটি অক্ষরও হ'তে পারে) আর যেখানে কয়েকটি ধ্বনির সমন্বয় সাধিত হয় (যেমন ব্+আ+ক্=বাক্, কি প্+আ=পা, কি হ্+আ+ত্=হাত ইত্যাদি) সেখানে সেটি হয় সিলেবল বা অক্ষর।

Sound ও Syllable

All speech consists of a sequence of such syllables and breath groups, which are phonetically the basic framework of speech and the most clearly detectable segmentation. "—H. A. Gleason : An Introduction to Descriptive Linguistics, New York, 1956, p. 203-4.

cf. also. R. H. Stetson : Motor Phonetics (2nd edition), 1951, p. 200. "Syllable : The smallest, indivisible phonetic unit. Basically the syllable is a puff of air forced upward through the vocal canal by a compression stroke of the intercoastal muscles. It is usually modulated by the action of the vocal folds. It is accompanied by accessory movments (syllable factors) which characterize it. These are the release (by the action of either the chest muscles for the releasing consonant), the vowel shaping movements of the vocal canal, and the arrest (by the action of either chest muscles or the arresting consonant). Four basic syllable types are possible :

1. Chest released, chest arrested ; ah, oh.
2. Chest released, consonant arrested ; at, up.
3. Consonant released, chest arrested ; for too.
4. Consonant released, consonant arrested ; top, cook.

ধ্বনির production বা গঠনগত দিক থেকে যেমন নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একবারে উচ্চারিত ধ্বনিই অক্ষর তেমনি শ্রুতির দিক থেকে যে ছোট ছোট ধ্বনিগুচ্ছ শ্রোতার কানে এক একটি তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করে সেগুলোকেই অক্ষর বলা যায়। নদীর খরস্রোত যখন একটানা প্রবাহিত হয়ে যায় তখন তার তরঙ্গমালা চোখে পড়েনা কিন্তু তাতে ছোট বড়ো তরঙ্গমালার সৃষ্টি হলে একটি তরঙ্গের উচ্চতা থেকে পরবর্তী তরঙ্গের উচ্চতা কিংবা একটি তরঙ্গের নিম্নাংশ থেকে পরবর্তী তরঙ্গের নিম্নতা যেমন এ ভাবে চোখের সামনে সমমাপের ব্যবধানে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে, ঠিক তেমনি বাক প্রবাহে নিঃশ্বাস-নিঃসৃত অসংখ্য ধ্বনিতরঙ্গ ছোট ছোট বীচিমালার মতো সম মাপের ব্যবধানে শ্রোতার কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত করে। সেই ধ্বনিতরঙ্গ ভঙ্গের ছোট ছোট অভিঘাতই শ্রোতার মনে এ ভাবে এক একটি অক্ষরের আভাস সৃষ্টি করে।
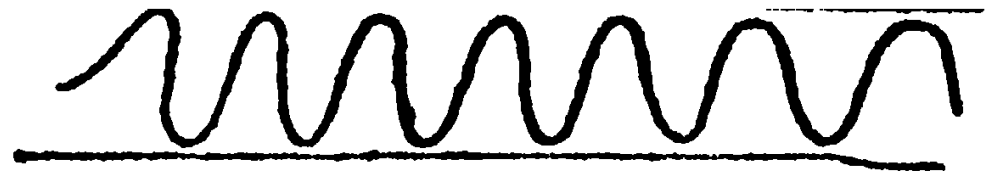
ভাষা লিখিত হলে দুই শব্দের মাঝখানের ফাঁকটুকুই (interword space) প্রতিটি শব্দকে আলাদাভাবে চিনে নিতে আমাদের সাহায্য করে কিন্তু মানুষের মুখের সাধারণ কথাবার্তায় বক্তৃতায় কিংবা লিখিত ভাষা পঠিত হবার কালে যে ধ্বনিস্রোতের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে থেকে একটি শব্দকে কি ভাবে আলাদা করা যায়? অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও (১) ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং (২) বাক্যের মধ্যে শব্দগুলোর সম্পর্কগত তথা ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দরাজিকে পৃথক করার প্রয়াস করা যেতে পারে।

শব্দভাগ
word demarcation

বাংলায় শব্দ শেষ হয়, স্বরধ্বনি না হয় ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে, যেমন করো, করি, না, মা, বাবা, এলো, দাঁড়ালো, কিংবা হাত্, সবাক্, অবাক্ ইত্যাদি। (১) স্বরধ্বনি দিয়ে শব্দ শেষ হ'লে যে ক'টা অক্ষরের সাহায্যে শব্দটি তৈরী হোক না কেন প্রান্তবর্তী অক্ষরটিই কালপরিমাণের দিক থেকে দীর্ঘতা লাভ করে সবচেয়ে বেশী; যেমন 'এলো' শব্দের 'এ'র তুলনায় 'লো' এর 'ও' দীর্ঘতর আর 'দাঁড়ালো' শব্দের শেষ স্বরধ্বনি 'লো' এর 'ও' দীর্ঘতম।

শব্দভাগের
ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া
phonetic basis of word
delimitation

(২) বাংলা শব্দে শেষের ব্যঞ্জনধ্বনিটি শব্দের প্রকৃতি নির্বিশেষে (তদ্ভব, তৎসম, দেশী প্রভৃতি) হলন্ত উচ্চারণ পায়, যেমন হাত্, অবাক্, গ্রাস্, টল্মল্ ইত্যাদি। বাংলা শব্দে ব্যঞ্জনধ্বনি হলন্ত উচ্চারণ পেলেই যে সেখানে শব্দ শেষ হবে তা নয়, কেননা আন্তঃস্বরীয় দুটো ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে প্রথমটির (যেমন মুক্তা ভক্ত, মট্কা প্রভৃতি শব্দে) উচ্চারণও হলন্ত ; কিন্তু শব্দ শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তাকে হলন্ত হ'তেই হবে।

(৩) কয়েকটি ইংরেজী যেমন ল্যাম্প্, ব্যাঙ্ক্, গ্র্যাণ্ড্ প্রভৃতি এবং ফারসী যেমন দোস্ত্, গোশ্ত্, গঞ্জ্ প্রভৃতি কৃতঋণ শব্দ ছাড়া বাংলা শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতে পারেনা। বাংলা শব্দের শেষ ব্যঞ্জনধ্বনিটি শুধু যে অসংযুক্ত তা নয়, পূর্বের নিয়মানুসারে হলন্তও বটে।

(৪) বাংলা শব্দের শেষে পাহাড়্, আষাঢ় (এরকম ক্ষেত্রে 'ঢ়' ধ্বনিগত দিক থেকে যদিও 'ড়' এ পরিণত হ'য়ে গেছে) প্রভৃতি শব্দে 'ড়' এবং 'ঢ়' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'ড' 'ঢ' ব্যবহৃত হয়না। 'সোডা' 'সডাক' প্রভৃতি বিদেশী কিংবা সমাসনিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দে ছাড়া অন্যত্র 'ড' এবং 'ঢ' শব্দের মধ্যেও ব্যবহৃত হয়না সুতরাং 'ড' ও 'ঢ' ধ্বনি দুইটি শব্দের সূচনার এবং 'ড়' ও 'ঢ়' শব্দশেষের ইংগিত বহন করে।

(৫) 'ঙ্' দিয়ে বাংলা শব্দ আরম্ভ হয়না। 'সাঙাত' 'রঙীন' 'রাঙা' প্রভৃতি শব্দে ধ্বনিটি আন্তঃস্বরীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এর ব্যবহার দেখি শব্দের শেষে যেমন রঙ্, ঢঙ্, সঙ্ ইত্যাদি শব্দ। সুতরাং 'ঙ' এর হসন্তান্তিক রূপ শব্দশেষের লক্ষণ।

(৬) আহ্, উহ্, ওঃ প্রভৃতি অব্যয় গুলোতে শেষের ধ্বনিটির উচ্চারণ অঘোষ 'হ' বা বিসর্গের মতো। 'হ' এর বিসর্গের মতো এ অঘোষ উচ্চারণ এ ধরনের অব্যয়ে শব্দ শেষের নিদর্শন।

(৭) খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ধ, এবং ভ এ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনিগুলো এবং তাড়নজাত মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ঢ়' এর মহাপ্রাণতার সম্পূর্ণ লোপ কিংবা তৃতীয় চতুর্থাংশ লোপ পাওয়া শব্দ শেষ হওয়ার চিহ্ন, যেমন মাচ্ (ছ্), মাট্ (ঠ্), সাঁজ (ঝ্) আষাড়্ (ঢ়্), লাপ্ (ফ্) সাদ্ (ধ্) ইত্যাদি।*

(৮) বিস্ময় কিংবা প্রশ্নবোধক বাক্যে ছাড়া অন্যান্য ধরনের বাক্যের মধ্যেকার প্রতিটি শব্দের শেষের সিলেবলে নিঃশ্বাস তার পূর্ববর্তী সিলেবলের তুলনায় নিম্নগামী হয়। বাংলায় এ ধরনের যে কোন একটি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর ধ্বনিতরঙ্গের (intonation) গতির প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতিটি বাংলা শব্দের শেষের অক্ষরে নিঃশ্বাসের অপেক্ষাকৃত নিম্নগামিতা ধরা পড়বে। (তুলনীয়, 'এখন আসল কথায় আসা যাক্' এ বাক্যটি। এটি স্বাভাবিক ভাবে পড়তে গেলে দেখা যাবে শব্দ শেষের 'খন্', 'সল্', 'থায়্', 'সা' এবং 'যাক্' প্রভৃতি অক্ষরগুলোতে শ্বাস ক্রমেই নিম্নগামী হয়েছে।

(৯) বাক্য মধ্যবর্তী যে শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে গুরুত্ব কি প্রাধান্য লাভ করে ধ্বনি তরঙ্গের দিক থেকে দেখা যায় তার অক্ষরগুলোও পার্শ্ববর্তী শব্দের অক্ষরাদির তুলনায় গুরুত্বলাভ করেছে সবচেয়ে বেশী। 'তুমি কি বল্‌লে?' কিংবা 'তুমি কি বল্‌লে!' কিংবা 'তুমি কী বললে?' এ একটি বাক্যের এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতির বাক ভংগীর তুলনা করলে প্রথম দুইটিতে 'বল্‌লে'র শেষাক্ষর 'লে'র আপেক্ষিক প্রলম্বন এবং 'বল্ অক্ষরটির ওপর অপেক্ষিক চাপ এবং তৃতীয় বাকভংগীর 'কী' এর প্রলম্বিত উচ্চারণ এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করবে।

(১০) বাক্যের ধারাস্রোতের মধ্যে যতি বা বিরাম (pause) শব্দের সীমানা নির্ধারক চিহ্ন। কোনভাবে বাধা না পেলে কিংবা কথা বলতে গিয়ে ইতস্ততঃ না করলে বাংলা শব্দের মাঝখানে কোথাও যতি পড়েনা, কিন্তু যেখানেই যতি পড়ে সেখানেই শব্দের সীমানা নির্ধারিত হয়।

শব্দের গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে প্রতি ভাষায় বাক্যের ভেতরে শব্দকে আলগা করার কয়েকটি প্রক্রিয়া পাওয়া যায়। শব্দের সাধারণত দুটো রূপ রয়েছে। একটি তার স্বয়ংসম্পুর্ণ রূপ (যেমন বাড়ী, ঘর, গিন্নী, বড়, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি) শব্দের মৌলিক রূপ হিসেবে যার পরিচয়। অভিধানে শব্দের এ মৌলিক রূপের সঙ্গেই আমরা পরিচিত হই। আর অন্যটি তার মৌলিক রূপ থেকে উপসর্গ, বিভক্তি ও প্রত্যয়াদির সাহায্যে উদ্ভূতরূপ; যেমন, বাড়ীওয়ালা, ঘরামি, গিন্নীপনা, বড়াই, ছেলেমি, মেয়েলী ইত্যাদি। বাংলায় শব্দমূল থেকে শব্দকে নানাভাবে প্রস্তুত করার জন্যে যে বিভক্তি ও প্রত্যয়াদির সাক্ষাৎ আমরা পাই

শব্দের প্রকৃতিগত দিক থেকে শব্দের সীমানা নির্ণয়

সেগুলো শব্দের সঙ্গে না মিলে পৃথকভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে না। এ গুলোকে শব্দ কণিকা বা শব্দের 'bound form' বলা যেতে পারে। আর ভাষার যে অংশ এ ধরনের শব্দকণিকা ছাড়াই বাক্যে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে এমনকি এ ধরনের যে অংশবিশেষের সাহায্যে একটি ছোট বাক্য কি বাক্যাংশও (phrase) গড়ে ওঠা অসম্ভব নয় ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তা-ই শব্দহিসেবে স্বীকৃতিলাভ করতে পারে।*

(১) বাক্যের ভেতরে একটি অংশের পরিবর্তে অন্য একটি অংশ ব্যবহার ক'রে তার সাহায্যে নতুন অর্থবোধক একটি শব্দ চিহ্নিত করা যেতে পারে; যেমন 'আমি একটি ঘোড়া চাই' এ বাক্যটিতে 'ঘোড়া'কে অপসারিত ক'রে সেখানে হাতী, ভেড়া, উট, গরু, বই, কলম, ছেলে, মেয়ে প্রভৃতি অগণিত শব্দ ব্যবহার করা চলে। ঠিক তেমনি 'চাই' এর পরিবর্তে 'পাই', 'কিনি', 'নিই' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের অবকাশও এখানে রয়েছে। একটি বাক্যে এ ধরনের অংশ বিশেষের পরিবর্তে বাক্যটির প্রথমে, মধ্যে কি অন্তে অন্য অংশ ব্যবহার ক'রে যদি তার একটি ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায় তাহ'লে সেগুলোই উক্ত বাক্যে এক একটি শব্দ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

(২) বাংলা বাক্যের পদক্রম মোটামুটি নির্ধারিত। তাতে প্রথমে কর্তা তারপরে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, যেমন আমি ভাত খাই, করিম একটি বই পড়ে ইত্যাদি। বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদবাচক শব্দের পূর্বে তাদের গুণান্বিত করার জন্যে আরও কিছু শব্দের ব্যবহার বাংলাভাষায় দেখা যায়, যেমন, 'আমি লালচালের ভাত খাই', 'আমি লালচালের ভাত হাপুস্ হুপুস্ ক'রে খাই', 'গাপুস্ গুপুস্ ক'রে খাই' কি 'রহিমের ভাই করিম একটি বিজ্ঞানবিষয়ক বই পড়ে' ইত্যাদি। এ রকম ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের পদক্রম সাধারণতঃ ওলোটপালোট করা যায় না। কিন্তু কোন বাক্যে কোনখানে শব্দবিন্যাসের

---

* "Forms which occur as sentences are free forms. A free form which is not a phrase, is a word. A word, then is a free form which does not consist entirely of lesser free form; in brief, a word is a minimum free form. For the purposes of ordinary life the word is the smallest unit of speech. Bloomfield, Language, p. 178, Allen & Unwin Ltd. 1950.

রদবদল স্বীকৃতি পেলে বাংলায় সেটি স্বতন্ত্র শব্দহিসেবেই পরিগণিত হবে। 'বই কেন পড়ি তার জবাব দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। পড়ার অভ্যাসটা আগে, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পরের ব্যাপার—না পেলেও কোন ক্ষতি হয় না' এ বাক্য দুটিকেও 'কেন বই পড়ি, জবাব দেওয়া তার দুরূহ ব্যাপার। আগে পড়ার অভ্যাসটা, পরের ব্যাপার তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, না পেলেও কোন ক্ষতি হয় না' এ ভাবেও বলা যেতে পারে। এতে অর্থের গুরুত্বের তারতম্য কিছু ঘটতে পারে তা সত্য; কিন্তু বাক্যবিন্যাসে যে রদবদল এখানে করা গেছে তা এক একটি শব্দেরই সাহায্যে।

(৪) পদক্রমের সাহায্যেও বাক্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশকে শব্দ হিসেবে পৃথক করা চলে।

(৫) এ ছাড়া প্রত্যেকটি বাংলা শব্দেরই এক একটি ঐতিহ্য এবং ইতিহাস আছে। বাঙালীর সমাজমনে এক একটি শব্দ এক একটি চিত্র কিংবা অমূর্তভাবের প্রতীক হিসেবে কালে কালে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। শব্দকে কালির আঁচড়ে ধ'রে দিতে গেলে যেমন দুই শব্দের মাঝখানে একটু ফাঁক দিয়ে লিখতে হয় তেমনি ভাষা বাঙালীর মুখে কথা হ'য়ে ফুটে উঠলে এ ধরনের এক একটি ভাষা অংশ, তা বস্তুগত concrete রূপের প্রতীক হোক, কিংবা abstract কি নির্বস্তুক ভাবের প্রতীক হোক, বাঙালী মাত্রের মনে এক একটি ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি ক'রে তোলে। ভাষায় শব্দের এ ঐতিহ্যভিত্তিক (institutionalised) রূপ ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বাক্যের মধ্যে তার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করে দেয়।

সংস্কৃতে 'সিলেবল' এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'অক্ষর'। অক্ষর অর্থ গুণতঃ, ধর্মতঃ, অবয়বতঃ ও স্বরূপত যার ক্ষয় (ক্ষরণ) নেই, যা স্বয়ং সম্পুর্ণ, অক্ষরের বাহন (nucleus) যা আত্মনির্ভরশীল। আর স্বরধ্বনিই হচ্ছে অক্ষরের জীবন।

ব্যঞ্জনধ্বনি না স্বরধ্বনি? এক কালে স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় না তাকে ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞাভুক্ত করা হতো; এ-কালে অবশ্য ব্যঞ্জনধ্বনির সে সংজ্ঞা টেকে না। সম্পুর্ণভাবে মুক্ত না হলেও স্বরধ্বনি ছাড়াই ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত, এমনকি পূর্ণভাবে রূপায়িতও হ'তে পারে। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন্' 'ম্' এবং 'ঙ্' এবং তরলধ্বনির অন্তর্ভুক্ত কম্পনজাত ধ্বনি 'র্' এবং পার্শ্বিক ধ্বনি 'ল্' ধ্বনির গঠন পদ্ধতি এ উক্তির সমর্থন করে। তবু স্বরধ্বনির 'স্বয়ংশাসিত'

ও স্বতঃবিকশিত রূপই অক্ষরের বাহন (nucleus) হিসেবে পরিগণিত হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত না হ'য়ে যেখানে স্বরধ্বনিই এক একটি অক্ষর রূপে ব্যবহৃত হয় (যেমন এ, ও, কি 'উনি'র উ কিংবা 'ইতি' কি 'ইনি'র ই) সেখানে অক্ষর গঠনে স্বরধ্বনিই সর্বেসর্বা কিন্তু যেখানে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে মিলে স্বরধ্বনি অক্ষর গঠন করে (যেমন বাজে, কাজে প্রভৃতি শব্দে 'বা', 'কা' 'জে' প্রভৃতি) সেখানেও স্বরধ্বনিই অক্ষরের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। এ জন্যে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা এ ধরনের অক্ষর নির্মাণে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একটি মালার মুক্তার সঙ্গে আর স্বরধ্বনিগুলোকে সে মালার সূত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। *

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি, তরলধ্বনি 'র্' 'ল্' কিংবা উষ্মধ্বনিগুলো যেহেতু একালের ধ্বনি বিশ্লেষণানুসারে স্বরধ্বনি ছাড়া গঠিত, এমনকি উচ্চারিতও হ'তে পারে এবং যেহেতু তাদের ব্যঞ্জনা এবং অনুসরণ অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় অনেক বেশী সেজন্যে কোন কোন ভাষায় দেখা যায় এ ধ্বনিগুলো অক্ষরের গতিনিয়ামক (nucleus) হয়ে দাঁড়িয়েছে। অক্ষর গঠনে ধ্বনির ব্যঞ্জনাগুণ (sonority) প্রধান হলেও তা-ই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গুণ নয়। উক্ত ধ্বনি ব্যঞ্জনার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ধ্বনির তুলনায় কোন একটি বিশেষ ধ্বনির বহন ক্ষমতা (carrying power), শ্রুতি দ্যোতকতা অন্য কথায় ধ্বনিগুণের দিক দিয়ে তার গুরুত্ব (prominence)ই এমন ধ্বনিকে অক্ষরের প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। আর ধ্বনির দৈর্ঘ্য, শ্বাসক্ষেপনের চাপ (breath force) এবং আপেক্ষিক ব্যঞ্জনার (sonority) ওপরেই ধ্বনির সে প্রাধান্য সংঘটিত হয়। এ জন্যে স্বরধ্বনি ছাড়াও কোন কোন ভাষায় 'ম্', 'ন্', 'ল্', 'স্' প্রভৃতি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে অক্ষর নির্মাণের নিয়ামক (nucleus) হ'তে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ জাপানী ভাষায় 'arimas' (is অথবা are অর্থে) শব্দে 's', ska (deer অর্থে) 's', kra (grass অর্থে) 'k' এবং ma (house অর্থে) 'm' কে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করতে দেখা যায়। ইংরেজী ভাষায় funnel (funl), tunnel (tunl), little (litl) প্রভৃতি শব্দে 'l', mutton (mutn), button (butn)

* Varma : The Phonetic observations of Indian Grammarians, 1929, P55. f.n. 4.

প্রভৃতি শব্দে n এবং বাংলায় 'তুমি একথা বলছো!' 'ম্!' এ ধরনের পরিবেশে 'ম্' কে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করতে দেখা যায়। তবু এ কথা সত্য যে প্রতিভাষার স্বাভাবিক কথাবার্তায় যে কোন ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় এমনকি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনি (continuant) গুলোর তুলনায়ও স্বরধ্বনিগুলোর শ্রুতি-স্থৈতকতা, বহমান ক্ষমতা এবং তার অনুরণনগত ব্যঞ্জনা অনেক বেশী। সেজন্যে যে কোন ভাষাতেই নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনিগুলোই তার অক্ষরের গতি নিয়ামক হয়।*

বাংলাভাষা এ সত্যের ব্যতিক্রম নয়; বরং বাংলাতে ওপরে বর্ণিত দু একটি পরিবেশে 'ম্' ছাড় একমাত্র স্বরধ্বনিই অক্ষর গঠন করে; প্রলম্বিত অন্য ব্যঞ্জনগুলোকেও কোন ক্ষেত্রে অক্ষরগঠন করতে দেখা যায়না। বাংলাভাষায় অক্ষরগঠনের দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় এমনকি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনি (তরল, নাসিক্য ও উষ্মধ্বনি) গুলোর তুলনাতেও স্বরধ্বনি অধিকতর প্রাণব্যঞ্জক, অনুরণনশীল এবং প্রলম্বিত হবার যোগ্যতা রাখে। এখানেই বাংলা অক্ষর এবং বাংলাছন্দের মাত্রানির্ণয়ে বাংলা স্বরধ্বনির শক্তির প্রশ্ন ওঠে। syllable এর বাংলা প্রতিশব্দ অক্ষর আর mora বা মাত্রার অর্থ 'কালপরিমাণ'। স্বরধ্বনি বাংলা অক্ষর এবং মাত্রা উভয়েরই নিয়ামক। সেজন্যে কি অক্ষর কিংবা কি মাত্রা উভয়ের বেলাতেই স্বরধ্বনির একটা duration বা স্থিতি আছে। সে স্থিতি বা duration এর অন্য নামই কালপরিমাণ। সেদিক থেকে syllable এবং মাত্রা একই হ'য়ে দাঁড়ায়; অথচ পড়ার ওপর নির্ভর ক'রে একই সিলেবল কোথাও হ্রস্ব আবার কোথাও দীর্ঘ হ'তে পারে। তাতে অক্ষর একই থাকে, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিটির উচ্চারণে সময়ের দিক থেকে হ্রস্ব দীর্ঘতার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অক্ষরের এ হ্রস্বতা কিংবা দৈর্ঘ্যটিই বাংলা ছন্দের তথা ধ্বনির মাপের ইউনিট—তার মাত্রা। একটি অক্ষরের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনির উচ্চারণের গুরুলঘু বিচারে অন্য কথায় ওটার উচ্চারণের সময়ের দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতা বিচারে শুধু তার প্রকৃতি বদলায়; আকৃতিগত দিক থেকে অক্ষরটি একটিই

Syllable : অক্ষর
Mora : মাত্রা

* cf. Meillet, "Langues Indo-europeenes", (3rd edition, p 106)
"The vowel belongs entirely to the syllable of which it is the centre."

থাকে, দুটো হয়ে যায় না। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বাক্, শাপ্, বল্‌কল্, ঐ, ভৈরব শব্দে বাক্, শাপ্, 'বল্‌কল্', 'ওই্' এবং 'ভই্' প্রভৃতি বদ্ধাক্ষরগুলোতে সর্বত্র এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শব্দশেষের এ ধরনের বদ্ধাক্ষরগুলোতে যে সচরাচর দু মাত্রা ধরা হয় তার কারণ হলো এই। এ রকম ক্ষেত্রে 'বাক্', 'শাপ্', 'ওই' প্রভৃতি অক্ষরে তাদের অক্ষরের মাপ বদলায় না, অর্থাৎ অক্ষর থাকে একটিই কিন্তু বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে পড়তে গিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিকে প্রলম্বিত করা হয় দেখে তাদের মাত্রা সংখ্যা একের জায়গায় দুই-এ গিয়ে দাঁড়ায়।

বাংলা অক্ষরের প্রকৃতি দুই প্রকার; মুক্ত (open), যেমন আ, ও, এ, ও | টা, আ | টা ইত্যাদি এবং বদ্ধ (closed), যেমন আট্, কাঠ্, নাক্, বাক্, সন্ | ধান্ (সন্ধান), ওই্, কই্, সই্ | রভ্ (সৌরভ্) ইত্যাদি। বাংলাশব্দ মুক্তাক্ষর (open syllable) এবং বদ্ধাক্ষর (closed syllable) নিয়ে সপ্তাক্ষরিক কি তদূর্ধ সংখ্যকও হ'তে পারে; যেমন (১) এ, ও, আর্, মৌ, ঐ, নাই্ গায়্, বাক্, মুখ ইত্যাদি।

(২) আ | টা, = ২, প্রী | তি = ২, জা | তি = ২, পা | ঠান্ = ২, দর্ | মা = ২ ইত্যাদি।

(৩) এ | খা | নে = ৩, বৈ | শিষ্ | ট (বৈশিষ্ট্য) = ৩, উ | পা | দান = ৩, প | রাক্ | ক্রম্ (পরাক্রম্) = ৩ ইত্যাদি।

৪। সং। যুক্ | ত | তা (সংযুক্ততা) = ৪, ঘর্ | ষণ্ | জা | ত (ঘর্ষণজাত) = ৪, ধ্ব | নি | গ | ত = ৪ ইত্যাদি।

৫। ধ্ব | নি | সং | শ্লিষ্ | ট = ৫, ধ্ব | নি | প্র | কৃ | তি = ৫, অ | ভি | ধান্ | লব্ | ভ্য (লভ্য) = ৫, ইত্যাদি।

(৬) অ | প | নির্ | বা (নির্বা) | চি | ত = ৬, ইত্যাদি

(৭) অ | ন | তি | প | রি | চি | ত = ৭ ইত্যাদি।

একমাত্র স্বরধ্বনিই যে বাংলা অক্ষর গঠন করে ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি তা পরিষ্কার হয়েছে। এবার বাংলা অক্ষরের ভাগ (syllabification) সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। বাংলার প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতিলিপি তথা হরফের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি লুকিয়ে আছে। উক্ত স্বরধ্বনিটি হলো 'অ'।

বাংলায় যে কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (letter) কে শব্দের বাইরে উচ্চারণ করতে গেলেই তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি 'অ' আপনা থেকে উচ্চারিত হ'য়ে উক্ত হরফটিকে একটি পূর্ণ অক্ষরের মর্যাদা দেয়। বাংলার লেখন পদ্ধতি তথা হরফগুলোও এ উক্তির সমর্থন করে। ক, চ, ট, ত, প প্রভৃতি হরফগুলো উচ্চারণ করবার সময় প্রতিবারই আমরা প্রতিটি হরফের মধ্যে উক্ত হরফ যে ধ্বনিটির প্রতীক সে ধ্বনিটি এবং একটি অতিরিক্ত 'অ' (যেমন ক্+অ=ক, প্+অ=প ইত্যাদি) উচ্চারণ করে একটি পূর্ণ অক্ষর গঠন করি। বাংলা ধ্বনির বৈজ্ঞানিক প্রতিলিপিকরণ জনিত বাংলা হরফগুলো এ কারণেই বোধ হয় অক্ষরভিত্তিক (syllabic)। এগুলো এক একটি বর্ণ বা হরফই শুধু নয়, এক একটি অক্ষর তথা syllable ও। শব্দ বহির্ভূত একটি ব্যঞ্জনবর্ণ তার অন্তর্নিহিত এবং পরক্ষণে উচ্চারিত 'অ' স্বরধ্বনি সহ যেমন একটি অক্ষর গঠন করে, অন্য কথায় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি অক্ষর গঠনের জন্যে যেমন এ রকম ক্ষেত্রে তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকে অনুসরণ করে তেমনি একটি শব্দে ব্যবহৃত প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি অক্ষর গঠনের বেলায় পরবর্তী স্বরধ্বনিরই অনুগমন করে; (যেমন ক্+অ=ক, তেমনি ক্+ই=কি, চ্+আ=চা, য্+আ=যা, ট্+উ=টু ইত্যাদি)।

শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর গঠন

বাংলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন ধ্বনিটি অক্ষর গঠনে কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনা, কারণ স্বভাবতই তা তার পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হয়; কিন্তু 'কাচা' কি 'কাদা' ধরনের শব্দের 'চ', 'দ' প্রভৃতি আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) ব্যঞ্জনধ্বনি অক্ষর গঠনে কোন্ স্বরধ্বনির সঙ্গে যাবে? পূর্বের? না পরের? কাচ্+আ, না কা/চা কিংবা কাদ্+আ, না কা/দা ভাবে উচ্চারিত হবে? অক্ষর বিভাগের বেলায় এ রকম প্রশ্ন ওঠা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রেও বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই বাংলা অক্ষরের গতি নির্ধারণ করেছে। লেখন পদ্ধতিতে এ কার (ে), ইকার (ি) ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বে, 'ও' কার (ো) পূর্বে ও পরে এবং উকার (ু ূ) বর্ণের নীচে লিখিত হলেও ব্যঞ্জনধ্বনি সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনিটি উক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পরেই উচ্চারিত হয় (যেমন কে (Ke), কি (Ki), শু (shu), রু (ru), কো (Ko),

আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর গঠন

ইত্যাদি)। ব্যঞ্জনধ্বনির হলন্ত উচ্চারণ নয়, তা পূর্ণ উচ্চারণ পেয়ে মুক্ত হলে তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকেই অনুসরণ করে; পূর্ববর্তীটিকে নয়। সেকারণে এরকম ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি যেমন তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকে অনুসরণ করে তেমনি আন্তঃস্বরীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটিকেও তার পরবর্তী স্বরধ্বনিটিরই অনুগমন করতে হয়। বাংলায় এ ধরণের যাবতীয় শব্দের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই তার প্রমাণ; ফলে এ রকম ক্ষেত্রে অক্ষর ভাগ হয় কা | চা, কা | দা, না | ন', কে | লি, কো | লা | হল্ ইত্যাদি ভাবে, কাচ্ | আ, কি কাদ্ | আ কি নান্ | আ, কি কেল্ | ই কি কোল্ | আ | হল্ ভাবে নয়।

শব্দশেষের ব্যঞ্জনও অর্ধস্বর ধ্বনির অক্ষর গঠন

বাংলা শব্দে শেষধ্বনিটি ব্যঞ্জনধ্বনি হলে তা স্বরবিহীন হলন্ত উচ্চারণ পায়, তুলনীয় বাক্, আট্, কাঠ্, ঘাট্, মাল্ প্রভৃতি শব্দ। এধরনের শব্দে অন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনিটির উচ্চারণ অসম্পূর্ণ (incomplete), কেননা এ রকম ক্ষেত্রে তাদের উচ্চারকেরা (articulators) ফুস্‌ফুস্-তাড়িত বাতাসের ধাক্কায় পৃথক হয়না, ফলে স্বরধ্বনি সহযোগে তারা সম্পূর্ণ মুক্তও হয়না। এ কারণে অক্ষর গঠনের বেলায় তারা তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিরই সহগমন করে। এ রকম ক্ষেত্রে 'কাঠ্,' 'ঘাট্' জাতীয় শব্দ নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একেবারে উচ্চারিত হয়েই এক একটি অক্ষর গঠন করে। বাংলায় যাই্, খাই্, স্থায়্, গায়্, আয়্, যাও্, দাও্, দাউ্দাউ্, ওই্, দই্ প্রভৃতি দ্বৈতস্বর বিশিষ্ট শব্দশেষের হসন্তান্তিক অর্ধস্বর ধ্বনিগুলোর উচ্চারণও শব্দ শেষের হলন্ত ব্যঞ্জনজাতীয় বলে তারাও তাদের পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে অক্ষর গঠন করে।

শব্দের প্রাথমিক সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর ভাগ

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি অধ্যায়ে বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকৃতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি শব্দের শুরুতে স্ক—, স্খ—, ষ্ট—, স্ত—, স্থ—, স্ন—, স্প—, স্ফ—, স্পৃ— এবং স্ত্র— উষ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট এ ক'টি ধ্বনি এবং তরল ধ্বনি (র,ল) সংশ্লিষ্ট ক্র—, খৃ (খ্র)— গ্র (গৃ)—, ঘ্র (ঘৃ)—, জ্র—, ট্র—, ড্র—, ত্র (তৃ)—, দ্র (দৃ)—, ধ্র—, ন্র—, প্র (পৃ)—, ফ্র (ফ্র)—, ব্র (বৃ)—, ভ্র (ভৃ)—, ম্র (মৃ)—, শ্র (শৃ)—, ক্ল—, গ্ল—, প্ল—, ফ্ল—, ব্ল—, ম্ল—ই এক-প্রয়াসজাত উচ্চারণ-জনিত যথার্থ

সংযুক্তত্ব রক্ষা করে। তার ফলে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে তারাও পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয়। সেকারণে বাংলা শব্দে নিঃশ্বাসের এক প্রয়াসজাত এবং একাত্মতাপ্রাপ্ত এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোও তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে একত্রে অক্ষর গঠন করে। প্লা | বন্, ঘ্রাণ, স্পৃ | হা, স্কুল্, স্থা | পনা, গ্রা | নি প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ প্রকৃতিই অক্ষর ভাগের এ নির্দেশ সমর্থন করে।

শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থিত দুই ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর ভাগ

এক শব্দের অন্তর্গত দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে বাংলায় সব রকমের ব্যঞ্জনধ্বনি অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানজাত স্পর্শধ্বনি (যেমন ভক্ত (ভক্‌ত), মুগ্ধ, তৃপ্ত ইত্যাদি), স্পর্শধ্বনি ও নাসিক্যধ্বনি (যেমন চিক্‌না, ভগ্ন, বাগ্মী ইত্যাদি) স্পর্শধ্বনি ও পার্শ্বিক ধ্বনি (যেমন বাক্‌লা, পাত্‌লা ইত্যাদি), স্পর্শধ্বনি ও প্রকম্পনজাত ধ্বনি (যেমন বক্‌রী, দাদ্‌রা ইত্যাদি), স্পর্শ ধ্বনি ও তাড়নজাত ধ্বনি (যেমন বিগ্‌ড়ানো, চুব্‌ড়ি ইত্যাদি), স্পর্শ ধ্বনি ও ঘর্ষণজাত ধ্বনি (যেমন পাক্‌সাট, খাক্‌সার লাগ্‌সই ইত্যাদি), ঘর্ষণজাত ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন মুশ্‌কিল, আস্‌কারা, নিশ্চয় ইত্যাদি), তাড়নজাত ধ্বনি ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন আড়কাঠি, খড়্‌গ ইত্যাদি) তরল ধ্বনি ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন বোরকা, বল্‌গা ইত্যাদি), নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন খানখান, ঝংকার, বোন্‌পো, রম্‌জান, রাম্‌দা, রঙ্‌দার ইত্যাদি), এবং নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি এবং স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি (যেমন সিংহ, সংহার ইত্যাদি) প্রভৃতি যাবতীয় ধ্বনি অবস্থান করতে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে দু'টি ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রথমটির উচ্চারণ শব্দশেষের হসন্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মতো, অমুক্ত অভিনিধান প্রাপ্ত।* কিন্তু দ্বিতীয় ব্যঞ্জন ধ্বনিটি তার পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ফলে অক্ষর বিভাগের বেলায় প্রথম ব্যঞ্জন ধ্বনিটি প্রথম অক্ষরের সঙ্গে যায় আর দ্বিতীয় ব্যঞ্জন ধ্বনিটি পরবর্তী অক্ষর গঠন করে। সেজন্যে এদের ভাগ হয় এভাবে : বাক্ | লা, ভক্ত (ভক্ | ত), মুক্তা (মুক্ | তা) খড়্ | গ, ঝং | কার, রঙ্ | দার, বোন্ | পো, আস্ | কারা, সং | হার ইত্যাদি।

* দ্রষ্টব্য বাংলার সংযুক্তধ্বনি : সাহিত্য পত্রিকা : বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৫।

বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখা গেছে যে উষ্মধ্বনি এবং পার্শ্বিক ও কম্পনজাত ধ্বনি কয়টিই বাংলায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গঠনের উপাদান। এদের মধ্যে আবার উষ্মধ্বনি সঞ্জাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো কেবলমাত্র শব্দের শুরুতেই তাদের সংযুক্ততা রক্ষা করে। শব্দের মাঝখানে তারা ধ্বনির পারম্পর্যগত উচ্চারণ পায়, সংযুক্ত ধ্বনির একাত্মতা (compactness) রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু 'র' ও 'ল' ফলাজাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো শব্দের শুরুতে ও মাঝখানে শুধু যে সমানভাবেই তাদের সংযুক্ত ধ্বনিসঞ্জাত একাত্মতা রক্ষা করে তা নয়, শব্দের মাঝখানে তাদের প্রথম উপাদানটির উচ্চারণে উচ্চারকদ্বয় (articulators) যেখানে পরস্পর সংলগ্ন হয় সেখানে তারা পৃথক না হয়ে সময়ের দিক থেকে দ্বিগুণ সময় ক্ষেপন করে দেখে উক্ত ধ্বনি সংগঠনজনিত উচ্চারকদের সংলগ্নতার পর্যায়টি প্রথম অক্ষর এবং তাদের পৃথকীকরণজনিত মুক্তির ভাগটুকু পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে দ্বিতীয় অক্ষরে বিভক্ত হয়ে যায়। তুলনীয় আক্রান্ত, পুত্র, অম্লান, বিস্মৃতি এবং বিশ্লিষ্ট প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ। এখানকার প্রতিটি শব্দের উচ্চারণেই দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম উপাদান 'ক্', 'ত্', 'ম্', 'স্' সময়ের দিক থেকে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। একারণেই বোধ হয় 'পুত্র' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত মতে আগের দিনে 'পুত্ত্র' রূপে লেখা হতো। উচ্চারণই অক্ষর ভাগের একমাত্র নিয়ামক। উচ্চারণের ভিত্তিতেই সেজন্যে এভাবে এদের অক্ষর ভাগ হয়ঃ— আক্রান্ত (আক্ | ক্রান্ত), পুত্র (পুত্ | ত্র), অম্লান অম্ | ম্লান, বিস্মৃতি (বিস্ | স্মৃতি), বিশ্লিষ্ট (বিশ্ | শ্লিষ্ট) ইত্যাদি।

শব্দের মাঝখানে সংযুক্ত
স্পৃষ্ট ও দ্বিত্ব ধ্বনি
ব্যঞ্জনধ্বনির অক্ষর ভাগ

'ব' ফলা ও 'ল' ফলা সম্বলিত শব্দ মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম উপাদানটি উচ্চারণের দিক থেকে যেমন দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয় এবং সেজন্যই অক্ষর ভাগের সময়ে তাদের সাংগঠনিক বদ্ধ অংশটুকু পরের স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলেমিশে যেমন পরবর্তী অক্ষরে সন্নিহিত হয়—ঠিক তেমনি শব্দ মধ্যবর্তী আন্তঃস্বরীয় দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোও (-ক্ক-, -গ্গ-, -জ্জ-, -ড্ড-, -দ্দ-, -ব্ব-, -ক্খ-, -চ্চ-, -ত্থ-, -জ্ঝ-, -দ্ধ-, -ব্ভ-, -ড্ঢ-, -শ্শ-, -ল্ল-, -ল্লহ-, -র্র-, -র্রহ-, -ন্ন-, -ন্নহ-, -ম্ম-, -ম্মহ-) এভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাদের

প্রথম অংশ প্রথম অক্ষর এবং দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। তুলনীয় :— পক্ক (পক্ | কো), সখ্য (সক্ | খো), ভাগ্য (ভাগ্ | গো), রাজ্য (রাজ্ | জো), আড্ডা (আড্ | ডা), পদ্ম (পোদ্ | দো), সব্বাই (সব্ | বাই), উত্থান (উত্ | থান), গব্ভ (গব্ | ভো), বিশ্বাস (বিশ্ | শাস), আল্লা (আল্ | লা), আহ্লাদ (আল্ | ল্হাদ), ছররা (ছর্ | রা), বর্হ (বর্ | র্হ), কন্যা (কোন্ | না), সম্মান (সম্ | মান), ব্রহ্মা (ব্রম্ | ম্হা) ইত্যাদি।

ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে বাংলা শব্দ একাক্ষরিক কিংবা একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট যেমনি হোক না কেন অক্ষরগুলোর গঠনপ্রকৃতি এ ক'টি রূপ ধারণ করে :—

[v = স্বরধ্বনি c = ব্যঞ্জনধ্বনি ; j = ই, y = য়, w = ব্ (ও) এবং উ অর্ধস্বরধ্বনির প্রতীক]

(১) v, যেমন এ, ও, উ, ই | তি, উ | নি প্রভৃতি শব্দে ই, উ প্রভৃতি। বাংলায় v স্বতন্ত্র অক্ষর এবং শব্দ দু-ই গঠন করে। v কাঠামোবিশিষ্ট অক্ষর ব্যাপক ভাবে শব্দ গঠন না করলেও ই, এ, ও, প্রভৃতি স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(২) vc, যেমন আজ্, আম্, এ্যাক্, এর্, ওর্, ইস্, আর্, ওত্, উট্, আঁজ্ | লা, ওড়্ | না ইত্যাদি। এ উদাহরণগুলো থেকে দেখা যাবে vc কাঠামোর অক্ষর শুধু শব্দাংশই গঠন করে না, যথেষ্ট পূর্ণ শব্দও গঠন করে।

(৩) cv, যেমন পা, দা, তা, ন', মা, যা, চা, বা, বা | বা, রা | জি, রী | তি ইত্যাদি।

cv কাঠামোর অক্ষরও পূর্ণশব্দ গঠন করে।

(৪) cvc, যেমন কাজ্, কাম্, নাক্, চোখ্, রাত্, হাত্, মাছ্, ভক্ | তো (ভক্ত), পন্ | থা (পন্থা), পুন্ | নো (পুণ্য), কীর্ | তি (কীর্ত্তি), কাঁ | ঠাল্, পা | ঠান ইত্যাদি।

cvc কাঠামোর অক্ষরই বাংলায় ব্যাপকভাবে পূর্ণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৫) ccv যেমন ক্রু | মি, কৃ | ষি, গ্রা | নি, প্রী | তি, দৃ | ঢ়, প্র | মান্, ইত্যাদি।

ccv কাঠামোর অক্ষরটি বাংলায় পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা।

(৬) ccvc যেমন, প্রাণ, ঘ্রাণ, ত্রাণ, ম্লান, ক্লাশ্, ক্লান্ | ত্ত, (ক্লান্ত), ভ্রান্ | তি (ভ্রান্তি) ইত্যাদি। এ কাঠামোর অক্ষরও পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(৭) vj যেমন এই্, ওই্, আই্, উই্ ইত্যাদি। অক্ষরের এ কাঠামোটি পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(৮) cvj যেমন দিই্, নেই্, নিই্, শিউ্লি, পিউ্লি, ভৈরব, সই্, দই্, কই্ ইত্যাদি। অক্ষরের এ কাঠামোটিও পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(৯) vy যেমন, আয়্ | এটি পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(১০) cvy যেমন, ন্যায়্, অন্ | ন্যায় (অন্যায়্) ছায়্, গায়্, যায়্, সায়্, ভয়্, হয়্, রয়্, জয়্, ধোয়্, শোয়্ ইত্যাদি।

cvy কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

(১১) ccvy যেমন, প্রায়্; পূর্ণশব্দ গঠন করে।

১২। vw যেমন আউ্লানো (au | lano), ঔরস্ (ou | rɔsh), ঔষধ্ (ou | shɔdh), ইত্যাদি; স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করে না।

১৩। vwc যেমন ঔৎসুক্য(out | shukko); স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা।

১৪। cvw যেমন দাও্ (dao), নাও্, খাও্, গাও্, যাও্, থোও্ (thoo), নও্, হও্ (hɔo), দাউ্ দাউ্ (dau dau), ঘেউ্ ঘেউ্ (gheu gheu)ইত্যাদি; স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করে।

১৫। * wv যেমন ওয়া | রিশ (wa | rish), ওয়া | সিল (wa | sil), ওয়া | রেন্ট (wa | rent), ওয়া | লা, খা | ওয়া (kha | wa), দা | ওয়া, পা | ওয়া, মো | য়া (mo | wa), প্রি | য়ো (pri | wo), দি | ও, নি | য়ো, প্র | য়ো | জন (pro | wo | ion), নি | য়ো | জন, ইত্যাদি।

১৬। * yv যেমন গে | য়ে (ge | ye), মে | য়ে (me | ye), নি | য়ে (ni | ye), দি | য়ে, হো | য়ে ইত্যাদি। yv কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে না। এবং শুরুতেও ব্যবহৃত হয় না।

[* wv কাঠামোর অক্ষর স্বতন্ত্রভাবে যেমন পূর্ণ শব্দ গঠন করে না তেমনি শব্দের শুরুতে কেবল বিদেশী অর্থাৎ আরবী ফারসী ও ইংরেজী শব্দেই পাওয়া যায়। খাওয়া, দাওয়া, কুয়ো, দিও, নিও এবং প্রয়োজন, নিয়োজন প্রভৃতি শব্দের শেষে কি মাঝখানে 'wv' কাঠামোর অক্ষর স্বতন্ত্রভাবে গঠিত না হ'য়ে পূর্ব স্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক। wv এবং yv কাঠামোর অক্ষর বাংলায় তাদের পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলে দ্রুত উচ্চারণেও অনিয়মিত দ্বৈতস্বর সৃষ্টি না করলে কেবল শব্দের শেষেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দ্বৈতস্বর সৃষ্টি করলে আর স্বতন্ত্র অক্ষর থাকে না, পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে পূর্ববর্তী অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হয় ; সেজন্যে শব্দের মাঝখানে ও শেষে wv এবং yv কাঠামোর স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন না করাই বাংলার ধ্বনি প্রকৃতির স্বভাবিক বৈশিষ্ট্য।]

১৭। wvw খা | ওয়াও (kha | wao), পা | ওয়াও (pa | wao), নে | ওয়াও (ne | wao), ইত্যাদি ; এ কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে না এবং শব্দের শুরুতে আসে না।

১৮। wvy যেমন নে | ওয়ায় (nc | way), দে | ওয়ায় (de | way), ইত্যাদি ; পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা এবং শব্দের শুরুতে আসেনা।

১৯। yvc যেমন প্র | য়োগ (pro | yog), নি | য়োগ (ni | yog) ইত্যাদি ; পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা এবং শব্দের শুরুতেও আসেনা।

পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনির মিলনের ফলে দ্বৈত (diphthong) স্বরধ্বনির সৃষ্টি হলে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটির ব্যবহার (function) হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মতো হয়। এ কারণে vj (যেমন এই্, ওই্, উই্ ইত্যাদি), vy (যেমন আয়্) এবং vw (যেমন আও্, আউ্) অক্ষরভাগের প্রকৃতিগত দিক থেকে vc (যেমন আজ্, আর্, আম্, ইস্, এ্যাক্ প্রভৃতি) কাঠামোর সগোত্র ; তেমনি cvj •(যেমন দিই্, নিই ইত্যাদি), cvy (যেমন যায়্, স্থায়, গায়্ ইত্যাদি),

cvw (যেমন দাও্, যাও্, গাও্, দাউ্দাউ্ ইত্যাদি) এবং ccvy (যেমন প্রায়) যথাক্রমে cvc এবং ccvc কাঠামোর গোত্রভুক্ত। শুধু wv এবং yv কাঠামোর অক্ষর ভাগ বাংলায় কিছু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। এ বৈচিত্র্যের কারণ বাংলায় w (ব্) ও, (উ) এবং y (য়) জাতীয় অর্ধস্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ ; তারা তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে এমনকি দ্রুত উচ্চারণেও দ্বৈতস্বর সৃষ্টি না করলে শব্দ শেষে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন ক'রে থাকে।

ওপরের অক্ষর কাঠামোগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায় v, vc, cv, cvc, cvy এবং cvw কাঠামোর অক্ষরই বহুল প্রচলিত। এদের তুলনায় অবশিষ্ট কাঠামোর অক্ষরগুলোর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

কয়েকটি ইংরেজী যেমন ব্যাঙ্ক্, ল্যাম্প, গ্র্যাণ্ড্ এবং ফারসী যেমন গঞ্জ্, দোস্ত্, গোস্ত্ প্রভৃতি কৃতঋণ শব্দ ছাড়া বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনি প্রকৃতিতে শব্দ শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাক্তে পারে না দেখে বাংলায় cvcc কি ccvcc জাতীয় অক্ষর কাঠামো দেখা যায় না।

জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি

কাজী আবদুল মান্নান

ইংরেজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে কাব্যধারা বাঙলা সাহিত্যে বিচিত্রভাবে প্রবাহিত হয়েছে তাকে নিয়েই আধুনিক বাঙলা কাব্যের ইতিহাস। এই ইতিহাসের একটি বড় অধ্যায় জুড়ে আছে ক্লাসিক রীতিকে অনুসরণ ক'রে রচিত আখ্যান কাব্য-সম্ভার। যার সূচনা হয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি কিন্তু জের চলেছে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত, কখন সক্ষম সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ, কখন অক্ষম প্রচেষ্টায় বিড়ম্বিত হয়ে। এ ধারা অনুধাবন করলে, এর ভালমন্দ বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে বিচরণ করলে, যে সাধারণ সত্যটি নজরে পড়ে সেটি হচ্ছে, এ কাব্যগুলো কবি-ধর্মের নয় বরং কবি-কর্মেরই নিদর্শন। কবির স্বতঃ-উৎসারিত আবেগের চেয়ে সচেতন প্রচেষ্টার স্বাক্ষর এ সবে বেশী ক'রে পাওয়া যায়। একটা আখ্যানকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে কবি তাঁর কালের চিন্তা-ভাবনা, তাঁর সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সর্বোপরি তাঁর নবলব্ধ জীবন-বোধকে রূপায়ণের ব্যাকুল প্রয়াস পেয়েছেন। তার সে প্রয়াসের সূচনা হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষায়, জ্ঞানে এবং ভাব ধারায় সচকিত সাহিত্যিকদের দ্বারা। পাশ্চাত্য ক্লাসিক কাব্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেন। এ কালে বাঙলা গদ্য ছিল অপুষ্ট। নব প্রাণ-চাঞ্চল্যে উজ্জীবিত কবিগণ তাঁদের ভাব-কল্পনাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন মহাকাব্য বা আখ্যান কাব্যগুলোতে। মধ্যযুগের বিজয় ও মঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যে আমরা তদানীন্তন যুগচিন্তার ক্ষীণ প্রতিফলন দেখতে পাই। আধুনিক কালের মহাকাব্য রচনার প্রয়াসের মধ্যে যুগ-চেতনার প্রকাশ অধিকতর সুপরিস্ফুট। তুর্কি অভিযানের আঘাতে সাহিত্যে অভিজাত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর একচেটিয়া প্রভাব ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রাকৃতজনের ছড়া, পাঁচালী প্রভৃতি সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে। আধুনিক যুগেও সাহিত্যের স্বরূপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তারই বিক্ষিপ্ত পরিচয় একালের আখ্যান-কাব্যগুলোর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই শিক্ষিত নাগরিক-চিত্তে যে আত্ম-সচেতনতা,

আত্ম-প্রত্যয় এবং মর্যাদাবোধ জাগ্রত হ'তে দেখা যায় তা সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রমেই ব্যাকুল হয়ে উঠে আর এ ব্যাকুলতা থেকেই জন্ম নেয় জাতীয়তাবোধ। আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতনতাই সেদিনের মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল জাতীয় শক্তির মহিমাকে প্রত্যক্ষ করতে কিন্তু বর্তমানের শূন্যতা সম্পর্কেও তাঁরা ছিলেন সচেতন, কাজেই তাঁদের দৃষ্টি ফিরেছিল পুরাণ এবং ইতিহাসের দিকে। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্নিহিত সংঘর্ষ এবং কোলাহলকে রূপায়িত করার মধ্য দিয়ে নিজের জাতীয় চরিত্রে বীরত্ব, ত্যাগ, আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি মহৎ অনুপ্রেরণা তাঁরা দিতে চেয়েছেন। ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার, শব্দ-সম্পদ প্রভৃতির সৃষ্টি ঐ আনুষঙ্গিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই হয়েছে। কবি মনের মহৎ ভাবকে রূপায়ণের জন্য তাঁরা কাব্যে ক্লাসিক রীতির সুসংহত বিন্যাস ও সুবিপুল গাম্ভীর্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। বাঙলা কাব্যের দুর্বলতা দূর করার সজ্ঞান চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ক্লাসিক কাব্যের উত্তুঙ্গ শিল্পাদর্শ, সুকঠিন সংযম এবং সুগভীর প্রজ্ঞা তাঁদের কাব্যে রূপলাভ করে নি। কোথাও ক্লাসিক রচনার চকিত পরিচয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আসলে এগুলো নিছক কাহিনী-কাব্য, যার প্রেরণা বাঙালী কবিগণ পেয়েছিলেন স্কট, বায়রণ প্রভৃতি কবির উচ্ছ্বাসপ্রবণ আখ্যান-কাব্যে। জাতীয় জীবনকে সুগঠিত করার চেতনা তাঁদের পেয়ে ব'সেছিল এবং এসব কাব্যে তাঁরা জাতির বলবীর্যের ঐতিহ্যকে রূপ দিতে চেয়েছেন। কাজেই এসব কাব্যের যদি কোন নামকরণ করতে হয়, তা'হলে এদের জাতীয় আখ্যান-কাব্য ব'লে অভিহিত করাই সংগত হবে। অবশ্য বাঙালী চিত্তের গীতি-প্রবণতা, কারুণ্য এবং মাধুর্যপ্রীতি উচ্ছ্বাস এবং আবেগ-প্রবণতা থেকেও এ কাব্যধারা মুক্ত নয়। ক্লাসিক রীতিসম্মত সংযম এবং সংসবদ্ধতা এমনকি বীর গাথাসুলভ গাম্ভীর্য ও মহিমা এ সব কাব্যে প্রায়শঃই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বীর হুঙ্কারে কাব্যের সূচনা হ'য়েও চোখের জলে কাব্য হয়েছে প্লাবিত, প্রবল শক্তি সংঘর্ষকে আচ্ছন্ন করেছে নারী-কণ্ঠের কল-কাকলী, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতাকে ম্লান ক'রে দিয়েছে কৈশোর-প্রণয়ের চাপল্য, আত্মধ্বংসী মহাসংগ্রামের অবসানে জাতির চেয়ে ব্যক্তির দীর্ঘশ্বাসই প্রকটিত হয়েছে বেশী, ধর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার মরণপণ সংগ্রামকে লঘু ক'রে দিয়েছে তরুণ তরুণীর প্রেমলীলা, আদর্শ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মহাসংঘাতের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে নারীর রূপশিখা।

জাতীয় আখ্যান-কাব্য ধারার সূচনা কবি রঙ্গলাল এবং তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'কে দিয়ে। কাহিনী-কাব্য যে জাতীয় প্রেরণা থেকে উদ্ভুত তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি তাঁর কাব্যেই প্রথম দেখা যায়। আর এ অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে হিন্দু-মানসের মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধা, অসংগতি এবং স্বার্থ সচেতনতাও তাঁর কাব্যে প্রথম পরিলক্ষিত হয়। কবি হিসেবে তিনি অসার্থক বা তাঁর কাব্যরীতি পুরাতনেরই অনুকরণ মাত্র এসব কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে তিনি বাঙলা জাতীয় কাব্যের যে প্রেরণাটি নির্দিষ্ট করেছিলেন, মাইকেলের আশ্চর্য ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সে প্রেরণাকেই পরবর্তী কবির নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ ক'রে গেছেন।

পাশ্চাত্য প্রভাব বাঙালীর জীবন সম্পর্কে এনেছিল নতুন মূল্যবোধ যার ফলে সে তার আত্মমর্যাদা সম্পর্কে হয়েছিল সচেতন এবং সে সচেতনতারই একটি বিশেষ পরিণতি স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি। কিন্তু যে জাতি ও সমাজ তাদের সম্মুখে বিদ্যমান, বিশেষ ক'রে তাঁদের নাগরিক পরিবেশে তা তখন পরানুকরণের ব্যাকুল প্রচেষ্টায় লিপ্ত। তাতে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিলনা বরং সে ছিল এক চরম গ্লানির কথা। নতুন শিক্ষিত সমাজ—যারা তখনকার দিনে দেশের সবচেয়ে জীবন্ত অংশ, তাদের পরানুকরণ ও আত্মবিস্মৃতি থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবচেয়ে বড় কবি-কর্ম। ইংরেজী শিক্ষায় গর্বিত এই নতুন সমাজ বাঙলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চা তো দূরের কথা বাক্যালাপ করাকেও ঘৃণা বোধ করতো। রঙ্গলাল তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় কাব্য-রচনার যে কারণগুলো নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে বাঙলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চার পথ প্রশস্ত করা অন্যতম। এ ভূমিকার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে 'রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কুন্তীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী' তাঁকে বাঙলা ভাষায় কাব্য-রচনা করতে উৎসাহ দিয়ে একপত্রে লেখেন :

"আধুনিক যুবজনে
স্বদেশীয় কবিগনে
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে
বাঙ্গালীর মনঃ পদ্ম
কবিতার সুধার সদ্ম
এই মাত্র রাখহে প্রমাণে।"[১]

১। পদ্মিনী উপাখ্যান রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ভূমিকা পৃঃ ১

বলা বাহুল্য এই প্রমাণ রাখতে গিয়েই রঙ্গলাল কাব্য রচনায় হাত দেন।

আসলে শিক্ষিত সমাজ যে মহৎজীবনের স্বাদ পেয়েছিল তাকে প্রত্যক্ষ করেছিল বিদেশী শাসকের মধ্যে, নিজ সমাজের দৈন্য তার চিত্তে জাগিয়েছিল বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভের প্রকাশ হয়েছিল উচ্ছৃঙ্খলতায়। এই বিক্ষোভ শান্ত ক'রে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিকে তিনি ফিরাতে চেয়েছিলেন বাঙলা ভাষা সাহিত্যের দিকে, অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিকে। পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় কবি তাঁর সে উদ্দেশ্যকে এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ "বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালংকারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক মৎ কর্তৃক রচিত হইল।"[১]

অতীতের কাহিনী থেকে প্রেরণা আহরণ ক'রে কবি বর্তমানকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন কিন্তু বর্তমান অতিশয় রূঢ়, সেখানে 'বীরত্ব' বা 'সাহসিকত্ব' প্রকাশ বিপদজনক, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সেখানে শাসকের সতর্ক দৃষ্টিতে বিড়ম্বিত হবার মহা আশঙ্কায় শঙ্কিত। সম্ভবত এ আশঙ্কাতেই কবি রঙ্গলাল তাঁর স্বাজাত্যবোধ বা স্বদেশ প্রীতির কোন অভিব্যক্তি সমসাময়িককালের ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ সিপাহী বিদ্রোহে দেখেন নি। শুধু দেখেননি বল্‌লে ভুল হবে বরং বিদ্রোহকে ধিক্কার দিয়েছেন। জাতীয় চেতনার উন্মেষকালে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কবি যদি নীরব থাকেন, প্রবল শাসকের পীড়নাশঙ্কায় কবি-কণ্ঠ যদি বিদ্রোহের বীরত্বকে অভিনন্দন জানাতে না পারে তাহলে কবিকে দোষারোপ করা হয়ত যায়না। কিন্তু যে-কবি জাতির সংগ্রাম এবং বীরত্বকে, এক কথায় তার বীর্যের সন্ধান করেন অতীত ইতিহাসের মধ্যে অথচ বর্তমানের সংগ্রামকে করেন অবজ্ঞা, সে সংগ্রামের ব্যর্থতায় উল্লসিত হয়ে করেন ব্রিটীশের বিজয় ঘোষণা সে কবি মানস জটিল এবং স্ব-বিরোধী বলেই প্রতীয়মান হয়। আসলে সমৃদ্ধপ্রয়াসী বুদ্ধিজীবী সমাজের স্ব-বিরোধী মানসিকতাই রঙ্গলালের কাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। যে শিক্ষিত নাগরিক চিত্তে আত্ম-মর্যাদা,

[১] পদ্মিনী উপাখ্যানঃ রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ভূমিকা পৃঃ ২

স্বদেশ-প্রীতি এবং স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটেছিল তাদের নিজেদেরই জন্ম হয়েছিল শাসকের স্নেহ ও কৃপাকে আশ্রয় ক'রে এবং সে স্নেহ ও কৃপার প্লাবন প্রবল থাকা কালেই কবি পদ্মিনী উপাখ্যান রচনা করেন। এ কাব্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম মুসলমানদের সঙ্গে। কাল্পনিক যবন-পীড়ন থেকে ইংরেজের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভের প্রার্থনা জানিয়ে কাব্যের পরিসমাপ্তি :

"ভারতের ভাগ্য জোর দুঃখ বিভাবরী ভোর
ঘুম ঘোর থাকিবে কি আর ?
ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে
জ্ঞানভানু প্রভায়-প্রচার ॥
শান্তির সরসী-মাঝে, সুখ সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে
হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহ-বারিদায়
আর যেন বিষ না বরিষে ॥"[১]

বুদ্ধিজীবীর কলেবর বৃদ্ধির প্রধান অবলম্বন তখন শাসক ইংরেজ, কাজেই তাদের স্তুতি, সেবা এবং সাহায্য করার গরজ কম ছিল না। যে বিদ্রোহ কবির সহায় ইংরেজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে এবং তার পরিপুষ্টিকে বিঘ্নিত করতে পারে, সে বিদ্রোহের সমূলে বিনাশই কবির চরম কামনা। বস্তুত রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রভৃতি কবির মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ তা একারণেই কোন সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় রূপ লাভ করে নি। রাষ্ট্র বলতে যে ভারতবর্ষ তা ইংরেজ জাতির অধিকারে, তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করার বিপদ যথেষ্ট ; কাজেই সে ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাক্। কেবল তারই ছত্রচ্ছায়ায় গোষ্ঠী-সমৃদ্ধি নির্বিঘ্ন হোক্, গোষ্ঠী তার স্বকীয় মর্যাদাবোধ সচেতন হোক, সম্ভবত এই ছিল তাঁদের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা।

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে জাতীয়তাবোধের সূচনাই দ্বিধাকম্পিত, প্রথম থেকেই স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা কলঙ্কিত। স্বাজাত্যপ্রীতি ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যেই প্রথম লক্ষ্যগোচর হয়, আবার কবি-মনের স্ববিরোধিতাও সেখানে প্রকটিত হ'য়ে

১ পদ্মিনী উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

উঠে। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় প্রথম স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু "ঈশ্বরগুপ্তই বাংলার প্রথম কবি—যিনি মুক্ত কণ্ঠে ইংরেজের প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন। পরবর্তীকালের রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মত ঈশ্বরগুপ্তের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা বিধাতারই মঙ্গলময় বিধান।"[১] কাজেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, যেমন নানা সাহেব, ঝান্সীর রাণী প্রভৃতিকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, সে বিদ্রূপ অনেকক্ষেত্রে শালীনতাকেও লঙ্ঘন করেছে। কারণ, "ইংরেজের বলবীর্য পরাক্রমে তিনি মুগ্ধ, যুদ্ধে জয়ে তিনি উল্লসিত, ইংরেজের বিরুদ্ধে যাঁহারা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাঁহাদের তিনি পরম শত্রু।"[২]

'ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা' যে 'বিধাতারই মঙ্গলময় বিধান' এ ধারণা ঈশ্বরগুপ্তেই শেষ নয়; বরং আরম্ভ। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীন সেন প্রভৃতি কবির কাব্যে এ ধারণারই ঐক্যতান শোনা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ভূদেব প্রভৃতি মনীষিগণ নানাভাবে ঐ একই ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন। যারা নতুন ভূম্যধিকারী এবং পাশ্চাত্য শাস্ত্রাদি পাঠে নবচেতনা প্রাপ্ত শিক্ষিত যাঁরা তারা সবাই—নিজের সমৃদ্ধিকে বিস্তৃত ও নির্ঝঞ্ঝাট করার উদ্দেশ্যেই কায়মনোবাক্যে ইংরেজের মঙ্গল কামনা করেছে। সেদিনের শিক্ষিত বাঙালী মনে করতেন—"ইংরেজ প্রভু, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসক, তার কর্মে নবীন গতি, কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব বাণী, সে বুদ্ধিতে অপরাজেয়, আদর্শে অভিনব, আর ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্যে সমষ্টিগতভাবে না হোক ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবে অসামান্য সমৃদ্ধির দ্যোতক, সুতরাং এই সব ব্যবহারিক সুফল থেকে যদি বঞ্চিত হতে না হয়, তা'হলে ইংরেজকে সমর্থন কর, তার রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হও—ইহাই কালের নীরব নির্দেশ। ঐ আমলের বাঙ্গালী চিন্তানায়কবৃন্দ কালের নির্দেশ পালন করেছেন, অন্যথা করেন নি।"[৩]

কিন্তু অন্যথা করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পাশ্চাত্য জীবন অবলোকন করে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যে অবগাহন করে এক প্রবল জীবনোন্মাদনা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। আপন সমাজের সংকীর্ণতা তাঁর কাছে হয়েছিল

১ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরা শঙ্কর সেন, পৃঃ ৫৩
২ ঐ, পৃঃ ৫৪
৩ উনবিংশ শতাব্দীর পথিক—ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ১০

দুর্বিসহ এবং খৃষ্টান হয়ে তিনি তা থেকে পেতে চেয়েছিলেন পরিত্রাণ। মেঘনাদ বধ কাব্যে রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা প্রভৃতি চরিত্রে তিনি বলিষ্ঠ এবং বেপরোয়া জীবনের আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন। তাঁর কবি সত্তায় যে সবল-সুস্থ মানবতাবোধ এবং উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যে তাকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কালোত্তীর্ণ প্রতিভার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি তাঁর কাব্যকে সমকালীন স্বার্থবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রেখে মহিমান্বিত ও ভাস্বর করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যে সমকালের মানুষের জীবনোল্লাস ধ্বনিত হয়েছে। ঐশ্বর্যের, বীর্যের, আত্মপ্রত্যয়ের এবং হৃদয়-মথিত বেদনার এমন অপরূপ সমন্বয় কাব্যে দুর্লভ। কাব্যের প্রথম সর্গেই এ সবের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

অগণিত হিরামরকত খচিত স্বর্ণপ্রাসাদে 'হৈমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর' এর মত 'তেজঃ পুঞ্জ' বিকীরণ করে কনকাসনে রাবণ সমাসীন। 'ভূতলে অতুল' তার ঐশ্বর্য্য! শুধু হিরামরকতেই নয়, পাত্রমিত্র, কিঙ্করকিঙ্করীও তার বিপুল ঐশ্বর্য্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজছত্র ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে যে ছত্রধরটি তার রূপেরই কি সীমা আছে! দেখে মনে হয়—

"হর কোপানলে কাম যেনরে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে"

এ হেন সম্পদশালী রাবণের কাছে যখন সংবাদ এল, পুত্র বীরবাহুকে রাম সম্মুখ সমরে হত্যা করেছে তখন যে সংবাদ তার কাছে 'নিশার স্বপন সম' অলীক মনে হয়েছে—

"অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখে রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"

বিপুল আত্মপ্রত্যয়ী রাবণের বিস্ময়ের আর অবধি নেই! কিন্তু রাবণতো শুধু ঐশ্বর্য্যবান বা শক্তিমানই নয় সে হৃদয়বানও বটে। তাইতো পুত্রের মৃত্যুতে তার অন্তরের ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। রাবণ বিজ্ঞ কিন্তু—

"জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ! হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয় ধন লয় কেহ হরি।"

বুদ্ধি দিয়ে যাকে অনিবার্য বলে জানা যায় হৃদয় তাকে স্বীকার করতে চায়না কিছুতেই। মানব হৃদয়কে আশ্রয় করে স্নেহ-প্রেমের যে ফুল ফুটে আছে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ জেনেও পরাণ কাঁদে, ছোট্ট মেয়ের মতই সে অবোধ, সে কেবলি তার স্নেহের দাবী ঘোষণা ক'রে বলে—'যেতে নাহি দিব।'

রামের সঙ্গে সংগ্রামে বীরপ্রসূ লঙ্কা হারিয়েছে অনেক তবু সে রিক্ত নয়। আর লঙ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব তো মেঘনাদ। বিপন্ন মাতৃভূমিকে আহ্বান জানিয়ে রাজ সভার বন্দী বন্দনা করেছে :

'উঠ রাণি, দেখ ঐ ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল। দেখ তূণ, যাহে
পশুপতিত্রাস অস্ত্র পাশুপত সম।

স্বর্ণ লঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এক দুর্বার শক্তি অবলোকন ক'রে অভিভূত হই। আর বীরত্বের এই বিস্ময়কর অভিব্যক্তির জন্য কবির কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে উৎফুল্ল বা ক্ষুন্ন করার প্রয়োজন হয়নি, ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাতে হয়নি। দেশপ্রেমের সহজ আবেগ এ কাব্যে কত সুস্থ ভাবেই না ব্যক্ত হয়েছে। হয়ত কিছুকাল আগে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে থাকবে। বিধ্বস্ত রণক্ষেত্রের দিক তাকিয়ে রাবণের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি :

"রিপুদল দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু, সে মূঢ়; শতধিক তারে।"

মেঘনাদ বধ কাব্যের ভাষা, ছন্দ, এবং গঠনকৌশলকে পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক জাতীয় কাব্য রচয়িতাগণই অনুশীলন এবং অনুকরণ করেছেন কিন্তু কোন

কবিই তাঁর মূল ভাব ধারাকে অনুসরণ করেন নি, হয়ত সে প্রেরণা তাঁরা অন্তরে অনুভব করতে পারেন নি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যের সংস্পর্শ দেশের শিক্ষিত চিত্তে যে উদার ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ জাগ্রত করেছিল তাকে মাইকেলের মত মনে প্রাণে অনুভব করা বা সে অনুভূতিসঞ্জাত শিল্প সৃষ্টি করা এঁদের কাউরি দ্বারা সম্ভব হয়নি। তাঁরা আঙ্গিকের দিক দিয়ে মাইকেলের প্রভাবকে অন্ধভাবেই স্বীকার করে নিয়েছেন কিন্তু তাঁদের কাব্যের মর্মবাণীর আশ্চর্য্য মিল হচ্ছে রঙ্গলালের সঙ্গে। রঙ্গলাল স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রীতির প্রকাশ ও প্রচার করতে গিয়ে কাহিনী নির্মানের যে কৌশল অবলম্বন করেন তাতে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই, মুসলমান আক্রমনকারীর হাত থেকে হিন্দুর ধন-প্রাণ কুল-মর্য্যাদা রক্ষা প্রভৃতি বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এতে একদিকে যেমন হিন্দু-সমাজ মুসলমানকে তাদের মহাশত্রু জ্ঞান করতে শিখেছে অন্যদিকে মুসলমান সমাজ হয়েছে বিক্ষুব্ধ, এবং পরস্পরের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে, সর্বোপরি শাসক ইংরেজের হয়েছে পরম লাভ। "ইংরেজী শিক্ষার শুরু থেকেই এদেশের ইতিহাসও ক্রমশঃ শিক্ষিত জনের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আর তখন থেকেই ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ হিন্দু এবং মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে। এই মনোভাবের সংগঠনে ইংরেজ রাষ্ট্রকর্তা এবং মিশনারিদের দানও কম নয়। একেবারে পলাশির যুগ থেকেই মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ব্যবধানটুকু জাগিয়ে তোলার সচেতন চেষ্টা করে এসেছেন দেশীয় ইংরেজ-সমাজ। তার ফলে আলোচ্য পর্য্যায়ে ইংরেজী শিক্ষিত নাগরিক বাংলার জাতি-চেতনা হিন্দু জাতিত্ব বোধের নামান্তর হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। রঙ্গলালের যুগ ভারতবর্ষের পরাধীনতার গণনা শুরু করেছে ভারতের মুসলমান আক্রমণের কাল থেকে এবং সেই পরাধীনতার গ্লানি মুক্তির আশা রঙ্গলাল এবং তার যুগ দেখতে পেয়েছে নূতন ইংরেজ অধিকার প্রবর্তনের মধ্যে।"[১] বিদেশী শাসকের 'সুচিন্তিত পরিকল্পনা' রূপায়নে সাহায্য ক'রে রঙ্গলাল হয়ত লাভবান হয়েছেন ডেপুটিগিরি পেয়ে কিন্তু দেশ বা জাতি উদ্ধারের পথকে করেছেন কণ্টকাকীর্ণ। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য রেখে গেছেন এক বিদ্বেষ

১। বাংলা সহিত্যের ইতিকথা দ্বিতীয় পর্যায়, ভূদেব চৌধুরী, পৃঃ ২৪৮

এবং ঘৃণার শিক্ষা। হেমচন্দ্রের বীরবাহু বা নবীন সেনের পলাশির যুদ্ধ কাব্য কালের ব্যবধান সত্ত্বেও ঐ একই শিক্ষা দিয়ে গেছে। "হিন্দু স্বাদেশিকতা উদ্বোধনে হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের কোন দায়িত্ব ছিলনা ভাবলেও ভুল হবে। সাম্রাজ্য-বাদী ঐতিহাসিকেরা এই সময়ে মুসলমান আমলের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত ক'রে একটি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির মূলে ইন্ধন জোগাতে থাকলেন। বাঙলার বুদ্ধিজীবিদের অনেকে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেন নি! তাঁরাও এই ইতিহাসকে পুরোপুরি সত্যি ইতিহাস ধরে নিয়ে মুসলমান বিদ্বেষ প্রচারে কলম ধরলেন। ব্যক্তিগত কুসংস্কার ও সম্প্রাদায়গত সংকীর্ণতাবুদ্ধি থেকেও যে তাঁরা এই মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার করতেন তাও অস্বীকার করা যায়না।"[১] চতুর ইংরেজ উনিশ শতকে হিন্দুকে কোলে টানার এবং মুসলমানকে দূরে ঠেলার যে নীতি অবলম্বন করেছিল, তাকে এভাবেই তাঁরা সার্থক করেছেন, হিন্দু-মুসলমানের ইতিহাসই শুধু নয় পরস্পরের সম্পর্কেও বিকৃত করতে সাহায্য করেছেন। ফল হয়েছে এই যে দেশ ও জাতির প্রত্যক্ষ শত্রু ইংরেজ পড়েছে আড়ালে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক আত্মঘাতী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। দেশে, সমাজে এবং সাহিত্যে তার প্রভাব হয়েছে দূর প্রসারী। একে অস্বীকার করতে পারলে স্বস্তি পাওয়া যায়, অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা ক'রে সান্ত্বনা সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু এ এক অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য এবং হিন্দু জাতীয় কাব্যের এক মর্মান্তিক পরিণতি। কে না জানে পদ্মিনী উপাখ্যান, বীরবাহু, পলাশির যুদ্ধ, আনন্দমঠ প্রভৃতি কাব্য এবং উপন্যাস বাঙ্গালী হিন্দুকে নব জন্ম দান করেছে। সাম্প্রদায়িকতার সুর যেখানে যত কড়া, হিন্দুর আত্ম-জাগরণের মন্ত্র সেখানে তত চওড়া।

এমনি এক বিভ্রান্ত মানসিকতা থেকেই বৃত্রসংহার এবং ত্রয়ী কাব্যের জন্ম। কাজেই মাইকেলের 'মেঘনাদবধে' যে উদাত্ত মনুষ্যত্ব বা আত্মশক্তির বিজয় ঘোষণা, এক কথায় বুদ্ধির প্রগতি—ধর্মের সংকীর্ণ সংস্কারকে অতিক্রম করেই যা সম্ভব—পুরাতন থেকে নতুনের মধ্যে প্রবেশের দিকেই যার লক্ষ, তা এঁদের কাব্যে দেখা দেয় নি ; বরং উল্টোটাই হয়েছে প্রকট।

১ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা'—নরহরি কবিরাজ, পৃঃ ১৮৬

প্রকৃত অর্থে বাঙলা মহাকাব্যের প্রথম ও শেষ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর বিপুল প্রতিভায় ও প্রাণের আবেগে তিনি মেঘনাদ বধ কাব্যের নায়ক-নায়িকার মধ্যে মানুষের অন্তর-বাহিরের সীমাহীন মহান শক্তিগুলিকে প্রকাশ ক'রেছিলেন। দেব-দেবীর প্রাধান্যে জর্জরিত বাঙলা কাব্যে মানুষের প্রচণ্ড শক্তিকে প্রত্যক্ষ করার অবকাশ তাঁর মহাকাব্যে ঘটেছিল। শুধু আদর্শ মানুষ নয়, মহত্ব ও ত্রুটিমিশ্রিত বাস্তব মানুষের মহিমা পরিস্ফুট হ'তে পেরেছে বলেই মেঘনাদ বধ কাব্য আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অবদানরূপে গণ্য হ'তে পেরেছে। মাইকেল ছিলেন বাঙ্গালীর নব প্রাণ স্পন্দনের প্রতীক। জাগরণ ও সমৃদ্ধির যুগে একটি জাতির প্রাণে পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুনকে বরণ করার যে প্রবল আগ্রহ জেগে উঠে তারই প্রকাশ মাইকেলের জীবনে ও কাব্যে। জীবনে তিনি ছিলেন যেমন বিদ্রোহী, কাব্যের ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর বিদ্রোহ সুস্পষ্ট, তা সে বিষয়বস্তুতেই হোক আর কাব্যের ছন্দ বা গঠন কৌশলেই হোক। কিন্তু তাঁরই অনুসরণকারী হেম-নবীনের কাব্যে নব মানবতা-বোধের বিকাশ তো নাই-ই বরং হিন্দু সনাতন ধর্মের গৌরব প্রচারের অক্ষম চেষ্টা দেখা যায়। দেব-দেবী, রাক্ষস-রাক্ষসীকে অবলম্বন ক'রেও মানুষের মহিমাকে কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করার মত কল্পনা শক্তি বা প্রতিভা কোনটাই হেম-নবীনের ছিল বলে মনে হয় না। বৃত্র সংহার ও ত্রয়ী কাব্য এক ধরণের ধর্মগাথা হয়েছে, মহাকাব্য হয় নি। স্বর্গচ্যুত দেবতার সঙ্গে অসুর বৃত্রের সংগ্রামের মধ্যে অলক্ষ্যে স্বাদেশিকতার বাণী থাকতে পারে কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের মত প্রবল ব্যক্তিত্বের বিজয়-ঘোষণা নেই। নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্যে Revivalism এর ভাবটাই প্রধান। ইসলামের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আঘাতে হিন্দু ধর্মে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় আমরা মধ্য যুগের বৈষ্ণব আন্দোলনে দেখেছি। একালে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘাত হিন্দু সমাজকে আর একবার বিচলিত করে তোলে। ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠা ও সংকীর্ণতা মানুষের মুক্তি বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে সামাজিক কঠোর বিধি নিষেধের দ্বারা অবদমিত করে রাখলেও বাইরের বৃহৎ জীবন, মুক্ত উদার বিচার-বুদ্ধির সংস্পর্শ হিন্দু মানসে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং তখনই চেষ্টা হয় এক দিকে সংস্কার ও অন্যদিকে প্রাচীনকে নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা জিইয়ে রাখার। আধুনিক কালে রামমোহন রায়ের সংস্কার এবং পণ্ডিত সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে হিন্দুমানস

চাঞ্চল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নবীনের সংঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধর্মের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের হাস্যকর প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথও কঠোরভাবে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর একটি ব্যঙ্গ কবিতার অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিত শির
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্ম দীক্ষা
কহেন বোঝায়ে কথাটি সোজাএ
হিন্দু ধর্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রী আর
শুধু পদার্থ তত্ত্ব।
টিকিটি যে রাখা ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগনেটিজম শক্তি।
তিলক-রেখা বৈদ্যুত ধায়
তায় জেগে ওঠে ভক্তি।[১]

নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্যে আর্য্য-অনার্য্য দ্বন্দ্বের সমাধান কল্পে এক ধর্ম, এক জাতি এক রাজ্য রূপে ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার মানসে কৃষ্ণের মহৎ পরিকল্পনা তদানীন্তন হিন্দু নবজাতীয়তাবোধেরই প্রকাশ। আর এ জাতীয়তাবোধে স্বধর্মের প্রধান্য, অন্য ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদগ্রীব হয়েছে। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যে দেবদেবীর মহিমা দেবচিত। কবি অত্যান্ত সাবধানতার সঙ্গে দেব চরিত্রকে সর্বপ্রকার দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেছেন। অসুরের শক্তিমত্তাকে তিনি অসুরিক রূপে অঙ্কিত করেছেন, তার মধ্যে কোন মানবীয় মহিমা নেই। প্রকৃত পক্ষে মেঘনাদ বধ কব্যে দেবদেবীর অবমানমা কল্পনা করে তৎকালীন হিন্দু-সমাজে যে আক্ষেপের সৃষ্টি হয়েছিল, তাহাকে দূর করার চেষ্টারূপেই বৃত্রসংহার কাব্য রচিত হয়। সমসাময়িক কালে বৃত্রসংহার কাব্যের জনপ্রিয়তার কথা আমাদের অজ্ঞাত নয়।

১—'কল্পনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'উন্নতি লক্ষণ'।

হেমচন্দ্র প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও বুদ্ধিহীন অন্ধ আবেগকে মহিমান্বিত রূপ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। নবীনসেন স্বপ্ন দেখেছেন পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার। সম্মুখের সত্যকে অস্বীকার করে পুরাতনের প্রতি তাঁদের এই মোহ, দেশের ও মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের কথা বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়াস জাতির মুক্তি এবং বিকারকে বিঘ্নিত করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কে জানে হয়ত সংকীর্ণতার এই পঙ্কিল আবর্তে বাঙালা সাহিত্য মহৎ সৃষ্টির পথ হারিয়ে ফেলত। বঙ্গ ভাষাভাষি মানুষ, হিন্দু এবং মুসলমান বিদ্বেষ এবং ঘৃণার মধ্যে আবর্তিত করতো সমগ্র সাহিত্যকে যদি না রবীন্দ্রনাথ এসে শাশ্বত মানবাত্মার চিরন্তন বাণীকে ধ্বনিত করে তুলতেন, যদি না নজরুল ইসলাম সমগ্র বাঙালী চিত্তের জাগরণকে সম্ভব করে তুলতেন।

দুই

আধুনিক যুগে বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান নগণ্য। একালে হিন্দু সাহিত্যিকদের বিকাশ যেমন বহুমুখী ও ফলপ্রসূ হয়েছে মুসলমানদের তা হয়নি। অথচ ব্রাহ্মণ্যবাদের অবজ্ঞা থেকে 'ইতরজনের ভাষা' বাঙলাকে মুসলমান রাজশক্তি শুধু রক্ষাই করেনি, বাঙলা সাহিত্যে মানবীয় ভাবধারার সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন মুসলমান কবিগণ এবং সেটা উনবিংশ নয়—ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেই। দৌলত কাজী, আলাওল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিগণের কাব্যে মানবীয় ভাবধারা ক্রমে স্পষ্ট, মধুর ও বিচিত্র রূপ লাভ করে। 'দৌলত কাজি ও তাঁহার কাব্য' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল বলেছেন: "দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া অথবা ধর্মভাবকে কেন্দ্র করিয়া কিংবা ভক্তি রসাত্মক পৌরাণিক কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা, বাংলা সাহিত্যে ইহার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিল মুসলমান কবিদের রচনায়। বঙ্গ সাহিত্যে এই যে একটানা নিছক ধর্মের সুর এতদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহা বদলাইয়া নূতন ধরনে অবিমিশ্র প্রেম-কাহিনী লইয়া কাব্য রচনার সম্মান মুসলমান কবিদের প্রাপ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।..........মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদিগকে এক নূতন সাহিত্যিক যুগের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয়না।" [১]

১। 'সাহিত্য প্রকাশিকা'—প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১

সংকীর্ণ চিন্তায় আবদ্ধ সমাজ বাঙলা কাব্যকে যখন একটি একঘেঁয়ে খাতে পরিচালিত করিয়াছিল—যার প্রধান সুর ছিল দেবদেবীর মাহিমাকীর্ত্তন এবং সেই দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে সর্বপ্রকারে অসহায় রূপে অঙ্কিত করা ঠিক সেই সময় দৌলত কাজি মানুষের যে অপরিসীম মূল্য ও মর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করেছেন তা' যেমন বিস্ময়কর তেমনি বৈপ্লবিক। রোসাঙ্গ রাজসভার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি তার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বলে নির্দেশ করেছেন মানুষকে:

নিরঞ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহান সমান॥
নর বিনে চিন নাই কেতাব কোরাণ।
নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান॥
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাই ঠাকুর কিঙ্কর।
তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল।
নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল॥[১]

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগে সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে মুসলমানগণের যে উন্নত দৃষ্টি বর্তমান ছিল, জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল,—কানান্নাসো উম্মাতান্ ওয়াহেদাতান্—সকল মানুষ একজাতি বলে যে মহামিলনের বাণী তাঁরা শুনিয়েছিলেন তারই এক ধরনের বিকাশ এ কালের বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য দান করেছিল। গাথা কাব্যের (ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি) মধ্যে তো 'মাটির কাছাকাছি' কবির গানই ধ্বনিত হয়েছে। 'নির্বাক মনের' এবং অবজ্ঞাত জীবনের মহিমান্বিত রূপ অঙ্কিত হয়েছে এসব 'অখ্যাত জনের' কবির কাব্যে। এ সম্পর্কে হুমায়ুন কবীরের উক্তিটি স্মরণযোগ্য "মোসলেম প্রভাবের সবচেয়ে বড় অবদান পল্লী কবিতার ক্ষেত্রে। ইসলামের মধ্যে যে বিপ্লবী সাম্যবাদ নিহিত ছিল, তাতে কেবল অবিনশ্বর থেকে নশ্বরের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে টানেনি, মানুষের সমাজেও রাজসভা ও অভিজাতের সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ সুখের মধ্যে কাব্যের উপাদান খুঁজেছে।"[২] এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামে বাস্তব ও বিপ্লবী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ যে মুসলমান মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যে

১। 'সাহিত্য প্রকাশিকা'—১ম খণ্ড (সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী) বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৮
২। বাঙলার কাব্য—হুমায়ুন কবীর।

অবিস্মরণীয় পরিবর্তন আনলো, তাদের প্রতিভা আধুনিক কালে এমন বন্ধ্যা হল কি ক'রে, কেনই বা তাদের সৃষ্টি হল পঙ্গু। এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে উনিশ শতকের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে।

ইংরেজ এদেশের মুসলমানদের হাত থেকে ছলে বলে কৌশলে রাজশক্তি লাভ করেছিল। মুসলমান সমাজ নতুন রাজশক্তিকে সুনজরে তো দেখেইনি বরং দীর্ঘদিন নানা ভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। রাজশক্তি কতকটা নিজের গরজে, কতকটা মুসলমানদের দুর্বল ও নির্বিষ করার উদ্দেশ্যে এমন কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করে যা মুসলমানদের আর্থিক ব্যবস্থাকে বিপর্য্যস্ত ও জীবিকার অবলম্বনগুলোকে নির্মূল করে দেয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজভাষা পারসীকে অপসৃত করে ইংরেজী প্রবর্তন একদিকে বিত্তবান মুসলমানদের নিঃস্ব, অন্যদিকে মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো এবং চাকুরী-নির্ভর মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংস সাধন করে। দূর দেশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশের মানুষের সমর্থন ছাড়া নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেনা। মুসলমান সমাজের সমর্থন তো দূরের কথা, শত্রুতাই ছিল প্রবল। কাজেই হিন্দু সমাজকে সুখ সুবিধা দিয়ে তাদের আকৃষ্ট করা ছিল ইংরেজ শাসকের তখনকার একটি বিশেষ কাজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বানিজ্যে সহযোগিতা ক'রে এবং নতুন ভূমি-ব্যবস্থার শরিক হয়ে হিন্দু সমাজে একটি স্থিতিশীল বিত্তবান শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তাঁরা ইংরেজ সৃষ্ট শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেন নতুন সমাজ আর এই সমাজ থেকে উদ্ভূত হয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ইংরেজীর মারফতে সমৃদ্ধিশালী পশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও বাস্তব চেতনার বিকাশ সাধন করে। মধ্যবিত্ত সমাজ চিরকালই সুবিধাবাদী এবং স্বার্থসচেতন। কাজেই উদীয়মান হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিগণ তাঁদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শাসককে সাহায্য করতে গিয়েই মুসলমানদের আহত করেছেন, সিপাহী বিদ্রোহের মত ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামকে অবজ্ঞা ক'রে ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন এ সবই সত্য কিন্তু একমাত্র সত্য নয়। বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সূচনাও করেছেন এঁরাই। কবি সমাজেরই অবদান এবং সম্ভবতঃ মহত্তম অবদান। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন মনীষী বাঙলা দেশে সংস্কার-মুক্ত মানবতার

প্রতিষ্ঠা কল্পে যে আন্দোলনের সূচনা করেন তার অনেকখানি প্রেরণা পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত হলেও বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব বিকাশকে সম্ভব করেছে। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজে একদিকে যেমন সুস্থ জীবনবোধ ও সবল দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেছেন তেমনি বিভিন্ন পত্রিকা ও সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য সৃষ্টির যথার্থ অবকাশ রচনা করেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ' পর্যন্ত সাহিত্যিক ও সমালোচকগণের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করলেই এ কথার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। 'প্রতিভাবান দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া' তুলেন বটে কিন্তু তিনি স্বয়ম্ভু নন, তাঁর উন্নতি ও বিকাশ অনেকটাই সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভরশীল। মুসলমান সাহিত্যিকগণের সাহিত্য পড়তে গিয়ে একথা বারবার মনে পড়ে।

বিদেশী শাসকের সঙ্গে সংঘর্ষে মুসলমান সমাজ বারবার পরাজিত হয়েছে। স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা নিয়ে তারা একটার পর একটা আত্মঘাতী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের শুধু ক্ষতবিক্ষতই করেনি পর্যুদস্ত করেছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন সেদিনের মুসলমান বলদৃপ্ত ইংরেজের শক্তি সীমাকে পর্য্যন্ত পরিমাপ করতে পারেনি। একটা অন্ধ অভিমানে ইতিহাসের অনিবার্য্য গতিকে রুদ্ধ করতে গিয়ে নিজদের অদৃষ্টকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। ওহাবী এবং ফারাজী অন্দোলনের পেছনে যে উদগ্র স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি বিদ্যমান ছিল এবং এসব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শত সহস্র মানুষ যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা চিরকাল মানুষের শ্রদ্ধার সম্পদ হয়ে থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একে সামন্ততন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন মনে করলে ভুল করা হবে। এ সব ছিল ব্যাপক গণজাগরণ এবং গণসংগঠনের আন্দোলন। ফারাজী আন্দোলনকে তো অনেকটা অর্থনৈতিক আন্দোলনই বলা যায়। অবশ্য এসবের প্রেরণা ছিল ধর্মীয় এবং আন্দোলনের নেতাদের মনে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও হয়ত ছিল। আসলে এ সব সংগ্রামের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এগুলো একদিকে যেমন অবৈজ্ঞানিক অন্যদিকে তেমনি যুগধর্মের বিরুদ্ধে। সমগ্রভাবে মুসলমান সমাজ এসব আন্দোলনের দ্বারা লাভবান না হয়ে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপর্য্যস্ত ও দিশেহারা সমাজকে যুগচেতনায় উদ্বুদ্ধ ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সজাগ ক'রে আধুনিক

জ্ঞানবিজ্ঞানের পথে পরিচালিত করার মত নেতৃত্বের অভাব বাঙলার মুসলমান সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টি করতে পারেনি। রাজশক্তি থেকে আরম্ভ করে পত্রিকা সমিতি কোনটারই আনুকূল্য সেদিন মুসলমানদের পক্ষে সুলভ ছিলনা।

১৮৬৩ সালের দিকে নবাব আবছুল লতিফের নেতৃত্বে 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' স্থাপিত হয় এবং সৈয়দ আমীর হোসেন প্রমুখ নেতারা মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকেন। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয় এবং ঢাকা, কোলকাতা প্রভৃতি শহর থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও তাঁরা প্রকাশ করেন। আবার ঠিক এই সময়েই খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচার মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উদীয়মান মুসলমান সমাজ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। বিভিন্ন শহরে আঞ্জুমান ও মিশনারী গড়ে উঠতে থাকে। এ সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সেদিনের বহু তরুণ সাহিত্যিক, সমাজকর্মী ও বক্তাগণ। এঁদের মধ্যে শেখ ফজলল করিম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতি কবি সাহিত্যিকরাও ছিলেন।

হিন্দু কবিদের মধ্যে যে আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-মর্যাদাবোধ দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি, মুসলমান কবিদের মধ্যে তা দেখা দিল উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়া থেকে তাঁরা জাতীয় আখ্যান-কাব্য রচনা শুরু করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যানে যে ধারার সূচনা হয়েছিল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীন সেনের হাতে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য এর জের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত চলেছে (যোগীন্দ্রনাথ বসুর পৃথ্বিরাজ কাব্য ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে)। মহাকাব্যের ঢং-এ জাতীয়-কাব্য রচনার আসরে আবির্ভূত হয়ে মুসলমান কবিরা দেখলেন হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনায় তাঁদের ইতিহাস কলঙ্কিত, খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা তাঁদের ধর্ম বিপন্ন, হিন্দু মধ্যবিত্তের দ্বারা তাদের জীবিকার পথ অবরুদ্ধ এবং ধর্মান্ধ অভিজাত মুসলমানদের দ্বারা বাঙলা সাহিত্য চর্চা বিঘ্নিত। সমস্যা সঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে তাঁরা যে সব রচনা করলেন তা একারণেই স্বস্তিহীন এবং কিছু বেশী পরিমানে প্রচার ধর্মী হয়ে পড়লো। হিন্দু কবিদের দ্বারা

প্রবর্তিত রীতিকে অনুসরণ করে তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। এ সব কাব্যের মূল কথা মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করা, তাদের মধ্যে ধর্মবোধ, দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধ উজ্জীবিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানী ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙ্‌লা সাহিত্য সৃষ্টি করা। বাঙ্‌লা ভাষা সাহিত্য চর্চার প্রতি মুসলমানদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করাও এঁদের একটা মস্ত বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সে কর্তব্য পালনের জন্য প্রথমেই দরকার হয় হিন্দু সাহিত্যিকদের আঘাত থেকে নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। তাঁরা যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রকে বিকৃত করেছিলেন তাদের প্রকৃত স্বরূপ যে গৌরবময় সে কথা প্রতিপন্ন করা। তথাকথিত মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় বাঙ্‌লা ভাষা চর্চার বিরুদ্ধে যে সব যুক্তির অবতারণা করতেন তার মধ্যে প্রধান ছিল হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম কুৎসাপূর্ণ সাহিত্যের নিদর্শন। এ সব মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে তদানীন্তন মুসলমান সাহিত্যিকদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা কিছু বেশী পরিমাণেই করতে হয়েছে। সাহিত্যে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর বদলে ইসলামী কথা কাহিনী প্রবর্তন এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবী, পারসী শব্দ ব্যবহারের চেষ্টাও তাঁরা করেছেন। হিন্দু সাহিত্যিকগণ একালে মুসলমানদের কতটা বিক্ষুব্ধ করেছিলেন তার পরিচয় মুসলিম সাহিত্য পত্রগুলোতে পাওয়া যায়। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৩০৭ সালে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মুসলমানদের বাঙলা শিক্ষা সম্পর্কে The Vernacular Education in Bengal নামে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষের সমালোচনা করেন। প্রবন্ধটি তখনকার দিনে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং রবীন্দ্রনাথ সহ অনেকেই তার উপর আলোচনা করেন। ১৩১০ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে ইমদাদুল হক সাহেব ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেন : "বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যে যোগদান করেন না বলিয়া হিন্দুগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলুন দেখি, মুসলমানরা বাঙ্‌লা সাহিত্য পড়িবে—কেবল গালি খাইবার জন্য ?"

গালি না খেয়েও মুসলমানরা বাঙালা সাহিত্য যাতে পড়তে পারে তারই চেষ্টা একালের মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণ করেছেন। ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে

প্রকাশিত পরিত্রাণ কাব্যের 'অবতরণিকায়' শেখ ফজলল করিম তাঁর কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে বলেছেন যে 'প্রেমে-পুণ্যে-সঞ্জীবিত সত্য ধর্মের উজ্জ্বল কাহিনী', 'ধর্মভীরু পাঠকের হৃদয়ে সজীব ধর্ম্মভাব উদ্দীপন' করতে পারবে এই ভরসাতে তিনি উক্ত কাব্য রচনা করেছেন। ১৩১১ সালে প্রকাশিত কাশেম বধ কাব্যের ভূমিকায় হামিদ আলী তাঁর কাব্যরচনার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের বিশেষ একটি সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভূমিকার প্রথমেই কবি লিখেছেন: "১৩১০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণের "মিহির ও সুধাকরে" বাবু দিনেশচন্দ্র সেনের "মাতৃভাষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন;—মুসলমান, হিন্দু সাহিত্য পাঠে,—হিন্দু আচার-ব্যবহার শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে, তাই বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় মুসলমানদের উচিত নহে।

"১৩১০ সালের ভারতীতে মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মহোদয়ের "মুসলমান ছাত্রের বাঙালা শিক্ষা" নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন: "মুসলমান গ্লানিপূর্ণ বলে আমরা আপন সাহিত্য বর্জ্জন করিতে পারিনা·········পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সময়ে মুসলমান ছাত্রের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার, মুসলমান গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহ দেওয়ার সময় আসিয়াছে।······তাই মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া লওয়া উচিৎ।"

"প্রকৃতপক্ষে মহানুভব হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মুসলমান পাঠক—মুসলমান বালক, চিরকাল তাহাদের গ্লানিপূর্ণ পুস্তক পাঠে ব্যথিত হওক, আর মনে মনে গ্রন্থকারদিগের আত্মার প্রতি অভিসম্পাত করুক। তাই তাঁহারা আমাদিগকে স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িতে পরামর্শ দিতেছেন।

"আমার এই কাব্য প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য মুসলমান (graduate) দিগকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান—পুস্তক প্রণয়নের দিকে পথ প্রদর্শন ও সে বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। নতুবা আমার মত দীনের কাব্য প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।"[১]

১। 'কাসেম বধ' কাব্য—হামিদ আলী, ভূমিকা, পৃঃ ৶০—।০।

১৩১৪ সালে কবির 'জয়নলোদ্ধার কাব্য' নামে আর একখানা কাব্য প্রকাশিত হয়। ঐ কাব্যের ভূমিকাতেও তিনি বলেছেন : "যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আমি বঙ্গ সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার কিঞ্চিত আভাস 'কাসেম বধ' কাব্যের ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। 'কাসেম বধে'র ভূমিকায় আমার বক্তব্য যাহা, জয়নলোদ্ধারের ভূমিকায়ও উহা প্রায় তাহাই।"[১]

কবির ভূমিকা পড়ে মনে হয় তখনকার দিনে মুসলমান সমাজের সামনে নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি করাই ছিল একটা বড় সমস্যা। কারণ হিন্দু সাহিত্যিকগণের সৃষ্টিতে তাঁদের নিজস্ব ধ্যান-ধারনারই প্রতিফলন ঘটেছিল। সে সাহিত্যের ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ধর্ম, পুরাণ ও সমাজকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছিল। মুসলমানরা তার মধ্যে না পেতেন নিজের ধর্মকে, না পেতেন নিজের সমাজ বা ধ্যান-ধারণাকে। উপরন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের ইতিহাসকে দেখতেন বিকৃত ও কদর্যরূপে। ফলে তাঁরা তখন সাহিত্যে এক ধরনের নিজস্ব পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেছেন যার অভিব্যক্তি হয়েছে মুসলমানী কথা, কাহিনী এবং ইতিহাস কেন্দ্র করে রচিত কাব্য, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতিতে। জাতীয় আখ্যান-কাব্যগুলোতে এ প্রয়াসের স্বাক্ষর সবচেয়ে বেশী করে দেখা যায়।

রঙ্গলালের কাব্যে বাঙ্গালীর যে জাতীয়তাবোধ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে স্বসমাজ ও স্বধর্মের কথাই ছিল প্রধান এবং এ প্রধান্য পরবর্তী প্রত্যেক হিন্দু কবির কাব্যেই দেখা দিয়েছিল। কাজেই এই কাব্যধারায় তদানীন্তন হিন্দু মানসেরই প্রতিফলন দেখতে পাই। মুসলমান সমাজের বা মুসলিম মানসের পরিচয় পেতে হলে আমাদের সে সময়ের মুসলমান কবিগণের কাব্যেই তা সন্ধান করতে হবে। মুসলমান কবি-রচিত তথাকথিত মহাকাব্যগুলো অনুধাবন করলে দেখা যায় হিন্দু কবিদের মত তাঁরাও জাতির অতীত গৌরব ও বলবীর্য্য অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। কায়কোবাদ তাঁর মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন : "আমি বহুদিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্য্যবীর্য্য সংবলিত এমন একটি যুদ্ধ-কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে এক সময়ে

১। জয়নলোদ্ধার কাব্য—হামিদ আলী, ভূমিকা, পৃঃ ৴৹

ভারতীয় মুসলমানগণ অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন, শৌর্য্যে বীর্য্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না; তাই তাঁহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ যেখানে যে কীর্ত্তিটুকু, যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি তাহাই কবি-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাঁহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। একথা স্থির নিশ্চয় যে আজই হউক কি দুইশত বৎসর পরেই হউক, বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে যখন বাঙ্গালা ভাষার বহুল প্রচার আরম্ভ হইবে, তখন তাঁহারা এই "মহাশ্মশান" পাঠ করিয়া অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে পাণিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধ তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষদের অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যের শেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।"[১]

রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবির কাব্য যেমন বিশেষ ক'রে হিন্দু বাঙালীর জন্য কায়কোবাদের কাব্যও তেমনি বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের জন্য। কবি জানতেন: "আমাদের দেশের সমালোচক ও সম্পাদকদের মধ্যে এরূপ অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা স্বার্থের বশীভূত হইয়া ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল বলিয়া থাকেন, এবং মুসলমান প্রণীত কোন কাব্যের সমালোচনা করা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ কাব্যখানা পাঠ করিতেও তাঁহারা অপমান বোধ করেন।"[২]

১৮৯৮ থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত 'মহাশিক্ষা' কাব্যের বন্দনায়, কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছেন:

"শিক্ষা দিতে নরকুলে অপূর্ব শিক্ষায়
বীরেন্দ্র কুল-কেশরী রাজর্ষি হোসেন—
মহানবী মোস্তফার নন্দিনী নন্দন
বীরেশ কুলের ত্রাস আলীর অঙ্গজ
অনন্ত কল্যাণ-প্রসূ প্রজাতন্ত্র প্রথা
ধর্ম্মের মর্যাদা আর স্বাধীনতা হেতু;
দেখাইলা যেই দৃশ্য, যেই আত্মত্যাগ
যে ভীষণ বীর ধর্ম্ম, কঠোর প্রতিজ্ঞা
সত্যে অবিচল নিষ্ঠা ন্যায়ের গৌরব
বিশ্বাসের দীপ্ত তেজ: অতুল সাধনা
অক্লান্ত অসীম ধৈর্য্য তীব্র উন্মাদনা
অতুল অক্ষয় তাহা কবীন্দ্রকুলের
চির অভিরাম ধন।"

অক্ষয় বীর্য্য এবং অপূর্ব আত্মত্যাগের মহিমা কীর্তন করে কবি মানুষকে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন।

১। মহাশ্মশান কাব্য (২য় সংস্করণ)—কায়কোবাদ, ভূমিকা, পৃঃ ১/০—১৵০
২। ঐ (১ম সংস্করণ) ভূমিকা, পৃঃ ॥৵০

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'স্পেন বিজয় কাব্যে' 'ইতিহাস উদ্যানের ঘটনাকুসুম' ভাবের সূত্রে গ্রথিত করতে গিয়ে বন্দনা অংশে সিরাজী বলেছেন ঃ

"গাব সে অতীত কথা, গৌরব কাহিনী
নাচাইতে মোস্লেমের নিস্পন্দ ধমনী।
যার সে দুর্জ্জয়-বীর্য দীপ্ত উন্মাদনা
কৃপা করি অগ্নিময় কর এ রসনা।"

কবির একান্ত কামনা ঃ

"গৌরব কাহিনী-গাথা করুক স্মরণ
গঠিত করুক সবে জাতীয় জীবন।
উঠুক গগনে পুনঃ সৌভাগ্য চন্দ্রমা
মোহিত করুক বিশ্ব ইস্লাম-সুষমা।"

ইতিহাসের গৌরবপূর্ণ কাহিনী স্মরণ করে বাঙলার মুসলমান তাদের জাতীয় জীবন গঠন করুক এবং 'ইস্লাম-সুষমা'য় বিশ্বকে মোহিত করুক এই ছিল কবির জাতীয় আখ্যান-কাব্য রচনার মূল উদ্দেশ্য।

ইতিহাসের অন্তর্গত বীরত্বকেই শুধু নয় তার অন্তর্নিহিত কারুণ্য এবং বেদনাকেও মুসলমান কবি দরদ দিয়ে রূপায়িত করেছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "কারবালা" কাব্যের প্রথম সর্গে কবি আবদুল বারি তাঁর অন্তরের কামনাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

হিন্দু, মুসলমান শুনুক সকলে,
"কারবালার" এই বিষাদ-গান!
আমার ক্রন্দনে শিখুন সকলে
কাঁদিতে বিপন্ন নরের দুঃখে,
হলে বিশ্বপ্রেমে দীক্ষিত বাঙ্গালী,
হবে মৃত্যু মোর পরম সুখে।

কারবালার বিষাদ গান শুনিয়ে বাঙ্গালীকে বিশ্বপ্রেমে দীক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধির কাজেও কবি আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছেন ঃ

"ওহে রঙ্গময়ী মাতৃভাষা মোর!
কর দীনে এই আশীষ দান;
করিতে বর্দ্ধন তোমার গৌরব,
পারি যেন আমি সঁপিতে প্রাণ।"

শুধু ভাব] বা বিষয়বস্তুর দিক দিয়েই নয়, কাব্যের ভাষায় মুসলমান কবিরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। কারবালা কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন ঃ "বর্তমান গ্রন্থে, মুসলমানগণের সমাজে ও পরিবারে নিত্য কথিত, কতিপয় আরবী, পারশী শব্দ] প্রয়োগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। বঙ্গীয়

পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের কিয়দংশ আহারে, বিহারে যে সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করিয়া মনোভাব পরিব্যক্ত করেন, তাঁহাদের মাতৃভাষায় সম্ভবমতে ঐ পদগুলি ক্রমশঃ আসনলাভ করিতে পারিলে তাঁহারা স্বভাবতই মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবেন, প্রধানতঃ এই যুক্তির পরে নির্ভর করিয়াই আমি স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের বঙ্গ মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি আকর্ষণ মানসে, 'কারবালা'য় সেরূপ কতকগুলি বৈদেশিক পদ প্রয়োগে সাহসী হইয়াছি।"[১]

'বঙ্গ মাতৃভাষার' ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে মুসলমান সাহিত্যিকগণ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। মীর মশাররফ 'মুসলমানের বাংলা শিক্ষা' বই লিখে জলকে পানি, আকাশকে আসমান বলতে শিখিয়েছেন। তবু সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তাঁরা যে বঙ্কিম-মাইকেলের ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার কারণ তাঁদের প্রতিভার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই তাঁরা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করে তাঁদের সাহিত্যকে কিম্ভূতকিমাকার করে তুলেন নি।

ইসলামী কাহিনী অবলম্বনে আদি মানব-মানবীর সৃষ্টি রহস্য এবং মানুষের আত্মার মুক্তি-সন্ধান করেছেন শেখ হবিবর রহমান, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কোহিনুর কাব্যে ঃ

"কি হেতু এসেছে নর সংসার আবাসে পশিবে সে কি প্রকারে তার গম্য দেশে—
কি লক্ষ্য সম্মুখে তার, কোন পথ ধরি গৌরব সম্মান সহ হয়ে রিপুদমী।"

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মুসলমান কবিগণ জাতির চিত্তকে জাগ্রত করার জন্য আখ্যান-কাব্যগুলোতে যে রীতি ও প্রেরণা অবলম্বন করেছিলেন তা হিন্দু কবিদের দ্বারা প্রবর্তিত ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কাহিনী-রচনার রীতি এবং হিন্দু বীরদের মত মুসলমান বীরপুরুষদের শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রেরণা মহাশ্মশান কাব্যের আদর্শ চরিত্র আমেদ আবদালী শাহা ভারতীয় মুসলমানদের, ঐতিহাসিক বীর জোবের বিন আওয়াম, ফজল বিন আব্বাস, ওকবা প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছে ঃ

১। 'কারবালা' —আবদুল বারি — 'গ্রন্থকারের নিবেদন' পৃঃ ৵০

'স্মর সেই পূর্ব বীর্য, 'দীন দীন' রবে
আবার কাঁপাও বিশ্ব, উড়াও গগনে
ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা সুন্দর।"

বলা বাহুল্য, তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানের কাছে কবি কায়কোবাদের আকুল আহ্বানই 'আমেদ আব্দালী শাহার' কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, যেমন হয়েছে রঙ্গলাল হেমচন্দ্র প্রমুখ কবির কণ্ঠে হিন্দু জাতির উদ্দেশ্যে জাগরণের আহ্বান। কিন্তু হিন্দু কবিদের সঙ্গে মুসলমান কবিদের একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। মুসলমান কবিদের স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির প্রকাশে সাম্প্রাদায়িকতার উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়না। স্বার্থবুদ্ধির যে তাড়না হিন্দু কবিদের দায়িত্বহীন ও সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী করেছিল তা মুসলমান কবিদের চিত্তে ছায়াপাত করেনি। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানের নায়ক স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর দেশবাসীকে যে ডাক দিয়েছেন তার শেষ কথা ঃ

যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে
চিতোর না পাই।"

হেমচন্দ্র স্বজাতিকে জাগরণের আহ্বান দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"পাষণ্ড যবন দল বল আর কতকাল
নিদয়, নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।"

পলাশির যুদ্ধে নবীনসেন ইংরেজের জয়ে বাংলা দেশের পরাধীনতার সূচনা মনে করেননি, তিনি বলেছেন :

যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে।'

কিন্তু কায়কোবাদের কণ্ঠে ঝংকৃত হয়েছে ঐক্যের মিলনের মহাবানী ঃ

"এস ভাই এস হিন্দু মুসলমান আমরা দুভাই ভারত সন্তান
এক স্বরে আজ গাহিব এ গান ঃ দুঃখিনী ভারত যাদের মাতা।"

হিন্দু সাহিত্যিকদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষের একটি বিশেষ কারণ অনুমান করা যেতে পারে। মুসলমানদের ইতিহাস একটি বিশেষ দেশে আবদ্ধ নয়, তার ইতিহাস মিশরে-স্পেনে, পারস্যে তুরস্কে বিস্তৃত কিন্তু,

হিন্দুর ইতিহাস একমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ। হিন্দু ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখেছে মেবারের পতন, রাজপুতের সংগ্রাম, মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র অভ্যুত্থান যার মূলকথা মুসলমান শাসকের সঙ্গে সংঘর্ষ। আসলে অবশ্য এগুলো স্বাধীনতার সংগ্রাম নয় বরং এসবকে সামন্ত প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দু সাহিত্যিকগণ জাতীয় ইতিহাসের গৌরব সন্ধান করলেন ঐ সব সংঘর্ষের মধ্যে। তাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে বুঝেছিলেন হিন্দু জাতির ইতিহাস, হিন্দু মুসলমানের আবাস-ভূমির ইতিহাস নয়। সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি পাক-ভারত উপমহাদেশে একদিন আর্য্যেরা এসেছিল বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে, তাদের রথচক্রে পিষ্ট হয়েছিল তথাকথিত অনার্য্য অসভ্যতা যার নিদর্শন আজ পাওয়া যাচ্ছে মহেনজোদারো বা হরপ্পার ধ্বংসাবশেষে। তারপর শক এসেছে, হুন এসেছে, পাঠান এসেছে, মোগল এসেছে। সবাই ভারতবাসী ব'লে স্বীকৃত হয়েছে কেবল পাঠান-মোগল অর্থাৎ মুসলমানরা থেকে গেছে বিদেশী 'পাষণ্ড যবন দল' হয়ে!

দেশের বৃহত্তর কল্যান চিন্তা করে হিন্দু কবিগণ বিদ্বেষ এবং ঘৃণার পথকে পরিহার করতে পারতেন এবং শিল্পী-সুলভ শালীনতা ও উদারতা প্রদর্শন করতে পারতেন যেমনটি কায়কোবাদকে করতে দেখা যায়। 'মহাশ্মশান' কাব্যের ঘটনা প্রধানতঃ হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ কিন্তু কবি তাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে অঙ্কিত করেছেন। কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছেনঃ "আমার এ কাব্যে আমি কোন সম্প্রদায়ের লোককেই আক্রমণ করি নাই, হিন্দু লেখকগণ যেমন মুসলমানদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া পিয়ন-চাপরাশী, কুলি-মজুর রূপে রঙ্গমঞ্চে আনায়ন করিয়া বাহ্‌বা লইয়াছেন! ভুরু চাচা, নেড়ে মামা ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে অপ্যায়িত করিয়া মনের ক্ষোভ মিঠাইয়াছেন, আমি হিন্দুদিগের প্রতি তেমন ব্যবহার করি নাই,······যদি মুসলমান ভ্রাতৃগণ বলেন যে এই কাব্যে হিন্দুদের চিত্র এত উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করা মুসলমান লেখকের উচিত হয় নাই, হিন্দু মহারথীগণ যে নীতির অনুসরণ করিয়া মুসলমানদের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, মুসলমান লেখকেরও সেই নীতির অনুসরণ করিয়া লিখিলে এই কাব্যের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিকতা অনেক পরিমানে কমিয়া যাইত, এবং পক্ষপাতিত্বের ঘৃণণীয় কলঙ্ক কালিমায় ইহা কলুষিত হইয়া পড়িত।"[১]

১। মহাশ্মশান কাব্য—কায়কোবাদ, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ৷৵—৸/০

হিন্দু কবিরাও তাঁদের কাব্য 'পক্ষপাতিত্বের ঘৃণনীয় কলঙ্ক-কালিমা' থেকে মুক্ত রাখতে পারতেন কিন্তু কোন্ বিশেষ স্বার্থে তাঁরা তা পারেন নি সে কথা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবু যে কথাটি ভেবে আশ্চর্য্য লাগে তা হচ্ছে এই : শাসককে সাহায্য ও সহযোগিতা করার যে তাগিদ থেকে হিন্দু-সাহিত্যিকরা সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেছিলেন সে তাগিদ বিশ শতকের গোড়ায় উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্তের কাছে বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল। আমরা সবাই জানি, একালে হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে শাসকের সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং উনিশ শতকের গোড়া থেকে ইংরেজ হিন্দুর ক্ষেত্রে যা করেছিল বিশ শতকে মুসলমানের ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, শাসকের ভেদনীতিকে সার্থক করার জন্য মুসলমান সহিত্যিকগণ লেখনী ধারণ করেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বাণী তাঁরা শুনিয়েছেন তার মধ্যে দ্বিধা নেই বা পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নেই। কবির কণ্ঠ কোথাও বিদ্বেষের দ্বারা বিষাক্ত, লোভের দ্বারা কম্পিত বা ভয়ের দ্বারা কুণ্ঠিত নয় ; সে কণ্ঠ উদার, প্রদীপ্ত এবং নির্ভীক।

তিন

মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্যগুলো অধিকাংশই এখন বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। ইচ্ছে থাকলেও আগ্রহী পাঠক এগুলো পড়ার সুযোগ পাননা। দুঃখের বিষয় 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান এ সব কবি-কর্মকে রক্ষা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেননি। অথচ কাব্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে নিছক সমালোচনা অর্থহীন ফাঁকা কথা মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই আমি যেসব কাব্য অবলম্বন করে সে কালের মুসলিম কবি-মানসকে বুঝতে চেয়েছি এখন সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে, তাঁরা আখ্যান-কাব্যগুলোকে যে মহাকাব্যের রূপদান করতে চেয়েছিলেন তার প্রকৃতি এবং কোন্ ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা মহাকাব্যের প্যাটার্নকে অনুসরণ করেছিলেন তা উপলব্ধি করা দরকার।

বর্তমান সভ্যতা মানুষের জীবনে কতটা অভিশাপ এবং কতটা আশীর্বাদ তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে। লালসা এবং বাসনাপূর্ণ মরীচিকার

মধ্যে মানুষের অস্থিরতা লক্ষ্য করে একালের কবি আক্ষেপ করেছেন—'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'। আধুনিক কালের জটিল জীবন এবং জটিলতর মানবমন মহাকাব্যের মুক্ত পরিসরকে নিঃসন্দেহে ব্যাহত করেছে। বিস্তৃত অবকাশের মধ্যে সৃষ্ট ও উপভোগ্য মহাকাব্য শুধু যে আজকের দিনে আর রচিত হচ্ছে না তাই নয়, লোকে পুরানো মহাকাব্য পড়তে চায়না পড়ার অবকাশ এবং ধৈর্য্য নেই। শিল্পীর শিল্প-কর্ম যুগদৃষ্টিকে অতিক্রম করলেও পাঠকের দিকে নজর তাকে কম রাখতে হয়না। এজন্যই মহাকাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দুঃখ করেছেন—"সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে।" বহু শতাব্দীর স্মৃতিকে বহন করে যে পিরামিড উচ্চতায় এবং পরিধিতে আজও তার সুবিপুল মহিমায় সমুন্নত তার দিকে আজকের মানুষ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীতের কথা স্মরণ করে, কিন্তু নতুন পিরামিড গড়ে তোলার কল্পনা করেনা। বর্তমানের মানুষ বিশালের চেয়ে বিশেষের মধ্যে, বিস্তৃতির চেয়ে নৈপুণ্যের মধ্যে আপন শক্তিকে প্রকাশ করতে চায়। একলক্ষ শ্লোকের মহাভারত বা ষাটহাজার শ্লোকের শাহানামা রচনার কথা এখনকার কবি ভাবতে পারেন না।

প্রত্যেক দেশে মানব সভ্যতার প্রাথমিক স্তর থেকেই গাথা জাতীয় কাব্য লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। একদিকে মানব-মানবীর হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে প্রেমগাথা, অন্যদিকে গোত্রের বীরপুরুষের বীরত্বকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বীরগাথা। এই গাথা জাতীয় কাব্যের সাধারণ ধর্ম একটা বিশেষ অঞ্চলের মানব সমাজের সাধারণ ভাব কল্পনাকে রূপদান করা। ফলে গাথা কাব্যে ব্যক্তিনিষ্ঠ কল্পনার চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়। প্রকৃতি ও বিরুদ্ধ মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করার প্রয়োজন প্রত্যেক জাতির জীবনেই কোন না কোন সময়ে অনুভূত হয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্ম সম্প্রসারণই হচ্ছে মানব জাতির যুদ্ধ বিগ্রহের মূল উদ্দেশ্যে। আদিম গুহাবাসী মানুষ যেদিন থেকে দলবদ্ধ জীবন যাপন আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকেই স্বধর্মীর সঙ্গে তার সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এক গোত্র অধিকতর দুর্বল গোত্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে জীবনধারণের উপাদানগুলো, নিজের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। দুর্বলকে করতে হয়েছে আত্মরক্ষা। সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ।

এ সব যুদ্ধে নিজের গোত্রের বীরগণের বীরত্বমূলক গাথা তদানীন্তন কবিরা গেয়েছেন এবং কালক্রমে সেগুলো দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর এককালে প্রতিভাবান এক বা একাধিক কবি বিচ্ছিন্ন আখ্যানগুলোকে একটি সুসংহত রূপদান করেছেন মহাকাব্যের মধ্যে। এজন্য জাত মহাকাব্যগুলোতে (Epic of growth) বীর রসের বিপুল সমাবেশ থাকে। এ সব প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যে এক একটি দেশের এবং জাতির বহুকাল সঞ্চিত চিন্তা-ভাবনা ও জীবনাদর্শের পরিচয় বিদ্যমান থাকে। পিতার প্রতি ভক্তি, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রভুর প্রতি আনুগত্য, ভ্রাতার প্রতি স্নেহ, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রভৃতি মানব-চিত্তের মহৎ বৃত্তিগুলির আদর্শরূপ মহাকাব্যে প্রতিফলিত দেখা যায়। জাতীয় কবির মনোরাজ্যে যে রামের জন্ম হয় তার চরিত্রে জাতির জীবনাদর্শ রূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> "কবি, তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

রামায়ণের রাম অযোধ্যার নয়, জাতিরই মানসপুত্র।

জাত মহাকাব্য দেশের মানুষের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয় এবং তাদের আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। পাক-ভারত উপমহাদেশে রামায়ণ, মহাভারত ও শাহনামার কাহিনীগুলো মানুষের অবকাশকে কল্পনার সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করে রেখেছে বহুকাল থেকে। শাহনামা যদিও পারশ্য কবির রচনা তথাপি দীর্ঘ কয়েকশ' বছর এদেশে মুসলমান শাসনের প্রভাবে পারসী সাহিত্যের সঙ্গে দেশের মানুষের পরিচয় ঘটেছে ঘনিষ্ঠভাবে। পারশ্য সাহিত্যের বিভিন্ন আখ্যান ও ভাবধারাকে অবলম্বন করে এদেশের সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েছে।

লোকমুখে প্রচলিত বীরত্বব্যঞ্জক গল্পগুলোকে অবলম্বন করে মহাকাব্য গড়ে ওঠে। এজন্য মহাকাব্যে বিস্ময় ও রোমাঞ্চ সৃষ্টিকারী অতিপ্রাকৃত ঘটনার বাহুল্য দেখা যায়। জাত মহাকাব্যগুলোর কাহিনী বিস্তৃত, চিন্তা ও কল্পনা ব্যাপক ও প্রসারিত এবং এগুলো বহুর সৃষ্টি। একদিক দিয়ে আমরা এ সব মহাকাব্যকে দেশের সাহিত্যের ভাণ্ডার বলতে পারি। অসংখ্য চিত্রপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ এ জাতীয় মহাকাব্যে থাকে যার অংশবিশেষকে অবলম্বন করে বিভিন্ন

কবি সাহিত্যিকের প্রতিভা বিকাশ লাভ করে। মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলা উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রী আখ্যান, শাহানামার অন্তর্গত সোহরাব রুস্তমের আখ্যান, তহমিনার প্রণয়কাহিনী প্রভৃতি অবলম্বন করে এদেশে বহু সাহিত্যিক তাঁদের কল্পনাকে রূপদান করেছেন।

জাত মহাকাব্যগুলোর বিশালত্ব এবং এসবে কল্পনার বিস্তৃতি দেখে স্বভাবতই সে যুগের মানুষের সরল-চিত্তের কথা মনে পড়ে। আজকের যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের মনে বুদ্ধি এবং যুক্তির সূক্ষ্ম জাল রচনা করেছে, মানুষকে প্রকৃতির সংস্পর্শচ্যুত করেছে কিন্তু কয়েকশ' বছর আগেও মানুষের মনে নিরাবিল সরলতার অভাব ছিলনা। অসম্ভবকে বিচার করে তার সম্ভবতা যাচাই করার মত মানসিক পরিপক্বতা সে কালের মানুষের ছিলনা। শিশু যেমন গল্প শুনতে এবং মনের মধ্যে সে গল্পের চিত্র কল্পনা করতেই ভালবাসে কোথাও থেমে থুমে বিচার বিশ্লেষণ করতে চায়না, সে যুগের মানুষও তেমনি গল্প শুনতে ভালবাসতো, মুক্তপক্ষ কল্পনায় ঘটনা প্রবাহের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করতো। এইজন্য জাত মহাকাব্যে ঘটনা যেমন বহু বিচিত্র এবং বিস্তৃত, তেমনি সেগুলি সম্ভব এবং অসম্ভব প্রশ্নের অতীত। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডেসি প্রভৃতি মহাকাব্যে সরল ও সহজ বিশ্বাসী মানুষের কল্পনায় অবগাহনের ক্ষেত্র সুপ্রচুর।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণ তাঁদের দেশের মহাকাব্যগুলোকে সামনে রেখে উক্ত কাব্যের ধর্ম নির্দ্ধারণ করেছেন কাজেই তাঁদের সূত্র সবক্ষেত্রে একরকম হয়নি। প্রাচ্যের দৃষ্টিতে ধর্ম বড়, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা বড়। রামায়ণ মহাভারতে বীরত্বের চিত্র কম নেই কিন্তু তার মূল প্রেরণা ধর্ম। পাশ্চাত্য মহাকাব্যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিজের বা গোত্রের প্রতিষ্ঠা আর প্রাচ্য মহাকাব্যের উদ্দেশ্য অধর্মের বিলোপসাধন ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা। তবু কতকগুলো ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক-ঐক্য দেখা যায়। মহাকাব্যের নায়ক যদু মধু হলে চলবেনা, তিনি হবেন উচ্চ বংশের অসাধারণ ক্ষমতা ও গুণাবলীর অধিকারী। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের মর্য্যাদা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে একেবারে একালে এসে। সমাজের চারিপাশে নিত্য ভীড় করে আছে যে নানা শ্রেণীর মানুষ তাদের মধ্যে মহৎ প্রবৃত্তির কোন সন্ধান কবি সাহিত্যিকরা করেননি, কাজেই মহাকাব্যের

মধ্যে দিয়ে জাতীয় আদর্শকে মহিমান্বিত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে রাজা রাজড়াদের, যারা শুধু মহাকাব্যের মধ্যেই নয়, সমাজের মধ্যেও ভীতির, শ্রদ্ধার এবং বিস্ময়ের পাত্র ছিল।

শিল্প ধর্মী মহাকাব্যের (Literary epic) সৃষ্টি একালে। জাত মহাকাব্যের আখ্যান বিশেষকে অবলম্বন করে কবি তার মধ্যে আপন শিল্প প্রতিভাকে প্রতিফলিত করেছেন। এ ধরণের মহাকাব্যে বিস্তৃতি নেই আছে শিল্পীর অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্য, ব্যক্তির একনিষ্ঠ মননশীলতা। ভাষার, ভাবের অলঙ্কারের পারিপাট্যে এ জাতীয় কাব্যগুলো একটি অখণ্ড সুন্দর শিল্পসত্তা লাভ করে। কবির ভাবসমুদ্র মন্থন করে সৃষ্টি হয় একটি পরিপূর্ণ রসমূর্তি।

জাত মহাকাব্যের ভাষায় থাকে আড়ম্বরহীন সরলতা, সাবলীল ঘটনা এবং জটিলতাহীন চরিত্র কিন্তু শিল্পধর্মী মহাকাব্যে ভাষা, ঘটনা-সংস্থান বা চরিত্র চিত্রন কোনটাই সরল নয়। কবির বিশিষ্ট অনুভূতির দ্বারা চরিত্রগুলো সৃষ্টি হয়। জাত মহাকাব্যে কবির নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশের অবকাশ নেই, সেখানে বিশেষ কালের একটি জাতির বিশ্বাস, ধারণা এবং আদর্শ কাব্যে রূপায়িত হয়। কিন্তু শিল্পধর্মী মহাকাব্যে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা কবির ব্যক্তি অনুভূতিকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়। মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে 'দেবদৈত্য নরত্রাস' রাবণ চরিত্রে যে শক্তি, সাহস এবং আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে কবির ব্যক্তি জীবনের প্রভাব সুস্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চাত্য জীবনাদর্শ বাঙলার তরুণ মনে আত্মজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তাকেই প্রতিফলিত দেখি মেঘনাদবধ কাব্যে। আবার কাব্যে নিয়তি লাঞ্ছিত মানব ভাগ্যের যে হাহাকার তা কবিভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে শয়তানের উদ্ধত চরিত্র সে যুগের ইংরেজ জাতির মানসিক চাঞ্চল্যের সাক্ষ্য বহন করে। স্বর্গের নিরীহ সাধু অপেক্ষা নরকের অধীশ্বর হওয়াকেই যে শয়তান শ্রেয় জ্ঞান করে। নরকে দুঃখ আছে, দাহ আছে কিন্তু আধিপত্য করার গৌরবও আছে।

আধুনিক যুগে অর্থাৎ বাঙলা দেশে ইংরেজ আধিপত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে ক'খানা মহাকাব্য রচনার

উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয়েছে তার মধ্যে কবিমানস ও যুগচেতনার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এ সবের কোন কোনটি আবার আকারে এত বড় যে জাত মহাকাব্যের বিশালতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এক 'মেঘনাদ বধ' ছাড়া অন্য কোন কাব্যে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্য নেই; কাব্যের নির্মাণ-কৌশলে মহাকাব্যোচিত সংযম এবং মহিমা প্রকটিত হয়নি। ফলে এসব কাব্য পাঠক-চিত্তে কোন মহত্ত্ব বোধ জাগ্রত করতে সক্ষম কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে যে ধ্যান এবং ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের কবিরা মহাকাব্য বা জাতীয় আখ্যান-কাব্য রচনা করেছেন তাকে আমি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। 'মহাশ্মশান' কাব্যের ভূমিকায় কায়কোবাদ মহাকাব্যের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করে বলেছেন:

"সাহিত্যের বাজারে আজকাল কবিতার বড়ই ছড়াছড়ি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্যের জন্ম অতি বিরল। মধুসূদনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মহাকবি নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র ব্যতীত কয়জন কবি মহাকাব্য লিখিয়াছেন? এখনকার কবিগণ কেবল 'নদীর জল', 'আকাশের তারা', 'ফুলের হাসি', 'মলয় পবন' ও 'প্রিয়তমার কটাক্ষ' লইয়া পাগল। প্রেমের ললিত ঝঙ্কারে তাহাদের কর্ণ এইরূপ বধির যে, অস্ত্রের ঝণঝণি ও বীরবৃন্দের ভীষণ হুঙ্কার তাহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতে অবকাশ পায়না। তাহারা কেবল প্রেমপূর্ণ খণ্ড কবিতা লিখিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। খণ্ড কবিতা কেবল কতকগুলি চরণের সমষ্টি, সামান্য একটি ভাব ব্যতীত তাহার বিশেষ কোন লক্ষ্য নাই, কিন্তু মহাকাব্য তাহা নহে; তাহাতে বিশেষ একটি লক্ষ্য আছে, কেন্দ্র আছে। কবি কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন গঠন-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া নানারূপ মালমশলার যোগে বহু কক্ষ সমন্বিত একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ইহার প্রত্যেক কক্ষের সহিত প্রত্যেক কক্ষেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথচ সকল গুলিই পৃথক, সেই পৃথকত্বের মধ্যেই একত্ব, ইহাই কবির নূতন সৃষ্টি ও রচনা কৌশল।—ইহাই মহাকাব্য।"[১]

গীতিকবিতার স্বর্ণযুগে, উপন্যাস এমন কি ছোট গল্পের প্লাবনের মধ্যে বসে মুসলিম কবিগণ মহাকাব্য রচনা করে তাতে 'অস্ত্রের ঝণঝণি ও বীরবৃন্দের

১। প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা পৃঃ ৷৹-৷৷/৹

ভীষণ হুঙ্কার' ধ্বনিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা যে 'বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া' মহাকাব্যের ইমারত গঠনের চেষ্টা করেছিলেন সেটি ছিল জাতিকে জাগ্রত করার লক্ষ্য। মহাকাব্যের অন্যতম কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছেন:

"কোন জাতি যখন মরণ সাগরের তলে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে, তখন কবির স্বর্গীয় বীণাধ্বনিই জাতিকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন-তটে উপস্থাপিত করিয়া থাকে।"[১]

এবং তাঁর ধারণায় কবিকণ্ঠের বীণা মহাকাব্যের মধ্যেই সার্থক ভাবে ধ্বনিত হতে পারে। মহাকাব্যের মহিমা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

"যে রবীন্দ্রনাথের গৌরবে আজ বাংলা দেশ আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে; তিনিও মহাকবি নহেন; তিনি শুধু গীতি কবি (Lyric poet)। তিনি বহু সংখ্যক সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা রচনা করিয়াছেন বটে; কিন্তু একখানিও মহাকাব্য লেখেন নাই। সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায়, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়না। ....কিন্তু মহাকাব্য হিমাচলের মত জিনিষ, যতদিন মানব-সমাজ থাকিবে, ততদিন উহাও থাকিবে। আজ কতকাল হইল ব্যাস বাল্মিকী হোমার ও ফেরদৌসী পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু নিখিল জগতের সুধীমণ্ডলী তাঁহাদের কাব্য রসামৃত পানে আজও সরস ও উৎফুল্ল হইতেছেন।"[২]

১৩২৬ সালে বাঙলা সাহিত্যে, বাঙলা দেশের মানুষের চিন্তা ভাবনায় রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাব কত প্রবল এবং সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল সে কথা আজ বিচারের অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে ইসমাইল হোসেনের সিরাজীর মনোভাব লক্ষ্য করে। তিনি রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তা যে কম বেশী সব মুসলমান কবিরই সে কথা বোঝা যায় তাঁদের মহাকাব্য রচনার প্রয়াস দেখে।

১। 'মহাকবি কায়কোবাদ'—ইসমাইল হোসেন সিরাজী—মোহাম্মদী—১৩শ বর্ষ, শ্রাবন, ১৩২৬

২। ঐ

আমরা দেখেছি মহাকাব্য রচনার পেছনে প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে—স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম, অতীত ইতিহাসের প্রতি প্রবল মোহ এবং বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, যে বীরত্ব মনের চেয়ে দৈহিক বলের দ্বারাই বেশী প্রকটিত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু কবিরা যেমন মনুষ্যত্বের আদর্শকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন বীরধর্মের মধ্যে, বীর ধর্মের চিত্র অঙ্কন করার নিরাপদ অবলম্বন খুঁজে পেয়েছেন ইতিহাসের পাতায়, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মুসলমান কবিরাও অনেকটা ঐ একই চিন্তা এবং একই পদ্ধতিকে অবলম্বন করেছেন।

গণতন্ত্র এবং ক্রমবর্ধমান গণচেতনার যুগে বসে সামন্ত রাজা-বাদশাকে আদর্শ জ্ঞান করা, তাদের জয়গান করা কবির রক্ষণশীলতা ব'লে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এ কথাও সত্য যে রাজা-বাদশার কাহিনীকে তাঁরা ঐতিহাসিক প্রেরণা রূপে দেখেছেন। জাতীয় আখ্যান কাব্যগুলোতে কোন কবিরই বোধহয় এমন কামনা ব্যক্ত হয়নি যে রাজতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত হোক—দিল্লীর সিংহাসনে রাজাধিরাজ বা শাহেনশাহ্ এসে বসুন। আসলে গণ-চিত্তকে জাগ্রত করার চেষ্টাই তাঁরা ঐ সব কাহিনী-কাব্যের মধ্যে করেছেন। মুসলমান কবির ক্ষেত্রে ঐ কথা সমভাবেই প্রযোজ্য। কিন্তু ইতোমধ্যে কাল বসে থাকেনি। বাঙলা সাহিত্যে তার অগ্রগতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর এঁকে চলেছিল। বাঙলা গদ্য পরিপুষ্ট হয়েছে, কাহিনী রচনার ক্ষেত্র কাব্যকে ছেড়ে গদ্যকে আশ্রয় করেছে—উপন্যাস এমনকি ছোটগল্পের সম্ভারে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সাহিত্যিকরা গল্পের উপাদান কতলু খাঁর দুর্গ বা মীর কাশেমের প্রাসাদে সন্ধান না করে বাঙলা দেশের পর্ণ কুটীরে, তার বিস্তীর্ণ মাঠেঘাটে এবং বর্দ্ধিষ্ণু শহরের অলি-গলিতে খুঁজেছেন। আর শুধু গল্পের উপাদানেই নয় তার প্রধান অবলম্বন যে মানুষ তাকেও উপলব্ধি করেছেন হৃদয়ধর্মের বিকাশের মধ্যে। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান এবং তারই প্রভাবে জীবনকে স্বমহিমায় উপলব্ধির চেতনা শিক্ষিত চিত্তকে তখন আর সচকিত করেনি, তাঁরা নিজের অন্তরে সে বোধকে জাগ্রত করেছেন। বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে জাতির আদর্শকে সন্ধান করার তাগিদ শেষ হয়েছে এবং শিল্পী ক্ষুদ্র তুচ্ছ ও বাস্তব মানুষের অন্তরের অপরিসীম রহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় শিল্পী চিত্তের জাগরণকে ব্যাপক করেছে। সে জাগরণের মন্ত্র তাঁরা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কাব্যে। অপর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকের মত ফুলে ফুলে তখন ভ'রে উঠেছে

বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গন, বিশ্ব-সাহিত্যের মোহনায় মহামিলনের উদ্দেশে তার যাত্রা হয়েছে শুরু। আর এই 'অভাব্য দুর্ঘটনার' মহাকাব্য তখন 'কনায় কনায়' ছড়িয়ে পড়েছে।

মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ যে নানাকারণে বিঘ্নিত হয়েছে এবং শহর কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় থেকে মুসলমানেরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সে কথা আমি আগেই বলেছি। অবশ্য উনিশ শতকের শেষে এসে মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং পত্র-পত্রিকারও উদ্ভব হয়। এসব পত্র-পত্রিকা যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরা আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। ভাষা ও সাহিত্য চচার প্রাথমিক চেতনাই তাঁদের মধ্যে প্রবল ছিল। উপরন্তু তাঁদের সমাজের উপর খৃষ্টান মিশনারীর আক্রমণ এবং ধর্ম, ইতিহাস প্রভৃতির উপর হিন্দু সাহিত্যিকদের কটাক্ষ তাঁদের চিন্তাকে স্বস্তিহীন করে তুলেছিল। নিজের সমাজের গোঁড়ামীও তাঁদের মাথায় খড়্গ উদ্যত করে রেখেছিল। সাহিত্যের সব রকম অভিব্যক্তিকেই তাঁরা ধর্মের বিধান দিয়ে চুলচেরা বিচার করতেন। আমরা দেখেছি বাঙলা ভাষা চর্চার পথে গোঁড়া সম্প্রদায় একটা মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এঁদের অভিযোগ ছিল বাঙলা ভাষা সাহিত্যে হিন্দুদের প্রভাব। সে প্রভাব যে অতিক্রম করা যায়না, সাহিত্যের অগ্রগামী ধারাকে অস্বীকার করে যে সার্থক রচনা সম্ভব নয় একথা মুসলমান সাহিত্যিকগণ বুঝতে চাননি অথচ ইতিহাসের অনিবার্য্য গতিকেও রোধ করতে পারেননি। ফলে বাঙলা সাহিত্যের উন্নত ধারাকে তাঁরা পরিহার করেছেন আবার পূর্ববর্তী কবিদের রচনার রীতি পদ্ধতিকেও অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু তাঁদের সাহিত্য সমসাময়িক কালের সুর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে। সাহিত্যে ধর্মের নিখাদ সুর এবং ইতিহাসের অকাট্য যুক্তিকে তাঁরা প্রাণপণে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মহাশ্মশান, মহাশিক্ষা, স্পেন বিজয় প্রভৃতি কাব্যের পাদটীকায় ঐতিহাসিক তথ্য সমাবেশ দেখে দেখে মনে হয় যে সাহিত্য রচনা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ছিল ঃ

"লেখা হবে সারবান
অতিশয় ধারবান
খাড়া রবে দ্বারবান
দশ দিকে রাখি দৃষ্টি।"

দৃষ্টি তাঁদের সতর্কই ছিল কিন্তু সৃষ্টি সার্থক হয়ে ওঠেনি।

উপরোক্ত মনোভাবের জন্যই মুসলমান কবিরা নিজেদের রবীন্দ্র প্রভাবের মহাপ্লাবন থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। ব্যতিক্রম যে ঘটেনি এমন নয়। কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, সিরাজী প্রভৃতি কবিরাও 'ফুলের হাসি' বা 'প্রিয়তমার কটাক্ষ' নিয়ে খণ্ড কবিতা লিখেছেন, জাতীয় কাব্য লিখতে গিয়ে ব্যক্তি-প্রেমের আনন্দ বেদনাকে অবহেলা করতে পারেননি, হয়ত তা বীর হুঙ্কারকেও ছাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু সে সব যেন তাঁদের অসতর্ক মুহূর্তের অভিব্যক্তি। তাঁদের সচেতন মন জাতীয় সমস্যার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। এবং সে মনেরই সৃষ্টি জাতীয় আখ্যান কাব্য।

মুসলমান কবিদের রচনাকালে দেশপ্রেম সক্রিয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। জাতি ও দেশপ্রেমের যে বাণী মহাকাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল তা খণ্ড কবিতার বিচিত্র ক্রমেই তীব্র এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। দেশের মানুষের মনে দেশপ্রেমের চেতনা বলিষ্ঠ হয়েছিল এবং তা নানাভাবে প্রকাশের পথ খুঁজেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে একালের প্রতিফলন নেই এমন নয় কিন্তু কবির উন্নত মন-মেজাজ, তাঁর সমুন্নত সৃষ্টি সমসাময়িক কালের সংঘর্ষ এবং কোলাহলকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেনি, উন্নত প্রতিভার পক্ষে তা হতে সম্ভব নয়। শ্রেষ্ঠ কবিরা যুগমানসকে তাঁদের কাব্যে উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেও যুগকে অতিক্রম করতে পারেন তাই যুগের স্বরূপটি তাঁদের কাব্যের চাইতে আর সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কবির কাব্যে। হিন্দু কবিদের প্রবর্তিত দেশাত্মবোধের সঙ্গে মুসলমানদের চিন্তার দ্বন্দ্ব আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল ফলে সমসাময়িককালের খণ্ড কবিতাকে তাঁরা বিশেষ অনুকরণ করেননি। অবশ্য সিরাজী খণ্ড কবিতার মাধ্যমে দেশ এবং জাতির প্রেমের কথা উচ্চ কণ্ঠেই বলেছিলেন এবং তা বিশ শতকের শুরুতেই, কিন্তু তিনি নিজেই মনে করতেন জাতির আত্মজাগরণ মহাকাব্যের মধ্যেই সম্ভব। কাজেই সমকালীন সাহিত্যের ধারাকে পাশ কাটিয়ে বিশ শতকে মুসলমান কবিরা উনিশ শতকের সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এর পরিবর্তন হয়েছে নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে। তাঁর কাব্যে শুধু দেশপ্রেম নয়—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির কথা শুনতে পাওয়া গেল। গোঁড়া মুসলমান পেল ইসলামী সংগীত, প্রগতিশীল মুসলমান পেল

ধর্মের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাণী। আর এ সবই নজরুল করলেন খণ্ড কবিতার সাহায্যে। ফলে মুসলমান কবিদের আখ্যান কাব্য রচনায় ছেদ পড়্‌লো।

কিন্তু এতকাল তাঁরা যে সব জাতীয় আখ্যান কাব্য রচনা করলেন, তার কি কোনই সার্থকতা নেই? যুগধর্মের বিচারে হয়ত সে সব অহেতুক, হয়ত বা নিষ্ফল, তবু একমাত্র কাব্য পাঠের দ্বারাই বোঝা সম্ভব তারা—

'কি যন্ত্রনায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।'

বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা

মুহম্মদ সিদ্দিক খান

ক। পাক ভারতে মুদ্রণের প্রথম প্রচেষ্টা*

আধুনিক পাক-ভারতীয় সাহিত্য এবং ভাষাসমূহের উন্নতির ইতিহাসে মুদ্রণের প্রাথমিক প্রচেষ্টার কাহিনী একটি চিত্তাকর্ষক অধ্যায়। ইউরোপীয়দের এদেশে আসার পূর্বে ছাপার কোন প্রচেষ্টা চলেছিল কি না তা বলা শক্ত। অবশ্য খোদাই করা কাঠ বা পোড়ামাটির পাতের সাহায্যে ছাপার অপরিপক্ক প্রচেষ্টা মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও তালপাতা এবং তুলোট কাগজে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে ছাপানো বই অবধি রূপান্তরের বিভিন্ন স্তরগুলোও নির্দেশ করা সহজ নয়। ছাপার সেই প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে মুদ্রণীয় বিষয়কে কাঠ অথবা মাটির পাতে 'গভীর খোদাই' (deep cut) বা 'উঁচু খোদাই' (relief) অক্ষর বসিয়ে যাওয়া হতো। এ সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন যে, তিব্বতী কিংবা নেপালী প্রণালীর অনুসরণে কাঠের ব্লকের উপর সম্পূর্ণ খোদাই প্রায় দু'শো বছরের পুরানো পাণ্ডুলিপি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন যে ঐ প্রণালীর সাধারণ ব্যবহার ছিল না; এবং সৌন্দর্যবর্ধনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত কোন সাময়িক উদ্যমকে বিশেষ রীতি অথবা বিদ্যার নিয়মিত চর্চার পূর্বলক্ষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে না।[১]

এই প্রসঙ্গে 'চলনশীল হরফের' (Moveable type) সাহায্যে ভারতে মুদ্রণপদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। যে সময় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি এ উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্য-

* বর্তমান প্রবন্ধের অন্যান্য অংশে ভারত এবং বাংলাদেশ বলতে আমরা যথাক্রমে পাক-ভারত ও বিভাগপূর্ব বাংলার কথাই বোঝাব।

১। বিশ্বকোষ; পঞ্চদশ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩১১ সন, পৃঃ ১৪৭।
দীনেশ চন্দ্র সেন, A History of Bengali Language and Literature, Calcutta, পৃঃ ৮৪৯।

ব্যপদেশে আগমন করেছিল সে সময় ইউরোপে মুদ্রণশিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। তাই একথা অনুমান করা স্বাভাবিক যে সেই সব ঔপনিবেশিক ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এদেশে মুদ্রণ প্রণালীর প্রথম প্রচলন হয়। অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের মতো ছাপাখানার প্রবর্তন ও বই ছাপানোর ব্যাপারে পর্তুগীজরাই ছিল অগ্রদূত। অভিযানপ্রিয়, দুঃসাহসিক এ জাতির ছিল খৃষ্টধর্ম প্রচারে অদম্য ও অক্লান্ত উৎসাহ। পর্তুগীজ জলদস্যু, নৌ-সেনা এবং শাসকদের অব্যবহিত পরেই আসে ধর্ম প্রচারের জন্য উৎসর্গিত পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও প্রচারকের দল। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে লিখিত বা মুদ্রিত বইয়ের বিরাট সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে এঁরা অবহিত ছিলেন। ফলে তাঁরা বহু ধর্মপুস্তক রচনা করেন। তার এক বৃহৎ অংশ প্রথমে পর্ত্তুগাল বা অন্য কোন ইউরোপীয় দেশে এবং পরবর্তী কালে ভারতে ছাপা হয়।

ঠিক কোন সময়ে যে ভারতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে পর্ত্তুগীজরাই এদেশে সর্বপ্রথম ছাপার প্রচলন করে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম বসতি স্থাপন করার কিছুকাল পরে পর্তুগীজগণ ইউরোপ থেকে দু'টি মুদ্রাযন্ত্র আমদানী করে এবং সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এ যন্ত্র দু'টি গোয়ায় প্রতিষ্ঠিত করে। যতদূর জানা যায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গোয়ায় মুদ্রিত প্রথম বইটি ছিল পর্তুগীজ ভাষায় রচিত Conclusoes। এটির বিষয়বস্তু ছিল জনবিতর্কে ছাত্রদের ব্যবহার্য দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়। এর পরের বছরেই সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কর্তৃক সংকলিত খৃষ্টীয়ধর্ম সম্পর্কিত একটি প্রশ্নোত্তরমালা বইয়ের আকারে গোয়ায় ছাপা হয়। গোয়ার অল্পসংখ্যক পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত ও প্রচারক এবং পর্তুগালে শিক্ষাপ্রাপ্ত গুটিকয়েক অজ্ঞাতনামা ভারতীয়কেই এ থেকে "ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের জন্মদাতা" রূপে আখ্যায়িত করা চলে।[১]

১। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (২), সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ খণ্ড, ১৩৪৫, পৃঃ ১১৫; বিনয় ঘোষ, কলকাতা কালচার, পৃঃ ১০১; (এঁর মতে প্রথম পর্তুগীজ মুদ্রাযন্ত্রগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপিত হয়।)

The Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing at the National Library, Calcutta, 1955. p. 1.

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বই মুদ্রণের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মূল পর্তুগীজ থেকে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের Doctrina Christao এর "খৃষ্টীয় ভন্নকনম" নামে মালাবার-তামিল ভাষায় অনুবাদ।[১] ক্রমে ক্রমে পর্তুগীজদের মুদ্রণশিল্পের চর্চা ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলস্থ কোচিন, পুদারকয়েল, ভাইপিকট্টা, আম্বালাকাদ্দু ইত্যাদি নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লো। প্রথম প্রথম এখানকার ছাপাখানাগুলোতে পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত ধর্মপুস্তকই ছাপা হতো। পরে ধর্মপ্রচারে দেশী ভাষার ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধার কথা উপলব্ধি করতে পেরে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা পর্তুগীজ থেকে দেশীয় ভাষায় কয়েকটি বই অনুবাদ করেন। মুদ্রণশিল্পের গতিপথের এই পরিবর্তন পাক-ভারতের ইতিহাসকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলো।

বলা বাহুল্য পুস্তক প্রণয়ন ধারার গতিপথের এই শুভ পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। De Backer's Bibliotheque de la Compagnie de Jesus নামক গ্রন্থে Antoine de Proencaর রচিত গ্রন্থাবলীর বিবরণে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। Antoine de Proenca রচিত Vocabulario Tamulico পুস্তকটি ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে আম্বালাকাদ্দুতে মুদ্রিত হয়। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ফাদার জোয়ানেস গনসালভেস (Father Joannes Gonzalves) নামক জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক স্পেনীয় পাদ্রী ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে আম্বালাকাদ্দুতে সর্বপ্রথম মালাবার ভাষার কতকগুলি হরফ তৈরী করেন। উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে ফাদার জোয়ানেস ফারিয়ার (Father Joannes Faria) Flos Sanctorum নামক বইটি তামিল অক্ষরে ১৫৭৮ সালে ছাপা হয়।[২]

১। আলোচ্য যুগে মালাবার ভাষা বলতে পর্তুগীজ ও অন্যান্য বিদেশীরা মালয়ালম ও তামিল উভয় ভাষাকেই বুঝাতেন।

২। Talbot Baines Reed, A History of the Old English Letter Founderies, revised and enlarged edn., London, 1952, p. 69.

আম্বালাকাদ বা বর্তমান আম্বালাকাদ্দু দক্ষিণ ভারতের কোচিনস্থ ত্রিচুর শহর থেকে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম।

তামিল ভাষায় লিখিত এ বইগুলি সম্ভবতঃ মালয়ালম ধাঁচের অক্ষরের সাহায্যে মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু তামিল ভাষায় বিভিন্ন জাতের অক্ষর ব্যবহারের সার্থকতা বা কারণ যে কি তা' সঠিক বোধগম্য হয় না। তামিল ভাষাভাষী লোকদের পক্ষেও অক্ষরগুলো অনেকাংশে কষ্টকর ছিল। ফাদার পলিনাসের (Father Paulinus) একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে ইগনাশিয়াস আইচামনি (Ignatius Aichamoni) নামক জনৈক তামিল একটি তামিল পর্তুগীজ অভিধান ছাপার জন্য কাঠের তৈরী তামিল হরফ প্রস্তুত করেছিলেন।[১]

প্রথমে মালয়ালম, তামিল এবং পরে কংকানি, মারাঠি প্রভৃতি দেশী ভাষায় বই ছাপার নীতি গ্রহণের ফলে ইউরোপ থেকে রোমান হরফ আনা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। রোমান হরফের পরিবর্তে এদেশে ছেনিকাটা ও ঢালাই করা হরফের ব্যবহার শুরু হতে থাকে।[২] ত্রাংকেবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে।[৩] এর মূলে ছিল সেখানে প্রতিষ্ঠিত দিনেমার লুথেরান প্রটেষ্টাণ্ট মিশনটির প্রধান পুরোহিত বার্থোলো-মিয়াস জিয়েগানবাল্গ (Bartholomæus Ziegenbalg)। তিনি পাক-ভারতের মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্য অমর হয়ে আছেন। তিনি যে কেবলমাত্র একজন সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন তা নয়, তিনি তামিল হরফ তৈরী ও তামিল বই ছাপার ব্যাপারেও অনেক কিছু করে গেছেন। ত্রাংকেবার মিশনের ছাপাখানার জন্য প্রথম প্রথম তিনি ইউরোপ থেকে প্রয়োজনীয় টাইপ আমদানী করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ হরফগুলো তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় তিনি স্বয়ং তামিল ভাষার টাইপ নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Horti Indici Malabaricir তামিল অনুবাদ মুদ্রণের জন্য তাঁর পরিচিত ভারতীয় তামিল অক্ষরনির্মাতাদের তৈরী হরফ

১। The Carey Exhibition..., p. 1.

২। সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি সম্পাদিত ম্যানোয়েল দা আসুম্পসাওঁয়ের বাংলা ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৯৩১, পৃঃ ৵০।

৩। ত্রাঙ্কেবার মাদ্রাজের অন্তর্গত তান্জোর উপকূলের একটি ছোট শহর। দিনেমারগণ সেখানে ১৬২০ সালে একটি কুঠি স্থাপন করে। পরে ইংরেজরা ১৭৪৬ সালে শ্রীরামপুর এবং এই স্থানটি কিনে নেয়।

উপযুক্ত হবে না, এ জেনেই তিনি ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডামের কোন একজন প্রসিদ্ধ ঢালাইকর দ্বারা এক সাট (fount) মালয়ালম অক্ষর তৈরী করিয়ে আনেন। জিয়েগেনবাল্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল Biblica Damulica অর্থাৎ তামিল ভাষায় New Testament এর একখানা অনুবাদ। অনুবাদটি ১৭০৮ সালে সমাপ্ত এবং ১৭১৪ কিংবা ১৭১৫ সালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।[১] বিশ্ব-কোষের একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে New Testament এর অনুবাদটির অন্তর্ভুক্ত Apostle's Creed অংশটি তামিল অক্ষরে জার্মানীর অন্তর্গত হলে (Halle) শহরে মুদ্রিত হয় ও পরে ত্রাংকেবারে পাঠানো হয়।[২]

হলে শহরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জিয়েগেনবাল্গের দিনেমার লুথেরান প্রটেষ্টান্ট মিশনের বহু সমর্থক ও হিতৈষী ছিল। তারা ঐ সময় নানাভাবে তামিল বাইবেল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বই মুদ্রণে প্রভূত সাহায্য করে এবং New Testament এর অনুবাদটির বাকী অংশ ছাপার জন্য একটা মুদ্রাযন্ত্র ও প্রয়োজনীয় টাইপ ত্রাংকেবার মিশনে প্রেরণ করে। ত্রাংকেবারের বর্দ্ধিষ্ণু ছাপাখানার চাহিদা পূরণের জন্য ত্রাংকেবারেই ভারতের সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন করা হয় বলে জানা যায়। অক্লান্তকর্মী জিয়েগেনবাল্গ অতঃপর Grammatica Damulica নামে একটি তামিল ব্যাকরণ রচনা করেন। এই বইটিও ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে হলে থেকে ছাপিয়ে আনা হয়। কিন্তু ওয়ারেন বলেন যে ব্যাকরণখানি হলে থেকে আনা টাইপের সাহায্যে ত্রাংকেবারেই ছাপা হয়। সে যা'হোক বিশ্বকোষ ও ওয়ারেন এই উভয় সূত্র থেকেই জানা যায় যে হলে থেকে আমদানীকৃত হরফগুলো ব্যবহারোপযোগী না হওয়ায় বাধ্য হয়ে জিয়েগেনবাল্গ পরিশেষে ত্রাংকেবারেই ক্ষুদ্রাকৃতির উৎকৃষ্টতর টাইপ নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। রীড বলেন যে হলের অক্ষর প্রয়োজনাতিরিক্ত বড় ছিল; তাই দিনেমার মিশনের কর্মীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যবহারোপযোগী নতুন অক্ষর

১। W. H. Warren, "Early Tamil Printing" in Memoirs of the Madras Library Association 1941, pp 88-89.
রীডের মতে বইখানা ছাপা হয় ১৭১৪ সালে। এর আরেক সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ১৭২২ সালে।

২। বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ খণ্ড, মুদ্রাযন্ত্র শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ১৯৭।

তৈরী করে New Testament এর অসম্পূর্ণ অংশ মুদ্রিত করেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে ত্রাংকেবারের তামিল টাইপগুলোও কিছুটা স্থূল ও চৌকা ছিল এবং সুন্দর ছিল না। পরবর্তী কালে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলম্বোস্থ ছাপাখানায় তৈরী তামিল অক্ষরগুলো তাদের বিশিষ্ট ঢাল ও অপেক্ষাকৃত গোলাকৃতি লাভ করে।[১]

পোপ পঞ্চদশ গ্রেগরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রোমান ক্যাথলিকদের অন্যতম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মিশনারীদের শিক্ষাকেন্দ্র Congregatio de Propaganda Fide এর জন্য বিবিধ ভারতীয় ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করা হয়। ১৭৭১ সালে প্রসিদ্ধ স্কটিশ অক্ষরনির্মাতা ডাঃ এডমাণ্ড ফ্রাই এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য বিশেষ আকারের এক সাট মালাবারী টাইপ তৈরী করেন। তা'ছাড়া ঐ Congregatioটি সংস্কৃত বা দেবনাগরী হরফও নির্মাণ করান। Alphabetum Brammanicum এর মতে সর্বপ্রথম নির্মিত দেবনাগরী অক্ষরগুলো এই প্রতিষ্ঠানটির জন্যই ১৭১১ সালে খোদিত ও ঢালাই করা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ ইংরেজ অক্ষরনির্মাতা জোসেফ জ্যাকসন (১৭৩৩—১৭৯২) Joseph Jackson উইলেম বোল্টসের (Willem Bolts) ফরমায়েশ মত পরীক্ষামূলক ভাবে বাংলা হরফ তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে বাংলা ছাপার হরফের জন্মদাতা বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্যভাষাবিশারদ ডাঃ (পরে নাইট খেতাবে সম্মানিত) চার্লস উইলকিন্স (১৭৪৯—১৮৩৬)এ গৌরবের অধিকারী। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এঁদের দু'জনের কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

জ্যাকসনের বাংলা হরফনির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা ছাড়াও ভারতীয় অন্যান্য ভাষার হরফ তৈরীর কীর্তি রয়ে গেছে। তিনি এক ফাউণ্ট দেবনাগরী হরফ ছাড়াও দুই ফাউণ্ট আরবী ও ফারসী ভাষার অক্ষর প্রস্তুত

১। ১৭৩৮ সালে সিংহলবাসী ওলন্দাজ মিশনারীরা সেখানে তৈরী মুদ্রাক্ষরে সিংহলী ভাষায় একটি প্রার্থনাপুস্তক ছাপায়। এর দুই বৎসর পরে তারা সিংহলী ভাষায় New Testament এর একটি অনুবাদও প্রকাশ করে। এদের কাছে তামিল টাইপও ছিল এবং সম্ভবতঃ এগুলোরই কথা এখানে বলা হয়েছে।

করেছিলেন। রীড বলেন "জ্যাকসনের তৈরী দেবনাগরী অক্ষরের নমুনা এখনো পাওয়া যায়......এর সংস্কৃত অক্ষর ও যুক্তাক্ষরগুলি প্লেট আকারে এক পৃষ্ঠায় ছাপা। ওগুলোর নির্মাণকৌশলে যে যথেষ্ট নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই নৈপুণ্য শুধুমাত্র প্রাচ্য হরফনির্মাণে সীমাবদ্ধ থাকে নি—বরং আখ্যা ছাপার জন্য কতিপয় রোমান টাইপ নির্মাণেও পরিলক্ষিত হয়......" ১। উইলিয়াম কার্কপ্যাট্রিক (William Kirkpatrick) নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন পদস্থ কর্মচারী,—যিনি কিছুদিন ভারতের প্রধান সেনাপতির পার্সীয়ান সেক্রেটারী ছিলেন তিনি Grammar and Dictionary of Hindvi Language নামক বইখানা সঙ্কলন করেন। এই বইটির জন্য জ্যাকসন অতি সুন্দর এক সাট দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করেন। কিন্তু যেহেতু কার্কপ্যাট্রিকের আরবী ফারসী শব্দগুলির সহিত "হিন্দু" বা হিন্দবি শব্দের পরিভাষা নামক একাংশমাত্র ১৭৮৫ সালে মুদ্রিত হয়, তাই জ্যাকসনের দেবনাগরী অক্ষরগুলো আদৌ ব্যবহৃত হয়নি। এই কারণেই জ্যাকসনের প্রাচ্যভাষার হরফনির্মাণের দক্ষতা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে।[১]

এভাবে ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্যান্য ভাষার প্রথম হরফ উৎপত্তির কাহিনী জানা যায়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভিনসেণ্ট ফিগিন্স (Vincent Figgins)কে দিয়ে তেলেগু ভাষার এক সাট অক্ষর তৈরী করে নেয়।

১। Reed, ৩১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বর্তমান প্রবন্ধের শেষাংশে দেখুন। Kirkpatrick এর বইটির শীর্ষনাম ছিল A Vocabulary, Persian, Arabic, and English, containing such words as have been adopted from the two former of these languages and incorporated into the Hindvi ; together with some hundreds of compound verbs formed from Pesrian or Arabic nouns and in universal use. Being the seventh part of the new Hindvi Grammar and Dictionary. London, 1785

উল্লেখিত 'হিন্দু' শব্দগুলি স্পষ্টতঃই ছিল হিন্দবী বা উর্দু। কেননা Kirkpatrick এর উক্ত বইটিতে এ সমস্ত শব্দগুলির জন্য কোন দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহৃত হয়নি। তা'ছাড়া লেখক কর্তৃক বইটির শীর্ষনামেও হিন্দবী শব্দের ব্যবহারের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

পূর্বোল্লেখিত এডমাণ্ড ফ্রাই (Edmund Fry) ১৮২৪ সালে দুই আকারের গুজরাটি টাইপ প্রস্তুত করেন। ওয়ারেন বলেন যে ১৭৬১ সালে ইংরাজগণ যখন পণ্ডিচেরী দখল করে তখন তারা মাদ্রাজনিবাসী তামিল ভাষাভিজ্ঞ জার্মান পাদ্রী জোহান ফেবরিসিয়াস (Johann Fabricius) এর নিকট একটি লুণ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্র সমর্পণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফেবরিসিয়াস তাঁর ঐতিহাসিক ইঙ্গ-তামিল অভিধান প্রণয়ন করেন। অচিরেই তাঁর ছাপাখানাটি মাদ্রাজের অন্তর্গত ভেপারীর Diocesan Press নামে খ্যাতি অর্জন করে। ভারতে সর্বপ্রথম মাদ্রাজে তামিল অক্ষর প্রস্তুত হয় এবং এগুলোর ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ভেপারীর ছাপাখানায় ব্যবহৃত হতো বলে উল্লেখ আছে।[১] স্বনামখ্যাত ইংরেজ হরফনির্মাতা উইলিয়াম ক্যাসলন (Wiliam Caslon) ১৮২২ সালে সংস্কৃত টাইপ তৈরী করেন। পাক-ভারতীয় অন্যান্য ভাষার হরফ এমনি করেই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের আদি নির্মাতাদের পরিচয় আজও সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হার্টফোর্ডের খ্যাতিসম্পন্ন স্টিফেন অষ্টিন প্রতিষ্ঠানটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য ভারতীয় ভাষায় বহু পুস্তক ছাপিয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি হার্টফোর্ডে প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজের অনুমোদিত ভারতীয় ভাষার পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত ছিল। ১৮০৬ সালে হার্টফোর্ডে কলেজটি প্রথম স্থাপিত হয় এবং তিন বৎসর পর কলেজটিকে হেইলীবারিতে স্থানান্তরিত করা হয়।[২] অষ্টিন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত টাইপে ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত হিতোপদেশ গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়।

১। Warren.

২। হেইলীবারী কলেজটি ১৮০৬ সালে স্থাপিত হয়। সিভিলিয়ান হিসাবে ভারতে পাঠাবার জন্যে মনোনীত ইংরেজ যুবকদের এখানে তিন বছরের জন্য শিক্ষা দেওয়া হতো। শিক্ষাসমাপ্তির পর তাদের রাইটার হিসাবে কোম্পানীর অধীনে ভারতে পাঠানো হতো। এই কলেজের কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল এক বিশেষ পাঠ্যতালিকার মাধ্যমে এ সমস্ত যুবক সিভিলিয়ানদের ভারত এবং ভারতবাসীদের উপযোগী করে গড়ে তোলা। অন্যান্য শিক্ষা ছাড়াও এখানে শিক্ষার্থীদের আরবী, ফারসী, হিন্দুস্তানী (উর্দু), হিন্দী ভাষা এবং এসিয়ার ইতিহাস আয়ত্ত করতে হতো। ১৮৫৫ সালে কলেজটি বিলুপ্ত হয়।

বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭৫৯—১৭৯৩) সময় তাঁর নিজের উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে সাফল্যজনক মুদ্রণের কথা জানা যায়। Bengal Armyর Major Yuleএর বিবরণী পাঠে জানা যায় যে ১৮০৩ সালে ইংরাজবাহিনী কর্তৃক আগ্রাদুর্গ দখলের সময় একটা মুদ্রাযন্ত্র দুর্গের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়। Major Yuleএর প্রুফশীটগুলি দেখে বিস্মিত হন কেননা অক্ষরগুলি ছিল অতি সুন্দর। ঘটনাস্থলে উপস্থিত Major Yule, Lieutenant Mathews এবং অন্যান্য ইংরাজ সেনানীরা মনে করেন যে এটাই সম্ভবতঃ হিন্দুস্থানে ছাপার প্রথম প্রচেষ্টা।[১]

১৭৭৮ সাল থেকে বিভাগপূর্ব বাংলার ছাপা ও প্রকাশনার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। প্রাচ্য ভাষাবিশারদ পণ্ডিতবর্গ এবং প্রাচ্যভাষানুরক্ত গভর্ণর-জেনারেলদের সাহায্য ও সহানুভূতির ফলেই এই যুগের গোড়াপত্তন। পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই বই রচনা ও প্রকাশের এই উদ্যম সাফল্যের চরমে উন্নীত হয়। এই সময়েই শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় এবং পরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও সক্রিয় সাহায্যের ফলে বাংলা বই ছাপার পরিমাণ আশাতীত রূপে বেড়ে যায়।

খ। বাংলা প্রথম মুদ্রিত পুস্তকাবলী ও ছাপাখানা সমূহ—(১৭৯৯ সাল পর্যন্ত)

বাংলা বই রচনা ও ছাপার ক্ষেত্রে পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকদের একনিষ্ঠ ও অক্লান্ত সাধনার কথা উল্লেখ না করলে পাক-ভারতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা সম্পর্কিত এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পাক-ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রথমে বাণিজ্যে সাফল্যলাভ ও পরে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করার পর পর্তুগীজ সওদাগরগণ নতুন নতুন ব্যবসাকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে সমস্ত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়লো। ইউরোপীয় ও আরব পর্যটকদের বিবরণী মারফত সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে বাংলার খ্যাতি শুধু সেকালে নয় বরং পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বেই দিকে দিকে বিস্তৃত হয়েছিল। বাংলার প্রচুর ধনদৌলতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দুঃসাহসী পর্তুগীজ বণিকগণ

১। W. H. Carey, The Good Old Days of Honorable John Company, 1909 reprint, Vol. I, p. 332-333.

অনতিবিলম্বে বাংলায় উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হয়। ন্যুনো দা কুনহা (Nuno da Cunha) (১৫২৯—১৫৩৮) নামক গোয়ার জনৈক পর্তুগীজ শাসনকর্তা বাংলার সমুদ্রোপকূলে বাণিজ্যঘাটি স্থাপনের জন্য বহুকাল অবধি খুব আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাঁর এই বহুদিনের বাসনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচটি জাহাজযোগে একদল বণিককে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। তার পর থেকেই ১৫৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসরই চট্টগ্রামে (পর্তুগীজ ভাষায় পোর্টো গ্রাণ্ডে Porto Grande) পর্তুগীজ জাহাজ নিয়মিত আসাযাওয়া করতে আরম্ভ করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় বেশ কয়েকটি পর্তুগীজ বাণিজ্য কুঠি গড়ে উঠে। হুগলীতে স্থাপিত কুঠিটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বণিকদের অব্যবহিত পরে ধর্মপ্রচারকগণ আসতে থাকেন ও নানাস্থানে মিশন নির্মাণ করে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। ব্যাণ্ডেলের পুরানো পর্তুগীজ গির্জার ন্যায় ঢাকার ভাওয়াল পরগণাস্থ নাগোরির গির্জা ও মিশনটি বেশ প্রসিদ্ধ। এই মিশনের উৎসাহী পাদ্রী ফাদার ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাওঁ (Father Manoel da Assumpcao) এর রচিত ও তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মুদ্রিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ছাপা তিন খানা বই মিশনটিকে অমর করে রেখেছে।

বাংলাদেশের পর্তুগীজ মিশনগুলোর প্রধান পাদ্রী ফাদার মার্কস আন্তনিয়ো সানটুচ্চি (Father Marcos Antonio Santucci) নালোয়াকট (Nelua Cot) থেকে গোয়ার পাদ্রীদের প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের নিকট লিখেন যে "The fathers (Ignatius Gomes, Manoel Surayva and himself) have not failed in their duty: they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers; they have translated the Christian Doctrine [Doutrina Christa or catechism] etc. nothing of which existed until now."[১]

১। O Chronista de Tissuary, গোয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৬৭ সাল, ১২ পৃষ্ঠা। Bengal: Past and Present পত্রিকার নবম খণ্ড, প্রথম ভাগ, ৪৬ পৃষ্ঠায় Hosten এর the Three First Type Printed Bengali Books শীর্ষক প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

জেসুইট মিশনারী ফ্রান্সিসকো ফার্নাণ্ডেস (Francisco Fernandes) পূর্ববাংলার শ্রীপুর থেকে গোয়াস্থ জেসুইট মিশনের অধ্যক্ষ নিকোলাস পিমেণ্টাকে (Nicolas Pimenta) লিখিত এক পত্রে তাঁর সংকলিত খৃষ্টধর্মের মূলনীতি সম্বলিত একটি গ্রন্থ ও অপর একটি প্রশ্নোত্তরমালার কথা উল্লেখ করেন। তাঁরই সহকর্মী ডমিনিক দা সুজা (Dominic da Sousa) যিনি বাংলা শিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তিনিই বই দুটি বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৭২৩ সালে উল্লেখিত ফাদার বারবিয়ে (Father Barbier) নামে একজন পর্তুগীজ পাদ্রীর রচিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমালা নামক একটা ক্ষুদ্র বাংলা বইএর সন্ধান পাওয়া যায়।[১]

যা হোক এখানে সেখানে উল্লেখের ফলে বইগুলোর নাম আমাদের আর অজানা নয়। তবে যেহেতু এদের কোনটার সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যায় না তাই বইগুলোর বিস্তারিত বিবরণ কিংবা তাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। এমন কি তাদের সবগুলো অথবা কোন একটা বই মুদ্রিত আকারে ছিল কি না তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

পরবর্তী সময়ের কয়েকটি বই আজও কালের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করে বেঁচে আছে। এই বইগুলি সম্বন্ধেই আমরা এখন আলোচনা করবো। আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু বাংলার আদি মুদ্রণ ও মুদ্রিত বই হলেও ভারতের বাইরে রচিত ও মুদ্রিত বাংলা বই সম্পর্কে এখানে কিছু বলা সমীচীন মনে করি। এই জাতীয় বইগুলোর মধ্যে পাদ্রী ম্যনুয়েল দা আসুম্পসাওঁএর প্রণীত রোমান হরফে মুদ্রিত তিনটি বাংলা বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফাদার আসুম্পসাওঁ ১৭৩৪ সালে বাংলাদেশে আগমন করেন। তিনি বাংলার St. Nicholas of Tolentino মিশনের রেক্টর রূপে কাজ করার সময় ১৭৪২ সালে ভাওয়াল পরগণার নাগোরির ক্যাথলিক গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[২] আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে পর্তুগীজদের স্বদেশ থেকে আমদানীকৃত অথবা ভারতে মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টধর্মের প্রচার। ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাওঁএর বইগুলো

১। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলিকাতা; ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ৫২। সজনীকান্ত দাস সুনীতি কুমার চাটার্জী এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

২। এই মিশন এবং নাগোরির গির্জার ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণের জন্যে Campos এর History of the Portuguese in Bengal কলিকাতা, ১৯১৯ ইংরাজী, পৃঃ ২৪, ১১১, ও ১৪৭-২৪৯ দেখুন।

রচনার পিছনে শুধুমাত্র এই প্রেরণাই কাজ করেছে। নিজের স্বীকৃতির মধ্যেই তিনি বলেছেন যে নবদীক্ষিত খৃষ্টানদের কাছে খৃষ্টধর্মের নীতিগুলো অপেক্ষাকৃত সহজ করে তোলাই ছিল তাঁর পুস্তক রচনার মূল উদ্দেশ্য। ফাদার আসুম্পসাঁও এর রচিত বইগুলোর নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(ক) Catechismo da Doutrina Christaá বা খৃষ্ট মতবাদ সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর মালা। কথোপকথনের মাধ্যমে খৃষ্টধর্মের মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা হল বইটির বিষয়বস্তু। ১৭৪৩ সালে বইটি লিসবনে ফ্রান্সিসকো দা সিলভা (Francisco da Silva) কর্তৃক মুদ্রিত। বইটি পর্যায়ক্রমে এক কলাম বাংলা ও পরবর্তী কলাম পর্তুগীজ ভাষায় রচিত এবং এর বাংলা অংশ রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছে।

ভূষণার খৃষ্টধর্মান্তরিত একজন বাঙালী রাজকুমার ঐ বইটির মূল রচয়িতা। ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাঁও মূল বাংলা থেকে পর্তুগীজ ভাষায় এর অনুবাদ করেন। পুস্তকটির মুদ্রণ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। স্পেনের ভ্যালাদলিদস্থ Colegio dos Agostinhos Filipinosএর পাদ্রী ফাদার থার্সো লোপেজের প্রেরিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ফাদার হোস্টেন বলেন যে বইটি উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারেই মুদ্রিত হয়। কিন্তু ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর সম্পাদিত ব্রাহ্মণ ক্যাথলিক সংবাদে বলেন যে বই খানি আদৌ ছাপা হয় নি এবং তিনিই স্পেনের ইভোরায় রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপির অংশের প্রতিলিপির প্রথম মুদ্রণ করেন।[১]

১। H. Hosten "The Three First Type Printed Bengali Books. Bengal Past and Present: vol-IX Pt. 1, July-Sep. 1914, pp. 40-63.

ডাঃ সেনের বইটি উপরোল্লেখিত নামে ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। মূল বইটি Don Antonio da Rozario নামক ভূষণার একজন বাঙালী রাজকুমার কর্তৃক লিখিত হয়। তিনি বাল্যকালে মগদস্যুদের হাতে বন্দী হয়ে আরাকানে নীত হন। এই সময়ে তিনি আরাকানস্থ রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের দ্বারা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাদের সাহায্যে বাংলায় ফিরে এসে এই বাঙালী রাজকুমার বাংলায় পর্তুগীজ মিশনারীদের শক্তির আধার হয়ে উঠেন। আসুম্পসাঁও মূল বইটির পর্তুগীজ অনুবাদ করেন এবং বইটি এভোরার আর্চবিশপ Father Miguel des Tavoraর নামে উৎসর্গ করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে আসুম্পসাঁও নিজে ছিলেন এভোরার অধিবাসী।

(খ) Compendio dos Misterios da Fe... ফাদার ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাঁওএর রচিত খৃষ্টধর্মের রহস্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত এই বইটি লিসবনে ১৭৪৩ সালে ফ্রান্সিসকো দা সিলভা কর্তৃক মুদ্রিত হয়। বইটির বিশেষত্ব এখানে যে বইটির ডান হাতের পৃষ্ঠায় মূল পর্তুগীজ ও বাম হাতের পৃষ্ঠায় বাংলা অনুবাদ ছাপা।

এই বইটি Catechismo da Doutrina Christa Ordenado por modo de Dialogo em Idioma Bengalla e Portuguez নামেও পরিচিত। এর বাংলা আখ্যা হলো 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (Crepar Xaxtrer Orth bhed)

(গ) Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas Partes...[দুইভাগে বিভক্ত বাংলা এবং পর্তুগীজ ভাষার একটি শব্দকোষ] বইটি ফ্রান্সিসকো দা সিলভা কর্তৃক ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত। এই বইটিতেও বাংলা হরফের পরিবর্তে রোমান হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। বইটি বাংলা ও পর্তুগীজ এই দুই ভাগে বিভক্ত এবং বাংলা শব্দকোষের প্রথমে বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।[১]

রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীদের দ্বারা রচিত অপর দুইটি বইয়ের লেখকের নাম বেণ্টো দা সুজা (Bento Da Souza)। গোয়ায় তাঁর জন্ম হলেও বাংলা দেশে তিনি সুদীর্ঘ পনর বছর কাজ করেছেন। তিনি Book of Prayer ও Catechism নামে দুইটি বইয়ের অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ করেন। পুস্তক দুটি 'প্রার্থনামালা' (Prarthanamala) ও 'প্রশ্নোত্তরমালা' (Proshnottar-mala) নামে লণ্ডন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়।

বাংলাদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় লিখিত বই রোমান হরফে ছেপে প্রকাশ করার জন্য পর্তুগীজ পাদ্রীর সযত্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের অনুরূপ উন্নতি সাধিত হয় নি। নিম্নলিখিত কারণগুলোর সাহায্যে এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে : (১) প্রথমতঃ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত পাদ্রীগণ শুধুমাত্র ধর্মমূলক

১। Hosten.

বই প্রকাশ করতেন; (২) রোমান হরফে ছাপা এই সব বইয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না এবং (৩) শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর ও অসংগবদ্ধ বাঙালী জাতি তাদের ভাষা ও সাহিত্যে মুদ্রণের বিপুল সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করে উঠতে পারে নি। এ ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরাজমান হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিও ছিল সেই ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ।

এই সব কারণে পঁয়ত্রিশ বছর পরেও ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হলহেড (Nathaniel Brassey Halhed) (১৭৫১-১৮৩০) এবং উইলিয়ম কেরীর (William Carey) (১৭৬১-১৮৩৪)[১] মতো নিরপেক্ষ অথচ নির্ভরযোগ্য পর্যবেক্ষকগণ ঐ আমলের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বইএর তীব্র অভাব লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছিলেন। হলহেড তাঁর বিখ্যাত A Grammar of the Bengal Language এর প্রণয়ন ও প্রকাশের সময় বলেন যে বাঙালী লেখকদের লেখার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি ধর্মীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সহ মাত্র ছ'খানি বইয়ের সন্ধান পান। এই বইগুলি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির আকারে তাঁর হস্তগত হয়। পরে বাংলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত উইলিয়াম কেরী যখন বাংলার ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করেন তখন অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি মাত্র ৪০টি বইয়ের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পর্তুগীজদের প্রচেষ্টায় লিসবনে মুদ্রিত তিনটি বাংলা বইয়ের জন্য ১৭৪৩ সালে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর হিসাবে পরিগণিত হয়। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র একটি বই মুদ্রণ ও প্রকাশের ফলে ১৭৭৮ সাল বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের ইতিহাসে তার চেয়েও অধিক স্মরণীয় বৎসর।

১। Dictionary of National Biography Vol. viii. pp. 625-26 হলহেডের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেরীর জীবনকথা সম্বন্ধে অনেক বই আছে। এর মধ্যে J. C. Marshman লিখিত The Life and Times of Carey, Marshman and Ward...1859 ও S. Pearce Carey প্রণীত William Carey, London. 1923 বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৭৪৩ সাল থেকে ১৭৭৮ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলা দেশে রচিত কোন ছাপা বইয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাই এই কালকে বাংলা পুস্তক মুদ্রণের বন্ধ্যাত্বের যুগ বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক ১৭৭৮ সালে হলহেড তার বিখ্যাত ব্যাকরণটি হুগলীতে ছাপেন। চার্লস উইলকিন্সের তৈরী প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত এই বইটির বহুস্থানে কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে বহু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে।[১] হলহেড এবং উইলকিন্সের যুগ্ম প্রচেষ্টার ফলে বাংলা সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হয়। উত্তরকালে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী জাতীয় সাহিত্যরূপে বাংলার স্বীকৃতি পাওয়ার মূলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই দুই ইংরাজ সিভিলিয়ানের দান অনেকখানি। অবশ্য সেই সময়ে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা তাঁরা নিজেরা কিংবা তাঁদের পৃষ্ঠপোষক ও বাংলার সুধীসমাজের কারো পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না।

মুদ্রিত বাংলা বইয়ের সংখ্যা এবং বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন দীন অবস্থা হলহেড, কেরী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের নিকট নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও বেদনাদায়ক হলেও এই সময় হতে তাঁদের সযত্ন সাধনার ফলে বাংলা বই উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক সুবর্ণ যুগের সুচনা হয়। এই স্বর্ণযুগ সৃষ্টির পেছনে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটা কাজ করেছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর যুদ্ধ কৌশল, কূটনীতির প্রয়োগ ও ষড়যন্ত্রের বলে ইংরাজগণ কলহপ্রিয় স্বার্থপর ওমরাহ পরিবেষ্টিত আরামপ্রিয় দুর্বল নবাবের কাছ থেকে শাসনদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ছিনিয়ে নেয়। পরবর্তী যুগে ইংরাজ শাসন এদেশে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ইংরাজগণ ক্রমে ক্রমে একদিকে মুসলমান আমলের সরকারী ভাষা ফারসীর বিরুদ্ধাচরণ ও অপরদিকে আরবী-ফারসী শব্দবর্জিত সংস্কৃতবহুল বাংলার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। তাদের বাংলা ভাষার প্রতি এই আকস্মিক অনুরাগের পেছনে ভাষাগত কিংবা সাহিত্যিক মূল্যবোধের চাইতে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের প্রেরণাই ছিল প্রধান। বহুদিন পর্যন্ত মুসলমান রাজদরবারে ফারসী

১। হলহেডের ব্যাকরণ মূলতঃ লেখা হয় সে সমস্ত ইংরাজ শিক্ষার্থীদের জন্য যাদের বাংলা ভাষার সাথে প্রাথমিক পরিচয় ছিল।

রাষ্ট্রভাষার সম্মান পাচ্ছিলো বলে সেই আমলের অন্যান্য দেশীয় ভাষার মতো বাংলাও ছিল ফারসী শব্দবহুল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলা দেশের শাসনভার বৃটিশ শক্তির হাতে চলে যায়। তাই এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে বিজয়ী ইংরাজ বিজিত মুসলমান শাসকদের রীতি-নীতি, আদব-কায়দা এবং ভাষাকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। আরবী-ফারসীবর্জিত সংস্কৃত-গন্ধী বাংলাভাষার উন্নয়নে ইংরাজদের এই উৎসাহ ছিল বাঙালী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু করার বহুবিধ কারসাজির মধ্যে অন্যতম।[১]

তা'ছাড়া একথাও অনস্বীকার্য যে ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের শাসনকার্যে দক্ষ করে তোলার জন্য কোম্পানী তাদেরকে দেশীয় ভাষার সঙ্গে পরিচিত করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলো। সংস্কৃত, বাংলা ও অন্যান্য প্রাচ্যভাষায় সুপণ্ডিত হলহেড, ফরষ্টার, কোলব্রুক, কেরী প্রমুখ ইংরাজ সিভিলিয়ান ও মনীষীরা সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার গোঁড়া সমর্থক ও উদ্যোক্তা ছিলেন, এবং পরিশেষে তাঁদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে। ডাঃ সুশীল কুমার দে এই উক্তির সমর্থনে লেখেন যে, "হলহেড ও ফরষ্টারের চেষ্টা এবং শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায় ও রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতার ফলে বাংলা ভাষা শুধু বাংলার সরকারী ভাষাতেই পরিণত হয় নি, বরং তা ভারতের অন্যান্য দেশীয় ভাষার চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।[২] মুসলমানী বাংলা সহ একে একে পাক-ভারতে ব্যবহৃত অন্যান্য ইসলামী ভাষার বিরুদ্ধে এইভাবে ইংরেজ শক্তি একজোট হয়ে দাঁড়ায়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনযন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট খাঁটি বাংলার সমর্থক প্রাচ্যভাষাবিদ ঐ সব ইংরেজদের অদম্য প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ফলস্বরূপ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী এক আইন পাশ করে। এই আইনবলে সরকারীভাবে কোম্পানীর আওতাভুক্ত সমস্ত আদালতে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

১। W. W. Hunter এর The Indian Musalmans দ্রষ্টব্য।

২। Sushil Kumar De, History of Bengali Literature in the Nineteenth Century, 1800—1825, Calcutta, 1919. পৃঃ ৯১।

ক্রমে ক্রমে ফারসী ভাষার পরিবর্তে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারে দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৭৫৫ সালের পর থেকে ভারতের হাটে-বাজারে দেশীয় ভাষায় সরকারী বিজ্ঞাপন টাঙানোর কথা জানা যায়। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ সালে বাংলার গভর্ণর এবং ১৭৭৩-১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি কোম্পানীর ইংরাজ সিভিলিয়ানদের জন্য এমন এক জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কোম্পানীর ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে থেকেও তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে পারে। ভারতের প্রধান প্রধান দেশীয় ভাষাগুলো শিক্ষা ছিল এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ এবং এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলিবারি কলেজের পাঠ্য-তালিকার প্রস্তুতির সময় এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো। ব্যক্তিগতভাবে হেষ্টিংস নিজে ও গ্ল্যাডউইন, হলহেড, উইলকিন্স, জোন্‌স্‌ প্রমুখ প্রাচ্যভাষাবিদ ইংরাজ পণ্ডিতবর্গের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলিবারী কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দেশীয় ভাষায় রচিত যথেষ্ট সংখ্যক বই প্রকাশের ব্যাপারে তাঁদের নিয়মিত উৎসাহ দিতেন।

ইউরোপীয় (এবং পরবর্তী কালে ভারতীয়) পণ্ডিতদের প্রাচ্যভাষা শিখতে এবং সে সমস্ত ভাষায় বই লিখতে উৎসাহ দেবার নীতি উত্তরকালে আরো ব্যাপক আকারে গৃহীত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস যখন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন তখন প্রখ্যাতনামা ইংরাজ রাজনীতিবিদ ও জনসেবক মিঃ উইলিয়াম উইলবারফোর্স পার্লামেন্টে প্রস্তাব করেন যে দেশীয় শিক্ষার প্রসারকল্পে পাক-ভারতে কোম্পানীর বেশী এবং ভাল সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা উচিত। এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে আপাতঃদৃষ্টিতে এই মহৎ উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় পাদ্রী ও শিক্ষিত ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হয় এবং ভারতে বহু ছাপাখানা স্থাপনে ও ভারতীয় শিক্ষার উন্নতি সাধনে আত্ম-নিয়োগ করে। বস্তুতঃ খৃষ্টধর্ম প্রচার ও এদেশে একদল উৎকৃষ্ট সিভিলিয়ান সৃষ্টিই ছিল ঐ ছাপাখানাগুলো স্থাপনের প্রাথমিক ও মূল উদ্দেশ্য। পরোক্ষভাবে এই ছাপাখানাগুলোর সাহায্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয় এবং এদেশের শিক্ষাও দ্রুত প্রসার লাভ করে।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীরা বৃটিশ পাক-ভারতে স্থান না পেয়ে বাধ্য হয়ে দিনেমার রাজ্য শ্রীরামপুরে তাঁদের মিশন ও ছাপাখানা স্থাপন করেন। এর পরের বৎসরই ইংরাজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার প্রকাশ্য অভিপ্রায় নিয়ে লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার মুদ্রিত পুস্তকের ইতিহাসে এই ঘটনা দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সমর্থন ও সাহায্যে বাটারওয়ার্থ বেইলী, ডাঃ কেরী এবং প্রাচ্যভাষা শিক্ষায় উৎসাহী অন্যান্য ব্যক্তিগণ মিলে Calcutta School Book Society প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতিটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও মুদ্রিত বইয়ের অধিকতর প্রসার ও ক্রমোন্নয়ন।

বাংলা মুদ্রণশিল্পের উন্নয়নের ইতিহাস বৈচিত্র্যময় কিন্তু এর ধারা যে কেন বাধা-বিমুক্ত অবাধ গতিতে প্রবাহিত হয় নি সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করবো। কিন্তু তার পূর্বে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলা দেশের মুদ্রণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা সমীচীন মনে করি। ১৭৭৮ সালে এনড্রুজ নামক জনৈক পুস্তক বিক্রেতা হুগলীতে বাংলার সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা থেকেই হলহেডের ব্যাকরণটি ছাপা হয়। বেঙ্গল গেজেটের কুখ্যাত সম্পাদক এবং প্রকাশক জেমস্ অগাষ্টাস হিকী দুই বছর পরে বাংলার দ্বিতীয় ছাপাখানা 'বেঙ্গল গেজেট প্রেস' স্থাপন করেন। এই প্রেস থেকেই 'হিকীর গেজেট' নামে সমধিক পরিচিত বেঙ্গল গেজেট পত্রিকা প্রকাশিত হতো। বেঙ্গল গেজেটে হিকীর যথেচ্ছা নিন্দাভাষণে সরকারী মহল অচিরেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তৎকালীন বৃটিশ-ভারতের বড়লাট হেষ্টিংস ও তাঁর কাউন্সিল হিকীকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইনকে একটি প্রেস স্থাপনের জন্য উৎসাহ দেন। গ্ল্যাডউইন ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে Calcutta Gazette Press স্থাপন করেন।[১] এ প্রেস থেকেই সরকারী গেজেট প্রকাশিত হতো

১। গ্ল্যাডউইনের আধা-সরকারী ছাপাখানিটি ১৭৮৬ সালের শেষে বা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মরিস হ্যারিংটন ও মেয়ারের নিকট বিক্রি হয়। সরকারী মুদ্রণের কাজ ১৮১৫ সালে ২৫শে মে তারিখে সদ্যস্থাপিত মিলিটারী অর্ফ্যান প্রেসে হস্তান্তরিত করা হয়।

এবং কোম্পানীর অধিকাংশ মুদ্রণকার্য নিষ্পন্ন হতো। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা মুদ্রণশিল্পের জনক চার্লস উইলকিন্সের সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে সরকার নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রেসটি প্রথমে অনারেবল কোম্পানীর প্রেস ও পরবর্তীকালে গভর্ণমেণ্ট প্রেস নামে পরিচিত হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা শহরে কলিকাতা ক্রনিকল প্রেস, পোষ্ট প্রেস, ফেরিজ এণ্ড কোম্পানীর প্রেস, রোজারিও এণ্ড কোম্পানীর প্রেস সহ বহুসংখ্যক ছাপাখানা গড়ে উঠে। এই সবগুলো ছাপাখানাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপিত এই সব ছাপাখানাগুলোতে ছাপার আনুমানিক খরচ নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে উইলকিন্সের ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর প্রেসে কি পরিমাণ খরচ পড়তো তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া গেল।[১]

ইংরাজী ছাপার হার

ফোলিও পোষ্টের কাগজের প্রতি দিস্তার জন্য খরচ

	সিক্কা টাকা
এক পৃষ্ঠার জন্য	৩৲
উভয়	৫৲

ফারসী ও বাংলা ছাপার হার

ফোলিও পোষ্টের কাগজের প্রতি দিস্তার জন্য খরচ

এক পৃষ্ঠার জন্য	৫৲
উভয় ,, ,, ...	৭৲

১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেসলী মহীশূরের অধিপতি টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থাবলম্বন হিসেবে অবাধ মুদ্রণের উপর তিনি কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ফলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বহুক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হয় ও বাংলা মুদ্রণের গতি অস্বাভাবিকরূপে ব্যাহত হয়।

১। Revenue Dept. Letter dated 8th January, 1779. সজনীকান্ত দাসের বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ শীর্ষক প্রবন্ধে (সাহিত্য পত্রিকা, ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ১৮৮, ১৩৪৫ বাংলা ,১৯৩৯ ইং) বিবৃত।

এ নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। অতঃপর ১৮১৮ সালে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল মার্কোয়েস অব হেষ্টিংস ছাপাখানার উপর আরোপিত কড়াকড়ি বহুলাংশে হ্রাস করেন।[১] এর স্বাভাবিক ফলস্বরূপ এ দেশে বহুসংখ্যক ছাপাখানা গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে স্থাপিত বেশ কয়েকটি ছাপাখানার মালিক ভারতীয়েরা ছিলেন বলে জানা যায়।

১৮২৫—২৬ খৃষ্টাব্দে একমাত্র কলিকাতাতেই প্রায় চল্লিশটি প্রেস চালু অবস্থায় ছিল। এগুলোর মধ্যে পূর্ববর্ণিত প্রধান প্রধান ছাপাখানাগুলি ছাড়া বৌবাজারের মিঃ লেভেনডিয়ারের প্রেস, ইটালীতে (এণ্টালী) মিঃ পিয়ার্সের প্রেস, ধর্মতলার রামমোহন রায়ের ইউনিটারিয়ান প্রেস, ১৮০৬—১৮০৭ সালে স্থাপিত খিদিরপুরের বাবুরামের সংস্কৃতযন্ত্র (এঁরা ছিলেন দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ছাপায় বিশেষজ্ঞ), মির্জাপুরে মুন্সী হেদায়েতউল্লার মোহাম্মদী প্রেস, হিন্দুস্থানী প্রেস, কলেজ প্রেস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উইলিয়াম কেরী এবং শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস সে সময়ের বাংলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রেস ছিল। এ সম্বন্ধে অপর একটি প্রবন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৭৭৮ সালের পূর্বে চালু ছাপাখানাগুলো সাধারণতঃ বিদেশ থেকে ইংরাজী এবং অন্যান্য দেশীয় ভাষার টাইপ আমদানী করত। এমন কি কাগজ, কালি ও ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির জন্যও এঁরা সম্পূর্ণরূপে বিদেশের মুখাপেক্ষী ছিল।

গ। বাংলা হরফের প্রথম ঢালাইখানা

বাংলাভাষার প্রথম বইগুলি রোমান হরফে বিদেশে মুদ্রিত হতো। প্রথম প্রথম বাংলা হরফগুলোও বিদেশেই তৈরী হতো। হষ্টেনের মতে ১৬৯২ সালে জেসুইট পাদ্রী Jean de Fontenoy, Guy Tachard, Etienne Noel এবং Claude Beze প্রণীত Observations Physiques et Mathematiques pour servir à l' histoire naturelle, et la perfection de l' Astronomie et la Geographie শীর্ষক পুস্তকে সর্বপ্রথম

১। ১৮৩৫ সালে স্যার চার্লস মেটকাফ অল্পসময়ের জন্য গভর্ণর জেনারেল থাকাকালীন মুদ্রাযন্ত্রের 'স্বাধীনতা' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা বর্ণমালা মুদ্রিত হয়।[১] জর্জ জেকব কের (Georg Jacob Kehr) কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় লিখিত Aurenk Szeb নামে ১৭২৫ সালে লাইপজিগে মুদ্রিত অপর একটি বইয়ে অনুরূপভাবে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহারের কথা জানা যায়। এই বইয়ে ১ থেকে ১১ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা, বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ এবং Sergeant Wolfgang Meyer এই জার্মান নামটি বাংলায় অক্ষরান্তরিত হয়ে "শ্রী সরজন্ত বলপকাং মাএর" রূপে মুদ্রিত হয়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে লাইপজিগে মুদ্রিত জোহান ফ্রাইডরিখ ফ্রিটজের (Johann Friedrich Fritz) এর Orientalischer und Occidentalischer Sprachmeister বইটিতেও পূর্বে উল্লেখিত বইগুলোর অনুকরণে বাংলা সংখ্যা ও বর্ণমালার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। জোয়ানেস জশুয়া কেটেলেয়ার (Joannes Joshua Ketelaer) প্রণীত Miscellanea Orientali নামক হিন্দী ভাষার ব্যাকরণেও বাংলা বর্ণমালা মুদ্রণের কথা জানা যায়। শেষোক্ত বইটি ওলন্দাজ লেখক ডেভিড মিলের (David Mill) ল্যাটিন ভাষায় রচিত Dissertationes Selectae পুস্তকটির সাথে একত্র করে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লাইডেনে একখণ্ডে মুদ্রিত হয়। উক্ত বইয়ের Alphabetum Brahmanicum iii B শীর্ষক প্রতিলিপিতে বাংলা বর্ণমালার স্বর ও ব্যঞ্জন এই উভয় প্রকারের প্রায় সমস্ত বর্ণই ছাপা হয়েছে।[২] এ সমস্ত বাংলা হরফগুলো কখন এবং কোথায় যে ঢালাই হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না এবং এগুলোর নির্মাতার পরিচয়ও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। বলা বাহুল্য ঐ টাইপগুলো সুন্দর হস্তাক্ষরের নমুনা অনুসারে নির্মিত হয় নি।

এর কিছুকাল পরে বিলাতে বাংলা হরফ তৈরীর জন্য ছেনিকাটা ও ঢালাইএর প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। খ্যাতনামা ইংরাজ অক্ষরনির্মাতাদের প্রশংসনীয় কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি, তবু তাদের দু'একজন সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করতে চেষ্টা করবো।

১। H. Hosten, পৃঃ ৪০

২। সুনীতি কুমার চাটার্জী এবং প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত ম্যানুয়েল দা আসুম্পসাওঁয়ের বাংলা ব্যাকরণ ... কলিকাতা, ১৯৩১, প্রবেশিকা পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য।

মিল তার উপরোক্ত ল্যাটিন বইতে কিছুটা ভুলবশতঃই বলেন যে বাংলা বর্ণমালা ভারতের সর্বত্র বিশেষতঃ বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় ব্যবহৃত হতো।

সামান্য শিক্ষানবীশের পদ থেকে বিখ্যাত হরফনির্মাতা জোসেফ জ্যাকসনের নাটকীয় অভ্যুদয়ের কাহিনী সত্যিই আশ্চর্যজনক। লণ্ডনস্থ ক্যাসলনের ঢালাই খানায় জ্যাকসন সামান্য ঘর্ষকের চাকুরী করতেন। এখানকার কর্তৃপক্ষের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি গোপনে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ছেনিকাটার পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। তারপর কালে তিনি কিরূপে বিলাতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হরফ নির্মাতার আসনটি দখল করেন তা আমাদের আলোচ্যবস্তুর বাইরে। তবে বিভিন্ন প্রাচ্যভাষার হরফনির্মাণে জ্যাকসনের প্রচেষ্টার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৭৭৩ সালে তাঁর কারখানায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ভাষার টাইপের এক তালিকায় গ্রিক (ডবল পাইকা), ফারসী (ইংলিশ) ও বাংলার নাম দেখা যায়। তালিকাটিতে বাংলাকে "Modern Sanskrit" বলা হয়েছে। Modern Sanskrit এর ব্যাখ্যা দিতে তালিকায় বলা হয়েছে "a corruption of the character of the Hindoos, the ancient inhabitants of Bengal !" রো মোরেস (Rowe Mores) এর মতে জ্যাকসন উইলেম বোল্টস্ নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারীর কাছে থেকে বাংলা হরফ নির্মাণের নির্দেশ পান। মিঃ বোল্টস্ কলিকাতা মেয়র কোর্টের একজন অল্ডার-ম্যান বা বিচারপতি ছিলেন। রীডের মতে কোম্পানীর নির্দেশেই তিনি একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা আরম্ভ করেন; কিন্তু ১৭৭৪ সালে আকস্মিক ভাবে তাঁর ইংলণ্ড ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ফলে জ্যাকসনের অর্ধসমাপ্ত বাংলা 'ফাউন্ট' তৈরীর কাজ বেশীদূর এগোতে পারে নি।

কোম্পানী বোল্টস্‌কে যে ঐ বাংলা ব্যাকরণখানা প্রণয়নের আদেশ দিয়েছিলেন একথা রীড তাঁর বইয়ে উল্লেখ করে বলেছেন যে এই বই রচনার মূলে কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ সিভিলিয়ানদের কাছে বিভিন্ন প্রাচ্যভাষা—বিশেষ করে ভারতীয় ভাষাগুলি—সহজগম্য করে তোলা এবং দেশীয় শিক্ষার মাধ্যমেই যুবক সিভিলিয়ানদের বিভিন্ন সরকারী পদের যোগ্য করে তোলা।[১]

সুচতুর বোল্টস্ নিজেকে একজন প্রাচ্যভাষা বিশারদ হিসেবে তুলে ধরতে হয়তো সফল হয়েছিলেন। প্রাচ্যভাষার পাণ্ডিত্য অর্জনের তাঁর এই দাবী যে

১। Reed, ৩১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কতটুকু যুক্তিযুক্ত বর্তমানে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তদুপরি উপরে উল্লেখিত ব্যাকরণটির রচনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কেননা ১৭৬৬ সালে থেকে ১৭৬৮ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ তিক্ত ছিল এবং এরই জের টানতে গিয়ে ১৭৭৪ সালে কোম্পানী এদেশ থেকে তাঁকে বলপূর্বক বহিষ্কৃত করেন। বিষয়টি বিবেচনা করলে কোম্পানী যে তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছিল তা বিশ্বাস করা কঠিন। সে যা'হোক বোল্টস্ যে ব্যাকরণখানি রচনার কাজে আদৌ সফলতা লাভ করতে পারেন নি তা নিশ্চিত। এর কারণ হিসাবে বোল্টসের বাংলা জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে উইলকিন্সের বক্রোক্তি বাদ দিলেও একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা টাইপ নির্মাণের বহুবিধ সমস্যাই তাঁর এই শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। রীড তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে বলেন যে বাংলা হরফের জটিল ধাঁচের নমুনা তৈরী করার মত যোগ্যতা বোল্টসের আদৌ ছিল না। বোল্টস্ বাংলা অক্ষরের যে নকশাগুলো জ্যাকসনকে ছেনিকাটার আদর্শ হিসাবে দিয়েছিলেন সেগুলি অনুপযুক্ত ও অসন্তোষজনক হওয়ায় এ হরফগুলির প্রস্তুতের কাজ কিছুকাল পর্যন্ত স্থগিত থাকে। অবশ্য চার্লস উইলিকিন্স কয়েক বৎসরের মধ্যে নিপুণভাবে বাংলা হরফ তৈরী করে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।[১]

বোল্টস্ এবং জ্যাকসনের হরফনির্মাণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সম্পর্কিত হলহেডের বিবরণটি খুব তথ্যবহুল। তিনি বলেন "Mr. Bolts ... attempted to fabricate a set of types for it with the assistance of the ablest artists in London. But as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, of which he has published a specimen, there is no reason to suppose that this project when completed would have advanced beyond the usual state of imperfection to which new inventions are constantly exposed".[২]

১। Reed, পৃঃ ৩১৩

২। হলহেড A Grammar of the Bengal Language. Introduction pp. XII—XXIV.

বিশেষজ্ঞদের মতে বোল্টসের এই ব্যর্থতার দোষ জ্যাকসনের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করলে ভুল করা হবে। কেননা জ্যাকসন বোল্টসের দেওয়া হরফের নমুনার হুবহু অনুকরণ করতে পেরেছিলেন। নিকৃষ্ট অক্ষরের নমুনা বা মডেলের জন্য সম্ভবতঃ বোল্টস্ স্বয়ং অথবা তাঁর নিযুক্ত শিল্পীদের অযোগ্যতাই দায়ী। মনে হয় তাঁর নিযুক্ত শিল্পীরা জ্যাকসনকে বাংলা অক্ষরের যথাযথ নমুনা সরবরাহ করতে সক্ষম হয় নি। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কিছুকাল পরে Captain Kirkpatrick এর তত্ত্বাবধানে উন্নত ধরণের এক ফাউন্ট দেবনাগরী অক্ষর তৈরী করে জ্যাকসন এই জাতীয় কাজে তাঁর নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রমাণ দেন। Kirkpatrick তাঁর Grammar and Dictionary of the Hindvi Language গ্রন্থটির জন্য ঐ হরফগুলো প্রস্তুত করান।[১]

হলহেড অনূদিত A Code of Gentoo Laws নামক বইটি বাংলা এবং দেবনাগরী অক্ষরের মুদ্রিত চিত্রসহ ১৭৭৬ সালে ছাপা হয়।[২] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে এর দুই বৎসর পরে হলহেডের বিখ্যাত A Grammar of the Bengal Language বাংলা হরফ নির্মাণের অগ্রদূত উইলকিন্সের তৈরী টাইপের সাহায্যে মুদ্রিত হয়।

১৭২৫ থেকে ১৭৭৬ সালের মধ্যে মুদ্রিত A Code of Gentoo Laws সহ জর্জ জেকব কের ও ডেভিড মিলের বইগুলোতে বাংলা হরফের বিভিন্ন নমুনার কোনটিই সার্থক হয়নি। কারণ এ নমুনাগুলি ছিল মুন্সীদের ত্রুটিবহুল বঙ্কিম হস্তাক্ষরের অবিকল প্রতিকৃতি। অবশ্য অক্ষরনির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে সবদেশের সব ভাষার জন্য এ কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। এ সম্পর্কে Polk বলেন "They (the early printers) even assiduously attempted to counterfeit the workmanship of the scribes ...in order that their handiwork might actually appear as manuscript"[৩].

১। Reed পৃঃ ৩১৪

২। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যের প্রথমযুগ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৫ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ; পৃঃ ৫৯।

৩। Ralph W. Polk, the Practice of Printing, Peoria, 1937. p. 7,

লাইপজিগ্, লেডেন ও লণ্ডনে নির্মিত বাংলা টাইপগুলোর মান উন্নত না হওয়ার প্রধান কারণ হলো ইউরোপীয় হরফনির্মাতাদের অপটু মুন্সীদের হস্তাক্ষরের উপর নির্ভরশীলতা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বাংলা মুদ্রিত বইয়ের ইতিহাসে ১৭৪৩ সালের মতো বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে ১৭৭৮ সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী নাথানিয়েল ব্রাসী হলহেড (১৭৫১-১৮৩০) প্রণীত A Grammar of the Bengal Language বইটির প্রকাশ বাংলা মুদ্রণ এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সূচনা করে। এই ঐতিহাসিক বইটি কলিকাতার অদূরে হুগলীতে মিঃ এনড্রুজের (Andrews) ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। এই প্রেসটি বৃটিশ-ভারতে হিকীর বেঙ্গল গেজেট প্রেসের দুই বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাপাখানাটি সম্পর্কে এর বেশী কোন তথ্য জানা যায় নি। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে হলহেডের অপরিসীম দান ও তাঁর ব্যাকরণটি সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এখানে আমরা বাংলা অক্ষর তৈরীর ক্ষেত্রে বাংলার ক্যাক্সটন নামে সুপরিচিত বাংলা ছাপার হরফের জন্মদাতা চার্লস উইলকিন্সের বিরামহীন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তাঁর সাফল্যের কথাই আলোচনা করবো।

বাংলা মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে চার্লস উইলকিন্সের বহুমুখী অবদানের কথা পর্যালোচনার পূর্বে এই বিশেষ বিদ্যায় কিরূপে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয় সে সম্পর্কে কিছু বলা একান্ত দরকার। উইলকিন্স যখন ২১ বৎসরের যুবক তখন তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য রাইটার হিসাবে বাংলাদেশে আসেন।[১] ভারতে নিযুক্ত অন্যান্য সিভিলিয়ানদের মতো তিনিও প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে

১। উইলকিন্সের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য Dictionary of National Biography Vol. XXI ২৫৯-২৬০ পৃষ্ঠা দেখুন। তাঁর জন্মের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে তাঁর জন্ম হয় ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কেউ কেউ ১৭৫১ সালের কথাও উল্লেখ করেন। হুগলীর প্রেসটিকে Dictionary of National Biographyতে ভুলবশতঃ উইলকিন্সের এবং হলহেডের জীবনীতে হলহেডের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংস্কৃত এবং ফারসী ভাষা শিখতে থাকেন। স্বচ্ছদৃষ্টি, বাস্তব মানস ও একজোড়া কর্মকুশল হাতের অধিকারী উইলকিন্স শুধুমাত্র নিজেই প্রাচ্যভাষা রফ্‌ত্‌ করে সন্তুষ্ট রইলেন না, উপরন্তু তাঁর সহকর্মীরা যাতে সহজে এদেশী ভাষা শিখতে পারেন সেদিকেও মনোযোগ দিলেন। তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ কাটার পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালান। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত নববিজিত বাংলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। শাসক হিসাবে তাঁর জীবন যতই বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে নিঃসন্দেহে তিনি একজন গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষা ব্যবস্থার তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। হিন্দু আইন সম্পর্কিত হলহেডের A Code of Gentoo Laws বইটির রচনার মূলে হেষ্টিংসের উৎসাহ যথেষ্ট প্রেরণা জুগিয়েছে। হেষ্টিংসের অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগিতায় কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের বাংলাভাষা শেখার সুবিধার্থে হলহেড ১৭৭৮ সালে A Grammar of the Bengal Language পুস্তকটি রচনা করেন।

বাংলাভাষার এই প্রথম ব্যাকরণটির রচনার পর হলহেড এটি ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা অক্ষরের কোন 'ফাউন্ট' খুঁজে পেলেন না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে জ্যাকসন বোল্ট্‌সের জন্য কিছু পরিমাণ বাংলা অক্ষরের ছাঁচ (matrices) কাটতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু বোল্ট্‌সের অতর্কিত লণ্ডন ত্যাগের ফলে ছাঁচ কাটার কাজটি পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে জ্যাকসনের তৈরী বাংলা হরফের ঐ 'ফাউন্ট্‌'টি অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক ছিল। এই থেকেই প্রমাণ করা যায় যে যদিও বোল্ট্‌স্‌ নিজেকে বাংলা ব্যাকরণ লেখার মত জটিল কাজের উপযুক্ত বলে প্রচার করেছিলেন তবু তাঁর বাংলা জ্ঞান ও ও বাংলা ব্যাকরণ রচনার যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে। এমন কি বাংলা হরফের নমুনা প্রস্তুতের জন্য বোল্ট্‌স্‌ যে লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সাহায্য নিয়েছিলেন তা'ও সন্দেহমুক্ত নয়। এ সম্পর্কে হলহেডের বিবরণ অতীব তথ্যবহুল। তিনি বলেন, "That the Bengal letter is very difficult to be imitated in steel will be readily allowed to every person who shall examine the intricacies of the strokes, the unequal length and size of the characters, and the variety of their positions and combinations. It was no

easy task to procure a writer accurate enough to prepare an alphabet of a similar and proportionate body throughout, with that symmetrical exactness which is necessary to the regularity and neatness of a fount. Mr. Bolts (who is supposed to be well versed in this language) attempted to fabricate a set of types for it with the assistance of the ablest artists of London But, as he has egregiously failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, there is no reason to suppose that his project when completed would have advanced beyond the usual state of the imperfection to which new inventions are constantly experd.",

বোল্টস্ প্রদত্ত বাংলা অক্ষরের নমুনার জ্যাকসনের সার্থক অনুকরণের কথা বিবেচনা করলে একথা আরো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে বাংলা ভাষার পণ্ডিত বা লেখক হিসাবে বোল্টসের দাবী আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরুপায় হলহেড অবশেষে বিদ্যোৎসাহী শাসক ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং বাংলা অক্ষরনির্মাতা রূপে চার্লস উইলকিন্সের নাম প্রস্তাব করেন কেননা ইতিমধ্যে উইলকিন্স বাংলা হরফনির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। উইলকিন্স ঐ সময় কোম্পানীর হুগলীস্থ কুঠিতে হলহেডের সহকর্মী রূপে কাজ করছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হিসাবে উইলকিন্সের সুখ্যাতি এবং বাংলা হরফনির্মাণে তাঁর সার্থক প্রচেষ্টার কথা গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের অজানা ছিল না। ফলে "The advice and even solicitation of the Governor-General prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the India Company's Civil Service in Bengal, to undertake a set of Bengal types. He did and his success has exceeded every satisfaction. In a country so remote from all connection with European artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist,

১। **Halhed, op. cit., Introduction, pp. xxii-xxiv.**

the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add the application of personal labour ; with a rapidity unknown in Europe, he surmounted all the obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art, as well as the disadvantages of a solitary experiment ; and has thus singly, on the first effort, exhibited his work in a state of perfection which in every part of the world has appeared to require the improvements of different projectors and the gradual polish af successive ages."[১]

নিয়মিত অভ্যাস ও পৌনঃপুনিক পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার ফলেই যে উইলকিন্সের দক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে একথা তাঁর অক্ষরগুলির সাথে প্রায় সমসাময়িক A Code of Gentoo Laws এ মুদ্রিত হরফগুলির তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায়। উক্ত বইটি ছাপার জন্য সম্ভবতঃ জ্যাকসনের অসমাপ্ত ফাউণ্টের টাইপগুলিই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ওগুলির তুলনায় দুই বৎসর পরে কাটা উইলকিন্সের অক্ষরগুলি সত্যিই খুব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল।

বাংলা হরফের প্রথম সম্পূর্ণ সাটের (complete fount) অক্ষরগুলির কে ছেনি কাটেন ও ঢালাই করেন এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ "বাংলার ক্যাক্সটন" উইলকিন্সের আবার কেউ কেউ তাঁর শিষ্য "বাঙালী ক্যাক্সটন" পঞ্চানন কর্মকারের নাম উল্লেখ করেন। নাম থেকেই বোঝা যায় যে পঞ্চানন জাতিতে কর্মকার ছিলেন। উইলকিন্সের সাগরেদী গ্রহণ করার পরে তিনি বাংলার প্রথম বাঙালী অক্ষরনির্মাতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা মনে রাখা উচিত যে রোমান বর্ণমালায় ছাব্বিশটি অক্ষরের স্থলে সাধারণ ভারতীয় ভাষায় স্বরচিহ্ন এবং সংযোজন চিহ্ন সহ প্রায় ছয়শত অক্ষর রয়েছে।[২] সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে বাংলা হরফের পূর্ণ সাট নির্মাণে অপেক্ষাকৃত বেশী সময়, পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দরকার হয়।

১। Ibid.

২। বিশ্বকোষে এই বিতর্কমূলক প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছে। এই বইটির পঞ্চদশ খণ্ডে, ১৯৮ পৃষ্ঠায় 'মুদ্রাযন্ত্র' নামক নিবন্ধে প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা সাটের কৃতিত্ব পঞ্চাননের উপর আরোপ করা হয়।

Portuguese	Bengalla
Resto,	Baqui.
Respeito, i, por este respeito.	Ei caron; Ei orth.
Restituir,	Phiria dite.
Restituiçaõ,	Phiria deon.
Resuscitar,	Zia utthité.
Resurreiçaõ dos mortos,	Zia utthon.
Retalho,	Qhan, Baqui.
Retardar,	Bilombo, Dirongó corité.
Reter o alheyo,	Porer mal raqhité, Gopto.
Ratificar;	Dhoraitė; Phiria cohité.
Retiro,	Ontor, Ghuchon.
Retirar-se,	Ontorité; Pharag hoité.
Retumbar,	Xobdo dite.
Retorno,	Phiria aixon.
Retroceder,	Paçhuaité Phirité.
Retrete,	Balqhanà; Chup qhanà.
Retorta couza,	Beca; Becaniá bosto.
Retrox,	Pacania rexom.
Revelar,	Gopto zanaité; Becto corité.
Revelaçaõ;	Gopter zanan.

Re;

Portuguese	Bengalla
Rever, i, tornar aver,	Phiria deqhite.
Reverencia,	Bhorom.
Rever, i, irse olicor.	C,huaité.
Rever-se no espelho,	Arxitė deqhitė.
Reverenciar, i, ter respeito.	Xėba corité.
Reverenciar,	Xeba corité; Bhocti corité.
Reverdecer,	Taza hoite.
Revezada couza,	Phira, Ghura.
Revez	Ulta.
Revolta, i, bulha,	Zhogora, Bibad.
Revoltozo.	Zhogoraniá: Bibadhi.
Revolver,	Ulott, pulott corité.
Rezaõ, i, cauza,	Caron.
Rezam, i, justiça.	Uchit.
Reza,	Zopon.
Rezar,	Zopité; Zopon corité.
Rezina,	Dhup.
Resoluçaõ,	Nistuc, Nirupon.
Resolver-se,	Corar corité.
Resoluto,	Xaoxi, Mordanà.
Resumido,	Olpo.
Riba, i, arriba,	Upor.
Ribançeira, i, borda do rio.	Par, Quinar, Cul.
Ribeiro,	Nala, Cala.

Rico.

ফাদার আসুম্পসাঁও রচিত এবং ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রোমান হরফে মুদ্রিত বাংলা শব্দকোষের একটি পৃষ্ঠা উল্লেখ করা যেতে পারে যে—এই বইটি বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম তিনটি বইয়ের অন্যতম।

মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বর মধ্যে এক অধ্যায়

Mohaabhaarotar dronporbbo mod,hya ak od,hyaayo

মুনিঃ বলে সুন পরিক্ষিতের তনয় ।
জেমতে সাত্যকি বীর হইল পরাজয় ॥

M*oo*neeh bol*a* ſ*oono* P*o*reekhyeet*a*r tonoy*o*

Jamota Saatyok*ee* beero ho-il*o* poraajoy*o*

এক কালে বসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ করে ।
নিমন্ত্রিয়া ভ্রাতৃ বন্ধু আনে সভাকারে ॥

Ak kaala B*o*ſoodab p*ee*tr*ee* ſhraaddh*o* kora

N*ee*mont*ree*yaa bhraatr*ee* bondh*oo* aana ſobhaakaara

সোমদত্ত বাহ্লিক আদি আর পঞ্চানন ।
সালু শিশু আইল পাইয়া নিমন্ত্রণ ॥

Somd*o*t Baahl*ee*k aad*ee* aar Ponchaanon

Saal*oo* ſheeſh*oo* aaeel*o* paaeeyaa neemontron

আইল অনেক রাজা নাহয় গননে ।
সভাকারে বসুদেব কৈল অভ্যর্থনে ॥

Aaeelo onak Raajaa naahoy genona

Sobhaakaara Boſoodab ko-il*o* obhyort,hona

হালহেড প্রণীত এবং উইলকিন্স কর্তৃক হরফ মুদ্রিত A Grammar of Bengal Language এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি।

তা ছাড়া ঐ কাজ যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। এ সম্পর্কে নরম্যান এলিস বলেন, "In hand typesetting a double case of roman characters can do the job for book-work, but up to seven cases of a similar size are needed for an Indian script. It is not unusual for an Indian press to have a fount of book type (of one size only) that extend to 2,000 pounds weight; at a comparative estimate of Rs. 3 per pound of type the cost of maintaining a composing room for book-work can be immense."[১]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বিবেচনা করা যেতে পারে যে ঐ ব্যাকরণটি ছাপার জন্য উইলকিন্সকে সম্পূর্ণ এক সাট অক্ষর তৈরী করতে হয়েছিল কি না? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে A Grammar of the Bengal Language শীর্ষক হলহেড সংকলিত ব্যাকরণখানা প্রাচীন বাংলার প্রসিদ্ধ বইগুলো থেকে নেওয়া যথেষ্ট সংখ্যক উদ্ধৃতিসহ একটি সম্পূর্ণ বই। সুতরাং এর মুদ্রণের জন্য সম্পূর্ণ এক সাট অক্ষরের প্রয়োজন হয়েছিল এরকম সিদ্ধান্ত করাই স্বাভাবিক। তা'ছাড়া উইলকিন্স ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত প্রথমে হুগলী প্রেসে ও পরে অনারেবল কোম্পানীর কলিকাতার প্রেসের টাইপ নির্মাণের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কোম্পানীর কলিকাতাস্থ প্রেসটির বাংলা বই ছাপার মতো সংগতি ছিল এবং সত্যি সত্যি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জোনাথান ডানকান অনূদিত Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewannee Adaulat এবং ১৭৯১ সালে এন, বি, এডমনষ্টোনের Bengal Translation of Regulations for the Administration of Justice in the Foujdarry or Criminal Courts বই দুইটি ছাপে। সুতরাং বিশ্বকোষ অনুসারে পঞ্চাননকে 'প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা অক্ষরের সাটের জনক' বলা ভুল এবং অন্যায়।

উইলকিন্সের তৈরী প্রথম বাংলা অক্ষরগুলি সম্পর্কে অপর একটি বিতর্ক-মূলক বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা ও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। কয়েকজন

১। Norman A. Ellis, "Indian Typography" in the Carey Exhibition of Early Printing and Fine Printing, ১০-১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিশিষ্ট বাঙালী পণ্ডিতের সযত্ন ও অক্লান্ত চেষ্টায় সংকলিত বিশ্বকোষের বহুস্থানে একথা উল্লেখিত আছে যে উইলকিন্সের প্রথম বাংলা অক্ষরগুলি ধাতুর পরিবর্তে কাঠে তৈরী হয়। আলোচ্য বিশ্বকোষের 'মুদ্রাযন্ত্র' সম্বন্ধে লেখা একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে "১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী শহরের মুদ্রাযন্ত্রে সর্বপ্রথমে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ইহাই বাঙ্গালা পুস্তকের সর্ব্বপ্রথম প্রচার। নাথানিএল ব্রসি হালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) বহু পরিশ্রমে এ' বাংলা ব্যাকরণ সঙ্কলন এবং বঙ্গীয় সেনাদলের অধ্যক্ষ সুযোগ্য ও সুপরিচিত সংস্কৃতাধ্যাপক (লেফটেনাণ্ট সি উইলকিন্স পরে সার চার্লস উইলকিন্স) স্বহস্তে উহার অক্ষর প্রস্তুত করেন। মহামতি উইলকিন্স তৎপরে এই অক্ষর খোদাই বিদ্যা (type-cutting) পঞ্চানন নামক জনৈক কর্ম্মকারকে শিক্ষা দেনে। এই ব্যক্তি ভাগীরথী তীরবর্তী শ্রীরামপুর নগরস্থ ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়কে এক সাট বাংলা হরফ (First fount of Bengali types) প্রস্তুত করিয়া দেন। পঞ্চানন কর্ম্মকার স্বকৃত প্রত্যেক অক্ষরের ১।০ সিকা দাম লইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই অক্ষরগুলি কাঠে খোদাই হইয়াছিল।"[1]

বিশ্বকোষে অনুরূপ মন্তব্য একাধিকবার করা হয়েছে। অন্য একস্থানে বলা হয়েছে যে শ্রীরামপুরস্থ পাদ্রীদের উদ্যোগে তাঁদের নিজস্ব প্রেসে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এবং 'সমাচার দর্পণের' জন্য গাছের ছালে অক্ষর খোদাইয়ের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চলে।[2] যা'হোক এ'ধরণের প্রচেষ্টা হয়ে থাকলেও তা ছিল সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষামূলক। সম্ভবতঃ পত্রিকার 'হেডলাইনের' বড় অক্ষর কিংবা ধাতুনির্মিত ছেনিকাটা অক্ষরের নমুনা তৈরীর জন্যই এ ধরনের প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এর কিছুকাল পরেই বিশ্বকোষের একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে "১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়, তাহাতে বাঙ্গালা অক্ষর ছিলনা। এই যন্ত্রে আবশ্যকমত কাষ্ঠের খোদাই করিয়া বাঙ্গালা অক্ষর মুদ্রিত করা হইত।......"[3]

১। বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮; অষ্টাদশ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬।

২। প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পন' শ্রীরামপুর হ'তে ২৩ মে ১৮১৮ সালে প্রাকাশিত হয়। ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৭ সালে প্রকাশিত হয় পত্রিকাটি প্রথমে ত্রৈমাসিক ছিল, পরবর্তীকালে এটা মাসিকে পরিণত হয়।

৩। এটি হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রেস।

বাংলাভাষায় লিখিত এই বিশ্বকোষটির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার উল্লেখের ফলে এ ধরনের মন্তব্যকে অনেকে বিনা প্রশ্নে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

যা'হোক উইলকিন্স থেকে আরম্ভ করে বাংলার বিভিন্ন টাইপনির্মাতাদের কার্যাবলীর যে বিবরণ আমরা দিয়েছি তা কাঠের অক্ষর ব্যবহারের মতো বিভ্রান্তিকর উক্তির অসারত্বের ইঙ্গিতই বহন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে "এ জাতীয় হরফে (কাঠের টাইপে) বই ছাপার প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য নহে।" তাঁরা আরো বলেন যে কাঠের টাইপে একটানা বই ছাপাও অসম্ভব। কারণ ছাপার সময় ফ্রেম বা chase এ আবদ্ধ দীর্ঘকাল ব্যবহৃত অক্ষরগুলিতে কালি দেবার ফলে ও অনবরত চাপে দুমড়ে যেতো এবং কাজের অযোগ্য হয়ে পড়তো।

Fournier[১] এর মতো বিখ্যাত মুদ্রাক্ষরবিদ কাঠের টাইপে মুদ্রণের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেন নি। প্রাথমিক মুদ্রিত বইয়ের হরফের ধাঁচের বিভিন্নতা ও অসমতার জন্য তিনি মনে করেন যে প্রথমাবস্থায় অক্ষরগুলিকে ধাতুনির্মিত ছাঁচে (Matrice) ঢালাই করা হয় নি। অনুরূপভাবে এই জাতীয় মতবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিতবর্গ প্রথম মুদ্রাক্ষরের মধ্যে আকৃতির মিলের অভাব লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে হলহেডের ব্যাকরণ থেকে আরম্ভ করে বাংলা মুদ্রণের প্রথমযুগে মুদ্রিত সমস্ত বইয়েই কাঠের হরফ ব্যবহৃত হতো। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে তা হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা পূর্বোল্লিখিত তামিল-পর্তুগীজ অভিধানের জন্য ইগনাসিয়াস আইচামণির কাঠের হরফ নির্মাণের কথা আমরা জানতে পেরেছি। সম্ভবতঃ এই জাতীয় একক দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করেই এরা বাংলা মুদ্রণের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে সেই একই বিবর্তনের কথা কল্পনা করেন।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলা দেশেও অক্ষর ঢালাইয়ের জন্য গোড়ার দিকে সমান আকারের কাটা ছাঁচ ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু তথাকথিত কাঠের অক্ষরগুলির মুদ্রিত প্রতিরূপ বিশেষভাবে পরীক্ষা করলে এগুলি যে ধাতুর তৈরী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক। রীডের কথায় "It is impossible, we think, to resist the conclusion that all the earlier works of typography were the impression of cast metal types; but that the methods of

১। প্রসিদ্ধ ফরাসী খোদক ও হরফ নির্মাতা। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন।

casting employed were not always those of matured letter founding seems to us not only probable, but evident from a study of the works themselves."

একথা ভুললে চলবে না যে, অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশের মুদ্রণের গোড়াপত্তন। তার বহু পূর্বেই ইউরোপে কাঠের টাইপের ব্যবহার উঠে গেছে। জার্মানী, পর্তুগাল, ইংলণ্ড প্রভৃতি থেকেই গোয়া, আম্বালাকাদ্দু, ত্রাংকেবার ও মাদ্রাজের খৃষ্টান মিশনারীদের মাধ্যমে মুদ্রণশিল্প বাংলাদেশে প্রসার লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছাপার জন্য বাংলায় যে সমস্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হতো তা প্রধানতঃ বিলাত ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে আমদানী করা হতো। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে পৌছা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে ঐ সমস্ত আমদানীকৃত দ্রব্যাদির মধ্যে ব্যবহারের অপ্রচলিত অনুপযুক্ত পুরানো আমলের কাঠের টাইপ ছিল না। কাঠের অক্ষর সম্পর্কিত ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের বিবরণটি আমরা পূর্বেই পেশ করেছি। এছাড়া তামিল পুস্তক মুদ্রণের প্রচেষ্টায় আইচামনি কর্তৃক কাঠের হরফ নির্মাণের একটি মাত্র দৃষ্টান্তই আমাদের জানা আছে। কিন্তু কাঠের তৈরী হরফ প্রয়োজনীয়তা মিটাতে ব্যর্থ হয়, তখন আমষ্টার্ডাম, হলে, সিংহল, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ধাতুর অক্ষর প্রস্তুত করা হয় ও তা দিয়ে আমাদের উল্লেখিত তামিল বইগুলো ছাপা হয়।

এ সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়া এ ব্যাপারে হলহেডের নিজস্ব উক্তি চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতে পারে। হলহেড তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেন, "The Bengal letter is very difficult to be imitated in steel"... .... অন্য এক জায়গায় আবার বলেছেন, "In a country so remote from all connections, he (Charles Wilkins) has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Founder and the Printer.[১]

উপরে প্রদর্শিত যুক্তি ও প্রমাণের সারবত্তা যদি কাঠের অক্ষরের সমর্থক পণ্ডিত মণ্ডলীর কাছে সন্তোষজনক না হয়ে থাকে তবে এ সম্পর্কে উইলকিন্সের নিজের উক্তিও বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানাই। ১৭৮৬ সালে শারীরিক অসুস্থতা হেতু উইলকিন্স দেশে ফিরে যান। সেখানে

১। হলহেডের ব্যাকরণ, Introduction pp. XXII—XXIV.

অবসরকালে তিনি A Grammar of the Sanskrita Language নামক তঁার বিখ্যাত ব্যাকরণটি সঙ্কলন করেন। বইটি লণ্ডনস্থ W. Bulmer & Co. কর্তৃক মুদ্রিত হয়। উইলকিন্স বইটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টরদের নামে উৎসর্গ করেন। কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হেইলিবারী কলেজে অধ্যয়নরত স্বদেশী যুবক সিভিলিয়ানগণ যাতে বিভিন্ন প্রাচ্যভাষা অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারে এই মহৎ ও প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে তিনি বইটি রচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই বইটি ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় অক্ষরের ছেনিকাটা ও ঢালাই করা সুপ্রসিদ্ধ অক্ষরনির্মাতা উইলকিন্স কর্তৃকই নিষ্পন্ন হয়। বইটির রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণে উইলকিন্স বলেন, "At the commencement of the year 1795, residing in the country, and having much leisure, I began to arrange my materials, and prepare them for publication. I cut letters in steel, made matrices and moulds and from them a fount of types of Devnagari character, all with my own hands." [১] উইলকিন্সের স্বহস্তে প্রস্তুত ধাতু-নির্মিত ছেনি ও অক্ষরে এক অসতর্ক মুহূর্তে আগুন ধরে যায় এবং বহু অক্ষর নষ্ট হয়ে যায়। উইলকিন্স এই ঘটনাটিও তাঁর ব্যাকরণটিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর উইলকিন্স যে ধাতুর অক্ষর নির্মাণে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এ কথায় আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সুতরাং হলহেডের ব্যাকরণ কিংবা অন্য কোন বাংলা বইয়ের জন্য তাঁর কাঠের অক্ষর খোদাই করার প্রশ্ন অবান্তর মাত্র।

অক্ষর নির্মাতারূপে উইলকিন্সের কার্যাবলী কেবলমাত্র বাংলা এবং দেবনাগরী বর্ণমালাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তিনি এক ফাউণ্ট ফারসী হরফও ঢালাই করেছিলেন। কিন্তু বাংলা অক্ষরের সম্পূর্ণ সাটের প্রথম নির্মাতারূপেই তিনি ভারতের ক্যাক্সটন নামে সুপরিচিত হয়েছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হালহেডের A Code of Gentoo Laws বইটি মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত জ্যাকসনের তৈরী বংলা হরফ ও অন্যান্য শিল্পীদের তৈরী বাংলা হরফগুলো মোটেই সুন্দর ছিল না। মুন্সীদের অপটু হাতের বাঁকাচোরা বর্ণমালাকে হুবহু অনুকরণ করায় ওগুলোতে কোন দক্ষতা-নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটে নি। ফলে

১। Charles Wilkins, A Grammar of the Sanskrita Language, লণ্ডন, ১৮০৮ ইং প্রবেশিকা, পৃষ্ঠা XII.

উইলকিন্সের তৈরী উন্নতমানের বাংলা হরফের সংঙ্গে ওগুলোর কোন প্রকার তুলনা চলতে পারে না। বিচক্ষণ উইলকিন্স হরফের সঠিক আকৃতি ও সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্যই একদল সুদক্ষ মুন্সী নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা উইলকিন্সের জন্য পরিষ্কার ও সুন্দর হরফের নমুনা প্রস্তুত করেন। হলহেডের ব্যাকরণে বাংলা উদ্ধৃতিগুলিতে ব্যবহৃত অক্ষরগুলো পূর্বের অক্ষরগুলোর চাইতে অনেক উন্নত ধরণের হওয়ায় বিশেষজ্ঞগণ এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী কালে তাঁরই সুযোগ্য সাগরেদ পঞ্চানন কর্মকার অধিকতর সুন্দর টাইপ প্রস্তুত করেন। এর পরে তাঁরই সুযোগ্য সাগরেদ পঞ্চানন কর্মকার অধিকতর সুন্দর টাইপ তৈরী করে বলে' বলা হয়েছে। কিন্তু সমাচার দর্পণে ১৮৩০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলা মুদ্রণ সম্পর্কিত তথ্যবহুল একটি প্রবন্ধের মতানুযায়ী উপরোক্ত উক্তির সত্যতা অস্বীকার করা চলে। প্রবন্ধে বলা হয় যে উইলকিন্সের অক্ষর সমাচার দর্পণে মুদ্রিত অক্ষরগুলোর চাইতে ছিল তিন গুণ বড়। কিন্তু তাহলেও এ প্রবন্ধে ১৭৯৩ সালে গভর্ণমেণ্টের আইন মুদ্রণের ব্যাপারে ব্যবহৃত হরফগুলির চাইতে উইলকিন্সের অক্ষরগুলিকে তুলনামূলক ভাবে বহুগুণে উৎকৃষ্ট বলা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে একথাও অনুমান করা যায় যে ঐ অক্ষরগুলি পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী। সুতরাং অক্ষর নির্মাণ বিদ্যায় পঞ্চানন তার ওস্তাদ উইলকিন্সের নৈপুণ্যকেও হার মানান এমন যুক্তির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত পঞ্চানন ও উইলকিন্সের হরফগুলির প্রতিকৃতির তুলনামূলক বিচারেও একথাই প্রতিপন্ন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

হলহেড ও উইলকিন্সের যুক্ত প্রচেষ্টায় সংকলিত এবং মুদ্রিত বাংলা ব্যাকরণটি প্রকাশের সাত বছর পর ১৭৮৫ সালে বাংলা মুদ্রিত দ্বিতীয় বই জোনাথান ডানকানের Regulations for the Administration of Justice in the Courts of Dewannee Adaulat এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। জোনাথান ডানকান বাংলাদেশে নিযুক্ত একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান ছিলেন। পরে তিনি বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন। সার এলিজা ইম্পে মহারাজ নন্দকুমারের ঐতিহাসিক বিচার যে দেওয়ানী আদালতের আইন ও ধারাগুলোর সাহায্যে করেছিলেন তা' উপরোক্ত বা Regulation Impey Code নামে পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয়।

হলহেডের বাংলা ব্যাকরণটি আগাগোড়া ইংরাজীতে লেখা এবং বইটির কেবল দৃষ্টান্তের জন্য স্থানে স্থানে বাংলা উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করলে ডানকানের বইটিকে নিঃসন্দেহে বাংলা মুদ্রিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ বলা যেতে পারে।

ডানকানের এই অনুবাদটি কোম্পানীর প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই প্রেস থেকেই পরে যথাক্রমে ১৭৯১ ও ১৭৯২ সালে নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোন নামক অপর এক সিভিলিয়ানের রচিত Bengal translation of Regulations for the Administration of Justice in the Fouzdarry, or Criminal Courts in Bengal, Behar and Orissa এবং Bengal Translation of Regulations for the guidance of the Magistrates, passed by the Governor General in Council in the Revenue Department, on the 18th of May, 1792 বই দুইটি মুদ্রিত হয়।

এর পরে ১৭৯৩ সালে হেনরী পিটস্ ফষ্টার কৃত Cornwallis Code এর বাংলা অনুবাদ ঐ প্রেস থেকেই মুদ্রিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে অনারেবল কোম্পানীর প্রেসটি গভর্ণমেণ্ট প্রেসে রূপান্তরিত হয়। অনূদিত বইটির নাম ছিল নিম্নরূপ "১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবাব গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুজুরের কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুজুরে কৌনসেলের অজ্ঞাতে মুদ্রণ করেন। মুদ্রণ স্থল কলিকাতা।" যতদূর জানা গিয়েছে তাতে মনে হয় যে ডানকান ও এডমনষ্টোনের অনুদিত গ্রন্থগুলো উইলকিন্সের তৈরী হরফে ছাপা হয় কিন্তু ফষ্টারের Cornwallis Code এর বাংলা অনুবাদটিতে উইলকিন্সের যোগ্য ছাত্র পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী অপেক্ষাকৃত উন্নত, ক্ষুদ্রাকৃতি ও সুন্দর টাইপে মুদ্রিত হয় একথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে বলা হয়েছে।[১] কেননা বলা হয়েছে যে কালে পঞ্চানন টাইপ নির্মানে তাঁর গুরুর চাইতে অনেক বেশী পারদর্শিতা লাভ করেছিল।

বাংলা মুদ্রাক্ষর-নির্মাণ শিল্পকে যিনি বঙ্গদেশে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন সেই স্বনামধন্য পঞ্চানন কর্মকার সম্পর্কে আরো কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। পঞ্চানন হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলা

১। সুশীল কুমার দে, পৃঃ ৮৮-৮৯ঃ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা ছাপারে হরফের জন্মকথা ভারতবর্ষ, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৪৪ বাং দ্রষ্টব্য।

অক্ষরের ছেনিকাটা ও ঢালাই করার জন্য উইলকিন্স যখন একজন যোগ্য দেশীয় সহকারীর খোঁজ করছিলেন তখন পঞ্চাননের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সবদিক দিয়ে উপযুক্ত ভেবে উইলকিন্স তাঁকে বাংলা হরফ তৈরীর কাজে নিযুক্ত করেন। উইলকিন্স অত্যন্ত যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে পঞ্চাননকে অক্ষর তৈরীর বিভিন্ন কৌশলগুলি শিক্ষা দিতে থাকেন। যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য পঞ্চাননও অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হরফনির্মাণে আশাতীত পারদর্শিতা লাভ করে। পরিতাপের বিষয় যে এই অদ্ভুতকর্মা হরফনির্মাতার বিস্তারিত কর্ম জীবনী সংগ্রহ করা যায় নি। উইলকিন্স যখন গভর্ণমেণ্ট প্রেসের ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধায়নায় ব্যস্ত ছিলেন পঞ্চানন সম্ভবতঃ তখন তাঁরই অধীনে কাজ করতেন। উইলকিন্স ১৭৮৬ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর থেকেই পঞ্চানন তাঁর নতুন পেশায় নব উদ্যমে কাজ করে যেতে থাকেন। তখন থেকেই ১৭৯৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি বিভিন্ন দেশীয় ভাষার হরফ নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠে। কিছুকাল পরে পঞ্চানন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ এবং সিভিলিয়ান এইচ, টি, কোলব্রুকের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই কোলব্রুকের চাকরী পরিত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যের এবং ভাষার গোড়ার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ডাঃ উইলিয়াম কেরীর সংগে যোগদান করেন। কেরীর সংগে তাঁর যোগদানের কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং এ শুভ যোগাযোগের ফলে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়।

এ সম্বন্ধে অপর একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার আশা রাখি।

ঘ। মুদ্রিত বাংলা বইয়ের প্রথম যুগ

আগেই বলেছি যে ১৭৭৮ সালে হলহেডের ব্যাকরণখানা প্রকাশের ফলে বাংলা ভাষার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এর আগে যে সমস্ত বাংলা বইয়ের কথা আমাদের জানা আছে তার সবগুলিই পর্তুগীজদের প্রচেষ্টায় ছাপা হয়। বাংলা ভাষার ঐ বইগুলি তারা রোমান হরফে বিদেশ থেকে ছাপিয়ে আনতেন। ধর্মপ্রচারের কাজ ত্বরান্বিত করাই ছিল তাদের পুস্তক প্রণয়নও মুদ্রণের মূল উদ্দেশ্য। হলহেডের ব্যাকরণটি নানা কারণে পূর্ববর্তী বইগুলি থেকে ভিন্ন। এই ব্যাকরণ সংকলনের মূলে পর্তুগীজ পাদ্রীদের মত হলহেডের কোন ধর্মীয় স্বার্থ ছিল না। ইংরাজ সিভিলিয়ানদের কাছে সংস্কৃত বহুল বাংলা ?

সহজগম্য করে তোলাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। অবশ্য তাঁর এ উদ্দেশ্যের সংগে রাজনৈতিক মতলব হাসিলের প্রশ্নটি ওৎপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। যা হোক ইংরাজদের জন্য একজন ইংরাজ কর্তৃক রচিত এই বইটির প্রায় সম্পূর্ণ অংশই ইংরাজীতে লেখা হয়েছিল। তবে দৃষ্টান্তের জন্য বাংলা হরফে মুদ্রিত বাংলা উদ্ধৃতির সংযোজনের ফলে বইটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কারণ বাংলা হরফে মুদ্রিত এই গুটি কয়েক বাংলা উদ্ধৃতিই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা করে। উক্ত উদ্ধৃতি সংগ্রহের জন্য হলহেড তৎকালীন পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত ও বিদ্যাসুন্দর সহ মোট ছ'খানি বইয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হলহেড কোম্পানীর অধীনে একজন রাইটার হিসাবে বাংলাদেশে আগমন করেন। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যে তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ওয়ারেন হেষ্টিংসের মতো তিনিও সদ্য আগত অনভিজ্ঞ ইংরাজ সিভিলিয়ানদের ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ভারত এবং ভারতবাসীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। হেষ্টিংসের সমর্থন এবং অনুপ্রেরণায় তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণটি সংকলন করে তাঁর মতবাদকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করলেন। বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে অনেকে এটাকে বাংলাভাষার বিজ্ঞান-সম্মত প্রবেশিকা বলে উল্লেখ করেছেন। বইটির ভূমিকায় হরফ নির্মাতা উইলকিন্সের অকুণ্ঠ অবদানের বিষয় তাঁর নিজের পরিশ্রমের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার মাঝে অতুলনীয় বিনয়ের পরিচয়ই পাওয়া যায়। হলহেড বলেন, "Although any attempt may be deemed incomplete or unworthy of notice, the book itself will always bear an intrinsic value from its containing as extraordinary an instance of mechanic abilities as has perhaps ever appeared."[১]

হলহেড বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত বাংলা গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে জোনাথান ডানকানের Impey Codeএর বাংলা অনুবাদ Regulation for the Administration of Justice in Fouzdary (or Criminal) Courts এবং হেনরী পীটস্ ফরষ্টারের Cornwallis Codeএর বাংলা অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য যদিও বইগুলি

১। হলহেড। ঐ প্রবেশিকা, পৃষ্ঠা XXIII—XXIV.

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কোম্পানী প্রণীত আইন কানুনের ব্যাখ্যার জন্য প্রধানতঃ লিখিত হয়। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এদের কোন মূল্যই খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৭৯৩ সাল থেকে ১৭৯৯ সালের মধ্যে বাংলাভাষা এবং সাহিত্যে অসীম সম্ভাবনা নিয়ে কয়েকটি বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়। আমরা এর আগে লিসবন থেকে মুদ্রিত ফাদার আসুম্পসাওঁয়ের Vocabulario lowm Idioma Bengalla, low Portuguez শীর্ষক রোমান হরফে মুদ্রিত বাংলা অভিধানটির কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু রোমান হরফে ছাপা হওয়ার ফলে এই বাংলা পর্তুগীজ অভিধানটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচ্য অভিধানগুলির মতো ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল থেকেই বিজয়ী ইংরাজ এবং বিজিত বাঙালী উভয়েই পরস্পরের ভাষা শেখার আগ্রহ দেখায়। এতে উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রণোদিত। হলহেডের ব্যাকরণটি এ জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রচিত হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রকাশের ১১ বৎসরের মধ্যেই বইটি অপ্রাপ্য হয়ে উঠে। ফলে স্বভাবতই একটি বাংলা ব্যাকরণ এবং বিশেষ করে ইংরাজী ও বাংলা এই দুই ভাষার একটি অভিধানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৭৯৭ সালে কয়েকজন বাঙালী অনুরূপ একটি ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশের জন্য কলিকাতা গেজেটে আবেদন জানান। ঐ আবেদনে তাঁরা বলেন যে, এ ধরণের বই প্রকাশিত হলে তাঁদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা অনেকটা সুবিধাজনক হবে। বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন এই সব আবেদনকারীরা এও বলেন যে, "By this means we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders." তাদের এ আবেদনে বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহের সাথে সাথে সরকারকে স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টাও স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়।[১]

ফলে ১৭৯৩ সালে সর্বপ্রথম এ ধরণের একটি শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। আখ্যাপত্রে বইটির নাম ছিল নিম্নরূপঃ ইংরাজি ও বাঙ্গালা বোকেবিলরি

১। W. H. Carey প্রণীত The Good Old Days of Honourable John Company, প্রথম খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

An extensive Vocabulary, Bengalese and English, very useful to teach the Natives English and to assist Beginners in Learning the Bengal Language, Calcutta, printed at the Chronicle Press.

অভিধানটির প্রণেতার নাম জানা যায় নি। তবে অভিধানের ভূমিকায় এই অজ্ঞাতনামা লেখক নিজের সম্পর্কে বলেন যে, The Author spent ten years in compiling and revising this work. He is very sensible of its defects ; but as it is the first of the kind, and promises much utility in diffusing the English language among the Natives, he hopes it will be candidly received by the publick. The Printer engages to furnish to every purchaser a complete Index, as soon as it can be prepared, gratis".[১]

বর্তমান যুগে পণ্ডিত মহলের কেউ কেউ কলিকাতা ক্রনিকল প্রেস এবং সাপ্তাহিক Calcutta Chronicle পত্রিকার মালিক মিঃ এ, আপজনকে উক্ত অভিধানটির প্রণেতা বলে অনুমান করেন। আপজন ১৭৯৫ সালে প্রকাশিত কলিকাতার মানচিত্র এবং ভারতের বিভিন্ন ডাকপথ-সম্বলিত মানচিত্র এবং ছুইটির মুদ্রাকর এবং প্রকাশক ছিলেন। তবে আপজন স্বয়ং অভিধানটির রচয়িত ছিলেন, না কেবলমাত্র মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন ; কলিকাতা ক্রনিকল পত্রিকায় প্রকাশিত বইটির বিজ্ঞাপনে এমন কোন স্পষ্ট উক্তি ছিল না।

অভিধানটি ডবল ক্রাউন যোল পেজী আকারে মুদ্রিত হয়। পুরোভাগে ভূমিকার কয়েকটি পাতা ছাড়া বইটিতে ৪৫৫ পৃষ্ঠা রয়েছে। বইটিতে বাংলা শব্দ বামে এবং ইংরাজী অর্থ ডানে—এইভাবে প্রত্যেক পাতায় ছুই কলামে ছাপা হয়। তাছাড়া শব্দ বিন্যাসেও একটা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরে স্বরবর্ণ সন্নিবেশ করা হয়েছে। 'শব্দকোষ'টী সম্পর্কে সজনীকান্ত বলেন যে, "এর অনেক হাল আমলে অপ্রচলিত, অনেক শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, সংস্কৃত তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম, দেশজ শব্দ অনেক

১। ইংরাজী ও বাঙ্গালা বোকেবিলরি An Extensive Vocabulary Bengales and English—Preface.

বেশী ; মুসলমানী শব্দের প্রাচুর্য্যও পরিলক্ষিত হয়। ফরষ্টারের অভিধান থেকে বাংলাভাষাকে সংস্কৃত বহুল করার যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল এই অভিধানে তার কোন চিহ্ন নেই।"[১]

আপজনের এই বাংলা-ইংরাজী অভিধানটি প্রকাশের কিছুকালের মধ্যেই Cornwallis Code এর অনুবাদক হেনরি পীটস্ ফষ্টার দুই খণ্ডে একটি সম্পূর্ণ দ্বিভাষিক অভিধান প্রণয়ন করেন। ইংরাজী-বাংলা এবং বাংলা-ইংরাজী এই দুই খণ্ড যথাক্রমে ১৭৯৯ এবং ১৮০২ সালে কেরিজ এণ্ড কোম্পানী প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়।

উক্ত অভিধানটি শুধু প্রথম যুগের বাংলা ভাষার শব্দকোষ হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ নয় ; বরং ডাঃ সুশীল কুমার দে'র মতে এটি সুকল্পিত এবং যত্ন-সহকারে সংকলিত শব্দকোষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তাঁর বিশ্বাস বইটি উইলকিন্সের তৈরী অক্ষরে ছাপা হয়। পরবর্তীকালে ফরষ্টারের এই বইটিই কেরীকে বাংলা শব্দকোষ প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করে। কেরী এই বাংলা অভিধান সম্পর্কে অন্য কোন প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রাখি। ফরষ্টারের শব্দকোষে প্রায় আঠারো হাজার শব্দ সন্নিবেশ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ শব্দকোষটির মূল্য ষাট টাকা নির্ধারণ করা হয়। তখনকার ছাপার খরচের অনুপাতে বইটির দাম অত্যন্ত বেশি। ফলে বইটি সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার উর্দ্ধে ছিল। এই প্রসঙ্গে বইয়ের এই উচ্চ মূল্য সম্পর্কে দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। গ্লাউডইনের গ্রন্থাবলীর উচ্চমূল্য সম্পর্কে এক বক্রোক্তিতে ডব্লিউ এইচ কেরি (শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম ক্যারি নন) বলেন যে এ সময় "নিশ্চয়ই ছাপার খরচ অত্যন্ত বেশী ছিল। অথবা লেখক ও প্রকাশকেরা বইয়ের ব্যবসায়ে অধিক লাভ করে দ্রুত ধনবান হবার আকাঙ্ক্ষা করতেন। যা হোক প্রকাশক এবং লেখকদের স্বপক্ষে একথা বলা যেতে পারে যে এ সময়ে নিশ্চয় ছাপার খরচই অধিক ছিল। কেনন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ উইলিয়াম কেরির নিকট থেকে কাগজের দাম সহ কলিকাতার মুদ্রাকরগণ দশহাজার কপি বাইবেল মুদ্রণের জন্য ৪৩,৭৫০ টাকা চেয়েছিল বলে জানা যায়।

১। সজনীকান্ত দাস ; বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান ; সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৪৩ বাংলা।

THE

TUTOR,

OR A

New English & Bengalee Work,

WELL ADAPTED TO TEACH

THE NATIVES ENGLISH

IN THREE PARTS

সিক্ষ্যা গুরু

কিম্বা এক নৈতন ইংগ্রাজি আর বাঙ্গালি কর্ম

ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালি দি[illegible]

সিক্ষাকরাইতে তিনখণ্ডে

COMPILED, TRANSLATED [illegible]

By JOHN MILLER

1797.

১৭৯৭ সালে প্রকাশিত জন মিলারের The Tutor বা 'সিক্ষ্যা গুরু' পুস্তকের আখ্যাপত্র। আখ্যাপত্রেই ইংরেজী বাক্যরীতির অনুকরণে সৃষ্ট 'ফিরিংগী বাংলার' প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

মুদ্রিত বাংলা বইয়ের ইতিহাসে প্রাক-শ্রীরামপুর যুগের দুইটি বাংলা বই সম্পর্কে কিছু না বললে আমাদের এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ঐ দুইটি বইয়ের প্রণেতার নাম জন মিলার। সজনীকান্ত বাবুর মতে কোম্পানীর অধীনে জন মিলার নামীয় বহু ইংরাজ রাইটার পদে নিযুক্ত ছিল। যা'হোক মিলারের প্রথম বইটি ১৮০১ সালে মুদ্রিত হয়। বইটির নাম ছিল The Bengali English Dictionary। তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকটি ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। এটার নাম "The Tutor or a New English and Bengali Work, well adapted to teach the Natives English in three parts : শিক্ষাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি ভালো উপযুক্ত আছে বাঙ্গালীদিগের ইংরাজী শিক্ষা করাইতে তিনখণ্ড।"

সজনীকান্ত বাবুর মতে যদিও মিলারের শব্দকোষের কথা রেভারেণ্ড লং সাহেবের ক্যাটালগ, বিশ্বকোষ এবং সুশীল কুমার দের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে তবু শব্দকোষটি কেউ দেখেছেন বলে জানা যায় না।

ইংরাজী বাক্যরীতি অনুযায়ী কথ্য বাংলার বিন্যাসই ছিল মিলারের এই বইটির প্রধান বিশেষত্ব। The Tutor এর আখ্যান পত্রেই পাঠক সম্ভবতঃ এ বিষয় লক্ষ্য করে থাকবেন। তাঁর এই বিশেষ রীতির প্রভাবেই 'ফিরিংগী বাংলা' বা ইংরাজী প্রভাবান্বিত বাংলা সৃষ্টি হয়। এই ফিরিংগী বাংলাই আজো মঞ্চের কৌতুকাভিনেতার বিশিষ্ট ভাষা। এ জাতীয় সংলাপ কেবলমাত্র শিক্ষিতদের নয় অশিক্ষিতদের মধ্যেও অট্টহাসির সৃষ্টি করে।

মুদ্রিত বাংলা বইয়ের প্রাথমিক যুগের ছয়জন কৃতী ইংরাজ লেখকের গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ'দের পরে অবশ্য ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিপ্লব সূচিত হয়। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। পরবর্তী কোন প্রবন্ধে শ্রীরামপুর এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত বাংলা বই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

—১৩

উপরে বর্ণিত ইংরাজ সিভিলিয়ান এবং পাদ্রীদের প্রচেষ্টার ফলেই যে বাংলা দেশে মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ লাভ ঘটে এ সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকা উচিত নয়। তবে একথাও মনে করা অনুচিত যে এদের প্রচেষ্টা ব্যতীত বাংলাদেশে মুদ্রণের প্রচেষ্টা মোটেই ঘটতো না। কেননা বাংলাদেশে মুদ্রণের প্রচেষ্টা যখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে তখন বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের অধীনে সাফল্যজনক মুদ্রণের কাহিনী আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং একথা বলা অন্যায় হবে না যে ইংরাজ পাদ্রী ও সিভিলিয়ানদের প্রচেষ্টা ছাড়াও মুদ্রণশিল্পের সূচনা এবং উন্নতি এদেশে হতোই। তবে এক্ষেত্রে মুদ্রণোন্নয়নের গতি হয়তো ততটা দ্রুতগামী হতো না।

উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ

এক

বাঙলা ও উর্দু গদ্য প্রায় সমবয়স্ক; 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বা 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের' কথা ধরলে বাঙলা গদ্য কিছুটা বড়ই হবে। এই দুই ভাষায় গদ্যসাহিত্যের প্রসার কিন্তু এক পথে হয়নি। বাঙলা গদ্যের গৌরব তার কল্পনানির্ভর গল্প-উপন্যাস-নাটক ও রম্য রচনার প্রাচুর্যে, ভাবসমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে, আর উর্দু স্বকীয়তা অর্জন করেছে তার তথ্যনির্ভর গবেষণামূলক ও তত্ত্ববহুল রচনার সঙ্কলন ও অনুবাদ সাহিত্যে। যেমন কাব্যে, তেমন গদ্যেও ফার্শি সাহিত্যের উত্তরাধিকার নিয়েই উর্দু সম্পদশালী হয়েছে। তাই বিষয়বস্তু, বাচনভঙ্গি ও রচনারীতির classical tradition উর্দুকে যেমন প্রাণশক্তি ও ঐশ্বর্য দিয়েছে বাঙলার ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। বাঙলা কথাসাহিত্যের আদি প্রেরণা ইয়োরোপীয় তথা ইংরেজি সাহিত্যের চিন্তা ও প্রকাশরীতি। পাশ্চাত্য রীতির আদর্শ উৎসাহের সঙ্গেই বাঙলা গদ্য মেনে এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য বাঙলা গদ্যের প্রসাদগুণ ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বাড়িয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু চিন্তা, প্রকাশভঙ্গি বা সাহিত্যরুচির নিয়ামক হতে পেরেছে কি না সন্দেহ। প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক traditionকে ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে বাঙালী যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে অনুশীলন করে এসেছে, বাঙলা গদ্য সাহিত্যে তার প্রতিফলন সে অনুপাতে হয় নি।

বাঙলা দেশের মত সমুদ্রমুখি অঞ্চলে উর্দুর প্রসার হলে তাতেও হয়ত সমুদ্রবাহিত পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের আদর্শ বাঙলার মতই সমন্বিত হোত। কিন্তু উর্দুভাষী অঞ্চল সমুদ্র থেকে দূরে ত বটেই, সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত সে অঞ্চল ইয়োরোপীয় বাণিজ্য ও শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তেও পারে নি। উত্তর ভারতের সামাজিক কাঠামো ও চিন্তাপ্রণালীতে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক; সে অঞ্চলের সাহিত্যে তার প্রতিফলন আরও সাম্প্রতিক, প্রায় বিশ শতকীয়। বাঙলা, তামিল, মারাঠীর মত উর্দুকে Classical tradition

ইতিহাসের তথ্যের মত আবিষ্কার করতে হয় নি; উর্দুভাষী উত্তর ভারতের মানসিকতায় সে ঐতিহ্য-ই ছিল জীবন্ত আদর্শ। ফার্শি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলি যেমন অনুকরণ ও অনুবাদের প্রেরণা যুগিয়েছে তেমনই তার প্রকাশরীতি, রুচি ও বিষয়বস্তু উর্দু সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। স্যার সৈয়দের উৎসাহে যখন ইংরাজি শিক্ষিতরাও উর্দু গদ্যের ব্যবহার করতে আরম্ভ করে, তখনও ফার্শির এই সর্বাত্মক প্রভাব অব্যাহতই ছিল। উত্তরকালে পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের সংক্রমণ উর্দুতে বেড়েছে বটে, কিন্তু তাও শুধু অলঙ্কারের ক্ষেত্রে। বামপন্থী উর্দু সাহিত্য থেকেও ফার্শি Classicismএর জের এখনও যায় নি।

ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত ফার্শি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা। ইতিহাস-সচেতনতা মুসলমান মানসেরও এক বিশিষ্ট লক্ষণ। ফার্শির মাধ্যমে এই মানসিকতা যে সাহিত্যের প্রেরণা যুগিয়েছে আরবীর মতই তা বিপুল ও বিচিত্র। রোম্যান্টিক উপাখ্যান, ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি বাদে ফার্শি গদ্য সাহিত্যের প্রায় সবটাই ইতিকথা, জীবনী, নীতিমূলক পুরাতত্ত্ব ও রাজন্য-কাহিনী। ফার্শি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি রাজকেন্দ্রিক, এবং রচনাগুলি উপাখ্যানধর্মী; ঘটনার ব্যাখ্যার চেয়ে বিস্তৃত বিবরণের প্রতি বেশী মনোযোগী। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইতিহাসের অর্থ রাজা বা ব্যক্তির কীর্তিকাহিনী। ফার্শি ইতিহাসগুলির গঠন তাই প্রধানতঃ বংশানুক্রমিক (dynastic) কিংবা জীবনীমূলক (biographical)। ইসলামের শক্তি ও সভ্যতার স্বর্ণযুগে ফার্শি ইতিহাসের মনোভঙ্গি তৈরী হয়েছিল বলে অমুসলমান জগৎ বা যুগের প্রতি ঐতিহাসিকদের অলস কৌতূহল কিছুটা ছিল বটে, শ্রদ্ধা বা অনুসন্ধিৎসা তেমন জাগে নি। বিশ্বের ইতিহাস-জাতীয় রচনাগুলিও ইসলামের আবির্ভাব ও মুসলিম জগতকে কেন্দ্র করেই লিখিত হোত। ফলে, তথ্যের বিচার বিশ্লেষণে ইসলামের মূল্যমানই ইতিহাস ব্যাখ্যার একমাত্র রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আরবদের প্রভাবে ফার্শি ইতিহাসগুলিতেও সঞ্চারিত হয়েছিল, তার দরুণ কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিত-গ্রন্থকারদের বিবরণ ও জীবনী সম্বলিত এক ধরণের bio-bibliographical রচনা আরবী-ফার্শী ভাষায় গড়ে উঠেছিল যার নজীর মধ্যযুগের কোন ভাষাতেই পাওয়া যায় না। বলা চলে যে, মুসলমানদের ইতিহাস চেতনা সাধারণতঃ রাজবৃত্ত ও সাহিত্যকর্মকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পেয়েছে। ভূগোল, সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্ম, আইন-কানুন, বিজ্ঞান ইত্যাদি

বিষয়ে ফার্শিতে প্রচুর রচনা আছে বটে, কিন্তু ইতিহাসের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা দেখান সে সব রচনার লক্ষ্য নয়। কাব্য, সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তু, রচনাভঙ্গী, চিন্তাধারা ইত্যাদির বিবর্তনের মূলে কোন নৈর্ব্যক্তিক বা সামাজিক কারণ থাকা সম্ভব, ফার্শি ইতিহাসকার (এক আধটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। ব্যক্তির ইচ্ছা বা যোগ্যতা-অযোগ্যতার দ্বারাই ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয়, মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিবর্তনের মূলে আকস্মিকতা থাকে, প্রাচীন গ্রীকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের আরবী, ফার্শি ইতিহাসগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমিত বিষয়বস্তুর উত্তরাধিকার নিয়ে উর্দু ভাষায় ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয় উনিশ শতকের গোড়ায়। প্রথম পর্বের রচনাগুলি প্রায় সবই ফার্শি ইতিহাসের তর্জমা, নয়তো সারসঙ্কলন। ১৮০৪ সালে Fort William Collegeএর মীর শের আলী আফসোস আঠারো শতকের লেখা সুজন রায়ের ফার্শি ইতিহাস 'খুলাসাতুত-তওয়ারিখের' যে সারানুবাদ 'আরায়েশে মাহফিল' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন তাকেই উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত মৌলিক ইতিহাস রচনার রেওয়াজ তেমন প্রসারলাভ করেনি তার জন্য ফার্শির ব্যবহার অব্যাহত ছিল বহুদিন পর্যন্ত। ১৮৭২ সালে যখন তথ্য ও তত্ত্ববহুল (serious) বিষয়ের জন্য উর্দু গদ্যের বহুল প্রচলন আরম্ভ হয়েছে তখনও, ভূপালের নবাব সেকান্দার বেগম তাঁর 'ভূপালের ইতিহাস' উর্দুতে রচনা করে সন্তুষ্ট হতে পারেন নিঃ উর্দুর সাথে তার একটা ফার্শি সংস্করণও প্রকাশ করেছিলেন। Methodology ও তথ্য প্রয়োগের দিক দিয়ে এই যুগের রচনাগুলি মধ্যযুগীয় ফার্শি ঐতিহাসিকতারই ভাষান্তরিত রূপ। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ ইতিবৃত্তের উদ্ধার ও তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি এশিয়ার ইতিহাসে প্রযুক্ত হচ্ছিল তার সঙ্গে পরিচয়ের স্বাক্ষর এযুগের ফার্শি ও উর্দু ঐতিহাসিকদের নাই বললেই চলে। লিখিত বিবরণের উপর একান্ত ভাবে ভরসা করা, প্রত্নতত্ত্ব ভূগোল, ভাষা, সমাজ ও অর্থনীতির আলোকে সে বিবরণের সত্যাসত্য যাচাই না করে তাকে নির্ভুল তথ্য হিসাবে ব্যবহারের রীতি ফার্শি ইতিহাস থেকে উর্দুতে সঞ্চারিত হল। বিশ্ব মানবের ইতিহাসকে সামগ্রিক ভাবে না দেখে শুধুমাত্র আরবী-ফার্শি ইতিবৃত্তের মুসলমান-কেন্দ্রিক ঘটনা গুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফলে ইতিহাসের ক্ষেত্র স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ হয়ে

গেল। ইতিহাসের গতি ও মর্মোপলব্ধির গভীরতা সেজন্য উর্দুতে তেমন লক্ষণীয় হয়নি। উত্তর কালে যখন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের আবিষ্কৃত তথ্য ও সিদ্ধান্তের প্রয়োগ আরম্ভ হলো, তখনও ফার্শি ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত কয়েকটি বিষয়ের তথ্যসম্ভার ও সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে তার ব্যবহার হয়, ইতিহাসের সামগ্রিকতার উপর জোর দেওয়ার জন্য নয়।

দুই

উর্দুতে মৌলিক ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শন বোধহয় সৈয়দ আহমদ খানের (পরে স্যার সৈয়দ আহমদ খান) ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত 'আসারুস-সানাদীদ' নামক রচনাটি। এ গ্রন্থটি রাজোপাখ্যান নয়; শিলালিপির নকলসহ দিল্লীর পুরাতন ইমারতগুলির সচিত্র ঐতিহাসিক বিবরণ। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এ বইটি পথিকৃতের দাবী রাখে। ভারতের সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হওয়ার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বের লেখা এই বইটি সে সময়েই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৈয়দ আহমদের জীবদ্দশাতেই এর ফরাসী তর্জমা হয়, এবং কলিকাতা ও লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটি লেখককে 'অনারারি ফেলো' নির্বাচিত করে সম্মানিত করে। যে অপরিসীম শ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেখক একাই সে সময়ের শ্বাপদসঙ্কুল জীর্ণ ইমারতগুলি পর্যবেক্ষণ ও শিলালিপিগুলির নকল করেছিলেন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সেরূপ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা ভারতীয়দের মধ্যে অল্পই দেখা গেছে। সৈয়দ আহমদ ইংরাজি জানতেন না, তবে দিল্লীর ইংরাজ মহলে তাঁর বন্ধু বান্ধব ছিল, এবং মূল উপাদান পরীক্ষা করার এই আগ্রহ সম্ভবতঃ ইংরাজ সংস্পর্শেরই ফল।

তা সত্ত্বেও এ বইটি ফার্শি ইতিহাসের প্রভাব এড়াতে পারেনি। বইটির শেষাংশে দিল্লীর কবি-সুফী-শিল্পী-পণ্ডিত প্রভৃতি বিদগ্ধ সমাজের একটি বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। এদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি সহ আদর্শায়িত জীবন-বৃত্তান্ত ও গুণকীর্ত্তনের এই পরিচ্ছেদটি পরে অবশ্য তাঁর বন্ধু, মুদ্রাতাত্ত্বিক Edward Thomasএর পরামর্শমত ১৮৫৪ সালের সংস্করণ থেকে গ্রন্থকার বাদ দিয়েছিলেন। এ ধরণের বিবরণ মোগল আমলের ফার্শি ইতিকথাগুলির অপরিহার্য অংশ ছিল। এর পূর্বে সৈয়দ আহমদ ফার্শিতেও একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন 'জাম-এ-জম' নামে, যাতে তৈমুর থেকে বাহাদুর শাহ পর্যন্ত মোগল বাদশাদের

জন্ম-মৃত্যু, সিংহাসন আরোহণ, শাসনকাল ও বিশেষ ঘটনার তারিখের তালিকা আকারে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছিল। এটিও মধ্যযুগীয় ফার্শি ইতিহাসের এক বিশেষ রচনারীতির সাক্ষাৎ ও সজ্ঞান অনুকরণ।

পাশ্চাত্য methodologyর সাথে সৈয়দ আহমদের পরিচয় অবশ্য পরে আরও গভীর হয়েছিল। ফার্শির মূল ঐতিহাসিক পুঁথিগুলির নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশে তাঁর যত্ন ও শ্রমস্বীকার থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালে লখ্‌নৌ থেকে তিনি নিজ ব্যয়ে 'আইন-এ-আকবরী'র প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং ১৮৬২ সালে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য 'তারিখ্‌-এ-ফিরোজ শাহী' সম্পাদনা করেন। দু'বছর পরে, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী'রও একটি সংস্করণ তিনি দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন। এ জাতীয় লিখিত উপাদানকে পাশ্চাত্য রীতিতে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের প্রচলিত ধারণাকে পুনর্বিচার করার দৃষ্টান্তও আছে তাঁর 'খুতবাত-এ-আহমদীয়া' নামক ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হজরত মুহম্মদের জীবনীসংক্রান্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে। এটি আসলে Sir Wm. Muirএর সদ্য প্রকাশিত 'Life of Mohammad' এর সমালোচনা। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত তথ্য ও যুক্তিবাদের মাপকাঠিতে মুসলমান রচিত গ্রন্থে বর্ণিত হজরতের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলি বিচার করে সৈয়দ আহমদ Wm. Muirএর বক্রোক্তির জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন। হজরতের চরিত্রে ও কার্যকলাপে অলৌকিকতা আরোপ করে মুসলমান লেখকরা যা বলেছেন, তার সবই আক্ষরিকভাবে সত্য, এমন মনে করার কোনও হেতু নাই, বরঞ্চ আতিশয্যের ভাষা হিসাবেই সে বর্ণনাগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত। প্রতীকে বর্ণিত সূক্ষ্মতত্ত্বকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের (Natural Science) ইন্দ্রিয়ানুভূত স্থূল তথ্যের মত ধরে নিয়ে খৃষ্টান পাদরীরা মুসলমানদের বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করার যে সুযোগ তৈরী করে নিয়েছিল সৈয়দ আহমদের এই লেখাটি তার প্রথম যুক্তিসম্মত প্রতিবাদ। মুসলমান লেখকদের মানসাভ্যাস ও তাদের লেখায় পারিপার্শ্বিক বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের প্রভাবের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধের শেষে সমকালীন ইয়োরোপীয় Humanismএর আদর্শে, হজরতের মানবতার উপর জোর দিয়ে তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়েছেন তাঁর চরিত রচনার নমুনা হিসেবে।

উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যে সৈয়দ আহমদ খানের দান অপরিমেয়। মৌলিক ইতিহাস অবশ্য তিনি লেখেননি, এবং ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর কৃতিত্বও তেমন

নাই। তবে, সমাজ ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ প্রয়োগ করে যে চিন্তামূলক প্রবন্ধ-সাহিত্যের তিনি সূত্রপাত করেন, তাঁর অনাড়ম্বর গদ্যরীতি ও সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যবহারের কৌশল উর্দুতে যুক্তি ও তথ্য নির্ভর ইতিহাস রচনা সহজতর করে দেয়। সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত সৈয়দ আহমদের নিজের লেখা দুইটি পুস্তিকা 'আসবাব-এ-বাগাওয়াত' আর 'ওয়াকিয়াত-এ-বিজনৌর' এই নূতন রীতিতে সমকালীন ইতিহাস রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ইতিহাসের যে ধারণা (Conception) এই নূতন রীতির গদ্যে ও তথ্য সম্ভারে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ হতে থাক্‌ল তা অবশ্য মধ্যযুগের মুসলমান লেখকদের ঐতিহ্য অনুসারী অর্থাৎ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, বর্ণনাত্মক (narative) ও উপদেশমূলক (didactic)। রাজৈশ্বর্য, যুদ্ধবিগ্রহ, সাহিত্য ও শিল্পকীর্তি এইরূপ কয়েকটি নির্বাচিত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে রাজবংশের উত্থান পতনে পার্থিব সম্পদের নশ্বরতা ও কালচক্রের অমোঘ গতি নির্দেশ করার দিকে প্রবণতা এই ঐতিহ্যের প্রধান লক্ষণ। সৈয়দ আহমদ খানের যুক্তিবাদ এ মনোভাবের তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। বরঞ্চ তাঁর অনুসৃত আলীগড় আন্দোলনের সুযোগে এ মনোভাব আরও পুষ্ট ও সৃজনক্ষম হোল। উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্য তার প্রসার, গভীরতা ও নির্দেশের (direction) জন্য এই আন্দোলন-প্রসূত বুদ্ধিবৃত্তিমূলক উদ্দীপনার কাছে যতটা ঋণী উর্দু সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা তেমন ঋণী নয়। উর্দু ঐতিহাসিকদের চিন্তাবৃত্তির অনেক ক্ষেত্রে সে আন্দোলনের প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়। সে জন্য আলীগড় আন্দোলনের মূল চিন্তাসূত্রগুলির উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন।

তিন

মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, ইংরাজ শাসনের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের একটা আপোষ মীমাংসার আশু প্রয়োজন থেকে এ চিন্তাসূত্রের উদ্ভব হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় ওহাবীদের সংগ্রামী প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় ছিল না। একদিকে অভিজাতরা প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারাতে বসেছিল। আর অন্যদিকে শিক্ষক-উকীল-আমলা-চিকিৎসক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবিদের জীবিকার ক্ষেত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রাধান্যের ফলে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙলা দেশের হিন্দুরা ইংরাজের

উপর আস্থা স্থাপন করে যে সহযোগ ও আনুগত্যের নীতি গ্রহণ করে লাভবান হয়েছিল, উত্তর ভারতীয় মুসলমানদেরও সেই একই নীতি গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। খৃষ্টান শাসনকে গ্রহণ ও তার সঙ্গে সহযোগের মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে জাগাতে হলে অবশ্য তাদের মনের অভ্যাসের আমূল পরিবর্তন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে নূতন পথে চালিত করা প্রয়োজন। একটি সম্প্রদায়কে তার অভ্যস্ত চিন্তা-রীতি ও কর্মপদ্ধতির ঐতিহ্য ছাড়াতে হলে শুধু নূতন চিন্তাসূত্র (set of ideas and principles) ও দিক্‌দর্শনেরই প্রয়োজন নয়, তার সঙ্গে পরম আত্মপ্রত্যয়, একটি অনন্যতাবোধ ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন ছিল।

সৈয়দ আহমদ খানের প্রচেষ্টা যুগের এই দাবীকেই রূপ দিয়েছিল। একদিকে তিনি মুসলমান সমাজে ইংরাজ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুকূল মনোভাব তৈরী করতে চেষ্টা করেন। আর অন্য দিকে মুসলমানকে বিশ্বাসঘাতক মনে করার যে অভ্যাস ইংরাজ সরকার মহলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তা দূর করতে সচেষ্ট হন। ইংরাজ শাসন ও সভ্যতার আদর্শকে সম্পুর্ণভাবে গ্রহণ করার পক্ষে রাজনীতি, শাস্ত্র, সমাজনীতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান ইত্যাদি থেকে যুক্তি সংগ্রহ করে চিন্তা ও আচরণের যে আদর্শ তিনি প্রচার করেন—তাতে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের একটি নৈতিক ভিত্তি রচিত হোল। এই আদর্শ সমকালীন ইয়োরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যমান থেকে সঙ্কলিত ; যেখানে এর সঙ্গে মুসলমানের অভ্যস্ত ধর্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-মর্যাদার বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেখানেই সৈয়দ আহমদ কোরানের সূত্র ও ইতিহাসের তথ্যকে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে পুনর্ব্যাখ্যা করে ইসলামের সঙ্গে তার সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন। নূতন আদর্শ প্রচারের এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মুসলমানের চিন্তা জগতে যে বিপ্লব সাধিত হোল—চিন্তা ও কর্মের নানাক্ষেত্রে এখনও তার স্বাক্ষর রয়েছে। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই আন্দোলনের দ্বারা সৈয়দ আহমদ ইসলাম ও মুসলমান সংস্কৃতিকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপিত করার বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায় (intellectual method) সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে জীবনবেদের মত ব্যবহার করে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের মুসলমান সমাজ মধ্যবিত্তরূপে গঠিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে।

ঐতিহাসিক চিন্তার দিক দিয়ে আলীগড় আন্দোলন তেমন কোনও নূতন ভাবনা বা সূত্রের প্রবর্তন করতে পারেনি। গণতন্ত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ বা সামাজিক ন্যায়

বিচার (Social Justice) প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে আন্দোলনের motive forceএ তেমন যোগ ছিলনা বলেই হয়ত সে যুগের উর্দু ঐতিহাসিক রচনাগুলিতে এসব ভাবনার স্বীকৃতি বা গভীর প্রতিফলন দেখা যায় না। সৈয়দ আহমদের এক প্রধান সহকর্মী এবং উত্তরকালে এ আন্দোলনের নেতা মৌলুবী মুশতাক্ হোসেন (পরে, নবাব ভিকারুল মুল্‌ক্) ১৮৭২ সালে ইংরাজি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের একটি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বইটির ৩।৪টি সংস্করণ হয়েছিল। এবং লেখকও সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এতে ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণগুলির গুরুত্ব ব্যাখ্যা না করে রাজবংশের পতনকে কেন্দ্র করেই বিপ্লবের ঘটনাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা মন্ত্রের উল্লেখ আছে অবশ্য তথ্যের মত, কিন্তু তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা নাই। মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, "মানব কীর্ত্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখিয়ে পাঠকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করার জন্য এ ইতিহাস লেখা হলো। এই পুস্তক থেকে আরও প্রমাণ হবে যে জননী শিক্ষিতা হলে সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন কত সহজ ও কত ভালভাবে হতে পারে।"[১]

প্রায় ৭০ বৎসর আগে মির্জা আবু তালেব খান নামক মুর্শিদাবাদ দরবারের অবসর প্রাপ্ত একজন উচ্চপদস্ত কর্মচারী তাঁর ইয়োরোপ ভ্রমণের একটি বৃত্তান্ত ফার্শিতে লিখেছিলেন। ইনি ফরাসী বিপ্লবের দশ বৎসর পর ইয়োরোপ গিয়েছিলেন এবং নেপোলিয়নের First Consul থাকাকালে লণ্ডন থেকে প্যারিস গিয়ে দ্বিতীয় Consul Tallyrand এর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগও পেয়েছিলেন। লণ্ডনে থাকা কালেও তিনি বিশিষ্ট রাজপুরুষদের সাথে মেলা মেশা করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা জানার ও তার তাৎপর্য লিপিবদ্ধ করার ঘনিষ্ঠ সুযোগ তিনি যতটা পেয়েছিলেন এশিয়ার আর কোনও লেখক তেমন পেয়েছিলেন বলে জানা যায়নি। অথচ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এ বিপ্লবের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাতে ফ্রান্সের রাজপরিবার ও অভিজাতদের দুর্গতি ও প্রজাদের নৃশংস আচরণের কাহিনীই বেশী, বিপ্লবের গুরুত্ব উপলব্ধির পরিচয় নাই।[২]

ইতিহাসকে এই ভাবে নীতিশিক্ষা ও চরিত্রগঠনের উপায় রূপে দেখায় মধ্যযুগীয় রীতির তেমন পরিবর্তন আলীগড় আন্দোলনের দ্বারা হয়নি। এই দৃষ্টিকোণের অন্তর্গত কয়েকটি বিশেষ দিক (aspect) ও চিন্তাসূত্রগুলি নবাবিষ্কৃত

ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে উদ্ভাসিত ও পরিণত হবার সুযোগ পেল মাত্র। ফার্শি ইতিহাসগুলিতে মধ্যযুগের মুসলমান রাজাদের সাম্রাজ্যলিপ্সার কোনও নিন্দা ত' থাকতইনা, রাজধর্মের নামে বিজয়ীদের অকুণ্ঠ সমর্থন-ই করা হতো। এ মনোভাবের যতটুকু ব্যতিক্রম উর্দু ইতিহাসে দেখা গেল তা উনিশ শতকের উপযোগী যুক্তির অবতারণায়। ইংরাজরা তাদের উপনিবেশ-নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে যেমন শ্বেতজাতির সভ্যতাবিস্তারের গুরুদায়িত্বের দোহাই পাড়ত, উর্দু ঐতিহাসিকরাও তেমনই অতীতের মুসলমান সাম্রাজ্যগুলিকে সংস্কৃতি-সভ্যতা বিস্তারের সহায়ক রূপে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। হিন্দু সমাজ ইংরাজ ব্যবস্থায় যে সব সুবিধা ভোগ করছিল, তার অংশীদার হওয়ার দাবী থেকে আলীগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে বলে এর ঐতিহাসিক চিন্তারীতিতে হিন্দুদের প্রতি বিরোধ, ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের ভাব অবচেতন ভাবেই জমে ওঠে। এ চিন্তা-রীতির রাজনৈতিক কাঠামো ছিল ইংরাজের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা, কিন্তু এর সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হোল ইসলামের নীতি ও কীর্তিকে পাশ্চাত্য মূল্যমান অনুযায়ী ব্যাখা ও প্রচার করা। তাই মুসলমানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অমুসলমান বা ভারতীয় উপাদানের গুরুত্বকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যেমন অভ্যাসে পরিণত হোল, তেমনই বিশ্ব মুসলিম সমাজের সাথে যেসব ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানদের যোগ আবিষ্কার করা যায়, সেগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়াল। ধর্ম সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় মুসলমানকে তার গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে বর্তমান অধঃপতন সম্বন্ধে তাকে সচেতন করার প্রেরণা এই ভাবে উর্দু লেখকদের ঐতিহসিক চিন্তার স্থায়ী লক্ষণ হয়ে রইল।

১৮৭৯ সালে আলতাফ হোসেন হালীর সুবিখ্যাত 'মুসাদ্দাসে' এই মনোভাব সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, যাতে বিশ্ব-মুসলিম শক্তির উত্থানপতনের কাহিনী আবেগময় কাব্যের ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছিল। সমাজের চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষাকে ইতিহাসের মাধ্যমে রূপ দেওয়ার জন্য এ কাব্যটি সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এবং লক্ষণীয় এই যে, উর্দুভাষীদের মধ্যে সে জনপ্রিয়তা আজও কমেনি। যে দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখার রীতি এ সময়ে উৎসাহের সঙ্গে প্রচারিত হতে থাকল তার স্পষ্টতর ইঙ্গিত পাওয়া যায় হালীর আর একটি ছোট কবিতা 'শেকোয়-এ-হিন্দে', যার আবেগের আন্তরিকতা মুসলমান সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সে ইঙ্গিত কবিতাটির প্রস্তাবনাতেই

আছে: "হে চিরবসন্তের দেশ হিন্দুস্থান, বিদায়! বিদেশ থেকে এসে বহুদিন তোমার আতিথেয়তা ভোগ করে গেলাম"। 'হজরত মুহম্মদের দরবারে আর্জি' এই শিরোনামায় হালীর আর একটি ছোট কবিতা আছে যার প্রথম ক'টি লাইনে ভারতের দুর্গত মুসলমানদের দিকে হজরতকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ জানান হয়েছে কেননা, "যারা একদিন স্বদেশ থেকে মহা সমারোহে বেরিয়ে দিকে দিকে তাঁর জয় ঘোষণা করেছিল, আজ তারা বিদেশ বিভূঁয়ে অনাত্মীয়ের মধ্যে দীনহীনভাবে পড়ে রয়েছে"।

এই ঐতিহাসিক মনোভাবের দু'টি ফল অনিবার্য ছিল। ভারতবর্ষ যে মুসলমানের দেশ নয়, এ অনুভূতি প্রসারের ফলে ভারত-ইতিহাসের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণে বা তার সাথে আত্মীয়তাবোধে অনিচ্ছা, আর তারই সঙ্গে ইসলামের জন্মভূমি ও বিশ্ব-মুসলিমের সমৃদ্ধির যুগের প্রতি মুসলমানের টান নিরন্তর বাড়তে লাগল। ইসলামের সার্বজনীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এই Extra-territorialism উর্দুভাষী মুসলমানদের মনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াবার ফলে প্যান্ ইসলামের আদর্শ তাদের মনে গভীরভাবে আঁকা হয়ে গেল। মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির জীবন্ত প্রতীক হিসাবে তুর্কীর খলিফার প্রতি আনুগত্যের ভাব এই কারণে এত বেড়ে গেল যে, উত্তর ভারতের অনেক মসজিদে সুলতান আবদুল হামীদের নামে খুতবা পড়ার কথাও ব্রিটিশ সরকারের কানে এল। প্যান ইসলামের বিখ্যাত মন্ত্রগুরু জামালুদ্দিন আফগানি এ সময়ে কিছু দিনের জন্য ভারতে নজরবন্দি হয়ে বাস করেছিলেন—তাঁর প্রভাবে এ উদ্দীপনা এত তীব্র হয়ে দাঁড়াল যে আলীগড় আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক আদর্শ—ইংরাজ সরকারের উপর অবিচলিত ভক্তি—সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল এবং এই পরিণতি রোধ করার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদকে প্যান্ ইসলামের বিরোধিতাও করতে হয়েছিল।[৩]

চার

এ আন্দোলনের প্রেরণায় রচিত ইতিহাসের সংখ্যা অবশ্য তেমন বেশী নয়। মুসলমানের অতীতকে কীর্তিগাথা ও নীতিমূলক জীবনচরিতের (commemorative and didactic) মাধ্যমে উপস্থিত করা এসব রচনার প্রধান রীতি। জীবনচরিতের বিষয় নির্বাচনে ও গুরুত্ব আরোপনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিই ছিল মাপকাঠি। যেমন হালীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইনি কবি গালিব ও শেখ সাদীর স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। এঁর রচিত স্যার সৈয়দের জীবন চরিত 'হায়াত্-এ-

জাবেদ' উর্দুর ঐতিহাসিক জীবনী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট অবদান। ইতিহাস চেতনাকে এইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ দেওয়ার ফলে উর্দু ভাষায় জীবন চরিত ও আত্মজীবনী রচনা যত প্রচুর সংখ্যায় হয়েছে, ভারতের অন্য কোনও ভাষায় তেমন হয়েছে কিনা সন্দেহ।

উর্দুতে ইতিহাসের এই রূপায়ন ও মানোন্নতি সাধনে আলীগড় কলেজের অধ্যাপক শিব্লী নোমানীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তাঁর ইতিহাস সচেতন রচনাগুলিই মুসলিম কীর্তির তথ্যনির্ভর মূল্যায়নে দিক্‌নির্দেশ ও গতিসঞ্চার করেছিল। শিবলীর মন ছিল কাব্যধর্মী কিন্তু তাঁর গভীর ইতিহাসবোধ ছিল। তিনি ইংরাজি জান্‌তেন না এবং ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্য-প্রধান পুরাতন শিক্ষারীতিতে তাঁর মানস গঠিত হয়েছিল। তাঁর চোখে, সাহিত্যে প্রতিফলিত মানুষের সংস্কৃতিবোধের ক্রমবিকাশই হোল ইতিহাসের একমাত্র অম্বিষ্ট, আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মানুভূতি যার শক্তির মূল উৎস। তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক T. W. Arnold তাঁকে পাশ্চাত্য গবেষণা-রীতি ও আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন বটে, কিন্তু একমাত্র বিবর্তনবাদ (Evolution) ছাড়া তাঁর ঐতিহাসিক ধারণায় পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর আর কোনও প্রভাব তেমন লক্ষণীয়ভাবে পড়েনি। তাঁর চিন্তায় সমসাময়িক ইংরাজ লেখক Carlyleএর আদর্শবাদের, বিশেষ করে Heroes and Hero-worshipএর, সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয় যার একটি আরবী তর্জমা তিনি পড়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে শিবলী দুইখণ্ডে আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের জীবন চরিত প্রকাশ করেন। আল-মামুনের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে যে তিনি এ গ্রন্থ লিখেছিলেন তা নয়; সে যুগের সাংস্কৃতিক গৌরবই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন: "হারূনল-রশীদ যদি বারমাক বংশের হত্যায় লিপ্ত না থাক্‌তেন তাহলে এ গ্রন্থের নায়ক হিসাবে তাঁকেই আমি নির্বাচন করতাম।"[৪] তথ্যের যাথার্থ্য স্বীকার ও নিরপেক্ষ বর্ণনার দাবী করা সত্ত্বেও আলোচ্য চরিত্র ও যুগকে আদর্শায়িত করে দেখাবার চেষ্টা এ গ্রন্থের সর্বত্র দেখা যায়। দশ বৎসর পরে প্রকাশিত তাঁর আর একটি ঐতিহাসিক জীবন-চরিত 'আল ফারূকে' এ প্রবণতা কিছুটা সংযত রূপ নিয়েছে কেননা খলিফা ওমরকে আবেগ উত্তেজনাময় রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হিসাবে তিনি দেখেছেন, ভুল প্রমাদ যার পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু, ওমরের প্রতি শিবলীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার স্বাক্ষর এ বইটির প্রতি ছত্রে রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সমকালীন ভারতের সরকারী পরিভাষায় ওমরের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার একটি সোৎসাহ

বর্ণনা আছে। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে, লেখক শাসনব্যবস্থার ন্যায়বিচার, কর্মদক্ষতা ও সাম্যবাদের ওপর জোর দিয়েছেন, অথচ আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-আদর্শের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি। শিবলীর আরও দুইটি জীবনীগ্রন্থ 'আল গাজ্জালী' ও 'সিরাতুন নোমানে'ও আদর্শায়িত ব্যক্তিচিত্রের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কীর্তির ইতিহাস লেখার রীতি পালিত হয়েছে। 'আল ফারুক'কে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করতেন এবং প্যান-ইসলামী উদ্দীপনার ফলেই এ গ্রন্থটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁর শেষ জীবনের রচনা 'সিরাতুন নবী'ই তার সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কীর্ত্তি। এ গ্রন্থটির মাত্র দুইখণ্ড তিনি লিখে যেতে পেরেছিলেন; পরে তাঁর শিষ্য সুলেমান নাদ্‌ভী, শিবলীর চিন্তাসূত্রকে অনুসরণ করে এটি সম্পূর্ণ করেন। শিব্‌লী ইতিহাসে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব স্বীকার করতেন কিন্তু স্যার সৈয়দের বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদ প্রসূত বস্তুতান্ত্রিকতার সাথে গভীর ধর্মীয় আদর্শবাদ মিলিয়ে তিনি সমতা রক্ষার চেষ্টা করেছেন। 'সিরাতুন নবী'তে হজরতের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়ে তাঁকে মানবতার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন; স্যার সৈয়দের 'খুত্‌বাত-এ- আহমদীয়া'র মত, ইয়োরোপীয় সমালোচনার জবাব দেওয়ার তেমন প্রয়োজন মনে করেননি। ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনে মুসলিম ইতিহাসের ধারণা যেমন আমীর আলীর History of the Saracens ও Spirit of Islamকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে প্রাথমিক ইসলাম সম্বন্ধ সাধারণ উর্দু পাঠকের মনও তেমনই শিব্‌লীর ঐতিহাসিক জীবনীগুলিকে আশ্রয় করেই গঠিত হয়েছে। তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'শের্‌-উল-আজম্‌', ফার্শি কাব্যের ইতিহাস। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতরাও এর মৌলিকতার সুখ্যাতি করেছেন। এটিও কিন্তু জীবনীমূলক; কাব্যের ভাব ও রীতি বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বিভিন্ন কবির কাব্যজীবনের পর্যালোচনা।

পাঁচ

ইতিহাসের একমাত্র বিষয়বস্তু হিসাবে মুসলিম জাহান, বিশেষ করে তার সাংস্কৃতিক কীর্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আর সে কীর্তিকে আদর্শায়িত করে বর্ণনা করার অভ্যাস শিব্‌লীর দৃষ্টান্তে সমস্ত উর্দু ঐতিহাসিকদেরই বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল। যে দেশ বা জাতি ইসলামের রাজনৈতিক আওতায় আসেনি, উর্দু

লেখকদের চোখে তার কোন নিজস্ব গুরুত্ব নাই। মুসলমান প্রভাবিত দেশগুলির ইতিহাসও আবার ইসলামের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করা হয়, যেন তার পূর্বে মানব সমাজ ও সভ্যতার কোনও উল্লেখযোগ্য অস্তিত্বই ছিলনা। মুসলিম জাহানের ইতিহাসও কেবল মাত্র মুসলমানের শক্তি ও গৌরবের ইতিহাস, অবনতির বর্ণনা নয়। সে জন্য বাগদাদের আব্বাসীয়দের, স্পেনের ওমাইয়া খিলাফতের ও ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সভ্যতা ঐশ্বর্য নিয়ে উর্দুতে যত ঐতিহাসিক রচনা আছে, এদের পতনের যুগ নিয়ে লেখা রচনার সংখ্যা তত নয়। পতন বা অবনতির কথা এলেই, ইসলামের মূল আদর্শ বর্জন ও অনৈসলামিক আচার ব্যবহারের প্রসারকে সে পতনের জন্য দায়ী করা, আর তারই অনুসিদ্ধান্তের (corollaryর) মত, মধ্যযুগের মুসলমান শাসনপ্রণালী রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক মানের উৎকৃষ্টতায় অহেতুক ও অযৌক্তিক বিশ্বাস, এই ইতিহাসগুলির বিশিষ্ট লক্ষণ। বিশ্ব ইতিহাসের মানদণ্ডে মুসলমানের এই কার্যকলাপকে বিচার করার অনিচ্ছা এই বিশ্বাসেরই আর এক দিক। অ-মুসলিম, বিশেষ করে অ-মুসলমান ভারতীয়দের, আইন কানুন, চিন্তারীতি, আচার অনুষ্ঠানে মর্যাদা যোগ্য কিছু থাকতে পারে, তা বিবেচনা করাও নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য প্রাচীন সভ্যতার প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব এখন অনেকটা কমেছে, তবু উর্দুর ঐতিহাসিক চিন্তায় এ মনোভাব কিরূপ ব্যাপক ছিল বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর রচনায় তার পুনরাবির্ভাব থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এ মনোভাবের প্রতিফলন বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখাগুলিতে দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে দশ খণ্ডে প্রকাশিত জাকাউল্লার 'তারিখ-এ-হিন্দুস্থান' উর্দু ভাষায় ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। এটিকে অবশ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস না বলে ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস বলাই উচিত। কারণ, এর আরম্ভ আরবদের সিন্ধু বিজয় থেকেও নয়—একেবারে আরবদেশে ইসলামের আবির্ভাব থেকেই, আর শেষ হয়েছে—সিপাহী বিদ্রোহ ও বাহাদুর শাহের নির্বাসনের সঙ্গে। উপক্রমণিকায়, ফার্শি ইতিহাসের রীতিতে, প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি সহ ইতিহাস শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও নীতি শিক্ষার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় রীতি পালনের প্রকৃষ্ট নমুনা। ফার্শি ইতিবৃত্তের মত বিভিন্ন সাক্ষ্য ও তথ্যের সঙ্কলনকেই ইতিহাস

হিসাবে পেশ করা হয়েছে, তথ্যের অনুবদ্ধ ব্যাখ্যা বা নৈতিক মূল্যায়ন হিসাবে নয়। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকীয়-আড়ম্বর উৎসবে সূক্ষ্ম ও জীবন্ত (minute and vivid) বর্ণনা রাজপুরুষদের আচরণে একান্ত মানোনিবেশ ঘটনার তুচ্ছতা উপেক্ষা করে ঘটনামূলক বেগবান কাহিনী রচনা করা প্রভৃতি ফার্শি ইতিহাসের সমস্ত লক্ষণই বর্তমান। আলাউদ্দিন খিলজী বা তৈমুরের নৃশংসতার মত মুসলমান রাজাদের নিন্দনীয় আচরণের কোনই সমালোচনা ত' নাই-ই বরঞ্চ তাদের দৃঢ়তা ও শত্রুদমনে দক্ষতার প্রশংসাই করা হয়েছে। আওরঙ্গজেবের প্রতি জাকাউল্লার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা খুবই প্রকট; শরীয়ত পালনে সম্রাটের নিষ্ঠা ও সাহসের উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিত এই ইতিহাসকে এতই সঙ্কীর্ণ পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, ১৮ শতকের শেষের দিকে ইংরাজ কোম্পানী যে সর্বভারতীয় শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল তার কোনও বিবরণ ত' নাই-ই, আভাসে-ইঙ্গিতেও তার উল্লেখ করা হয়নি। সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনাতেও জাকাউল্লার ব্যক্তিকেন্দ্রিত অনুবীক্ষণি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। বাহাদুর শাহের নির্বাচন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা বা মুসলমান শক্তির এই চরম পতনের কারণ বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি।

জাকাউল্লার মানসিকতার আর একদিকের পরিচয় গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের একটা মূল্যায়ণ হিসাবে হিন্দুরা মুসলমান রাজত্বের ফলে কী ভাবে উপকৃত হ'য়েছে তার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু শাসনব্যবস্থার কোনও সংবাদ তেমন জানা যায় না। তাঁর যুগে এ কথা আংশিক সত্য ছিল বটে, কিন্তু এ মন্তব্য করার পরই তিনি হিন্দু শাসন ব্যবস্থার একটা কাল্পনিক বর্ণনা দিয়ে তার সঙ্গে মুসলমান শাসনের তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এবং উপসংহারে ফার্শি ঐতিহাসিকদের আত্মতৃপ্ত ("self complacent) ভঙ্গিতে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এই বলে যে, রীতি নীতি, আইনকানুন, শিল্পসাহিত্য, কোন ক্ষেত্রেই হিন্দুদের তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল না, আর থাক্‌লেও তা মুসলমানদের সাথে তুলনা করার যোগ্য নয়"। কাজেই মুসলমান শাসনের ফলে যে ভারতবর্ষ সভ্য হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই।[৫] শিব্‌লী নোমানিও তাঁর একটি প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছিলেন: "অন্যের দেশ আক্রমণ করে দখল করা তেমন দোষের কথা নয়; আসলে, সভ্যতাবিস্তারের যোগ্যতা ও আগ্রহ দিয়েই বিজয়ীকে আমাদের বিচার করা উচিত।"[৬]

এ যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে এ ধারার প্রবর্তক ছিলেন সাংবাদিক আবদুল হালিম শরর। দুনিয়া থেকে মিথ্যা ও অসুন্দরকে দূর করে ন্যায়বিচার ও বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা করতে, সাম্যবাদের পতাকাবাহী ইসলামের মহান প্রচেষ্টাই তাঁর উপন্যাসের মূল সুর। স্পেনে, ভারতবর্ষে ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসলামের ক্ষাত্রশক্তি, মহত্ব ও সৌকর্যকে আদর্শায়িত করে দেখানোর উৎসাহে শরর কাহিনী বা চরিত্রাঙ্কনকেও উপেক্ষা করেছেন। ইনি সিন্ধুতে মুসলমান শাসনের একটি ইতিহাসও প্রণয়ন করেন। তার উপাদান বেশীর ভাগই Elliot এর সঙ্কলিত ইংরাজি ইতিহাস থেকে নেওয়া হয়েছিল। এতে, জাকাউল্লার 'তারিখের' মত, বিভিন্ন বিবরণ ও সাক্ষ্যকে ফার্শি ইতিহাসের রীতি অনুযায়ী, অত্যন্ত যত্নের সাথে লিপিবদ্ধ করা হলেও ঘটনার মূল্যনিরূপণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে এবং সেজন্য এ রচনাটি উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজনা। নীতি প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকলেও শররের চিত্তবৃত্তি ছিল আসলে রোমান্টিক কাহিনীকারের। সেজন্য লখনৌএর শেষ বাদশাহকে নিয়ে লেখা তার আর একটি রচনা 'মাশ্‌রেকি তামাদ্দুন কা আখরী বাহার্' এই পতনোন্মুখ রাজত্বের ইতিহাস না হয়ে ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারী ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতি-চর্যার একটি আদর্শায়িত আবেগময় বর্ণনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছয়

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, ভারতের ভাষাগুলির মত, উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যেও রাজনৈতিক আন্দোলন-সৃষ্ট মনোভাব প্রতিফলিত হতে থাকে। প্যান্ ইসলামী আদর্শের টানে মুসলমানরা ক্রমেই ইংরাজবিরোধী ও মুক্তি আন্দোলনের সমর্থক হয়ে ওঠে। মুক্তির জন্য হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেজন্য ইতিহাস থেকে এই দুই জাতির মধ্যে অতীত সৌহার্দ্যের প্রমাণ সংগ্রহ ও বিবরণ দেওয়া ঐতিহাসিকের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। যে সব অতীত ঘটনা হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে, সেগুলির পুনর্ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ৎ দেওয়া ঐতিহাসিকের দায়িত্ব বলে গণ্য হোল। ইংরাজ যেহেতু মুক্তি আন্দোলনের একমাত্র প্রতিবন্ধক হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে জিইয়ে রাখার জন্য ইংরাজ লেখকদের দুরভিসন্ধিকে সেজন্য দায়ী করে নিশ্চিন্ত মনে ইতিহাসকে সময়ের তাগিদানুযায়ী ব্যাখ্যা করা

ঐতিহাসিকের পক্ষে সহজ ছিল। চিন্তার প্রসার ও যুক্তি প্রমাণের সমৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এ যুগের ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলীতে এই সাময়িকতার ছাপ খুবই বেশী। তাছাড়া আর্য সমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলন, হিন্দি-উর্দু বিবাদ, নূতন ও পুরাতনপন্থী মুসলমানের চিরন্তন বিরোধ প্রভৃতি সাময়িক প্রশ্নের দরুন উর্দু-ভাষী মুসলমানের মনে যে জটিলতা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার ফলে ঐতিহাসিক চিন্তার লক্ষ্যও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এ সময়ে শিবলীর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে এ দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানদিগকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিবার উৎসাহ দিয়ে তিনি ১৯১৩ সালে লক্ষ্ণৌএর উর্দু 'মুসলিম গেজেটে' কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার একটিতে ইতিহাস থেকে মুসলমান বাদশাদের ধর্মান্ধতা সত্ত্বেও তাদের প্রতি হিন্দুদের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও সহযোগিতার নজীর দেখিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদের বন্ধুত্বে আস্থা স্থাপন করতে তিনি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন। চার বছর পরে, ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে এ মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করে এবং আর একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁকে স্বীকার করতে হয় যে, হিন্দুদের আনুগত্যের মূলে তাদের উদারতার চেয়ে মুসলমান বাদশাদের সহৃদয় ব্যবহারই ছিল বেশী কার্যকরী।[৭]

এ যুগের রচনাগুলিতে সাময়িকতার প্রতিফলন আর একদিক দিয়েও দেখা যায়। ইতিহাস থেকে মুসলমানদের সমকালীন কর্মনীতির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার আগ্রহ লেখাগুলিতে স্পষ্ট। 'আওরঙ্গজেব আলমগীর পর একনজর' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটি তার দৃষ্টান্ত। এটি খিলাফত নেতা মওলানা মুহম্মদ আলীর অনুরোধক্রমে লেখা এবং যুক্তি ও তথ্যের গুণে উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রচনা। এতে আওরঙ্গজেবের সম্পূর্ণ ইতিহাস নাই। তাঁর যেসব কার্যের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে ইংরাজ ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু লেখকরা বক্রোক্তি করে থাকে, এবং যা হিন্দু-মুসলমানের মনে বিদ্বেষের সঞ্চার করতে পারে, তারই এক তথ্য-নির্ভর ব্যাখ্যা। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও প্যান-ইসলামি জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকেই আওরঙ্গজেবকে বিচার করা হয়েছে। তাঁকে ভারতীয় নৃপতির চেয়ে মুসলমান বাদশা হিসাবে দেখার দরুন, শাসন কাজে শরীয়তের নীতি প্রতিষ্ঠা, দারা শুকোহের ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টার বিরোধ, আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ শাসন-নীতি বর্জন প্রভৃতি কয়েকটি কার্যের জন্য শিব্‌লী তাঁকে সমালোচনা করেন নি। যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাঁর হিতাকাঙ্খা ও

উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণ করেছেন মাত্র। বিশ্বমুসলিম সমাজের ভারতীয় শাখা, স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যে সৌহার্দ্য ও প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ ছিল, আওরঙ্গজেবের নীতি তার পরিপন্থী ত নয়-ই, বরঞ্চ মুসলমানকে স্বধর্ম রক্ষায় প্রবৃত্ত করার ফলে উভয়ের মধ্য দিয়ে যে সমতা বিধান করার চেষ্টা এ নীতির মূলে ছিল তার দরুন সে সূত্র আরও দৃঢ় হবারই কথা।[৮] শিব্‌লীর যুক্তিতে তাঁর সমকালীন ধর্মানুপ্রাণিত ইংরাজবিরোধী মুসলমান আন্দোলনের ছায়াপাত সুস্পষ্ট।

সাত

খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর উর্দুর ঐতিহাসিক চিন্তাবৃত্তির আরও স্বচ্ছতর প্যাটার্ন চোখে পড়ে। শিব্‌লীর চিন্তাধারা অবশ্য এ প্যাটার্নের ভিত্তি। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আজমগড়ের 'দারুল মুসান্নেফী'নের উদ্যোগে তাঁর শিষ্য ও সহকর্মী সুলেমান নাদ্‌ভী সে চিন্তার সূত্রগুলিকে আরও প্রসারিত করেন। ঐতিহাসিক হিসাবে উর্দু-সাহিত্যে শিব্‌লীর পরই সুলেমান নাদ্‌ভীর স্থান। উর্দু ইতিহাস-সাহিত্যে শিব্‌লীর সবচেয়ে বড় দান এই যে তিনি মূল দলীল-দস্তাবেজগুলির উদ্ধার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার পরীক্ষা ও ব্যবহারের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। এ ধারা আজমগড় গোষ্ঠী অব্যাহত রেখেছেন। এঁদের চিন্তায় শিব্‌লীর প্রভাব ত আছেই, ওহাবী মনোবৃত্তির রেশও দুর্লভ নয়; জাতীয়তাবাদ, পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ ও সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্বের দিকে ঐকান্তিক ঝোঁক তার দৃষ্টান্ত। মুসলমান ও তাদের সংস্কৃতি যে ভারতের জীবনে প্রধানতঃ বিদেশাগত উপাদান, যার পৃথক সত্তার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ দেশীয় উপাদানের তুল্য মর্যাদায় ও সহযোগিতায় হওয়ার দরকার, এ বিশ্বাসের দৃঢ়তা এই লেখক গোষ্ঠীর আর একটি বৈশিষ্ট্য। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে এঁরা বিশ্বাসী ও সচেষ্ট কিন্তু বাঞ্ছিত পরিণতি হিসাবে এদের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কল্পনা এঁদের চিন্তারীতির বিরোধী। এঁদের ঐতিহাসিক রচনাগুলি প্রধানতঃ সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে; রাজনৈতিক ইতিহাস-রচনায় এঁদের উৎসাহ নাই। কেবলমাত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের চাপে পড়ে ভারতবর্ষকেও এঁরা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, নয়ত এঁদের ইতিহাসবোধ ভারতবর্ষ-সচেতন নয়। আরবী ইতিহাসপ্রণালী অনুসরণ করে জীবনী আকারে রচিত সাহিত্য ও ধর্মতত্ত্ব

বিষয়ে এঁদের ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি গবেষণার মৌলিকত্ব ও রচনাশৈলীর গুণে ইয়োরোপীয় Orientalistদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

হিন্দু-মুসলমানের এক জাতিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত ইতিহাসের সংখ্যা উর্দু ভাষায় বেশী নাই। ১৯০৫ সাল থেকে এ মনোভাবের তেমন অকুণ্ঠ প্রকাশও দেখা যায় না। ১৯৩১ সালে সুলেমান নাদ্‌ভী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে পুষ্ট করার জন্য "আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুকাত" লিখেছিলেন, যাতে ভারতবর্ষ ও আরবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ঐতিহাসিক নজীরগুলি মূল আরবী-ফার্সি থেকে সংগ্রহ করে হিন্দু মুসলমানকে সেই স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করিয়েছেন যখন এই দুই জাতি বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিল। উপক্রমণিকায়, হিন্দু মুসলমান বিরোধের জন্য ইতিহাসের বিকৃতিকে দায়ী করে জাতীয় সংহতির কাজে ঐতিহাসিকের গুরু-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন।[৮] এখানে লক্ষণীয় যে, সুলেমান নাদ্‌ভী যে জাতীয়তার কথা বলেছেন তা কংগ্রেসের ধারণাসম্মত territorial জাতীয়তা নয়। এ জাতীয়তাবাদ হালীর ধারণাসম্মত, সেজন্য মুসলমান ও আরবের ইতিহাসকে অভিন্ন মনে করে ভারতবর্ষের সঙ্গে মুসলমানের ঐতিহাসিক ঘনিষ্ঠতা দেখান হয়েছে। অবশ্য ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবকে দৃঢ় করতে এ ধরণের প্যান-ইসলামী জাতীয়তাবাদ অবান্তর হয় নি। এই মনোভাবের সংক্রমণ আবদুল্লাহ ইয়সুফ আলী, আই. সি. এস. এর লেখা 'অংরেজি আহ্‌দ্‌ মেঁ হিন্দুস্থানী তাহজীবে'ও দেখা যায়, যাতে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ভারতীয়দের উপর ইংরাজের অমানুষিক অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে তাদের বিদ্বেষপ্রসূত বিবরণগুলির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। উর্দুতে ইয়সুফ আলীর আরও দুইটি ঐতিহাসিক রচনা আছে। কিন্তু গবেষণারীতির দিক দিয়ে এগুলি উর্দুর ব্যতিক্রম, কারণ বিভিন্ন ভাষা ও সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও তুলনামূলক বিচারভঙ্গির জন্য এগুলি ইংরাজিতে লিখিত ইতিহাসেরই অন্তর্গত এবং ইংরাজি শিক্ষিত পাঠকের রুচিগ্রাহ্য করেই এগুলি লেখা।

কংগ্রেসের ধারণাসম্মত জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন হিন্দু লিখিত উর্দু ইতিহাসেও তেমন নাই। ১৯০৫ সালে লালা লাজপত রায় দুই খণ্ডে একটি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেছিলেন। তাতে ভারতীয় সভ্যতায় মুসলমান অবদানের স্বীকৃতি আছে বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের এক জাতিত্ব প্রমাণের তেমন চেষ্টা নাই।

সে চেষ্টা পণ্ডিত সুন্দরলালের 'হিন্দুস্থান মেঁ অংরেজী হুকমাত্' নামিত ১৯৩২ সালের দিকে লেখা বইটিতে অতি আন্তরিকতার সাথে করা হয়েছে। তবে এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা ইতিহাস হিসাবে তেমন সফল নয়; এতে ইংরাজ শাসনের কংগ্রেসী ব্যাখ্যার যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টাই যেন বেশী। ভারতের জাতীয়তা ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে আদর্শ করে ইতিহাস রচনার আরও সফল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গত মহাযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত দিল্লীর জামেয়া মিল্লিয়া কলেজের অধ্যাপক আবিদ হোসেনের 'হিন্দুস্থান কি কওমী তাহজীব' নামক পুস্তকটিতে। ভারতের সংস্কৃতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা বিচ্ছেদবাদী বা স্বাতন্ত্র্যপন্থীর (disruptive or extraneous) নয়, বরং অনুপূরকের (complementray), এ কথার উপর জোর দিয়ে লেখা এই বইটি বোধ হয় আধুনিক উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যের সবচেয়ে সার্থক রচনা। মুসলমান ইতিহাসে বিতর্কের চিরন্তন কেন্দ্র সম্রাট আওরঙ্গজেবকে এই গ্রন্থে নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটাই করা হয় নি। বরং তাঁকে অশোকের ন্যায় আদর্শবাদীরূপে দেখান হয়েছে, যিনি সস্তা অপ্রিয়তা উপেক্ষা করে তাঁর নিজের বিশ্বাসমতে ইসলামের নীতিকে শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠানে নয়, কায়মনোবাক্যে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যান্য আদর্শবাদীর মত যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যুগের ক্রমবর্দ্ধমান ধর্ম-নিরপেক্ষ বস্তুতান্ত্রিকতার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল।[১০]

উর্দুর স্বাতন্ত্র্যবাদী ইতিহাসবোধ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছে যেমন, তেমন তার থেকে শক্তি সঞ্চয়ও করেছে। আলীগড় আন্দোলনের চিন্তাধারায় যেসব উপাদানগুলি নেপথ্যে ছিল এবং শিব্‌লী প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনায় যেগুলি ক্রমশঃ রূপায়িত হচ্ছিল, স্বাতন্ত্র্যবাদী ঐতিহাসিকতা তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় জীবনধারার সাথে মুসলমানদের মৌলিক ও দুরতিক্রম্য পার্থক্য দেখিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা প্রতিপন্ন করা এ ঐতিহাসিকতার প্রধান উপজীব্য। হিন্দু সভ্যতা বা প্রাক্ মুসলিম ভারত সম্বন্ধে এর কোনও কৌতূহল বা শ্রদ্ধা নাই। এ ঐতিহাসিক চিন্তায় অনেক ক্ষেত্রে revivalismএর সুর পাওয়া যায় এবং ইতিহাসের বিচারে (judgement) ধার্মিকতাকে মানদণ্ড করার প্রবৃত্তি এর আর এক লক্ষণ। এ মনোবৃত্তি অনুযায়ী আওরঙ্গজেবই ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলমান সম্রাট এবং আকবর ও দারা শুকোহ স্বজাতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক। স্বাতন্ত্র্যবাদী

ঐতিহাসিকরা অবশ্য পাশ্চাত্য গবেষণারীতিতে শ্রদ্ধাশীল এবং ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক মূল্যমান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে এঁরা দ্বিধাবোধ করেন না। ১৯৫২ সালে করাচী থেকে প্রকাশিত হাশিম ফরিদাবাদীর 'তারিখ্-এ-পাক্ ও হিন্দ্' নামক রচনাটি এই স্বাতন্ত্র্যবাদী ঐতিহাসিকতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

উর্দুর ইতিহাস-সাহিত্যে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নাই বল্লেই চলে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে লেখা গোলাম বারীর 'কোম্পানী কী হুকুমাত্ হিন্দুস্থান মেঁ' এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় হলেও, আসলে এটি Lester Hutchinson এর Nabobs of Indiaরই সার সঙ্কলন; নিজস্ব মননরীতির পরিচায়ক নয়।

টীকা

(১) হবিবুর রহমান শেরওয়ানি : 'ওয়াকার-এ-হায়াত'; আলীগড়, ১৯২৫, পৃঃ ৩৮২।

(২) হুসেন আলী ও কুদরত আলী সম্পাদিত 'মআসির-এ-তালিবী'; কলকাতা, ১৮১২। English tran. Charles Stewart; London, 1810. এ বইটির সে সময় ফরাসী ও জার্মাণ ভাষাতেও তরজমা হয়েছিল। লেখকের বৈশাখ, ১৩৪১ সালের 'মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত "ইয়োরোপে প্রথম ভারতীয়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৩) Butt, Abdullah : Spirit and Substance of Urdu Prose under the Influence of Sir Syed Ahmad Khan; Lahore, p. 148. Syed Ahmad Khan: The Truth About the Khilafat (English tran.) Lahore. (revised ed.) p. 5.

(৪) 'আল-মামুন', ১ম ভাগ, পৃঃ ১৪।

(৫) জাকাউল্লা: 'তারিখ-এ-হিন্দুস্থান', খণ্ড ১০, পৃঃ ১৪—১৯ দ্রষ্টব্য।

(৬) শিবলী নোমানি : 'মাকালাত' : আজমগড়, ভাগ ৬, 'মোগল শাসনের সাংস্কৃতিক রূপ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৭) 'মাকালাত' : ভাগ ৮ "মুসলমানু কা পোলিটীকাল কারওয়াট্" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

(৮) শিবলী নোমানি : 'আওরঙ্গজেব আলমগীর পর এক নজর', পৃঃ ৭—৮।

(৯) সুলেমান নাদ্ভী: 'আরব ও হিন্দকে তাআল্লুকাত'; এলাহাবাদ, ১৯৩১, ভূমিকা, পৃঃ ১।

(১০) আবিদ হোসেন: 'হিন্দুস্থান কী কওমী তাহ্জীব'; দিল্লী, ১৯৪৬, পৃঃ ২৫৯।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্চা

শ্রী চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা অবধি আজ প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্চা চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও সেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কার্য আরম্ভ করে। এসিয়াটিক সোসাইটির মত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, প্রাচীন পুথির সংকলন ও প্রকাশ এবং প্রাচীন গ্রন্থের গবেষণামূলক সংস্করণ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ক্রমে অন্যান্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ও স্বতন্ত্রভাবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ ব্যক্তি এইরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে আজ আমরা প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানিতে পারিয়াছি— বিপুল প্রাচীন সম্পদের প্রচুর নিদর্শন আজ আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে এই ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। শিক্ষার উচ্চতম স্তরেও অনেকে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। এই অবস্থায় আত্ম-সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না — আমাদিগকে কঠোরভাবে আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে, আমাদিগের দোষ-ত্রুটি অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে — যাহাতে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আমাদের প্রধান অসুবিধা এই যে, আমাদের গণ্ডী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ফলে কৃতকার্যের নিন্দা ও প্রশংসার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ, বাংলায় বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে সার্থক আলোচনা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কর্মীদের উৎসাহের অভাব ঘটে এবং আশানুরূপ ভাল কাজের পরিমাণ খুব কম হয়।

এই কার্যের গুরুত্ব ও ইহার আনুষঙ্গিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করিলে ইহাতে সমুচিত উৎসাহদানের প্রয়োজন অনুভূত হইবে। প্রাচীন পুথির বিবরণ সংকলন ও প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণ প্রণয়ন আপাতদৃষ্টিতে যতটা সহজ মনে হয়, আসলে উহা তত সহজ নয়। এই কার্যের জন্য বিশেষ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। পুথির বিবরণ প্রণয়নের কাজে দীর্ঘ সময় ও প্রচুর পরিশ্রমের দরকার হয়। পুথির বিষয়বস্তু, ইহার বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করিয়া সমবিষয়ের অন্য পুথির সঙ্গে ইহার পার্থক্য প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গের যথাসম্ভব পরিচয় পুথির বিবরণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস-লাইব্রেরী ও অক্সফোর্ডের বোডলিঅন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির বিবরণ এই দিক দিয়া আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, এই আদর্শকে আমরা আমাদের কার্যের মধ্যে এখনও প্রতিফলিত করিতে পারি নাই। আমরা সাধারণতঃ পুথির আরম্ভ, মধ্য ও শেষ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের কার্য সমাপ্ত করি। বস্তুতঃ পুথি আলোচনার ব্যাপারে আমরা এখন পর্যন্ত যথোচিত অগ্রসর হইতে পারি নাই। নানা প্রতিষ্ঠানে বিস্তর পুথি সংগৃহীত হইয়াছে সত্য— কিন্তু অনেক সংগ্রহের বিবরণ ত দূরের কথা, কোন তালিকা পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অথচ কোথায় কি পুথি আছে তাহা জানিতে না পারিলে— তাহার বিবরণ না পাইলে এবং পণ্ডিত সমাজের মধ্যে তাহার আদান-প্রদান ও ব্যবহারের সুব্যবস্থা না হইলে পুথির যথোচিত আলোচনা হইতে পারে না—ইহাকে সার্থকভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে না। এ জন্য যেমন দ্রুত সমস্ত সংগ্রহের বিবরণ বা তালিকা সংকলনের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন বিবরণ ও তালিকা অবলম্বনে প্রস্তুত একখানি কোষগ্রন্থের। সংস্কৃত পুথি সম্পর্কে সংকলিত এইরূপ কোষগ্রন্থ 'ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম' যাঁহাদের পুথি ব্যবহার করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য। ইহার আদর্শে বাংলায় একখানি প্রাচীন সাহিত্য-কোষ সংকলনের প্রস্তাব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে গৃহীত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ প্রস্তাব এখন পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই।

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণের উৎকর্ষ ও গৌরব পুথি আলোচনার ত্রুটিহীনতা ও নৈপুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য চাই যথেষ্ট

শিক্ষা ও প্রচুর অভ্যাস। যদৃচ্ছাক্রমে সংগৃহীত একাধিক পুথির একখানির পাঠকে মূলপাঠরূপে গ্রহণ করিয়া অপর পুথিগুলিতে প্রাপ্ত পাঠান্তর লিপিবদ্ধ করিলেই বৈজ্ঞানিক সংস্করণ প্রস্তুত হয় না। লিপিকাল ও লিপিস্থান হিসাবে পুথিগুলিকে সাজাইয়া তাহাদের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আবিষ্কার করিতে পারিলে পাঠবিচার ও পাঠনির্ণয়ের সুবিধা হইতে পারে। একালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সংগৃহীত পুথি এবং ভারত ও বৃহত্তর ভারত হইতে সংগৃহীত অন্যান্য উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া পঞ্চতন্ত্র, মহাভারত ও রামায়ণ গ্রন্থের আদর্শ সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান জুড়িয়া প্রচলিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে এইরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে। তবে একজনের চেষ্টায় এ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার আবশ্যক। চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এইরূপ চেষ্টার আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহারই আনুষঙ্গিক ফল শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে এই জাতীয় চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন এদিকে আর কোনও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অথচ এ বিষয়ে তৎপর হওয়া আশু কর্তব্য।

যে সমস্ত গ্রন্থের প্রসিদ্ধি ও প্রচার ক্ষুদ্র অঞ্চল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যাহাদের প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা নগণ্য, এক বা দুইখানি মাত্র—তাহাদের স্থলে পুথির তুলনামূলক আলোচনা তেমন সম্ভবপর নয়। তাই সে ক্ষেত্রে পাঠ নির্ণয়ের জন্য বহিঃপ্রমাণের উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়। এ জন্য গ্রন্থ-সম্পাদকের নানা বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া, প্রাচীন সাহিত্যের সহিত ব্যাপক পরিচয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ উপযোগী। প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের পুথি প্রায়শই অশিক্ষিত লোকের হস্তলিখিত এবং অশুদ্ধিবহুল। বানানের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রাচীন বাংলা পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অধুনা প্রকাশিত সংস্করণে পুথির বানান অপরিবর্তিত রাখা হইবে বা পরিবর্তিত হইবে এবং পরিবর্তন করিতে হইলে কতটা ও কিরূপ পরিবর্তন সঙ্গত হইবে—তাহা ধীর-ভাবে বিচার করিয়া ঠিক করা দরকার, সম্পাদকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। তাহা ছাড়া, অধুনা অপ্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় অপরিচিত গ্রাম্য আচার-ব্যবহারের যে সব বর্ণনা ইহাদের মধ্যে পাওয়া

—১৬

যায় তাহাদের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা বা তাৎপর্য গ্রহণ করা দুরূহ। প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, গ্রাম্য ভাষা ও লোকাচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছাড়া এ কার্য সম্ভবপর নয়। অথচ একত্র এরূপ বহুগুণের সমাবেশ দুর্লভ। ফলে প্রাচীন গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণের অভাব অনুভূত হইতেছে—প্রকাশিত সংস্করণের পঠন পাঠনে নানা অসুবিধা দেখা যাইতেছে। এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির অনেক অংশ আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণগুলির টীকা-টিপ্পনী অনেক ক্ষেত্রে ভ্রম ও অপব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে আমরা অনেকটা উদাসীন। গ্রন্থের পংক্তিব্যাখ্যা আজ উপেক্ষিত—প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থের খুঁটি-নাটি ব্যাখ্যা আজ অনাদৃত। এমন কোন গ্রন্থ নাই—যাহার সাহায্যে এই সমস্ত গ্রন্থের অর্থবোধ সুসাধ্য হইতে পারে। প্রাচীন বাংলা শব্দকোষ, গ্রাম্য শব্দকোষ ও লোকাচারকোষ সংকলিত হইলে এ অসুবিধা দূর হইতে পারে। কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ একখানি প্রাচীন বাংলা শব্দকোষ সংকলনের কল্পনা করিয়াছিলেন। সে কল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে সংযোজিত শব্দসূচীর মধ্যে এই শব্দকোষের মূল্যবান উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আছে। গ্রাম্য শব্দকোষ সংকলন সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলার বিভিন্ন অংশের বহু শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সংগ্রহ পরিষদ পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। অন্য কোন কোন পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র পুস্তকেও এইরূপ শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথের অন্তিম অভিলাষ অনুযায়ী একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি এ বিষয়ে কৃতকার্যের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলাম (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৯)। দীর্ঘদিন পূর্বে যে কার্যের সূচনা হইয়াছিল —নানা মনীষী নানাভাবে যাহাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষার পরম প্রয়োজনীয় সেই কার্য আজও উপেক্ষিত অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

হিন্দু বাংলার লৌকিক দেবতা ও লোকাচারের বহু বিবরণ বিক্ষিপ্তভাবে নানা পত্রিকা ও পুস্তকের পৃষ্ঠায় ছড়ান রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিবরণ সংগ্রহের মূল্য সম্বন্ধে ছাত্রসমাজকে উদ্‌বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই কাজের জন্য ছাত্রদের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আবেদন

কতটা সার্থক হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে, নিয়মবদ্ধভাবে এ বিষয়ে কোনও কাজই এখন পর্যন্ত হয় নাই। আর এক মস্ত অসুবিধা এই যে, কোন বিষয়ে কেহ কিছু প্রকাশ করিলে তাহার সন্ধান পাওয়া ও তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় লাভ করার কোন ব্যবস্থা নাই। নিয়মিত গ্রন্থপঞ্জী বা প্রবন্ধপঞ্জী প্রকাশিত না হইলে এ অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে না। 'সাহিত্য বার্তা' নাম দিয়া কয়েক বৎসর 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় এই পঞ্জী প্রকাশের সূচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহা স্থায়িত্বলাভ করে নাই। ১৩৪৩ সালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশ অধিবেশনে এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই।

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অনুশীলন আধুনিকপূর্ব যুগে সাধারণ লোকের মধ্যেই প্রচলিত ছিল — শিক্ষিত-সমাজে ইহার তেমন আদর ছিল না। কচিৎ দুই একজন রাজা নবাব বা রাজদরবারের লোকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কোন কোন লেখকের ভাগ্যে জুটিয়াছে সত্য কিন্তু প্রায় সকলেরই আসল পৃষ্ঠপোষক জনসাধারণ। জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীন কবিগন কাব্য রচনা করিতেন। জনসাধারণের আসরে তাঁহাদের কাব্য গীত বা পঠিতও হইত। তাহারা ইহা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিত।

সাধারণ লোকের জন্য রচিত এই সাহিত্য স্বভাবতই শিক্ষিত সমাজের তৃপ্তি বিধান করিতে পারিত না — তাঁহারা সংস্কৃত বা ফারসীর মারফত তাঁহাদের সাহিত্যরস পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেন — নিজেদের মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থ তাঁহারা আলোচনার যোগ্য বিবেচনা করিতেন না। ইহা তাঁহাদের নিকট একরূপ অপাংক্তেয় ছিল। বিশাল সংস্কৃত ও ফারসী সাহিত্যের নিয়মিত পঠন-পাঠন সংগঠন ও সমালোচনে তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতেন। এক দিকে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাদেশিক ভাষায় লঘু সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে অপর দিকে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় উচ্চাঙ্গের লঘু সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে গুরু-গম্ভীর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। জ্ঞানাহরণের জন্য এই সব গ্রন্থ ছিল অপরিহার্য। বাংলা বা অন্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্রধানত অবসর বিনোদনের যোগ্য ছিল। এই অবস্থায় বাংলা-ভাষায় রচিত সাহিত্য যথোচিত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে ইহার আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকায় কালক্রমে নানারূপ

বিকৃতি ও অশুদ্ধি ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে ইহার আসন নির্দিষ্ট হইলেও ইহা ছাত্র-সমাজে বা শিক্ষিত মহলে তেমন সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ছাত্রদের প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের আলোচনা পরীক্ষার প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য চর্চাকে যাঁহারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এমন পণ্ডিতের সংখ্যা নগণ্য। অথচ নিছক সাহিত্যের দিক্ দিয়া এই সাহিত্যের মূল্য যাহাই হউক না কেন ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের দিক্ দিয়া ইহার মূল্য অবিসংবাদিত। প্রকৃত দেশকে যদি জানিতে হয় — দেশের জীবনধারার সঙ্গে যদি পরিচয় লাভ করিতে হয় তাহা হইলে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হইবে—ইহার প্রতিটি পংক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে—ইহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়া অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে।

পাক-ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রাদেশিক ভাষায় এমন সমস্ত পুরাণ কাহিনী পাওয়া যায় যেগুলির কোন সন্ধান প্রচলিত পুরাণ গ্রন্থে পাওয়া যায়না। ইহাদের সকলগুলিই যে অর্বাচীন এমন কথা বলা যায় না। হইতে পারে ইহাদের কিছু কিছু সুপ্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ লোক-সাহিত্যে প্রচলিত আখ্যানের কতকগুলিই ব্যাস ও বাল্মীকি সংকলন করিয়া অমর হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে যে সমস্ত কাহিনী পাওয়া যায় না অথচ প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্যে পাওয়া যায় এরূপ কাহিনী মাত্রই অপ্রাচীন ও উপেক্ষণীয় মনে করা চলে না। পুরাণ কাহিনীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দিক হইতে ইহারা বিশেষ মূল্যবান্ হইতে পারে। তাই ইহাদের সংকলন, সমালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

আমেদাবাদের অধ্যাপক শ্রী শিবলাল জেসলপুরা কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত অভিমন্যু উপখ্যানের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। এইরূপ আলোচনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন ভাষায় নিবদ্ধ উপখ্যানগুলি সংগ্রহ করা দরকার। বাংলায় প্রচলিত কতকগুলি কাহিনীর পরিচয় কিছুদিন পূর্বে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (৫৬।৪৫—৪৮) প্রকাশিত হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে নানা দিকে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য চর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে। এজন্য উপযুক্ত কর্মী গড়িয়া তুলিতে হইবে। কর্ম সম্পাদনের যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ আছে তাঁহাদের সকলকেই এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে এবং যথাশক্তি এই কার্যের সহায়তা করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন

মুনীর চৌধুরী

এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, অধুনা দুষ্প্রাপ্য মীর মশাররফ হোসেনের স্বরচিত জীবন চরিত আমার জীবনীর[১] একটি পূর্ণাংগ বর্ণনা প্রকাশ করা। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়ে সতর্ক পাঠকের বিচারাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় পরিচয় যথেষ্টরূপে পরিতৃপ্তিকর বা নিরন্ধ্র হোতে পারে না। বর্তমান প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট। মীর সাহেবের বইটি বিপুল। পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৪১৫। তার ওপর আত্মকাহিনীর মধ্যে জগতের যাবতীয় বস্তু ও তত্ত্বের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে বোলে সকল অংশ সমান প্রাসংগিকতার সূত্রে পরস্পরের সংগে সুগ্রথিত নয়। বইটি তাড়াতাড়ি পোড়বার সময়[২] এবং টুকে নেবার জন্যে অংশ বাছাই করার কালে আমার ব্যক্তিমানসের নানা প্রবণতা যে আমার মনোযোগকে পরিচালিত করে নি এমন কথাও বোলতে পারি না। তবুও মূলের পরিচয়কে যথাসম্ভব অস্পর্শিত বিশুদ্ধতায় উপস্থিত কোরতে প্রয়াস পেয়েছি। আলোচনার দ্বারা যে অন্তরাল সৃষ্টি করেছি তার অপনোদনের জন্যে প্রবন্ধের শেষে পরিশিষ্টে মূল বইয়ের এক সুবৃহৎ অংশ পৃষ্ঠানুক্রমিক ধরাবাহিকতা বজায় রেখে অবিকল তুলে দিয়েছি।

বর্তমান প্রবন্ধের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মীর সাহেবের আমার জীবনীর একটি বিস্তৃত পশ্চাদপট ও ভূমিকা রচনার অজুহাতে বাংলা ভাষায় রচিত আত্মচরিত সমূহের একটি বর্ণনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করা।

দুই

আত্মকথার ভূমিকায় প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, 'আমি বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে তাঁর কাগজে আত্মকথা যে কেন লিখিনি, তার একটা নাতিহ্রস্ব কৈফিয়ৎ প্রকাশ করি। তাতে যতদূর মনে পড়ে প্রথমে বলি যে, বাংলা সাহিত্যে আত্মকথা লেখার রেওয়াজ নেই।'[৩] রবীন্দ্রনাথ, নবীন সেন এবং ঢাকা জেলার

জনৈক ব্রাহ্মণকন্যা লিখিত আত্মজীবনীত্রয় ছাড়া বাংলা ভাষায় এই সাহিত্য-রূপের অন্য নজীর তিনি অনায়াসে মনে কোরতে পারেন নি। এবং আত্মচরিতে প্রত্যাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও রস যে এগুলোর মধ্যে স্পষ্টতই উপেক্ষিত হোয়েছে একথাও তিনি না বোলে ছাড়েন নি।

প্রমথ চৌধুরীর এ অভিমত রহস্যচ্ছলে উচ্চারিত হোলেও এর অন্তর্নিহিত বিশ্বাসটি অমনোযোগ ও অসতর্কতা পুষ্ট। 'আমাদের নব্য বংগ সাহিত্যের নানা বিষয়ে পথপ্রদর্শক' বংকিম তাঁর আত্মজীবনী লেখেন নি এটা সত্য। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সুরু কোরে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত, বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় উদ্যোগী বংগদেশীয় প্রায় প্রত্যেক মনীষীই তাঁদের নিজেদের জীবন কাহিনী লিখে রেখে যেতে প্রয়াস পেয়েছেন। কোনোটা আয়তনে বিরাট, কোনোটা সংক্ষিপ্ত। কেউ হয়তো আত্মমানসের বিচিত্র বিবর্তনের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন, কেউ কর্মযোগী সমাজিকের দৃষ্টি নিয়ে পরিচিত পরিবার ও পরিবেশের বিশদ চিত্র তার সংগে যুক্ত কোরেছেন। নিজে লেখেন নি, কিন্তু নিজের জবানীতে অন্যের লেখার মধ্যে আত্মপরিচয় প্রকাশ কোরেছেন এমন চরিত্রও একাধিক। আমাদের নির্দিষ্ট কালগণ্ডির মধ্যে সেরকম একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হোলো পুরাতন প্রসংগ।[৪] এই বইয়ের লেখক বিপিন বিহারী গুপ্ত, আত্মকাহিনীর কথক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। আরেকটি বইয়ের নাম বিদ্রোহে বাংগালী।[৫] কথা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু সেগুলো গুছিয়ে লিখতে সাহায্য কোরেছেন বা লিখে দিয়েছেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। উভয় গ্রন্থকেই আমাদের আলোচ্য তালিকার এখতিয়ারভুক্ত কোরে নিয়েছি। আত্মবর্ণিত একক চরিত্রের আখ্যান না হোলেও একাধিক আত্মজীবনীর সংকলন হিসেবে বংগভাষার লেখক[৬] মূল্যবান বই। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'পিতাপুত্র' এই সংকলনের দীর্ঘতম ও সার্থকতম রচনা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের জীবনের নানা কথা এই গ্রন্থে বিবৃত কোরেছেন। তবে রচনাগুলো আয়তনে ও আবেদনে পূর্ণাংগ আত্মজীবনীর সংগে একাসন পেতে পারে না বোলে বইটির উল্লেখ মাত্র কোরে ক্ষান্ত হোলাম।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে সুরু কোরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী প্রকাশের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। রাসসুন্দরী দাসী[৭], ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর[৮], দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়[৯], মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর[১০], রাজনারায়ণ বসু[১১], নবীন সেন[১২], মীর মশাররফ হোসেন[১৩], রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৪], সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৫], শিবনাথ শাস্ত্রী[১৬],—এঁদের আত্মজীবনী সমূহ এই সংকীর্ণ কালের মধ্যে ছাপা হয়। ১৯১৮র পরে প্রকাশিত গ্রন্থাদি আমাদের প্রবন্ধে আলোচিত হয় নি।

তিন

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর উক্তি আপাত দৃষ্টিতে দুমুখো মনে হলেও, সিদ্ধান্তটি দ্বিধাহীন এবং আত্মজীবনীর প্রত্যাশিত শিল্পরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণায় পরিপুষ্ট। 'এ বই অতি চমৎকার বই।......কিন্তু এও রবীন্দ্রনাথের জীবন চরিত্র নয়. তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। যদিচ এর মধ্যে তাঁর বাল্যজীবনের মালমশলা অনেক পাওয়া যায়।'[১৭] কবির 'জীবন দেবতা' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গভাষার লেখক-এ।[১৮] সেখানেও নিজের লৌকিক জীবনাংশ বা শৈল্পিক সত্তার ইতিবৃত্ত কোনোটা রচনা করাই হয়তো কবির লক্ষ্য ছিলনা। যা অভিপ্রেত ছিল তার সত্যতা সম্পর্কেও সমসাময়িক রবীন্দ্রবিদ্বেষী পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালের ঘোর সংশয় ছিল।[১৯] আত্মজীবনী মূলক রচনা হিসেবে, জীবনী হিসেবে এবং রচনা হিসেবে জীবনস্মৃতির ত্রিমাত্রিক বিচার প্রাসংগিক হোলেও তা বর্তমান প্রবন্ধের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য ও আয়তন অনুমোদিত নয়। অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত ক্বচিতপঠিত বাংলা আত্মজীবনী সমূহের তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা বিশেষ কোরে সে সকল আত্মজীবনীর আলোচনাতেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ কোরেছি যে গুলো উনিশ শতকের বাংগালীর বিশিষ্ট চিন্তা ও চরিত্র, চাল ও মেজাজকে চিত্রিত কোরেছে।

চার

কালানুক্রমিক বিচারে বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী শ্রীমতী রাসসুন্দরী দাসীর আমার জীবন, কলিকাতা, বাং ১২৭৫ [ইং ১৮৬৮]। প্রমথ চৌধুরী যে জনৈক পূর্ববংগীয় মহিলার আত্মজীবনীর কথা উল্লেখ কোরেছেন, এইটেই যে সেই গ্রন্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই বইয়ের যে গভীর কৌতুকজনক দৃশ্যটি তিনি দীর্ঘ কাল পরেও ভুলে যেতে পারেন নি সেটা সুকুমার সেন বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত কোরেছেন[২০] ঃ

> ঐ বাড়ীতে একটা ঘোড়া ছিল, তাহার নাম জয়হরি। এক দিবস আমার বড় ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর চড়াইয়া, বাটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে আনিল। তখন সকল লোক বলিল, এ ঘোড়াটি কর্ত্তার। তখন আমাকে সকলে বলিতে লাগিল, দেখ, দেখ! ছেলে কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে, একবার দেখ! আমি ঘরে থাকিয়া শুনিলাম, ওটা কর্ত্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কর্ত্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা। আমি মনে মনে এই প্রকার ভাবিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম।... বাস্তবিক আমি যে ঘোড়া দেখিয়া লজ্জা করিয়া পলাইতাম, তাহা কেহ বুঝিত না। সকলে জানিত, আমি ঘোড়া দেখিয়া ভয়ে পলাইতাম। এ কথা আমি লজ্জায় কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। [রাসসুন্দরী, আমার জীবন, ৩য় সং ১৩১৩, পৃঃ ৫৬—৫৮]

সম্প্রতি বইটি একটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হোয়েছে বলে শুনেছি, এখনও দেখবার সুযোগ পাই নি। সুকুমার সেনের মতে 'মনের কথার এমন সহজ ও নিরাভরণ প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ।' 'ভক্ত বৈষ্ণব গৃহের কন্যা লেখিকার ভগবৎপরায়ণ চিত্তের পরিচয় বইটিতে দীপ্যমান' এবং 'যে কালে পুথি পড়িলে বিধবা হয় এই সংস্কার প্রবল ছিল সে কালের গৃহস্থবধূ হইয়া রাসসুন্দরী কিরূপ অদম্য জ্ঞানপিপাসা লইয়া ও বৃহৎ সংসারের ভারগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথমে পুথি ও পরে ছাপা বই পড়িতে এবং আরো পরে লিখিতে শিখিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়াবহ।'[২১]

গ্রন্থটি যে সত্যি স্বরচিত তার আন্তর প্রমাণ হিসেবে সুকুমার সেন লেখিকার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন।

পাঁচ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর-চরিত'। স্বরচিত, কলিকাতা, ১৮৯১ ॥

সন-তারিখ বিচারে বিদ্যাসাগরের রচনাটি হয়তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম নয়, দ্বিতীয় আত্মচরিত। কিন্তু আত্মজীবনীর শিল্পমূল্যের কথা স্মরণ রেখে বিচার কোরতে বসলে স্বীকার কোরতেই হবে যে বাংলায় সার্থক আত্মজীবনী-মূলক রচনার সূচনা বিদ্যাসাগর থেকে। এমনকি এরকম মনে করাও অসংগত হবে না যে, যদি বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ করে যেতে পারতেন তা'হলে হয়তো এই বইটি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী বলে ইতিহাসে স্থায়ী মর্যাদা লাভ কোরতো।

বইটির প্রথম গুণ তার ভাষা। যে বিদ্যাসাগর গতানুগতিক ধারণায় বাংলা গদ্যের বিবর্তনে 'পণ্ডিতী রীতির' শ্রেষ্ঠ লেখক বোলে সম্মানিত সে বিদ্যাসাগরই যে আত্মপ্রকাশের অনিবার্য শিল্পানুভূতি নিয়ে ভাষাকে কি সরল এবং সবল অন্তরঙ্গ কলারূপ দান কোরতে সক্ষম ছিলেন তার পরিচয় মিলবে এইখানে। দ্বিতীয়তঃ, এই বিরাট পুরুষের মানস কোন উপাদানে গঠিত, কোন পরিবেশে বর্ধিত, কোন ঘটনারাশির দ্বারা সংক্রামিত তার আদিকথা এখানে বলা হোয়েছে দুর্লভ সরসতার সংগে। যে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি সে কাহিনীর নানা অংশ চয়ন কোরেছেন, যে নিপুণতার সংগে সেগুলো বর্ণনা কোরেছেন, আত্মসত্তার যে পূর্ণতাবোধ নিয়ে তাকে সূত্রাকারে গেঁথেছেন তা স্বল্পায়তন হলেও আত্ম-জীবনীর পরিণত শিল্পরূপের দ্যোতক।

এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থটিতে 'তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও স্বীয় শৈশবের সামান্য বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধ আছে।'[২২] সামান্য এবং সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সে আলেখ্য ঈশ্বর-চরিতের তাৎপর্য নির্দেশে এবং মর্মোদ্‌ঘাটনে যেমন সরস তেমনি গভীর। কুশলী কাহিনীকারের মতো সত্যকে উপাখ্যানরূপ দান করেছেন এবং তার দ্যুতিতে আলোকিত কোরে তুলেছেন নিজের সত্তার এক একটা দিককে। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পৃষ্ঠায় আছেঃ 'জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোষিশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল, আর সময়ে সময়ে কার্য দ্বারাও এঁড়ে গরুর পূর্বোক্ত [এক গুঁইয়া] লক্ষণ আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।' বিদ্যাসাগরের

তেজোময় স্বভাবের পরিচিত পিঠের অপরপার্শ্বে যে একটি হাস্যময় উদার পুরুষ অংগাংগীভাবে বিরাজমান ছিল এই উক্তি তার সংকেতবাহী। বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই মনোমুগ্ধকর দ্বৈত ধর্ম যেন পিতামহদেব রামজয় তর্কভূষণের আদলে গঠিত।[২৩] উভয় চরিত্রের এই সাযুজ্যের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অঙ্গুলি নির্দেশ, পূর্ব-পুরুষের গতানুগতিক বিবরণকেও আত্মজীবনী-সংগত শিল্প-মর্যাদা দান কোরছে। এই রীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত আছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। সামান্য অভিজ্ঞতার খোশ গল্প, ব্যক্তিসত্তার অন্তরংগ বৈশিষ্ট্যের সংগে যুক্ত হোয়ে, তুচ্ছ কাহিনীর অভিঘাতকে মহনীয় কোরে তুলেছে :

> আমি স্ত্রীজাতীর পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। [৪৭০ পৃঃ]

বিদ্যাসাগর চরিতের অচরিতার্থতার প্রধান কারণ তার অসংগত অসম্পূর্ণতা। কিন্তু ব্যক্তিসত্তার অন্তরংগ পরিচয় জ্ঞাপনে তিনি যে কলারীতির প্রবর্তন করেন, জীবন-চরিতে স্মৃতিসিঞ্চিত বিচিত্র খণ্ড কাহিনী ও বিবিধ পার্শ্ব চরিত্র সৃজনের যে সম্ভাবনাকে তিনি উন্মোচিত কোরে দেন, পরবর্তীকালে কীর্তিমান আত্মচরিতকার মাত্রেই তার উত্তরাধিকারে উপকৃত হোয়েছেন। এই ধারার উত্তরসূরীদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রেষ্ঠ।[২৪]

ছয়

স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, আত্মজীবন চরিত, কলিকাতা, ১৩০৩ ॥

দেওয়ানজীর রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকায়। প্রকাশকালের সাহিত্য-সম্পাদক এই বইয়ের দুটো গুণের কথা বিশেষ কোরে উল্লেখ করেন। এক, 'দেওয়ানজী নিজগুণে অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন, তাঁহার স্বলিখিত জীবনচরিত যে তদীয় বান্ধবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' দুই, 'ইহাতে গত পঁচাত্তর বৎসরের বঙ্গের সামাজিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।' আদর্শ আত্মজীবনীতে আমরা প্রকারান্তরে

এই দুই গুণেরই মিলিত কারুকার্য কামনা করি। ব্যক্তিচরিত্রের প্রকাশ দেখতে চাই অন্তরঙ্গ সুহৃদের দৃষ্টি দিয়ে; সে ব্যক্তিত্বের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার সকল রহস্যকে হৃদয়ঙ্গম কোরতে চাই নিঃশেষে। সে সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও উপলব্ধি কোরতে চাই যে একটি মূল্যবান চরিত্র আগাগোড়া আকস্মিক নয়, সে ইতিহাসের ধারায় বিধৃত, সমাজে প্রতিপালিত, পরিবারে পরিবেষ্টিত। তাঁর অন্দরের আনন্দ এবং সদরের কোলাহল দুইই আমরা জানতে চাই, চিনে নিতে চাই। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম আত্মজীবনীর এই পরিপুষ্ট রসরূপকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেন। তবে তাঁর রচনাটি অসম্পূর্ণ এই অর্থে দেওয়ানজীর আত্মজীবন চরিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সার্থক আত্মজীবনী। সার্থক কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে। কারণ এই বইতে ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় যে রূপ উন্মোচিত হয়েছে তা আলোচনা মূলক, প্রচার-উন্মুখ, আদর্শায়িত এবং খণ্ডিত। নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বোলেছেন:

> প্রাক্ রবীন্দ্র বাংলা আত্মজীবনী ইতিহাসে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বা উদ্দেশ্যে বড় স্পষ্ট। সেগুলিতে আত্মপ্রতারণার ভাব কতখানি আছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অহমিকাটুকু যে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার সপক্ষে কোন আত্মচরিতখানি না আসিয়া দাঁড়ায়![২৫]

দেওয়ানজীও ব্যতিক্রম নন। তিনিও তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেকে ব্যক্ত করার নামে কার্যত 'কামজয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন'। একটি উদ্ধৃতি পেশ করা যাক।

> আমার স্বভাবের জন্যই হউক, বা আকারের জন্যই হউক, কি স্বরের জন্যই হউক অথবা এই সকল কারণের সমষ্টিতে হউক, আমাকে স্ত্রী লোকেরা নিরতিশয় ভালবাসিতেন। এমন কি, শুনিয়াছি বালিকারাও আমার মত স্বামী হয় আপনাদের মধ্যে বলা কহা করিত। আমার বোধ যে, আমার স্বরের গুণেই কামিনিকুল আমাকে এত ভালবাসিতেন।
>
> বাল্যকাল স্মরণ হইলে কত কথাই মনে পড়ে। এককথা শেষ করিলে আর এককথা স্মৃতিপথে আইসে হৃদয়ের কত পবিত্রতা ছিল। কোন দূষণীয় ভাবই মনোমধ্যে স্থান পাইতনা। মিত্রতার সহিত কিছুমাত্র স্বার্থপরতা ছিলনা। প্রেমের সহিত কিছুমাত্র অপবিত্রতা মিশিত না। চিত্তের সকল ভাবই যেমন নির্ম্মল রসে পূর্ণ থাকিত। বন্ধুতা ও প্রেমের একই ভাব ছিল। যে কামিনীর মোহিনীর মূর্ত্তি দিনযামিনী হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত ছিল। সে মূর্ত্তিকে দর্শন ব্যতীত স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা হইতনা। দৈবাত স্পর্শ হইলেও শরীরে কোন অপবিত্র ভাবের

আবির্ভাব হইত না। দর্শন স্পর্শন উভয়েতেই পবিত্রভাব ছিল। আমাদের উভয়েরই বয়ঃক্রম তৎকালে চৌদ্দ কি পনর বৎসর। এ দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে নিন্দার ভয়ে তিনি আমার সহিত স্পষ্টরূপে কথা কহিতে পারিতেন না। কিন্তু নানা ছলে অন্যকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া আমাকে তাঁহার কথা শুনাইতেন। [পৃঃ ৪১-৪২]

এই প্রণয় কাহিনীর পরবর্তী অস্বস্তিকর পরিণতি ব্যাখ্যা কোরে চরিতকার বলছেন 'বোধ হয়, তাঁহার দুশ্চরিত্রা দাসীর কুসংসর্গে বা কুমন্ত্রণায়, তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে অপবিত্র ভাবের উদয় হইল'। [পৃঃ ৪৫] এই স্মৃতিমন্থনের মধ্যে আত্মগৌরব ঘোষণার যে প্রবণতা মিশ্রিত ছিল তা কাহিনী-শেষের সরল আত্মপ্রসাদজনিত বাণীর মধ্যে অসংকোচ প্রকাশ লাভ কোরেছে :

আমার সেই বয়সে সেই সময়ে, আমি যে এই প্রলোভন দমনে সমর্থ হইয়া পাপ পংকে পতিত হইনাই, ইহা অদ্যাপি স্মরণ করিলে মনে আহ্লাদ উপস্থিত হয়। [পৃঃ ৪৬]

যখন দেওয়ানজীর ৩০ কি ৩২ বৎসর বয়স তখনও একবার চতুর্দশ বর্ষীয়া এক সুশ্রী গায়িকা তার প্রতি আসক্ত হন। সে প্রলোভন থেকে মুক্তিলাভের প্রক্রিয়াও ১১০ থকে ১১২ পৃষ্ঠায় উক্ত আছে।

দেওয়ানজীর বইয়ের আসল মূল্য অন্দর নয়, সদর এলাকার প্রশস্ত আলোচনায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগের মহানগরীর জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর এমন সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। বিবরণ দানের বিষয় চয়নে যে অন্তর্দৃষ্টি ও সম্পর্কবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা পরিণত সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষেও গৌরবের বস্তু হোতো।

দেওয়ানজীর আমলে নবীন শিক্ষার্থীগণ ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় বিশেষ রূপে মগ্ন থাকতেন। বলা উচিত, সে শ্রমে প্রাণপাত কোরতেন। কার্তিকেয় চন্দ্র রায় তৎকালীন সে শিক্ষাপ্রণালী খুঁটিয়ে বর্ণনা কোরেছেন, পাঠ্য পুস্তক সমূহের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, গুরু মহাশয়ের অমানুষিক জুলুমের জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন, ফারসী পুথির অর্থ বালকের নিকট দুর্বোধ্য উর্দু ভাষার ব্যাখ্যা করা হোতো বলে গভীর আক্ষেপ প্রকাশ কোরেছেন। দেওয়ানজীর বক্তব্য :

অষ্টম বর্ষে আমার পারস্য বিদ্যারম্ভ হয়। [পৃঃ ৮]

প্রথমে আমরা সেখ মসলার্দ্দিন সাদীর রচিত পন্দনামা (উপদেশ-পুস্তক) নামে নীতিগর্ভ পদ্যপুস্তক একখানি পাঠ করি। এখানি অতি ক্ষুদ্র ও অতি

সরল ভাষায় লিখিত।... এই সকল উপদেশ অতি সংক্ষেপে ও অতি সরল ভাষায় পারস্য বালকবৃন্দের নিমিত্ত রচিত হয়। এইরূপ সরল ভাষায় রচিত বাংলা ভাষায় পুস্তক যেরূপ বঙ্গীয় বালকের বোধগম্য হয়, সেইরূপ এই পন্দনামা পারস্য বালকগণের বোধগম্য হইয়া থাকে, কিন্তু বিদেশীয় বালকের এই পুস্তিকার অর্থ কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে ও তাহার পাঠেই বা কি লাভ হইবে; কারণ তৎকালে কোন পারস্য পুস্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় শিখান হইত না। উর্দ্দু ভাষায় অর্থ শিক্ষার পদ্ধতি ছিল। বিশেষতঃ বালককে পন্দনামার অর্থ অভ্যাস করাইবার প্রথাই ছিল না, কেবল তাহার আবৃত্তি করান হইত। যদি এই পুস্তিকা বাংলা অর্থের সহিত পড়ান হইত, তাহা হইলে বালকেরা অবশ্যই কিছু উপকার পাইত।

আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে ঐ সাদীর বিরচিত গোলস্তাঁ। অর্থাৎ গোলাপ ফুল কানন নামে গ্রন্থের পাঠারম্ভ হয়। এইখানি গদ্যে পদ্যে রচিত এবং অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে সত্য অসত্য নানাবিধ গল্পে বিবিধ প্রকার সুনীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। [পৃঃ ১১] প্রথমে আমরা এই গ্রন্থেরও আবৃত্তি করিতে থাকি। পরে এক অধ্যায় পাঠ করিলে, পুনরায় প্রথম অধ্যায় হইতে উর্দ্দু ভাষায় ইহার অর্থ সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। দুই অধ্যায় পঠিত হইলে ঐ গ্রন্থ-কর্ত্তার বিরচিত বুস্তাঁ (সৌরভাধার) নামে একখানি নীতিসার পদ্যপুস্তকের পাঠারম্ভ হয়। [পৃঃ ১৪]

গোলেস্তাঁ ও বুস্তাঁ, উভয় গ্রন্থই অতি উচ্চাঙ্গের ও উচ্চ শ্রেণী পাঠোপযোগী, তথাপি এই দুই গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ম করাইতে পারিলে বালকদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। কিন্তু উর্দ্দু ভাষায় অর্থ শিখাইবার রীতি থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান ব্যতীত বঙ্গীয় বালকগণের নীতি শিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, পারস্যের ন্যায় উর্দ্দু ভাষাও বালকের বোধগম্য হইত না। যাহা হউক তৎকালে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে ও উর্দ্দু ভাষায় তাহার অর্থ বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্তুষ্ট হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের প্রকৃতার্থ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হইত না। এবং বালকের সুনীতি শিক্ষা যে বিদ্যার প্রধান অঙ্গ, ইহাও তাঁহারা জ্ঞান করিতেন না। কতদিনে বালকেরা এই ভাষায় রচনা করিতে পারিবে, ইহাই কেবল চিন্তা করিতেন। [পৃঃ ১৫]

এবং কৈশোর উত্তীর্ণ হবার আগেই—

মাতুল মহাশয় প্রথমে আমাকে ইয়ার মহম্মদ আলমগীর, সেকন্দর নামা এবং মিজান অধ্যয়ন করিতে দেন। এই সকল পুস্তকের কতকাংশ পঠিত

হইলে ক্রমশঃ বাহার দানেশ, আল্লামি জহুরি, আসফি উবুফি জাহির, হাফেজ এবং যোনশব এই কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত করেন। [পৃঃ ২২]

এই ছিল পোড়বার বিষয় এবং পড়াবার রীতি। যাঁরা পড়াতেন তাঁদের সম্পর্কে দেওয়ানজীর দ্ব্যর্থহীন অভিমত ঃ

গুরু মহাশয় ও ওস্তাদজি, উভয়েই কৃতান্ত অপেক্ষাও ভয়ানক ছিলেন। পাঠশালায় যেমন প্রথমেই নীরস ও কঠিন অঙ্কবিদ্যা শিখাইবার রীতি ছিল। মকতবেও তেমনই বালবুদ্ধির অগম্য পুস্তক সকল ব্যবহৃত হইত। উভয় স্থলেই ছাত্রগণ শিক্ষকের ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা করিতে না পারিলে বা পঠিত বিষয় বিস্মৃত হইলে অতি নির্দ্দয়রূপে তিরস্কৃত বা প্রহারিত হইত। শিক্ষাতে তাহাদের মনোযোগ নাই, ইহাই শিক্ষক ও গুরুজন বিবেচনা করিতেন এবং কেবলমাত্র পীড়ন দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষায় আবিষ্ট করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন। যে লেখা-পড়ার জন্য ইদানীন্তন শিশুগণ পর্য্যন্ত আগ্রহ করে, শিক্ষাপ্রণালীর দোষে সেই লেখাপড়ার ভয়ে ১২।১৩ বৎসরের বালকেরাও প্রাণত্যাগ করিবার ও অন্ধ হইবার বাঞ্ছা করিত। [পৃঃ ২০]

এত কষ্ট স্বীকার কোরে ফারসী আয়ত্ত করার পর শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই যেদিন অকস্মাৎ ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে আদালতের ভাষা রূপে গ্রহণ কোরতে বাধ্য হোলো সেদিন কেবল মুসলমান নয়, অনেক উচ্চ হিন্দুও কঠিন মুসিবতের মধ্যে পোড়লেন। ইংরেজীর খড়্গাঘাত সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা যে অংশত হলেও সংশোধনযোগ্য দেওয়ানজীর জবানবন্দী তার স্মারক। আদালতে ইংরেজীর প্রচলন হওয়াতে ;

(বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্য) একরূপ অকর্ম্মণ্য হইল, এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইলে অথবা উপার্জ্জনক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্ব্বক যে কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহা নির্মূল হইয়া গেল। পূর্ব্বে আমার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ বিদ্যা শিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পারস্যবিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।

স্কুলে প্রবিষ্ট হইলে বালকদের সংগে পড়িতে হইবে বলিয়া আমি স্বতন্ত্ররূপে পড়িতে লাগিলাম। [পৃঃ ৩৪]

যখন পারস্য ভাষা রাজকার্যে অব্যবহৃত হয় তখন আমি টেলিমেকাস ওক্যাম্বেলের প্লেজারস্ অব্ হোপ পড়িতেছিলাম। রীতিমত না পড়িলে এ সখের পাঠে বিদ্যাশিক্ষা হইবে না, এই ভাবিয়া উক্ত দুই পুস্তক ছাড়িয়া দিলাম, এবং নিম্নশ্রেণীর পাঠোপযোগী পুস্তক সকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম, এবং এক বৎসরের মধ্যে তিনখানি রিডর ও একখানি গ্রামার পড়িলাম। স্কুলের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলে অধিক উপকার হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে লজ্জাত্যাগ পূর্ব্বক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম, এবং কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। [পৃঃ ৩৫]

...আর ইংরাজী বিদ্যার প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং ইংরাজী রীতিনীতির অনুকরণে বিশেষ স্পৃহা হইল। আমাদের বাহ্যে বিশেষপরিবর্তন হউক না হউক, অন্তরে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিল। [পৃঃ ৩৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সঙ্গে শেষার্ধের তুলনা করে বোলেছেন ঃ

কোন কোন বিষয়ে তদানীন্তন লোকের আচরণ দেবতার ন্যায় প্রশংসনীয় ছিল, আবার কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের চরিত্র প্রেতের ন্যায় দূষণীয় দৃষ্ট হইত। দেব-ভক্তি, পিতৃমাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃভগিনী স্নেহ, প্রতিবাসী ভালবাসা, অতিথি সৎকার, দান, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ বিষয়ে তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আবার মিথ্যা কথন, উৎকোচ গ্রহণ, ইন্দ্রিয় দোষ ইত্যাদি দোষাবহ বিষয় সকল তাঁহাদের বিবেচনায় যৎসামান্য পাপ বলিয়া বোধ হইত। [পৃঃ ১৫]

প্রসঙ্গক্রমে বংগদেশীয় গণিকালয়ের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে তিনি যে সকল মন্তব্য কোরেছেন আজকের দিনের পাঠকের জন্য সেগুলো রীতিমতো শিহরণমূলক এবং দৃষ্টি উন্মোচনকারী ঃ

এ প্রদেশে বেশ্যাগমন অতীব অধর্ম বলিয়া বিশ্বাস ছিল। এমনকি গণিকালয়ে প্রবেশকালে প্রবেশকের সঞ্চিত পুণ্যসমূহ বহির্দ্বারে রাখিয়া যাইতে হয় এবং তজ্জন্য সেই বহির্দ্বারের ভূমি পুণ্যস্থান বলিয়া তাহার মৃত্তিকা দুর্গাপূজার মহাস্নানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোধ হয়, এই কারণেই প্রাচীনদিগের প্রায় কোন ব্যক্তিকে বারাঙ্গনার গৃহে প্রবেশ করিতে দৃষ্ট হইত না।

কৃষ্ণনগরের কেবল আমিনা বাজারে বেশ্যালয় ছিল। গোয়াড়ীতে কয়েক ঘর গোপ ও মালো গাঁড়ার ও অন্যান্য নীচ জাতির বসতি ছিল। পরে

যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই স্থান প্রশস্ত ও নদী তীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচারালয়, সকল স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবেরা গোয়াড়ীতে পশ্চিম দিকে, ও তাঁহাদের আমলা, উকীল ও মোক্তারেরা ইহার পূর্ব দিকে, আপন আপন বাসস্থান নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্বে গ্রীস দেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্বোপলক্ষে তথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা-দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন। [পৃঃ ৩৭]

সবার শেষে আর একটি উদ্ধৃতি। তাঁর বাল্যকালে দেখা কলিকাতার চিত্র, চিত্র হিসেবে অংশটি অবিস্মরণীয়।

একালে কলিকাতা যেরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সে সময় সেরূপ ছিল না। বিশেষতঃ দেশীয় নগরবাসীদিগের বাসস্থানের অংশ অতীব অস্বাস্থ্যজনক ও অসুখকর ছিল। এই বিভাগের প্রায় সমস্ত বর্ত্মের পার্শ্বস্থপ্রণালীর মলমূত্রযুক্ত জল হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প সর্বদা উত্থিত হইত। অভ্যাস বশতঃ অধিবাসিদের তাহাতে তত বিশেষ কষ্ট হইত না, কিন্তু বাহিরের লোকের এ সকল পথে গমনাগমন করিতেও অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হইত! এমন কি, নাসিকা দ্বার বন্ধ করিয়া চলিতে হইত। রাত্রিতে কোনরূপ আলোক সংগে না থাকিলে গলি রাস্তায় অন্ধের ন্যায় চলিতে হইত, এবং পুলিশের সুনিয়ম অভাবে দস্যুভয়ে অনেক গলিতে যাইতেও সাহস হইত না। শুনা যাইত যে, তস্করেরা কৃত্রিম মত্ততা প্রকাশ করিয়া পথিকের গাত্রে পড়িত, এবং তাহার শাল বা ঘড়ি লইয়া পলায়ন করিত।

জাহ্নবী তীরস্থ স্থানসমূহ অতিশয় অপবিত্র ছিল। জন্সের স্থলের বহু লোক তথায় নিরন্তর মলমূত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দাঁড়াইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ও দর্শনে-ন্দ্রিয়ের যাতনার সীমা থাকিত না। জলও এতাদৃশ মলময় ও অপরিষ্কার ছিল যে তাহাতে গংগার প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকিলেও, তাহাতে প্রফুল্লচিত্তে অবগাহন করা যাইত না। [পৃঃ ৫৫]

সাত

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ ইং ১৯২৭, (১ম সংস্করণ ইং ১৮৯৮ ২য় সংস্করণ ইং ১৯১১) ॥

আমাদের আলোচ্য তালিকার এটি চতুর্থ আত্মচরিত। বাংলা ভাষায় রচিত এইটেই প্রথম দীর্ঘ আত্মজীবনী যার বিষয় বস্তুর গৌরব রচনার শিল্পকলার কৃতিত্বের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল নয়। 'মহর্ষি দেবন্দ্রনাথের জীবন বর্ত্তমান ভারতের পরম গৌরবের বস্তু।' [তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকীয় নিবেদনের প্রথম বাক্য] আত্মজীবনী পাঠ কোরে আমরা যে জ্ঞানমূলক কৌতুহল নিবৃত্ত কোরতে চাই, যে আনন্দের স্বাদ লাভ কোরতে উদ্যোগী হই, তার কারণও হোলো বর্ণিত ব্যক্তি চরিত্রের ইতিহাসস্বীকৃত মহিমা সম্পর্কে পাঠকের এই পূর্বস্মৃতি।
মহর্ষি-রচিত আত্মজীবনীর তৃতীয় সংস্করণটি সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত। বিষয়সূচী, নামসূচী, বংশতালিকা, কয়েক শত পাদটীকার অত্যন্ত প্রাসংগিক তথ্যবহুল মন্তব্য এবং সর্বোপরী গ্রন্থশেষের সুদীর্ঘ [৩৯৯ থেকে ৪৬৫ পৃষ্ঠা] পরিশিষ্টটি গ্রন্থের মূল বিষয়ের প্রতি সম্পাদকের গভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টির উজ্জ্বল সাক্ষী। মুদ্রন পারিপাট্যেও এই সংস্করণ অসাধারণ মৌলিকতার অধিকারী। প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে পরিচ্ছেদ সংখ্যা, ঘটনার বৎসর, মহর্ষির বয়স এবং সেই পৃষ্ঠার বক্তব্যের সংকেত দেয়া রোয়েছে। পাঠকের চেতনাকে তা প্রতি পংক্তিতে বহুমুখে প্রসারিত কোরে দিয়ে মৃত অতীতকে সারাক্ষণ মুখর কোরে রাখে। যাঁদের কথা আত্মজীবনীতে চকিতে উল্লেখ করা হোয়েছে, যে সকল গ্রন্থের প্রভাবের প্রতি মহর্ষি ইংগিত মাত্র কোরেছেন, যে সব তত্ত্বচিন্তা আন্দোলন ও সংগঠনের কথা মহর্ষি ব্যক্তি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত কোরেছেন, পরিশিষ্টে সে সম্পর্কিত যাবতীয় প্রামাণ্য তথ্যপুঞ্জ বিস্তৃত আকারে বৈজ্ঞানিক সততার সঙ্গে সংকলিত হোয়েছে। পরিশিষ্টটি যে এত মূল্যবান হোতে পেরেছে তার একটি কারণ, মহর্ষির প্রকৃত জগত ও জীবন ইতিহাসের বিচারেও বিশেষ মূল্যবান ছিল। মীর সাহেবের আমার জীবনী বা এ শ্রেণীর অন্যান্য রচনার একটি কোরে তথ্যকণ্টকিত, টীকা পরিশিষ্ট সম্বলিত, নয়া সংস্করণ [উদ্যমশীল গবেষক সম্পাদক দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হোলেও সে শ্রম কতখানি আত্যন্তিক মূল্যে গরীয়ান হোয়ে উঠবে বলা কঠিন। তবুও ওরকম]

সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রোয়েছে। মহর্ষির আত্মজীবনী সম্পর্কে পর্যন্ত সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বোলতে বাধ্য হোয়েছেন "আমি যখন এই গ্রন্থ-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি, তখন আমার ধারণা ছিল যে মহর্ষির লেখাতে কোথাও ভুল নাই।...কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, মহর্ষিদেব আত্মজীবনী লিখাইবার সময় কিছু কিছু ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং সেজন্য স্থানে স্থানে তাঁহার উক্তিতে ভুল রহিয়াছে।" [৩য় সং, সম্পাদকের নিবেদন, ।।৵০] কারণ যাই থাকুক মহর্ষিও কিছু ভুল কথা লিখেছেন। সে বিচ্যুতি যে মীর সাহেবের রচনাতেও অদৃশ্য কীটের মতো প্রবেশ কোরতে সমর্থ হোয়েছে তা বলা বাহুল্য। তাই শুদ্ধমাত্র মীর সাহেবের জবানবন্দীকে সম্বল করে আমরা যদি তাঁর একটি জীবনচিত্র আঁকি তবে তা প্রামাণ্য বা পূর্ণাংগ বলে গৃহীত হবে না। সে কাজ করার আগে আমাদেরকেও মুক্তদৃষ্টি নিয়ে, সকলরকম বিরোধী অবিরোধী প্রমাণাদি একত্রিত কোরে মীর সাহেবের নিজ মুখে বলা কথারও সত্যাসত্য বিচারে প্রবৃত্ত হোতে হবে।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে অকিঞ্চিৎকর রচনা শৈলিকে আশ্রয় কোরে নিজের জীবনের মহৎ ভাব ও মহৎ কীর্তিসমূহের ফিরিস্তি প্রদান কোরেছেন মাত্র, একথাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। দেবেন্দ্রনাথের গদ্যে এমন এক বিশেষ সরলতা ও সরসতা ছিল যার তুলনা বাংলা গদ্য নির্মাণের কৈশোর কালে ত বটেই, আজও দুর্লভ। দেবেন্দ্রনাথের গদ্য আটপৌরে হোলেও স্বমানসের আদলকে অন্তরংগরূপে ফুটিয়ে তুলতে অনেকাংশে সক্ষম। বিদ্যাসাগরের কালবৃত্তে রচিত হোয়েও দেবেন্দ্রনাথের নিরলংকৃত গদ্য স্বগুণে প্রাণস্পর্শী। তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসবের বর্ণনা, মহর্ষির ভাষায়ঃ

> আমরা এদিকে সারাদিন ব্যস্ত। কেমন করিয়া সভার ঘর ভাল সাজান হইবে, কি করিয়া পাঠ ও বক্তৃতা হইবে, কে কি কাজ করিবেন, তাহারই উদ্যোগ। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আমরা আলো জ্বালিয়া, সভা সাজাইয়া, সব ঠিকঠাক করিয়া ফেলিলাম। আমার মনে ভয় হইতেছিল, এই নিমন্ত্রণে কি কেহ আসিবেন? দেখি যে, সন্ধ্যার পরেই লণ্ঠন আগে করিয়া এক একটি লোক আসিতেছেন। আমরা সকলে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া সভার সম্মুখের বাগানে, বেঞ্চের উপর বসাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে লোক আসিয়া বাগান ভরিয়া গেল। লোক দেখিয়া আমাদের উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। ... রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণেরা একস্বরে বেদে পড়িতে লাগিলেন। বেদ

> পাঠ শেষ হইতেই রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি উঠিয়া বক্তৃতা করিলাম। ... আমার বক্তৃতার পর শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য বক্তৃতা করিলেন, তাহার পর চন্দ্রনাথ রায়, তাহার পর উমেশচন্দ্র রায়, তৎপরে প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, তদনন্তর অক্ষয়কুমার দত্ত, পরিশেষে রমাপ্রসাদ রায়। ইহাতে রাত্রি প্রায় ১২ টা বাজিয়া গেল। এই সব কাজ শেষ হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একটা ব্যাখ্যান দিলেন। তাহার পর সঙ্গীত। ২ টা বাজিয়া গেল। লোকগুলান্ হয়রান! সকলেই অফিসের ফেরতা। হয়ত কেহ মুখ ধোয় নাই, জল খায় নাই, তথাপি আমার ভয়ে কেহ সভা ভঙ্গের আগে যাইতে পারিতেছে না। কেহই বা কি বুঝিল, কেহই বা কি শুনিল, কিছুই না! কিন্তু সভাটা ভারী জাঁকের সহিত শেষ হইল। [পৃঃ ৬৯—৭০]

'তিনিই বাংলায় ভাবুকতা ধারার গদ্য, (Refletive Prose) প্রথম রচনা করেন, আর সে ধারায় তাঁর তুলনা নেই। [১৬] দেবেন্দ্রনাথের বাণীর এই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর উক্তি স্মরণীয়। 'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, উহা তড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তোলে এবং মনচশ্চক্ষুকে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে।' মহর্ষির অন্তর্লোকের উৎকণ্ঠা এই ভাষায় কী মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করে তার একটি বিখ্যাত নজীর হোলো এই অবিস্মরণীয় পংক্তি কটি :

> তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তন ভূমি হইল না। উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি, আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহন করিতে পারিনা। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষদ্, তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল।

মহর্ষির চরিত্রেরও এইটেই পরম রমণীয় দিক। তাঁর হৃদয় ছিল ভক্তের, সংস্কার রক্ষনশীলের, চিত্ত যুক্তিবাদীর। হৃদয়ে অনুমিত সত্য যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সর্বান্তঃকরণে তা গ্রহণ কোরতে পারতেন না। না পারার ক্ষোভে অশান্তি ও অস্থিরতা অনুভব কোরতেন। তারপর বিবুদ্ধ সত্য যুক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হওয়া মাত্র নিজের প্রাচীনতম সংস্কার ও অতিপ্রতীত বিশ্বাসরাশিকে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত

বাংগালীর যে নবজাগ্রত চেতনা ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনকে আশ্রয় কোরে বুদ্ধির মুক্তি কামনা কোরেছিল, মহর্ষিই তার গোড়াপত্তন করেন। এই বিচারে অপেক্ষাকৃত আপোষহীন যুক্তিবাদি অক্ষয়কুমার মহর্ষির শিষ্য ও সহকর্মী, গুরু বা অরি নয়।[২১]

কর্মজীবনের ইতিবৃত্ত রচনা কোরতে বসে মহর্ষি, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রসংগে বোলেছেন :

> পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুই-ই প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর, আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।
>
> ফলতঃ ইহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ,—আকাশ পাতাল প্রভেদ! [পৃঃ ৭৫—৭৬]

দশ বছর শ্রমের পর পিতৃ ঋণের মহাভার যখন কিছুটা লাঘব হোয়েছে তখনই 'কিন্তু আরেক প্রকার, নূতন বিপদভার, ঋণভার, আমাকে জড়াইতে লাগিল।' [পৃঃ ২১৮] পিতৃ ঋণের সঙ্গে গিরীন্দ্রনাথের ঋণও মহর্ষি অংশত পরিশোধ কোরে আসছিলেন, এখন তার সঙ্গে এসে যুক্ত হোলো নগেন্দ্রনাথের ঋণ। সে সময়ে নিজের মর্মচেতনায়, সত্যদৃষ্টির দিব্য জ্যোতি লাভ কোরতে না পেরে তিনি এক গভীর অস্থিরতা ও অশান্তি অনুভব কোরছিলেন, তার ওপর অন্যকৃত পরিশোধ্য ঋণের এই বিরামহীন খড়্গাঘাতে

> মন নিতান্ত ভগ্ন হইয়া গেল। মনে করিলাম, বাড়ীতে থাকিলে এইরূপ নানা উপদ্রব আমাকে ভোগ করিতে হইবে এবং ক্রমে আবার ঋণজালে বদ্ধ হইতে হইবে। অতএব আমিও বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, আর ফিরিব না। ওদিকে, অক্ষয়কুমার দত্ত একটা 'আত্মীয় সভা' বাহির করিলেন, তাহাতে হাত

তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, 'ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ কি না?' যাহার যাহার আনন্দ স্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপ অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত। এখন যাঁহারা আমার অঙ্গ স্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না। আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল। [পৃঃ ২১৯—২২০]

একটু পর শান্তির স্পর্শ লাভ কোরছেন তাঁর প্রিয় কবি হাফিজের কাব্য স্মরণ কোরে। মহর্ষির অধ্যাত্ম জীবনের কাহিনী এমনি কোরে বাস্তব জীবনের সংকটকে, ব্যক্তি চেতনার বিক্ষোভকে মূর্ত কোরে তুলেছে। পাঠশেষে যাঁর সাক্ষাৎ নিজ হৃদয়ে লাভ করি তিনি সৌম্য দর্শন প্রেমময় পুরুষ, যাঁর ভাবুকতা দরদভরা, যিনি একাধারে জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী এবং কাব্যরস পিপাসু। মহর্ষির মধ্যে স্মিতরসের বা কৌতুক বোধের লেশমাত্র ছিল না এমন আশঙ্কা করাও ভুল। কোনো কোনে বর্ণনায় নিজের গভীরতম সংস্কার এবং প্রখরতম স্বচ্ছ দৃষ্টি উভয়কেই তিনি সরসভাবে ব্যক্ত কোরেছেন। যেমন [পৃঃ ২০০—২০৪] পুরীতে নিরাকার জগন্নাথ দর্শনের চিত্রটি :

"স্নান করিয়া উঠিয়াছি, জগন্নাথের একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাকে ধরিল। আমি অমনি তাহার সঙ্গে সেখান হইতে হাঁটিয়া চলিলাম। আমার পায়ে জুতা ছিল না, তাহাতে পাণ্ডা বড় সন্তুষ্ট হইল। গিয়া দেখি যে, মন্দিরের দ্বার বন্ধ, আর তাহার সেই দ্বারে লোকারণ্য। সকলেই জগন্নাথ দেখিতে উৎসুক। পাণ্ডার হাতে মন্দিরের চাবি ছিল, সে চাবি খুলিতে লাগিল। একটা দ্বার খুলিল, মন্দিরের মধ্যে একটা দীর্ঘ দালান দেখিতে পাইলাম। তাহার ভিতর গিয়া পাণ্ডা আর একটা দ্বার খুলিল, আবার একটা দালান দেখিলাম। যখন পাণ্ডা শেষ দ্বার খুলিল, তখন আমার পশ্চাতে হাজার যাত্রী ছিল, 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া তাহারা বেগে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি অসাবধানে ছিলাম, তখন তাহাদের সেই লোকতরঙ্গের মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। আমার সঙ্গীরা আমাকে কোন প্রকারে ধরিয়া সামলাইয়া রাখিল, কিন্তু আমার চশমাটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সাকার জগন্নাথকে দেখিবার আর সুবিধা হইল না, আমি সেই নিরাকার জগন্নাথকেই দেখিলাম। এখানে যে একটি প্রবাদ আছে, যে যাহা মনে করিয়া এই জগন্নাথ মন্দিরে যায়, সে তাহা দেখিতে পায়, আমার নিকটে তাহা পূর্ণ হইল।"

আরেক পাণ্ডার সঙ্গে দেখা হোয়েছিল প্রয়াগ তীর্থে, প্রসিদ্ধ বেণীঘাটে :

> এই ঘাটে লোকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তর্পণ করে, দান করে। আমার নৌকা পঁহুছিতে পঁহুছিতেই কতকগুলা পাণ্ডা আসিয়া তাহা আক্রমণ করিল, তাহাতে চড়িয়া বসিল। একজন পাণ্ডা, 'এখানে স্নান কর, মাথা মুণ্ডন কর' বলিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'আমি এ তীর্থে যাইব না, মাথাও মুণ্ডন করিব না।' আর একজন বলিল, 'তীর্থে যাও আর না যাও, আমাকে কিছু পয়সা দাও।' আমি বলিলাম, 'আমি কিছুই দিব না, তোমার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, পরিশ্রম করিয়া খাও।' সে বলিল, 'হম্ পয়সা লেকে তব্ ছোড়েঙ্গে, পয়সা দেনেহী হোগা।' আমি বলিলাম, হম্ পয়সা নেহী দেঙ্গে, কিস্তরে লেওগে, লেও তো?' এই শুনিয়া সে নৌকা হইতে লাফ দিয়া ডাঙ্গায় পড়িল এবং দাঁড়িদের সঙ্গে গুন ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল। খানিক টানিয়া আমার কাছে নৌকায় দৌড়িয়া আসিল—বলিল, হম্ তো কাম কিয়া, অব্ পয়সা দেও।' আমি বলিলাম, 'এ ঠিক হইয়াছে,' আমি হাসিয়া তাহাকে পয়সা দিলাম।' [পৃঃ ২২৭—২২৮]

এসব সত্ত্বেও আত্মজীবনী হিসেবে মহর্ষি রচিত গ্রন্থটির সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। "দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বলিতে গেলে তাঁহার ধর্ম্মচিন্তার ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইতিহাস মাত্র।" [পরিশিষ্ট ২, পৃষ্ঠা ৩০২] লোকচক্ষু অন্তরালবর্তী ব্যক্তিসত্ত্বার পারিবারিক ও সামাজিক আচরণের অন্তরঙ্গতম অভিব্যক্তি এখানে বিরল। একেবারে যে নেই তা নয়। সম্পূর্ণ চতুর্দশ পরিচ্ছেদটি তার প্রমাণ। ১০৯-১১০ পৃষ্ঠায় আছে :

> ১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্ম্মপত্নী সারদা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও। 'আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহার জন্য একটি পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন। আমি রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে লইয়া নিজের একটি সুপ্রশস্ত বোটে উঠিলাম। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর, সত্যেন্দ্রনাথের ৫ বৎসর, এবং হেমেন্দ্রনাথের ৩ বৎসর।

অন্যত্র কোনো কোনো যায়গায় নিজের গ্লানিমিশ্রিত অভিজ্ঞতার স্মৃতি ক্ষণিকের জন্য উন্মোচিত কোরেই রুদ্ধ কোরে দিয়েছেন। যেমন ২য় পরিচ্ছেদের একেবারে

প্রথম বাক্যটি, 'এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম।' পরে গোটা পরিচ্ছেদের মধ্যে এর কোন বাস্তব পটভূমি উদ্ঘাটিত হোলো না। অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোরযুবকের অন্তর্দ্বন্দ্বের বোধগম্য কারণ ও স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল অচরিতার্থ থেকে গেল। মহর্ষিকে মানুষরূপে পেতে পেতেও পেলাম না। এমন অতৃপ্তির উৎস ৯৯ পৃষ্ঠার আরেকটি উক্তির অতিসংক্ষিপ্ততা।

> গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করিয়া কি আশার অতীত ফলই পাইলাম! তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিলাম, এবং একেবারে তাঁহার সঙ্গী হইয়া পড়িলাম।......যখনি নির্জ্জনে অন্ধকারে তাঁহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ম্ম করিতাম, তখনই তাঁহার শাসন অনুভব করিতাম, তখনি তাঁহার 'মহদ্ভয় বজ্রমুদ্যতং রুদ্র মুখ দেখিতাম, সকল শোনিত শুষ্ক হইয়া যাইত। [৯৯ পৃষ্ঠা]

নির্জনে অন্ধকারে অনুষ্ঠিত বিপরীত কর্মের ইতিবৃত্ত মহর্ষি প্রকাশ করেননি। এই অনুচ্চারণ ও আত্মগোপন আদর্শ আত্মজীবনীতে প্রত্যাশিত নয়। তুলনায় মীর সাহেবের জবানবন্দী স্পষ্টভাষিতায়, 'মনের কথা' প্রকাশে, ব্যক্তিজীবনের গরলামৃত উদ্‌গারণে অধিক সাহসী, অধিক সমর্থ।

আট

রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, (১ম সং ১৯০৯) ৩য় সংস্করণ কলিকাতা, ১৯৫২

রাজনারায়ণ বসুর লৌকিক জীবনও কীর্তিশোভিত। সেই কীর্তির অসাধারণ শোভার একটি কারণ এই যে উনিশ শতকী বাংলার প্রধান পুরুষদের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়. কালব্যাপ্তি ও জনবহুলতায় দেবেন্দ্রনাথ-শিবনাথের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ। 'যে ব্যক্তি যুগপৎ প্রায় তিন পুরুষের অন্তরংগতা লাভ করিতে পারেন তাঁহার ব্যক্তিত্বের উদার বৈচিত্র্য ও গভীরতা অনুভব গম্য। রাজনারায়ণের সঙ্গে পাইয়া মহর্ষির অধ্যাত্মস্ফূর্তি হইয়াছিল, রাজনারায়ণের অট্টহাসিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বপ্নপ্রয়াণ-পাথেয় লাভ করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের সান্নিধ্যে মুখচোরা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন খুশি হইয়া উঠিত। এ মানুষের সমানধর্মা কই।[২৮]

মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে তাঁর এই ভূতপূর্ব সহপাঠীর মুখ চেয়ে অনেকগুলো কাব্য ও কবিতা রচনা করেছিলেন প্রমাণ তার মিলবে অধুনা অতি পরিচিত মাইকেল-রাজনারায়ণ পত্রাবলীর মধ্যে। প্রচুর আহার কোরে এবং তার চেয়েও বেশী পান কোরে মধুসূদন বিদায় কালে স্নেহে প্রেমে যাঁকে 'জড়াইয়া ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন' তিনি শ্মশ্রুল রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণের কাছেই মাইকেল নিজের প্রচ্ছন্ন প্রত্যয়কে ব্যক্ত কোরে বলেন 'ভবিষ্যত বংশীয় হিন্দুরা বলিবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসূদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন।' [পৃঃ ১০৪] রাজনারায়ণ বসুর গোঁফ পর্যন্ত সমকালে কাব্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। রচনাকারী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যের নাম গুম্ফাক্রমণ কাব্য। নমুনা: পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।

> যথা গুম্ফধারী, ভারী ভারী, গোঁফের সেবা করি,
> সুখে বিচরে[২৯]

এসব কৌতুকময় দৃষ্টান্ত ছাড়াও আরোও অনেক ওজনদার তথ্য মজুদ রোয়েছে যার ভিত্তিতে এ কথা অনুমান করা সহজ যে সমসাময়িক শিল্পী সাহিত্যিকরা তাঁর বিচার বুদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুকুমার সেন যথার্থই বোলেছেন যে 'সাহিত্যিক বলিয়া আজ আমাদের কাছে রাজনারায়ণ তেমন পরিচিত নন। অথচ সাহিত্যগুরু বলিতে আসলে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই।'[৩০] রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথের মতো ব্রাহ্মণ ধর্মের উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন নতুন তত্ত্ব বা সত্য সংযোজিত করেননি বটে কিন্তু তার সমাজগ্রাহ্য স্বরূপকে সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও গ্রহণীয় রূপে প্রচার কোরেছেন। স্বয়ং কেশব সেন, বসুর বক্তৃতা শুনেই ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া বেঁধেছিলেন বসু 'বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত।' জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর সস্নেহে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে 'রাজনারায়ণ ধর্মের ডিসপেপসিয়ায় মরমর।' দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে ডাকতেন 'ইংরেজী খাঁ' বোলে কিন্তু ধর্মতত্ত্বের বিচার ও প্রচার বিষয়ে তাঁহার পরামর্শকে বিশেষ মূল্যবান মনে কোরতেন। উপাধিটি যে কত সংগত হোয়েছিল তা ভালো কোরে আন্দাজ কোরতে পারি যখন রাজনারায়ণ নিজের জবানীতে বলেন :

> আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতাম এমত নহে। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার নিকট অল্প-বিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিল। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের যে সকল ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান। [পৃঃ ৬২]

সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই রাজনারায়ণ ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাসমূহের স্বাপ্নিক ও প্রচারক। 'ইংরেজী খাঁ' বলে তিনি যে কেবল মাইকেলকে বাংগালী কবি হতে অনুপ্রাণিত করেন তাই নয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি যেন নিত্যকার সমাজ জীবনে তার স্বকীয় আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোতে পারে তার জন্যেও কম উদ্যোগী ছিলেন না। বসু-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার 'সভ্যরা গুডনাইট না বলিয়া সুরজনী বলিতেন। ১লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন না করিয়া ১লা বৈশাখ করিতেন, ইংরাজী বাংলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ বাংলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন। যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত।' [পৃঃ ৮১] রাজনারায়ণের ব্যক্তিত্ব এই বিচিত্র ঐশ্বর্যের স্মৃতিবাহী বলে তাঁর আত্মচরিত ঐতিহাসিক দলিল এবং সুখপাঠ্য সাহিত্য উভয়রূপেই স্মরণীয়।

দ্রুত উন্মোচনশীল ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশ্রুত ব্যক্তিবর্গের সংগে রাজনারায়ণ বসুর আত্মিক লেনদেন কয়েক পুরুষে ব্যাপ্ত বোলে সেই স্মৃতিমন্থনজাত আত্মপ্রচারও কয়েকটি বিশেষ গুণে মণ্ডিত। 'তার মধ্যে প্রধান হোলো তাঁর কালচেতনা, সেই চেতনার তৌলন প্রবণতা। সেকাল আর একাল বিষয়ক কথা যে কেবল মাত্র ঐ শিরোনামের বক্তৃতার মধ্যেই বসু সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তা নয়। তাঁর আত্মচরিতেও প্রায় সকল বিশিষ্ট বস্তুর বর্ণনার পশ্চাতে এই কালভিত্তিক তুলনামূলক বচন রচনার প্রবণতা লক্ষণীয়। রাজনারায়ণ বসু সেকাল-একাল বলতে সময়ের যে এলাকা বিভাগ বুঝতেন তার একটা হিসেব হোলো: 'ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দু কালেজ সংস্থাপন পর্যন্ত যে সময় তাহা "সেকাল" এবং তাহার পরের কাল "একাল" শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।' বিশেষ করে ঐ বক্তৃতার পর তাঁর যুগ চেতনার এই প্রসার সেকালে কতদূর জাহির ছিল সে সম্পর্কে আত্মচরিতে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। 'আমি একদিন কোনো বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাটীর

দোতালায় বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময় শুনিলাম যে, নীচের তলায় তাঁহার পালিত পুত্র আর একটি বালককে বলিতেছে, 'উপরে কে এসেছে জানিস? সেকাল-একাল এসেছে।' আমার নাম সেকাল একাল হইয়া গিয়াছিল।" [পৃঃ ৯৯]

আত্মচরিত তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে জন্ম ও বংশ বৃত্তান্ত, ১ থেকে ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। দ্বিতীয় অংশ শৈশব তৎকালীন শিক্ষা, ২০—৫১ পৃষ্ঠা। কর্ম-জীবন, ৫২—২৩৬ পৃষ্ঠা।

প্রথম অংশে একেবারেই আগের কালের কথা। একালে মীর মশাররফ হোসেনের জীবনে যে বিপর্যয় একবার ঘটেছিল রাজনারায়ণের পিতার জীবনে হুবহু তাই ঘটে। তবে পার্থক্য এই যে, রাজনারায়ণের পিতার জীবনে সে অঘটনের কালে চিত্তস্থির রাখতে যিনি সৎ পরামর্শ দেন, তিনি ছিলেন, এক মহান পুরুষ এবং দৈবক্রমে সে অঘটনই পরে মঙ্গলময় বলে প্রমাণিত হোলো। কাহিনীটা এই রকম ঃ

> আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর সহিত আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহাতে বাবা চটিয়া পুনরায় আর একটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, গাছের ফলের দ্বারা গাছের উৎকৃষ্টতা বিবেচনা করা কর্তব্য। যদি তোমার এই স্ত্রীতে উত্তম পুত্র জন্মে, তবে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে। [পৃঃ ১০—১১]

মাতাপিতামহের আমলে মুসলমানী চালচলনের প্রভাব সম্পর্কে একটি মন্তব্য ঃ

> সেকালে মুসলমান রীতি-নীতি অনুসরণ করিতে আমাদের দেশের ভদ্র লোকেরা ভালবাসিতেন। বড় ঠাকুরদাদা ঢিলে পাজামা পরিয়া বাটীতে বসিয়া থাকিতেন এবং দলাদলি করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'ঢিলে পাজামা পরিয়া দলাদলি করিলে কেহ আপনার কথা শুনিবে না, ঢিলে পাজামা পরিত্যাগ করুন। [পৃঃ ১৩]

দ্বিতীয় অংশের বিষয় বস্তু আরো সরাসরি আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার তৎকালীন বাংগালীর জড় সমাজে যদিও প্রথম দিকে বিক্ষোভ বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু পরে ক্রমশঃ গরিষ্ঠ সংখ্যক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ী বা সংরক্ষণী মনোভাবই বুদ্ধি ও হৃদয়ের উদ্দাম গতিবেগকে অনেকখানি শান্ত ও স্তব্ধ কোরে দেয়। নানা ঘটনা ও চরিত্রের আলোচনার মধ্য

দিয়ে সে কাহিনী তাৎপর্যপূর্ণ রূপে এ বইতে বর্ণিত হোয়েছে। অবশ্য রাজনারায়ণ বসু নিজে শেষ বয়সে স্মৃতিরোমন্থনকারী অন্যান্য সামাজিক 'বৃদ্ধ হিন্দুর' মতো বিশেষ করে সেকাল আর একালে, সেকালের অপস্মৃত মহিমা স্মরণ করে তুলনায় বেশী শোক প্রকাশ কোরেছেন। তবে আমরা সকল সময়ে তাঁর অতি উচ্চারিত সিদ্ধান্তকে সরল সত্য বোলে মেনে নিতে বাধ্য নই। লেখার অন্তরালে সঞ্চরণশীল অনুচ্চারিত ধারণা সমূহকে উদ্ভব'হ্য যাবতীয় তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই কোরে, বাছাই কোরে, গ্রন্থিত কোরে তবে আমরা আত্মজীবনী থেকে অতীতের কোনো বিশেষ পর্বের সমাজ-ইতিহাসকে পুনর্গঠিত কোরতে সমর্থ হবো। সে বিশ্লেষণ রীতির নানা স্তরে প্রবেশ না করে বর্তমান বর্ণনামূলক প্রবন্ধে আমরা শুধু প্রাসংগিক ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সমূহ একত্রিত কোরে উপস্থিত কোরছি।

ইংরেজ লেখকদের মধ্যে মেকলে ছিলেন, 'এজুদের' পরম পূজনীয় শিল্পী ও মনীষী। কিন্তু রাজনারায়ণের সাক্ষ্য থেকে এ কথা জানতে পারি যে সেই প্রতাপশালী মেকলেও বিংশ শতাব্দীর সূচনায় লয় পেতে সুরু করেছেন। 'তখন আমরা মেকলে খোর ছিলাম। তাঁহাকে ইংলেণ্ডের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তাঁহার শত শত মহদ্গুণ সত্ত্বেও তাঁহাকে কবিওয়ালা ও তাঁহার এক একটি রচনা (এসে) এক এক তান কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, একবগ্‌গা ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে।' [পৃঃ ৩৭] কলেজ পড়ুয়া ছেলেরা মেকলে ছাড়াও আরো দুএকটি বস্তুর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন। তবে আরো আগেকার যুগের তুলনায় এই আসক্তি অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের। কারণ 'তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের এক পুরুষ পূর্ব্বে যুবকেরা মদ্যপান করিত না—কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল, গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। [পৃঃ ৪১]। সমকালীন তারুণ্যের অস্থিরতাকে আর্দ্র চিত্তে লোচন করে দরদী রাজনারায়ন এই অতিরিক্ত পানাসক্তির যে আদর্শগত কারণ ব্যখ্যা করেছেন তাও বিশেষরূপে বিশ্লেষিত ও পরীক্ষিত হওয়ার দাবী রাখেঃ 'তাহারা কখনই পানাসক্ত হইতেন না, যদ্যপি তাহা সভ্যতার চিহ্ন এমন মনে না করিতেন।' [পৃঃ ৪৫]। ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রিয়া কর্মের সংগে পর্য্যন্ত সে সময়ে পানাহারের যে

যোগ অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে রাজনারায়ণের সাক্ষ্য সত্যানুসরণে কুণ্ঠাহীন। 'যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। ······খানা খাওয়া ও মদ্যপান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিত রূপে পান করিতাম। পীড়ার পর চৈতন্য হইয়াছিল।' [পৃঃ ৪৯]

ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বগত ও প্রতিষ্ঠানগত বিবর্তনের অনেক মঞ্চান্তরাল দৃশ্য রাজনারায়ণ বসু তাঁর উদার কৌতুকবোধ নিয়ে বর্ণনা কোরেছেন। মহর্ষির জীবিত কালেই তাঁর অনেক প্রিয় বিশ্বাস ও সংস্কার নবীন ব্রাহ্মদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের তাড়নায় বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হোয়েছে। রাজনারায়ণ বসুর বর্ণিত কোনো কোনো সংক্ষিপ্ত দৃশ্য সেই স্মৃতিতে দীপ্যমান। মহর্ষি ও কেশব সেন প্রসংগে আলোচনা কোরতে গিয়ে বসু মহাশয়ের চিত্তপটে যে চিত্রটি ঝলক দিয়ে উঠেছে সে হোলো: 'কেশব বাবু এক কোণে বসিয়া বাইবেল পড়িতেন, এ দিকে দেবেন্দ্র বাবু বসিয়া উপনিষদ পড়িতেন।' [পৃঃ ১০৩]। কিন্তু দৃশ্য বা চিত্র চিত্রণের চেয়ে চিন্তা বা তত্ত্বের প্রামাণ্য দলিল পেশ করায় রাজনারায়ণের উৎসাহ বেশী। তাই তিনি মহর্ষি ও অক্ষয় দত্তের মধ্যে যে ভাবদ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল, স্বকীয় দৃষ্টিতে বিচার কোরে তার সার ব্যক্ত কোরতে কুণ্ঠিত হননি। এবং সে বিচার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপুষ্ট সুচিন্তিত এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বোলেই মূল্যবান।

> দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কারক, অক্ষয় বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। ··· ব্রাহ্ম সমাজের দুই নায়কের মধ্যে তর্ক বিতর্ক দ্বারা যাহা স্থিরকৃত হয় তাহার গৌরব কেবল একজনকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষয় বাবুর বন্ধুরা ইহার গৌরব কেবল তাঁহাকেই দিয়া আসিতেছেন। যিনি সর্ব্বপ্রধান ও যাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজে কোন পরিবর্তন আদোবেই সাধিত হইতে পারিত না তিনি আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব সত্ত্বেও যেমন সত্য প্রদর্শিত হইল অমনি তাহা গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে ইহা তাঁহারা বিবেচনা না করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন না। রক্ষণশীল স্বভাব হইয়া অগ্রসর হওয়া আরো গৌরবের বিষয়। [পৃঃ ৬৭-৬৮]

নিজের ধর্মমতের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কেও অনেক মনোজ্ঞ গল্প করেছেন। একটি কাহিনীর ভূমিকা স্বরূপ এক জায়গায় এমন কথাও বোলেছেন যে, 'শেভালিয়র র‍্যামজের "সাইরাসেজ ট্রাভেলজ" পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের "অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক ইন ফেভর অফ্ দি প্রিসেপ্টস্ অফ্ জীসাস" এবং চ্যানিংগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই. পরিশেষে কলেজে ছাড়িবার অব্যাহিত পূর্ব্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী হই।" (পৃঃ ৪৩) তত্ত্ব ব. তত্ত্বমগ্ন চরিত্রাংশে এই শ্রেণীর বিশ্লেষণ মূলক সরস আলোচনাই রাজনারায়ণের আত্মচরিতের প্রধান আকর্ষণ। আত্মচরিত হিসেবে গ্রন্থের দুর্বলতাও এইখানে। সম্পাদক হরিহর শেঠ অবশ্য ভূমিকায় বোলেছেন যে 'তিনি গ্রন্থখানিতে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ঘটনাবলীর শুধু উল্লেখ বা বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার মূল্যবান অনুভূতি বা উপলব্ধিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম 'আত্মজীবনী' 'জীবনস্মৃতি' এসব কিছু না দিয়া 'আত্মচরিত' দেওয়া হইয়াছে, ইহা খুব সমীচীন হইয়াছে, কারণ ইহাতে তাঁহার চারিত্রিক দুর্বলতা বা গুহ্যকথাও কিছুমাত্র গোপন করা হয় নাই।' কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। 'আমার প্রথম বিবাহ সেয়ালদহের রামমোহন মিত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর সহিত হয়। আমার বয়ঃক্রম তখন সতেরো বৎসর কন্যাটির বয়স এগার বৎসর। আমার এখানে কুলকর্ম হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আত্মরস হাটখোলার দত্তদিগের বাটিতে হয়। ইহা পরে বিবরিত হইবে। ... একুশ বৎসরে আমার আত্মরস হয়।' (পৃঃ ৩৫) —এই ঘোষণার মধ্যে আত্মজীবনী সুলভ অকপটতার আভাস থাকলেও তা এত অপরিপুষ্ট এবং অনুরূপ স্বীকারোক্তি সমগ্র গ্রন্থে এতো ক্বচিৎদৃষ্ট যে তার মধ্যে লেখকের ইন্দ্রিয়াধীন দুর্বল মানবীয় সত্ত্বা প্রতিফলিত হোতে পেরেছে বোলে মনে হয় না। কি করে নিজের পিতার কাছে পরিমিত মদ্যপানের শুভপাঠ গ্রহণ কোরলেন (পৃঃ ৪৭), খানা খাওয়া ও মদ্যপানে আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মাছের ঝোল ও সর্ষের তেলের প্রতি যে তাঁর ভক্তি বরাবর অচল ছিল (পৃঃ ৬৯) —সেসব স্মৃতিকথার মধ্যে অন্তরংগ মানুষের যে মাঝে মাঝে উন্মোচিত হয়েছে তা আরো বহুল ও বিস্তৃত, বিনীত ও বিশ্রদ্ধ হোলেই আমরা অধিক আনন্দিত হোতাম, আত্মচরিতও যথার্থ শিল্পরূপ লাভ কোরে আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি সাধন কোরতে পারতো।

নয়

নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, কলিকাতা, ১৯০৮-১৯১৩।

নবীন চন্দ্র সেনের আমার জীবন পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। লেখক প্রতি খণ্ডকে ভাগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩১৪, সালে (ইং ১৯০৮), দ্বিতীয় ভাগ ১৩১৬, তৃতীয় ভাগ ১৩১৭, চতুর্থ ভাগ ১৩১৮, পঞ্চম ভাগ ১৩২০ সালে। বাংলাভাষায় এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পূর্ণাংগ আত্মজীবনী। লেখক শৈশব থেকে প্রৌঢ় কাল অবধি জীবনের সকল অভিজ্ঞতার ইতিহাস অকপটে ব্যক্ত কোরতে প্রয়াস পেয়েছেন। শৈশবে যা ঘটেছে, কৈশোরে যা অতিক্রম কোরতে হোয়েছে, পুরুষ চিত্তে যা উন্মাদনা এনেছে, কবি চিত্তে যা রেখাপাত কোরেছে, হাকিমী জীবনে যা আত্মপ্রসাদজনিত পরিতৃপ্তি দান কোরেছে তার বিচিত্র, বিস্তৃত এবং পুংখানুপুংখ কাহিনী একটা দিলখোলা আসর জমানো মনমাতানো মজলিসী ঢংগে বলা হোয়েছে। স্বভাবতই নবীন সেনের কণ্ঠ উচ্চ, ঘোষণারীতি নাটকীয়। বিনয়ের নিবেদনও এখানে আত্মগৌরব প্রচারের স্থূল চেতনাকে, হিতোপদেশ বিতরণের মহৎ আকাংখাকে প্রচ্ছন্ন রাখে নি।

> আমার জীবন?—আমার মত লোকের জীবন লিখিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন? অসংখ্য কুসুমরাশির মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৌরভ ও শোভাবিহীন ফুল কোথায় অনন্ত অরণ্যের নিভৃত স্থানে ফুটিয়া ঝরিতেছে, অসংখ্য নক্ষত্র খচিত আকাশতলে অসংখ্য জোনাকিরাশির মধ্যে যে একটি জোনাকি কোথায় অনন্ত প্রান্তরের অন্ধকারতম প্রদেশে ফুটিয়া নিবিতেছে, অনন্ত জগতের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে কোথায় একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু কি অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার জীবন কে জানিতে চাহে? তথাপি ইহারা এই জ্ঞানাতীত বিস্ময়পূর্ণ বিশ্বের অংশ!! অহো কি রহস্য! তাহাদের দ্বারাও এই মহাসৃষ্টিযন্ত্রের কোন কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহা না হইলে তাহাদের সৃষ্টি হইবে কেন? বিধাতার সৃষ্টি নিষ্ফল নহে। সেইরূপ আমার মত ক্ষুদ্র মানবের দ্বারাও অবশ্য কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, যাহা আমার ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানে বুঝিতে পারিতেছিনা। যখন মনে এরূপ ভাবের উদয় হয়, যখন ভাবি যে, এই মহা রঙ্গভূমে, যেখানে সৌরজগৎ প্রভৃতির অনন্তকাল হইতে অনন্ত অভিনয় হইতেছে, আমিও তাহাতে রূপান্তরে অনন্তকাল হইতে অভিনয় করিয়া আসিতেছে, তখন হৃদয় কি আত্মগরিমায় পূর্ণ হয়! তখন

> আমাকে আর একটি ক্ষণজীবী ক্ষুদ্র পতংগবিশেষ বলিয়া বোধ হয় না। তখন আমি এই অনন্ত অভিনয়ক্ষেত্রের অনন্ত অভিনয়ের এক জন অনন্ত অভিনেতা। কিন্তু যখন চিন্তারাজ্য হইতে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখন আবার আপনার ক্ষুদ্রত্বে আপনি ম্রিয়মাণ হই। কই, এই জীবনের কার্যকারিতা ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমার জীবন জানিবার জন্য সময়ে অনেকে পত্র লিখিয়াছেন। একজন বারংবার অনুরোধ করাতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমার জীবন তিনটি মহা ঘটনায় পরিপূর্ণ—জন্ম, বিবাহ, দাসত্ব। আর একটি ঘটনা এখনও বাকি আছে, তাহা—মৃত্যু। তাঁহাকে আরও লিখিয়াছিলাম যে, এ শিরস্ত্রাণ বাংলার বড়লোক মাত্রকেই খাটিবে।
>
> তবে আজ স্বয়ং আপনার জীবন লিখিতে বসিলাম কেন? ইচ্ছা ভূত জীবনের দর্পণে একবার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া কিরূপ দেখায়, দেখিব। দেখিয়া তাহার একটী মন্দ রেখাও পরিবর্ত্তন করিতে পারি কি না, চেষ্টা করিব। এই মধ্য-জীবনে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে, যে সকল ঝটিকা বিলোড়িত অরণ্যানী ও ভূধরমালা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কথঞ্চিৎ আশায় পূর্ণ করিতে পারিব, এই সাহস, এই শিক্ষা, এই সান্ত্বনার আশায় আজ আত্মজীবনের আলোচনা করিতে বসিলাম। [১ থেকে ৩ পৃঃ, প্রথম খণ্ড]।

দেওয়ান কর্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের এরূপ অভিলাষ ছিল, মীর মশাররফ হোসেনও এরকম ভাবনার দ্বারা পীড়িত হোয়েছেন। এই আত্মজীবনীত্রয়ের উপক্রমণিকা অংশের ভাবের এই ঐক্য চোখে পড়ার মতো। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা রাজনারায়ণ বসু কিম্বা শিবনাথ শাস্ত্রীর নিজ নিজ চরিত্রের গরিমা প্রচারে উদাসিন ছিলেন এমন বলি না। তবে তাঁদের ব্যক্তি জীবনের মহিমা সুবিদিত। তাঁদের যুগ নির্ম্মাণকারী সামাজিক কীর্ত্তিকলাপ সর্বজন স্বীকৃত। আত্মকাহিনীর মধ্যে তাঁর অন্তরংগ পরিচয় লাভ কোরে আমরা একটা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কৌতূহলকে নিরস্ত করি মাত্র; বর্ণিত অভিজ্ঞতার অসাধারণত্ব বা অতি সাধারণত্ব লক্ষ্য কোরে মনে অবিশ্বাস বা ঔদাসীন্যের সৃষ্টি হয় না।

আত্মজীবনীতে উপন্যাসের কলারীতি অনুসৃত হলেই সেটা অপরাধ বলে বিবেচ্য নয়। লেখকের আত্মসাক্ষাৎকার শিল্পরূপে প্রাণময় করে তুলবার জন্যে নাটক উপন্যাসের রস রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা লেখকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক তবে উপন্যাস ও আত্মচরিতের মধ্যে যে উপাদানগত মৌলিক বৈষম্য বিদ্যমান,

কল্পনার স্বাধীনতা ও অধীনতা দুয়ের মধ্যে যে মাত্রায় বিধৃত, কাহিনীর পরিচর্যায় যত্ন ও অযত্ন উভয়ের মধ্যে যে পর্যায়ে প্রকাশিত তার অস্বীকার মাত্রেই পীড়াদায়ক। আত্মজীবনী বাস্তব বোলেই যে আবেদনগত তীব্রতা সে কাহিনীর স্বাভাবিক প্রাপ্য, এরকম ক্ষেত্রে আত্মকাহিনী সে মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়। আত্মচরিত রচনার নিজস্ব কৌশল যদি তা রক্ষা কোরতে না পারে, উপন্যাস থেকে ধার করা ভাষা ও কলার ছল সে বঞ্চনাকে বাড়াবে বই কমাবে না। দেওয়ান সাহেব, মীর সাহেব ও নবীন সেন নিজেদের জীবনের কথা বোলতে গিয়ে কখনো কখনো এই অকৃত্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বোলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করবেন। সম্ভবতঃ নবীন সেনের স্বভাবের মধ্যেই একটা কলাশ্রয়ী অতিপ্রত্যয়ের প্রবণতা অত্যাধিক পরিমাণে ছিল। তাই তাঁর জীবনী পাঠ কোরে প্রমথ চৌধুরীর যে ধারণা জন্মে তা হোলো: এই বইখানি সেন মহাশয়ের জীবন চরিত্র হলেও একখানি নভেল বিশেষ। অরে সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক।

নবীন সেন সমকালের একাধিক প্রধান পুরুষদের সান্নিধ্য লাভ কোরেছিলেন। তাঁদের চরিত্র চিত্রণে তিনি নৈপুণ্য ও স্বকীয়তা প্রদর্শন কোরেছেন তা সামগ্রিকভাবে আমার জীবনকে অধিকতর পঠনীয় ও রসপুষ্ট কোরে তুলেছে। একটি হ্রস্ব দৃষ্টান্ত:

> ভগবানের কি রহস্য বুঝিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্যারী বাবু ও কৃষ্ণদাস পাল তখন বাংলার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তিনেরই চরিত্র দেবতুল্য, কিন্তু তিনেরি কদাকার। (১৪২ পৃঃ, ১ম খণ্ড)

এই চরিত্রচিত্র সমূহের মধ্যে বিদ্যাসাগর ১ম ভাগে, বঙ্কিম ২য় ভাগে, রবীন্দ্রনাথ ৪র্থ ভাগে—এই ত্রিমূর্তিই সর্বাপেক্ষা জীবন্ত। সাহিত্য সাধক চরিতমালার তৃতীয় খণ্ডে, নবীনচন্দ্র সেন পুস্তিকায়, ৫০ থেকে ৬৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী যে দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলো রোয়েছে তা এই চরিত্রালেখ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমূহের সংকলন। চরিতমালার লেখকের মতে "নবীনচন্দ্র সেন স্বভাব-কবি ছিলেন, তিনি হৃদয়াবেগে লিখিতেন, মস্তিষ্কের সহিত তাঁহার কাব্যের কচিৎ যোগ ছিল। এই কারণে আমার জীবন লিখিতে বসিয়া তিনি ডেপুটি নবীনচন্দ্র, হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক নবীনচন্দ্র, স্বদেশবৎসল নবীনচন্দ্রের, আত্মম্ভরী নবীনচন্দ্রেরই পরিচয় দিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্র কুত্রাপি আত্মপ্রকাশ করে নাই।" এই সিদ্ধান্ত তর্ক সাপেক্ষ।

নিজের জীবনের অনেক সাফল্য ও সংকট বর্ণনায়—যেমন ১ম ভাগে পিতৃহীন যুবকের দুর্দশার চিত্র অংকনে তিনি তার প্রকৃত সংবেদনশীল কবি হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। সূক্ষ্মতর অর্থে, তার কবিতার শক্তি ও অশক্তির মূলে যে অনিয়ন্ত্রণ, লঘুগুরু ভেদজ্ঞানের অস্থিরতা, আবেগ ও দুর্দমনীয় তরংগোচ্ছাস ক্রীয়াশীল, নিজের অন্তরংগতম সত্তার এই মৌল পরিচয়কে নবীন সেন যথেষ্ট রূপে ব্যক্ত কোরেছেন। প্রথম অনুরাগের স্মৃতির উজ্জ্বলতার সাক্ষী :

> অবশেষে উঠিলাম, আত্মহারাবৎ চলিয়া যাইতেছিলাম, অন্ধকারে বারণ্ডা পার হইতে বক্ষে কি লাগিল? আমি এক পা পিছাইলাম, কিন্তু আবার সে কুসুম-স্তবকনিভ স্পর্শ হৃদয়ে লাগিল—আহা! কি স্পর্শ! বুঝিলাম আমার বুকে মাথা রাখিয়া বিদ্যুৎ। অজ্ঞাতে আমার দুই ভুজ তাহাকে আরো বুকে টানিয়া ধরিল। আমার শরীরের যন্ত্র কি এক অমৃতে আপ্লুত হইয়া নিশ্চল হইল। বালিকা আমার করে একটী গোলাপ ফুল দিল। আমি তাহার ললাটে একটি চুম্বন দিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে গুরু ঠাকুর চন্দ্রকুমারের কাছে উর্দ্ধশ্বাসে উপস্থিত হইলাম। (৬০ পৃষ্ঠা, ১ম ভাগ)

নিজের কাব্যপ্রবণতার স্বরূপ বর্ণনায় তা স্বপ্রকাশিত :

> "অতএব পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থি মজ্জায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল। (১২৯-৩০ পৃষ্ঠায়)

গীতিকাব্য রচনায় ও স্বদেশপ্রীতি প্রকাশে তিনি যে হেমচন্দ্রের চেয়ে শতগুণে বড় এই দাবী সজোরে প্রচারের মধ্যেও এই মানসিকতা পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের সংগে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করতে বসে, তুলনীয় ঘটনা হিসেবে অবলীলাক্রমে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের ঐতিহাসিক মিলনের চিত্রটি উপস্থাপিত করেছেন। আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করব। বিষয় : রৈবতক কাব্য ও কবির কৃষ্ণভক্তির অংকুর অনুসন্ধান।

> কিরূপে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী যুবতী আমার বক্ষের উপর পড়িয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বাহ্যজ্ঞানহীনা হইয়া, তাহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে বলে,... তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে চলিয়া গেলে, দর্শন মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারস্থ সোপান

পার্শ্বে কৃত্রিম সিংহে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া আমি ভাবিলাম যে যদি একটি যুবতী কেবল জগন্নাথ দর্শনের জন্য ভক্তিতে এরূপ আত্মহারা হইয়া একজন অজ্ঞাত পুরুষের বক্ষে এরূপ পড়িতে পারে, তবে এরূপ রমণীরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পাইলে তাঁহাকে লইয়া যে ব্রজলীলা করিবে, রাসরাত্রিতে আত্মহারা ও বাহ্যজ্ঞানহীনা হইয়া তাঁহাকে যে শ্রীভগবানজ্ঞানে আলিঙ্গন করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? সেখানে বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম, এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল। (১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড।)

॥ দশ ॥

শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র) কলিকাতা, ১৯১৫ ॥

এই প্রবন্ধের সূত্রপাত হয় মীর আত্মজীবনীর সারাংশ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। ভূমিকা হিসেবে বাংলা আত্মজীবনীর সাধারন বর্ণনায় উদ্যোগী হই। আমাদের আলোচনার অন্তর্গত জীবনচরিত সমূহের সীমানা নির্দিষ্ট কোরেছি ১৯১৮ তে, শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত প্রকাশের কাল পর্যন্ত। মীরের পর ও শিবনাথের পূর্বে প্রচারিত আত্মমানস উদ্ঘাটনমূলক উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচিত্র পাই মাত্র দুটো। এক রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, দুই আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস (সচিত্র)। এই শেষের বইটির কেবল মাত্র প্রথম অংশই আমাদের জন্যে প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয় অংশে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও ভাষা বিষয়ক নানা তত্ত্বের তথ্যবহুল আলোচনা। এই অংশে ব্যক্তি চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন কোরতে বা আত্মসত্তার তাৎপর্যপূর্ণ পরিমণ্ডলটি উজ্জ্বল কোরে তুলতে লেখক প্রয়াস পান নি। বাল্যকথা বর্ণিত হোয়েছে ৬৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, চলতি বাংলায়। তারপর ২৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বোম্বাই প্রবাসের কথা সাধু ভাষায়। চিত্রটি যে প্রধানতঃ বোম্বায়ের, ব্যক্তির নয়, এ সচেতনতা সত্যেন্দ্রনাথেরও ছিল। দ্বিতীয় অংশের প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায় বলে দিয়েছেন, 'এই ভাগের অনেক কথা আমার প্রণীত বোম্বাই চিত্র হইতে সংগৃহীত।'

বাল্যকথার প্রধান আকর্ষণ সত্যেন্দ্র সত্তার বিশিষ্ট পরিবেশের প্রাণময় বর্ণনা, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর পারিবারিক ইতিবৃত্ত। বাংগালীর জীবনে ও সাহিত্যে পরিবারের মেয়ে-পুরুষের প্রভাব এত বিচিত্র পথে সঞ্চারিত যে, তার অনুধ্যান স্বভাবতঃই প্রীতিকর। অন্ততঃ দু'জন বহুশ্রুত ব্যক্তিত্বের বর্ণ-রঞ্জিত জীবন চিত্র এখানে আছে—যা অন্যত্র অপ্রাপ্য। একজন হলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৬৪ সালে তিনি তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যে পত্র লেখেন, তার স্মরণীয় উদ্ধৃতাংশটুকু এরূপ ঃ

> আমার সকল বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই, ইহাই আমার আশ্চর্য বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও পরিদর্শন কার্য্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ না করিয়া তাহা তোমার প্রিয় পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ। ভারতবর্ষের উত্তাপ ও আবহাওয়া সহ্য করিবার আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম।
>
> (মূলের বাংলা অনুবাদ পৃঃ ৭।)

দ্বারকানাথ যখন ইংলণ্ডের সাসেক্স জেলার অন্তর্গত ওয়ার্দিংএর এক হোটেলে থাকতেন তখন তাঁর "সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ জন অনুচর ছিল, তার মধ্যে দুইজন এদেশীয় ভৃত্য। তা ছাড়া একজন সেক্রেটারী, একজন Interpreter, সংগীত ওস্তাদ জার্ম্মান একজন, চিকিৎসক Dr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ সহচর সর্ব্বদা কাছে থেকে তাঁর অবশ্যকমত কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল।" (৮ পৃষ্ঠা)। প্রোফেসর ম্যাক্সমুলার সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর পিতার প্যারিসে বাসকালীন জীবনযাত্রা বর্ণনা কোরতে গিয়ে বোলছেন,

> ১৮৪৪ সালে যখন একদিন সহরময় রাষ্ট্র হইল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহে বাস করছেন, তখন প্যারিসে হুলস্থুল পড়ে গেল এবং আমারও তার সঙ্গে আলাপ করার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল।.... তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হল।......দ্বারাকানাথ প্যারিসে খুব জাকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ কর্তৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তা নয়—দ্বারাকানাথ একদিন খুব সমারোহে সান্ধ্য সম্মিলনের আয়োজন করেন, তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। দ্বারকানাথ সমস্ত

ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরি শাল দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন! তখন কাশ্মীরের শাল ছিল ফরাসী স্ত্রীলোকদের একটা আকাঙ্খার বস্তু, সুতরাং কল্পনা কর যে তাদের কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায় কালীন প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন। (১১—১৪ পৃষ্ঠা।)

দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর কাব্য সাধনা, তত্ত্ববিদ্যানুশীলন, গণিতশাস্ত্র চর্চা, বাক্সরচনা প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন, বাংলা রেখাক্ষর বর্ণমালার উদ্ভাবন, এমন কি তিনি যে 'সাঁতারে সর্ব্বাপেক্ষা মজবুৎ ছিলেন। তাঁর রেখাক্ষরের মত সাঁতারেও তিনি যে কত কারদানী করতেন তার ঠিক নেই।' (৪৬ পৃষ্ঠা) —বড়দাদার সকল কথাই সত্যেন্দ্রনাথ বড় দরদ দিয়ে সরস কোরে বর্ণনা কোরেছেন।

এগার

শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, নতুন সংস্করণ; কলিকাতা, ১৩৫৯ (প্রকাশ ১৯১৮)॥

আলোচ্য কালের মধ্যে রচিত আত্মচরিত সমূহের মধ্যে এইটেই সর্বশ্রেষ্ঠ। একশ' বছর আগে শিক্ষিত হিন্দু বাংগালী যে ভাবোন্মাদনা ও কর্মানুপ্রেরণার জোয়ার অনুভব কোরেছিলেন তার শেষ প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণক হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, কেশব সেন সকলের সান্নিধ্যই তিনি লাভ কোরেছিলেন। তাঁদের স্নেহ অর্থ শ্রম স্বপক্ষে লাভ কোরে শিবনাথ নিজের অনেক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত কোরতে সমর্থ হন। তখনকার উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দুর ধর্মীয় চেতনার মুক্ত বুদ্ধির আলো যে সাধনকর্মের পথকে দ্যুতিময় কোরে তোলে শিবনাথ শাস্ত্রী সে পথেরই একজন ব্রাহ্ম পথিক ও পথপ্রদর্শক। স্বভাবতই তাঁর জীবনবৃত্ত যে মণ্ডলকে ঘিরে পূর্ণতা লাভ কোরেছে তার আন্তর কাহিনী আত্যন্তিক মূল্যে ঐশ্বর্যশালী। যেমন,

"একদিন আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ ভবনেই আছেন। গিয়া দেখি, ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। তিনজনে অনেক কথা আরম্ভ হইল। মহর্ষি রাজনারায়ণ বাবুকে ও আমাকে বড় ভালবাসিতেন। রাজনারায়ণ বাবুতে ও আমাতে মিলন,

> মহর্ষির নিকট যেন মণিকাঞ্চনের যোগ বোধ হইল, তাঁহার হৃদয় দ্বার খুলিয়া প্রেমের উৎস আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল, তিনজনের অট্টহাস্যে অত বড় বাড়ি কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে নির্ঝরের সুস্নিগ্ধ বারির ন্যায় মহর্ষির বাক্যস্রোতে হাফেজ আসিলেন, নানক আসিলেন, ঋষিরা আসিলেন, উপনিষদ আসিলেন, আমরা সকলে সেই রসে মগ্ন হইয়া গেলাম। দেখিতেছি, মহর্ষির কান দুটা লাল হইয়া যাইতেছে মহর্ষির মস্তকের কেশ মাঝে মাঝে খাড়া হইয়া উঠিতেছে।...এমন সুন্দর, এমন পবিত্র এমন অকপট হাস্য মানুষে কম দেখিয়াছি। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মধ্যে অকপট অট্টহাস্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মহর্ষির হাস্য বড় কম চিত্তাকর্ষক ছিলনা। তবে তিনি সকলের কাছে হাসিতেন না, নিতান্ত অনুরক্ত লোকের ভাগ্যেই তাহা ঘটিত। (১৫৮—৯ পৃষ্ঠা)

ব্যক্তিচরিত্রের এই মহিমা ও পরিবেশের এই সম্মোহন শক্তি দেবেন্দ্রনাথ বা রাজনারায়ণের জীবন-জীবনীতেও বিদ্যমান। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত অতিরিক্ত আরো কিছু সদগুণের অধিকারী বোলে তা সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়।

এই বিশেষ গুণটি শিবনাথের শিল্পীসত্তার দান। তিনি কর্মী ছিলেন, ভাবুক ছিলেন এবং লেখকও ছিলেন। কথার তিনি দক্ষ কারিগর, তাঁর দৃষ্টি পরিণত শিল্পীর। শৈশবে যেদিন পাঠাভ্যাসের জন্য

> বাবা আমাকে কলিকাতা আনিলেন। সেদিনকার কথা আমি ভুলিব না। আমি মায়ের এক ছেলে, বাছুর লইয়া গেলে গাভী যেমন হাম্বায়, তেমনি আমার মা সেদিন হাম্বাইতে লাগিলেন। (৯৩ পৃষ্ঠা)

নিরামিষাশী শিবনাথ তাঁর তরুণ বয়সের পাঠানুরাগ বর্ণনা কোরতে গিয়ে বলেন :

> যখনই কোন ভালো গ্রন্থ হাতে পাইতাম, অমনি ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র যেমন আমিষ খণ্ডের উপরে পড়ে, সেইভাবে তাহার উপরে পড়িতাম। (৪০ পৃষ্ঠা)

আক্ষেপের বিষয় এই যে, "শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন দিগভ্রষ্ট সাহিত্যিক। ইঁহার অন্তরবাসী কবি মানুষটি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার মতো সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই। শিক্ষক ও সংস্কারক বনিয়া গিয়া শিবনাথ এক হিসাবে স্বধর্মচ্যুত হইয়াছিলেন।"[৩১] "ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত বঙ্গ-ভারতীর সেবায়

আত্মোৎসর্গ করিলে যে তিনি কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার নিদর্শন অক্ষয় রাখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার গ্রন্থ পুষ্পমালা এবং উপন্যাস মেজ-বৌ যুগান্তরেই পাই।''[৩২]

এই আত্মচরিতের লেখক কথাসাহিত্য রচনার সূক্ষ্ম কলা কৌশলকে অনায়াসে এবং অলক্ষ্যে নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনায় প্রয়োগ কোরেছেন। যুগান্তরে প্রতিভার যে বিশিষ্ট পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিককে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, আত্মচরিতেও তার প্রকাশ স্পষ্ট। আত্মচরিতের অনেক চরিত্র প্রসংগেই বলা চলে, "এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সুরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গ সাহিত্যে দুর্লভ।"[৩৩] এতোগুলো চরিত্র এতো জীবন্ত ও নিপুণভাবে বাংলা অন্য কোনো আত্মজীবনীতে চিত্রিত হয় নি। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র উদ্ধৃত কোরব।

প্রপিতামহের বয়স ৯৫ বৎসর। চোখ জ্যোতিহারা। শিবনাথ তাঁকে 'পো' বোলে ডাকতেন।

> 'আমাদের বাড়িতে প্রায়ই ২।৩টা বিড়াল থাকে। সে সময় একটা কদাকার বিড়াল ছিল। সে কদাকার বলিয়া মা তাহাকে হনুমান বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও হনুমান বলিতাম। হনু বড় চোর ছিল। পোর পাতের মাচ চুরি করিয়া খাইত, তিনি দেখিতে পাইতেন না। এই জন্য মা প্রথম প্রথম পোকে আহারে বসাইয়া বাম হস্তে একগাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন, বলিয়া আসিতেন, "মধ্যে মধ্যে বাড়িগাছটা আপ্সো বেরাল আসে। পো মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছটা লইয়া বিড়ালের উদ্দেশে মারিতেন। একদিন দেখা গেল, হনুমান লম্বা হইয়া পোর পাত হইতে চুরি করিয়া মাছ খাইতেছে, পো তাহার উদ্দেশে ছড়ি মারিতেছেন, সে ছড়ি হনুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া পড়িতেছে, হনুর গ্রাহ্যই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পোর পাতের নিকট ছড়ি হস্তে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর আর বিড়াল আসিতে পারিত না। কিন্তু একদিন যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে হাসিও পাইতেছে, লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, পো আহার করিতেছেন। শুক্ত, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন, আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভ্রাট ঘটিল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ কলা ও সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন হইল। অলক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলাম।

আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল যে আহারে বসিয়া কথা কহিতেন না, এ নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বৎসর পর্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটি নিয়ম ছিল যে, আহারের সময় কেহ স্পর্শ করিলে আহার হইতে বিরত হইতেন। আমার ক্ষুদ্র হাতের থাবা উঠিতেছে উঠিতেছে, একবার হাতে হাতে ঠেকিয়া গেল। অমনি পো শিহরিয়া মাকে ইশারাতে ডাকিতে লাগিলেন, "উ, উ!" অর্থাৎ কে আমাকে ছুঁইয়া দিল, দেখ। মা আসিয়া দেখেন, পেটুক পুত্রটির হাতে মুখে দইয়ের দাগ, আর লুকাইবার যো নাই। পোর কানে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর উ কি? ঐ 'বাবা'। বড় যে আদর দেও!" শুনিয়া প্রপিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, 'হাঃ হাঃ, বেশ করেছ, তবে ওই সব থাক,' বলিয়া আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মার সহ্য হইল না। তিনি আমার গলা টিপিয়া থাবড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা তো বেড়াল তাড়াতে বসিয়েছি, নিজেই বেড়াল হয়েছে।" (৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)

পিতা সম্পর্কে বাল্যস্মৃতি আরো রোমাঞ্চকর। তখন শিবনাথের সদ্য বিয়ে হয়েছে। নিজের বয়স বারো তেরো। স্ত্রী প্রসন্নময়ীর ন'দশ।

বিবাহ উৎসব শেষ হইতে না হইতে একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার স্মৃতি অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। আমার বিবাহের কয়েকদিন পরেই আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে এক জেঠার এক কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। তখনো প্রসন্নময়ী আমাদের বাড়িতে আছেন, বাপের বাড়ি ফিরিয়া যান নাই এবং তাঁহার পিত্রালয় হইতে যাঁহারা সংগে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ তখনো আছেন। আমার ঐ জ্যাঠতুতো বোনের বিবাহ উপস্থিত হইলে, একদিন আমাদের পাড়ার ছেলেরা বরযাত্রীদিগের সহিত কৌতুক করিবার জন্য পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দিয়া আসন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল, আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সেখানে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে আমার বড় পিসীর মেজো ছেলে রামযাদব চক্রবর্তীর সহিত আমার হঠাৎ বিবাদ বাধিয়া গেল। দুইজনে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি ও ঘুষাঘুষি করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মা এই সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিলেন এবং দুই জনের কানে ধরিয়া থাবড়া দিয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া দিলেন। মেজদাদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাড়িতে গিয়া নিজের মাকে বলিল, "মামী-মা মায়ে পোয়ে পড়ে আমায় মেরেছে।" বড়পিসী প্রকৃত ব্যাপারটা অনুসন্ধান করিলেন না, ছেলেদিগকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করিলেন না, একেবারে আগুন হইয়া গেলেন, এবং আমার এক পিসতুতো বোনের সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার মায়ের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুই ননদ ভাজে খুব ঝগড়া হইয়া গেল।

ইহার পর সন্ধ্যার প্রক্কালে মা আমাকে বলিলেন, "আজ তোমার কপালে অনেক নিগ্রহ আছে। ভাত দিচ্ছি, শিগগির খেয়ে, ভটচায্যি পাড়ায় যাত্রা হবে সেখানে গিয়ে রাত্রে যাত্রা শোন। কর্তার রাগ পড়ে গেলে সকাল বেলায় আসবে।" মা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। বাবা সন্ধ্যার পূর্বে আসিতেছিলেন, পথ হইতে বড়পিসীর গালাগালি শুনিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গিয়া বলিলেন, "তোরা কাকে এমন করে গালাগালি দিস যে রাস্তা হইতে শোনা যায়?" আর কোথায় যায়! বড়পিসী বাবার কানে মার নামে অনেক কথা ঢালিয়া দিলেন। বাবা আর কাহারো কাছে কিছু শুনিলেন কিনা জানি না আমার মায়ের উপরে কি বড়পিসীর উপরে রাগ করিলেন, তাহাও জানি না। তাঁহার মনে চিরদিন এই একটা ভাব ছিল যে, তাঁহার পুত্র এমনি সাধু ছেলে হবে যে তাহার নামে কেহ কখনো অভিযোগ করিবে না, তাহার কোন দোষ কেহ দেখাইবে না, সে সকল দোষের ও সকল অভিযোগের উপরে থাকিবে। সেই ভাবের ব্যাঘাত হইল বলিয়া রাগিয়া গেলেন কি না, জানিনা। যাহা হউক, যখন মায়ের ত্বরাতে আমি রান্নাঘরের এক কোণে বসিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতেছি, এমন সময়ে বাবা আসিয়া বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলেন। হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে পাজীটা কোথায়?" আমার মা দুইহাতদিয়া রান্নাঘরের দরজার দুইকাঠ ধরিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "সে ঘরে নাই।" আমি বুঝিলাম, বাবা যদি রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে আসেন, মা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না, বাধা দিয়া রাখিবেন কিন্তু বাবা সেদিকে আসিলেন না, বলিলেন, "দাখানা দাও দেখি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দা কেন?" বাবা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কথায় কাজ কি? দাও না।" মা দা খানা বাহির করিয়া দিলেন। বাবা দা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

আমি তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া পিছনের দ্বার দিয়া খানা খন্দ বন জঙ্গল পার হইয়া ভট্টাচায্যি পাড়ায় যাত্রাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মা আমাকে মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়াইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে আমি মুখে মাথায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে মন হইতে ভয় ভাবনা চলিয়া গেল। নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইতেছি, রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় কে আসিয়া পিছন হইতে আমার ঘাড়ের কাপড় ধরিল। আমি বলিলাম, "কে রে?" স্বপ্নেও ভাবি নাই যে বাবা সেখানে আসিয়া ধরিবেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখি, বাবা! তিনি আমার পিঠে দুঘুষা দিয়া বলিলেন, "খবরদার কাঁদতে পারবি না।" সে ঘুষা খাইয়া কান্না গিলিয়া খাওয়া আমার পক্ষে মুশকিল হইয়া পড়িল। কি করি, কান্না গিলিতে লাগিলাম। বাবা সে

অবস্থায় আমাকে বাড়ি লইয়া গেলেন, এবং উঠানের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "দাঁড়িয়ে থাক, নড়িস নে, আমি আসছি।" এই বলিয়া আমাকে মারিবার জন্য যে বাঁশের ছড়ি কাটিয়া গোলার গায়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা খুঁজিতে গেলেন, মা যে তৎপূর্বেই সে ছড়ি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন না। আমি ২।৪ মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিতে না থাকিতেই আমার মা, বড়পিসী, পিসতুতো দিদি, বিবাহ বাড়ির লোকেরা আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে! পালা পালা, মার খাবার জন্য কেন দাঁড়িয়ে থাকিস। আমি বলিতে লাগিলাম, "না, আমি যাব না, বাবা যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে গিয়েছেন।" এই বলিয়া প্রায় আধ ঘণ্টাকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ওদিকে বাবা আপনার ছড়িগাছা না পাইয়া, কি দিয়া মারিবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে আর কিছু না পাইয়া একখানা চেলা কাঠ লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই কাঠ লইয়া যখন আমাকে মারিতে আসিলেন, তখন বড়পিসী আমার ও বাবার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "ওরে ডাকাত! দে কাঠ দে। ওই কাঠের বাড়ি মারলে কি ছেলে বাঁচবে!" এই বলিয়া বাবার হাত হইতে কাঠ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই ভাইবোনে লুটোপুটি লাগিয়া গেল। বাবা বড়পিসিকে এরূপ ধাক্কা মারিলেন যে তিনি তিন চারি হাত দূরে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন আমার মা প্রস্তরের মূর্তির ন্যায় অদূরে দণ্ডায়মানা, সাড়া নাই শব্দ নাই, নড়া নাই চড়া নাই। বাবার সহিত চোখোচোখি হওয়াতে তিনি বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখ কি? ছেলে মেরে ফেলতে হয় মেরে ফেল, আমি এক পা-ও নড়ব না।" বাবা বলিলেন, "আচ্ছা, তবে দেখ।" এই বলিয়া সেই চেলা কাঠ দিয়া আমাকে মারিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আরো কেহ কেহ আমাকে বাঁচাইবার জন্য আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মাথায় ও পিঠে চেলা কাঠ পড়াতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চেলা কাঠের কয়েক ঘা খাইয়া আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর মানুষ চিনিতে পারি না। বোধ হইতে লাগিল, আমার চারিদিকে মুখগুলো ঘুরিতেছে। তৎপরেই আমি অচেতন হইয়া গেলাম।

প্রায় আধঘণ্টা পরে চৈতন্য হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, উঠান হইতে তুলিয়া আমাকে ঘরের দাওয়াতে শোয়ানো হইয়াছে, এবং দুই তিনজন লোক তার্পিন তেল দিয়া আমার গা মালিশ করিতেছে, বাবা আপনি তেল জোগাইতেছেন ও তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। আমি জাগিয়া 'মা মা' করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। শুনিলাম, তিনি আমাকে অচেতন হইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ির নিকটস্থ জংগলে গিয়া পড়িয়া আছেন। আমার

চেতনা হইবামাত্র লোকে তাঁহাকে আনিবার জন্য গেল। একজনের পর একজন গেল, তিনি কাহারও কথাতে বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন, "কৃষ্ণচরণ নাপিত যদি আসিয়া বলে যে ছেলে বেঁচে আছে, তবে আমি যাব, আর কারও কথাতে যাব না।"

এই কৃষ্ণচরণ নাপিত পাড়ার একজন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন তিনি বড় ভক্ত ও ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন। পাড়ার লোকে তাঁহাকে 'ভক্ত কৃষ্ণচরণ' বলিয়া ডাকিত। সেই রাত্রে কৃষ্ণচরণের নিকট লোক গেল। বৃদ্ধ লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে আসিলেন, এবং আমার সহিত কথা কহিয়া মাকে ডাকিতে গেলেন। মা তাঁহার কথা শুনিয়া জঙ্গল হইতে উঠিয়া আসিলেন, এবং "বাবার, তুই কি আছিস্?" বলিয়া আমার শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে, আমার যখন চেতনা হইল, তখন আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ জেঠামো করিয়া বলিতে লাগিলাম, "আমি মেজদাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম, মারামারি করেছিলাম, দোষ হয়েছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু লঘুপাপে এত গুরুদণ্ড দেওয়া বাবার পক্ষে কি ভালো হয়েছে? আমার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাড়িতে রয়েছে, পাশেরবাড়িতে কুটুম্বরা এসেছে, তাদের সম্মুখে এত মারা কি বাবার পক্ষে ভালো হল?" এই কথা বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইলাম, বাবা অদূরে মাটিতে নাক ঘসিয়া নাকে খৎ দিতেছেন। (৪৮—৫১ পৃষ্ঠা)

পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং মাতা গোলকমণি এই গ্রন্থের উজ্জ্বলতম সম্পদ। বিশেষ কোরে পিতা হরানন্দ। শিবনাথ যখন পিতার কাছে এই সংবাদ প্রেরণ কোরলেন যে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন এবং উপবীত ত্যাগ কোরেছেন তখন

"পিতাঠাকুর মাতুলের পরামর্শ শুনিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন এবং প্রায় একমাস কাল আমাকে এক প্রকার নজরবন্দী করিয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে উপবীত ত্যাগ তখন তৎপ্রদেশে নূতন কথা, কেহ কখনো শোনে নাই। সুতরাং এই সংবাদে সমুদয় গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন কি, দুই চারি ক্রোশ দূর গ্রামের চাষার মেয়েরা পর্যন্ত আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহারা তখন আমার বিষয়ে কি ভাবিত, তাহা ভাবিলে এখন হাসি পায়। একদিন প্রাতে বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় কয়েকটি চাষার মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিঃশ্বাস পড়ে কি না পড়ে তন্মনস্ক! আমার হস্ত-পদের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি যখন বলিলাম, "মা, একট তেল

দাও, নেয়ে আসি,” তখন একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, “মা ঠাকুরুণ, কথা কয় ?” মা বলিলেন, “কথা কবেনা কেন ?” শুনিয়া আমার ভয়ানক হাসি পাইল।... আর একদিন একটি স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক আসিয়া দেখেন যে আমি মুড়ি খাইতেছি। দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “ও মা, এই যে মুড়ি খায়, কে বলে আমাদের মধ্যে নাই ?”

যাহা হউক, বাবা আমাকে মাসাধিক কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।··· শেষে বাবা আর আমাকে আবদ্ধ রাখা বিফল বোধে আমাকে বিদায় দিলেন।.... তিনি অতি সহৃদয় মানুষ ছিলেন। তাঁহার ভিতরে নীচতা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র দিয়া নিজ ব্যয়ে আমাকে কলিকাতা পাঠাইলেন। তখন বুঝি নাই যে, আমাকে জন্মের মতো বর্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। সেই অবধি ১৮ কি ১৯ বৎসর আমার মুখ দর্শন করেন নাই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। ..

··· কিন্তু আমি জননীর জন্য বাড়ীতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না।···আমার পিতার ইচ্ছা নয় আমি গ্রামে পদার্পণ করি। আমি তাঁহাকে গোপন করিয়াই তাঁহার অনুপস্থিতকালে বাড়ীতে যাইতাম। তিনি লোক-মুখে আমি মার কাছে গিয়াছি শুনিলেই, আমাকে প্রহার করিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করিয়া লইয়া আসিতেন। পাড়ার ছোট ছেলেরা আমাকে বড় ভালোবাসিত। বাবা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেছেন দেখিলেই তাহারা গোপনে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে সংবাদ দিয়া যাইত, আর অমনি আমি মাতার চরণধূলি লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পলাইতাম।... আমি পরে শুনিয়াছিলাম, বাবা এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবার জন্য ২২৲ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে আমাকে মারিবার জন্য ২২৲ টাকা ব্যয় সামান্য প্রতিজ্ঞার কথা নয়। বাবার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা আমাতে কিছু অধিক মাত্রায় থাকিলে ভালো হইত।” (পৃঃ ৯৭—৯৮)

নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কেউ গোপনে বানচাল কোরতে উদ্যোগী হোলে হরানন্দ ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য পোড়তেন তার দৃষ্টান্ত :

“আমি যখন ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলে কর্ম করি, তখন আমার মধ্যম ভগিনীর বিবাহ হয়। সে সময়ে আমি বিবাহ ব্যয়ের সাহায্যার্থ গোপনে মায়ের হাতে কিছু টাকা দিয়াছিলাম। পরে শুনিলাম যে, বাবা তাহা জানিতে পারিয়া এতই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঘরের চালে আগুন দিয়াছিলেন, পাড়ার লোকে আসিয়া নিবাইয়াছিল।” (পৃঃ ২০৫)

অপরদিকে হরানন্দ যে কতো সদাশয় ও পরোপকারী, উদার ও সন্তানবৎসল ছিলেন তারও একাধিক নজীর এ বইতে মজুদ রয়েছে।

আত্মচরিতকার হিসেবে শিবনাথের মস্ত সৌভাগ্য এই যে, নানা রকম দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার অভিঘাত সারা জীবন বিচিত্র পথে এসে তাঁর মর্মে হানা দিয়েছে। সমাজ ও ইতিহাসের চোখে তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিকথা সাধারণ মানুষের পারিবারিক উত্থান-পতনের গ্লানি-বিপর্যয়ের শোনিত ধারায় উজ্জীবিত। যতখানি তা ব্যক্ত হোয়েছে, ততখানিই কীর্তিমান পুরুষ অন্তরংগ সুহৃদে পরিণত হোয়েছেন। শিবনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এই মনের কথা, দেহ-মনের কথা, তাঁর সাধ্যমতো বোলতে চেষ্টা কোরেছেন। স্বভাবগত 'আধ্যাত্মিক শুচিবাই'কে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কোরতে সমর্থ হননি বটে, কিন্তু প্রধান কীর্তি সমূহের মূল্যবান দলিলের ফাঁকে ফাঁকে মানবীয় বিকারের এই পরিমিত স্বীকারোক্তি ইতিহাসকে স্পৃহনীয় কোরে তুলেছে। বর্ণিত চরিত্রের মূলগত গৌরব তাতে কোথাও বিকৃত হয় নি, পাঠকের শ্রদ্ধাবোধ কখনো পীড়িত হয় নি। মীর সাহেবের জীবনেও রোমাঞ্চকর নাটকীয় ঘটনার অভাব ছিল না। আমার জীবনীর মুখ্য এবং একমাত্র অবলম্বনই হোলো মীর সাহেবের প্রথম প্রেমের মর্মান্তিক শোকাবহ অভিজ্ঞতা। কিন্তু তার পটভূমি নির্দেশ, তার ঘনায়মান জটিলতার প্রস্তুতি, তার পরম মুহূর্তের ট্র্যাজেডির ব্যাখ্যান সবই এতটা উদ্দামতা, নাটকীয়তা ও অতিকথনের মাধ্যমে পরিবেশিত যে তাকে সকল সময় ঠিক আত্মজীবনীর এখতেয়ারভুক্ত বলে মনে হয় না। রচনাকারীর জীবনের অপরিহার্য যশ খ্যাতি-দীপ্ত মহত্ব দৃশ্য অদৃশ্য সূত্রে হৃদয়ের গোপন লীলার সংগে আগাগোড়া গ্রথিত নয় বোলে, আবেদন অনেক ক্ষেত্রে নিছক শিহরণমূলক এবং উপন্যাসোচিত। মীর-মানসের একটি প্রধান ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হোয়েছে সপত্নীবাদকে কেন্দ্র কোরে। এই বিষবৃক্ষ যেন মীর পরিবারের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে হলেও শিবনাথের গার্হস্থ জীবনের বিক্ষোভের মূলেও জায়া। দুই পত্নী। প্রথম পত্নী যখন সম্ভবত অষ্টাদশবর্ষীয়া তন্বী তখন শিবনাথের পিতা কোনো কারণে পুত্রবধুকে জীবনের মতো তার পিতৃগৃহে নির্বাসিত রাখার সংকল্প নেন এবং শিবনাথকে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ কোরতে বাধ্য করেন। উভয়ের প্রতি নিজের আচরণে টানাপোড়েন, প্রচারিত অধ্যাত্ম আদর্শ ও মানবোচিত স্বভাবের বিপরীতমুখী

তাগাদায় জর্জ্জর হোয়ে শিবনাথ অনেক নিঃসংগ বিনিদ্র রজনী যাপন কোরেছেন। তার কিছু কিছু কথা শিবনাথ বলেছেন সংকোচের সংগে, শংকার সংগে। অতি পরিমিত আকারে। অতি নিম্ন কণ্ঠে।

> আমার পত্নিদ্বয় ঘটিত যে সকল সংগ্রাম গিয়াছে সে বিষয়ে তাঁহাকে (দুর্গামোহন দাস) অনেক কথা বলিলাম, এসকল বলিতে লজ্জা হয়। জগদীশ্বরের মহিমা! আমি অতি দুর্বল, তিনি আমাকে বিনয়ী রাখুন।[৩৪]

একুশ বৎসরের শিবনাথ তাঁর বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ও বন্ধুপত্নী মহালক্ষ্মীর সংগে নানা রকম পরামর্শের পর স্থির করেছিলেন

> যে আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনীকে আনিয়া পুনরায় বিবাহ দিব। তখনও আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি একবার তাঁহাকে আনিতে যাই। তখন তিনি ১১।১২ বৎসরের বালিকা। বোধ হয়, আমার পিতামাতার পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহারা পাঠাইলেন না। যাহাকে বিবাহ দিব ভাবিতেছি, তাহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করা কর্তব্য নয় বলিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতাম না। (পৃষ্ঠা ৭৯।)

পত্নীকে পুনর্বার বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

> "আমি কর্তব্যবোধে ১৮৭২ সালের মধ্যভাগে বিরাজমোহিনীকে আনিতে গেলাম।...প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া তাঁহাকে আনিতাম গেলাম। আনিয়া আশ্রমে প্রসন্নময়ীর সহিত রাখিলাম। বিরাজমোহিনীর বয়স তখন ১৪।১৫ বৎসর হইবে। বিরাজমোহিনীকে বলিলাম, "আমি যে এতদিন তোমাকে পত্নীভাবে গ্রহণ করি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও, করিতে দিব। আর যদি লেখাপড়া শিখিয়া কোনো ভালো কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে, এজন্য তোমাকে স্কুলে দিতেছি। তুমি এখন লেখাপড়া কর।" এই বলিয়া তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়! তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, "মা গো! মেয়েমানুষের আবার কবার বিয়ে হয়! ."তাঁহার ভাব দেখিয়া, পুনর্বিবাহের প্রতি দারুণ ঘৃণা দেখিয়া, আমার এতদিনের পোষিত মাথার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল। ...আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় প্রস্তাবই কার্যে পরিণত করিতে হইবে।
>
> কিন্তু আর একদিক দিয়া আমার আর এক পরীক্ষা উপস্থিত হইল। প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী যখন এক ভবনে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ আমি বিরাজমোহিনীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিতে বিরত রহিলাম, তখন প্রসন্নময়ী

হইতেও সেই সময়ের জন্য আমার স্বতন্ত্র থাকা উচিত বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহার সংগে বহুদিনের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তৎপূর্বে হেমলতা, তরঙ্গিনী ও প্রিয়নাথ তিনজন জন্মিয়াছে। কিন্তু আশ্রমে স্নুলঘর ও কেশববাবুর আপিস ঘর ভিন্ন অধিক বাহিরের ঘর ছিল না। রাত্রে প্রসন্নময়ীর ঘরে না শুইলে শুই কোথায়? দূরে গিয়া থাকা আমার পক্ষে সংগ্রামের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নময়ীর পক্ষেও তাহা অতীব ক্লেশকর হইল। অবশেষে প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া বিদায় লইয়া এখানে ওখানে শুইতে আরম্ভ করিলাম।...শুইবার স্থানাভাবে কলেজের বারাণ্ডায় পড়িয়া থাকি শুনিয়া প্রসন্নময়ী কাঁদিতে লাগিলেন। বিরাজ-মোহিনী মনে করিলেন তিনি এই সমুদয় কষ্টের কারণ, ইহা ভাবিয়া ঘোরবিষাদে পতিত হইলেন, তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। (১১২-১১৩ পৃষ্ঠা)

আরো কিছুদিন পর :

একদিন কেশব বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার দুই পত্নীকে যেভাবে আশ্রমে রাখিয়াছি, তাহা আর চলিবে না। তিনি ভয় করেন যে, বিরাজমোহিনী আত্মহত্যা করিবেন, যদিও আমার মনে সে প্রকার ভয় ছিল না, কারণ আমি কলিকাতায় আসিলেই তাঁহাকে বুঝাইতাম। যাহা হউক অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, প্রসন্নময়ী আমার সঙ্গে হরিনাভিতে থাকিবেন এবং বিরাজমোহিনীকে আশ্রম হইতে অন্য কোথাও রাখা হইবে, আমি শনিবারে সেখানে আসিয়া রবিবার তাহার সঙ্গে যাপন করিব।..

...বিরাজমোহিনী আমা হইতে বিযুক্ত হইতে চাহিলেন না দেখিয়া এই স্থির করিলাম যে, যখন তিনি ও প্রসন্নময়ী একত্রে থাকিবেন, তখন আমি উভয় হইতে বিযুক্ত থাকিব, আর যখন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে পরস্পর হইতে পৃথক থাকিবেন, তখন পতিভাবে মিলিব। তদনুসারেই কার্য আরম্ভ হইল। প্রসন্নময়ীর জীবিতকালে বহু বৎসর এই প্রণালীতে কার্য চলিয়াছে। (পৃঃ ১১৮—১১৯)

তারপর আরো পরিণত বয়সে :

আমি কিছুদিন মুঙ্গেরে থাকিয়া পরিবারদিগকে সেখানে রাখিয়া কলিকাতার কর্মস্থানে আসিলাম। এই সময় হইতে প্রসন্নময়ী ও বিরাজমোহিনী একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আমিও পূর্ব নিয়মানুসারে তাঁহাদের উভয় হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে লাগিলাম। এই সংগ্রামে অনেকদিন গিয়াছিল। (১৪০—১৪১)

অর্ধ শতাব্দী পরে আমাদের আধুনিক কালের অব্রাহ্ম পাঠক এই সংগ্রামের বিস্তৃততর ইতিহাস আরো অকুণ্ঠিত স্পষ্টতার সঙ্গে বিবৃত হোলনা বলে আক্ষেপ কোরতে পারেন কিন্তু অস্বীকার কোরতে পারবেন না যে, যা বর্ণিত হোয়েছে, তার মূল্য বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায় অপরিসীম।

বার

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ, পুরাতন প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩২০॥

বিপিন বিহারী গুপ্তের পুরাতন প্রসঙ্গ প্রধানত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মনের কথা। এই বই প্রকাশিত হবার পর আরো উনিশ কুড়ি বছর উনি বেঁচে ছিলেন। কৃষ্ণকমল মারা যান ইং ১৯৩২ এ, বিরানব্বুই বৎসর বয়সে। "তিনি ছিলেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য উভয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর, ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। স্মৃতি ও ব্যবহার শাস্ত্রে তিনি কৃতবিদ্য। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিদ্বজ্জন সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্র সমাজে পূজ্য ছিলেন। সকল খ্যাতির উপর ছিল তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার স্থান, তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা হইতে এক তিলও বিচ্যুত হইতেন না। এই দৃঢ়সংকল্প, পরিমিতভাষী, তীক্ষ্ণধী পুরুষ জীবিতকালে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগর থেকে শুরু কোরে দ্বিজেন ঠাকুর পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর এমন কোনো স্বদেশী বিদেশী কৃতি পুরুষ নেই যাঁর সান্নিধ্য ও সংঘাত কর্ম বা চিন্তা ক্ষেত্রে তিনি তীব্র ভাবে উপলব্ধি না কোরেছেন। এই কারণে এই গ্রন্থে যে রীতিতে আত্মমানস বর্ণিত হয়েছে, যে রসে তা ভরে উঠেছে সেটা রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতের সংগে তুলনীয়। কৃষ্ণকমলের আত্মকাহিনী, বলা বাহুল্য, ব্যক্তি জীবনের কালানুক্রমিক অভিজ্ঞতার উদঘাটন নয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের সূত্র ধোরে আলোচনা প্রসংগে নিজের ও যুগের চিন্তার নানা উজ্জ্বল ছবি তিনি এঁকেছেন। আশপাশের মানুষেরা রক্তমাংসের সজীবতা নিয়ে সেই তত্ত্বালোচনায় বাস্তব জীবননাট্যের প্রাণ সঞ্চারিত কোরেছে। পুরাতন প্রসঙ্গে এই জন্যে খুব সংগত কারণেই পুরাতন কালের বহু সংখ্যক মনীষীদের নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকাকে সূচিপত্রের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যদিও কোঁৎ ও মিলের জীবনচিন্তার অন্তরংগ বিশ্লেষণ কৃষ্ণকমলের জীবনদর্শনকেই ব্যক্ত কোরেছে, তবু আমরা এই গ্রন্থের যে সকল অংশ সমূহ পাঠ কোরে সবচেয়ে বেশী হৃদস্পন্দনের দ্রুতি অনুভব কোরি সে হোলো যেখানে লেখক নিজের ধ্যান ধারণার সংগে আমাদের অতি পরিচিত সেকালের কোন চিন্তানায়কের জীবনবোধের সম্পর্ক বিচার কোরেছেন। যেমন

বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না, যাহারা জানিতেন তাঁহারা কিন্তু সে বিষয়ে লইয়া তাঁহার সংগে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্য পরিহাস্য করিতেন, ললিত সে সময়ে যেন কতকটা যোগসাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "হা রে ললিত, আমারও পরকাল আছে না কি?" ললিত উত্তর দিতেন, "আছে বৈ কি! আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কার?" বিদ্যাসাগর হাসিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন আরম্ভ হয়, যখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল, যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাংলাদেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের নিজ নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই, ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason এর পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এ দেশীয় ছাত্রের ধর্ম্মবিশ্বাস টলিল, চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আমার এই পূর্ব্বস্মৃতি বিবৃতি করিতে বসিয়া যাহাদের কথা তোমাকে বলিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন নাস্তিক ছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল, কবি বিহারিলাল, জজ দ্বারকানাথ।......

আমি Positivist, আমি নাস্তিক। যে কথা লইয়া এই পুরাতন প্রসংগ বিবৃতির সূত্রপাত হয়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কথাটি আজ এতদিন পরে মনে পড়িতেছে,—"কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক, he can write and he can fight, and he can slight all things devine (২২৮-২৩০ পৃষ্ঠা)

এই পর্য্যায়ের জীবন চিত্রণের মধ্যে কৃষ্ণকমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পুনর্সৃষ্টি বিদ্যাসাগর ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের জীবনাচরণ ও সাহিত্য-প্রীতি যে সমালোচনার ঊর্ধে নয়, এরকম কঠিন কথা সেকালে কেনো একালেও এত স্বল্পশ্রুত যে, এই অংশের আবেদন তীব্ররূপে চাঞ্চল্যকর না হোয়ে পারে না। কয়েকটি উদ্ধৃতি :

বিদ্যাসাগরের মুখের বুলি ও লেখার ভাষা :

কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জনসনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। যেকলে ডাঃ জনসন সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় তোমার মনে আছে। যিনি লিখিবার সময় গম্‌গমে Johnsonese ও Latinism ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, কিন্তু লোকের সঙ্গে মজলিসে কথা কহিবার সময় এমনকি বাংলা Slang শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—'ফ্যাপাচুড়ো খাওয়া', (to be confounded), 'দহরম মহরম', 'বনিবনাও', 'বিধঘুটে', 'বাহবা লওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। যাহাকে সাধুভাষা বলে তিনি সেদিকেই যাইতেন না। 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয় শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার Style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে, সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সাধারণ কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ। একটা উদাহরণ দিয়া আমি বিষয়টা ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। 'মহাসমারোহে' এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে ব্যবহার করে, তিনিও সেই অর্থে সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন, অথচ সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি সমারোহ ও অর্থে ব্যবহৃত হয় না—ও কথার ও অর্থ হইতে পারে না, উহা একেবারেই ভুল।

একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি একটি বড় গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন,—কথাটি 'স্বরূপযোগ্যতা'। এই শব্দটি ন্যায় শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পারিভাষিক শব্দ; ইংরাজীতে ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়—Fitness per se। যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন সেটি এই—একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়াছিলাম, এমন সময় দ্বারবান আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ! আমরা এক দেশের লোক, একজাত, এই শহরের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার এসে দেখা করলেই পারতেন। সাহেবেরা যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠায় ত যাওয়া উচিত মনে করি, স্বদেশীর সঙ্গে আসা-যাওয়ার স্বরূপযোগ্যতা আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই।' অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যান নাই।

আজকাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন এক জন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দিতে জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম। আগন্তুকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যাসাগর কথা কহিতে কহিতে aside আমাকে বলিলেন—'এদিকে কথায় কথায় কোষ্ঠ-শুদ্ধি হোচ্চে, তবুও হিন্দি বলা হবে না!' (পৃঃ ৪৭—৪৯)

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের পরশ্রীকাতরতা ঃ

বিদ্যাসাগরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্য গঠনে কি প্রকার বিকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখ, আমার মনে হয় যে যেমন জগৎ-সংসারে তেমনই ভাষার মধ্যেও একটা natural selection আছে, নহিলে শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ শর্ম্মা, যাঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের—আমাদের যে নূতন বাংলা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের,—এক একটি দিক্‌পালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত, তাঁহারা কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, একা বিদ্যাসাগরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল!

শ্যামচরণ সরকার ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, ল্যাটিন ও গ্রীক জানিতেন। পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণ-কারের ভাষায় ভরতশিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—অষ্টাদশভাষাবার-বিলাসিনীভুজংগঃ (the fancyman of eighteen courtezans of Languages)। শ্যামাচরণ বাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, তখন ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসিকলাল সেন। শ্যামাচরণ বাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল, কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণ বাবু আর মাথা তুলিতে পারিলেন না।...

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের ইংরাজী তর্জমা লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন।... বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁহাকে

মোটেই দেখিতে পারিতেন না, কেবল বলিতেন, 'লোকটার রকম দেখেছ? টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে।'

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন, 'ও লোকটা ইংরেজীতে একজন ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখতে মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—'ইংরাজী আমি যৎসামান্য জানি, যদি কিছু আমার জানা-শুনা থাকে তা সংস্কৃত শাস্ত্রে।' ইহাতে সাহেবরা মনে ভাবেন—বাসরে, ইংরাজীতে এত সুপণ্ডিত হোয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃততে এর কতই বিদ্যে আছে!' এইরূপ কোনও আসরে বিদ্যাসাগরের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি কোনও পদস্থ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মত বুদ্ধিমানও নেই, নির্ব্বোধও নেই, তোমরা যে বুদ্ধিমান, তাহা বলা বাহুল্য, তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান, কিন্তু তোমাদিগকে নির্ব্বোধ এইজন্য বলি যে, আমাদের দেশের অকর্ম্মণ্য অনেক ব্যাক্তি তোমাদের কাছে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে, আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই।' রাজেন্দ্রলালের বিবিধার্থ সংগ্রহ কোথায় ভাসিয়া গেল!

ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিতেন,—সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাংলা ভাষার গঠন বিষয়ে কেহই সহায়তা করিতে পারে না। একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি কারতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু তাঁহার সুখ্যাতির মধ্যেও যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন—'অক্ষয় লিখতে টিখতে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয়।' কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দুজনের style, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (পৃঃ ৫০—৫৩)

বিদ্যাসাগরের খ্যাতির অপর পিঠ ঃ

বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহা নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের বাঙ্গালীর চরিত্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত 'সাহেবদের' নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙ্গালী মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে না বলি, কিন্তু মনে মনে যাহাদের বড় বলিয়া জানি, তাঁহাদের সিল মোহরের ছাপ না পড়িলে জিনিসের মূল্য হয় না।

> আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙ্গালীর সাহেবদের কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়। পূর্ব্বে আমি যে তাঁহার literary jealousyর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে এইরূপ একটা কারণ নিহিত ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্ব্বল্য ছিল, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। সাহেবদের নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না, তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে সাহেব সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।
>
> কালীপ্রসন্ন সিংহের দোষ নহে, পাইকপাড়ার রাজাদের দোষ নহে, দোষ দিতে হয় সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে দাও। Mrs. Besant হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা করিলেন, বাঙ্গালী গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবি যখন হিন্দুর তীর্থস্থানে হিন্দু কলেজ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, হিন্দু রাজন্যবর্গ টাকা ঢালিয়া দিল, প্রকাণ্ড কলেজ স্থাপিত হইল। এই যে ভাব, ইহা আমাদের জাতীয় অবনতির একটা প্রসব। (পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭)

কালীপ্রসন্ন, বংকিম, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ সম্পর্কেও অনেক উল্লেখযোগ্য উক্তি এ বইতে রয়েছে। বিহারীলাল যে 'যাবজ্জীবন' 'দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, খাড়া দেহ ও হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন' এবং 'সাহস ও অকুতোভয়তা তাঁহার যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালী জাতীর সেরূপ খুব কমই আছে'—একথাও বোলেছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। (১৭৩ পৃষ্ঠা)

এই গ্রন্থের আরেকজন কথক হোলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। অভিনেতার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে তিনি অতি সংক্ষেপে (১২৫-১৬২ পৃষ্ঠা) বাংলা রংগমঞ্চের উন্মেষ ও বিকাশ ধারাকে জাজ্জ্বল্যমান কোরে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পুরাতন প্রসংগের লেখক বিপিনবিহারী গুপ্ত যদিও সকল প্রসংগের অন্তরালে আত্মগোপন কোরতে সক্ষম হোয়েছেন, তথাপি যেখানে তিনি স্বপ্রকাশ সেখানেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। ভূমিকা অংশের কয়েক পৃষ্ঠায়, আত্মকাহিনীমূলক রচনা পাঠের উৎকণ্ঠা ও আনন্দের স্বরূপকে প্রসংগক্রমে হলেও অতি চমৎকাররূপে ব্যক্ত কোরেছেন:

> কিন্তু যাহা হারাইয়াছে, এক একবার মাঝে মাঝে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত কুড়াইয়া আনিয়া একাগ্রভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে কি

হারাণর মধ্যে পাওয়া কাহাকে বলে বুঝিতে পার কি? একদিন সন্ধ্যাকালে অথবা প্রভাতে মেছোবাজার ষ্ট্রীটের যে একতলা বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রথমে বাস করিতেন, সেই বাড়িটি খুঁজিয়া বাহির করিবে কি? সেখান হইতে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ির যে ঘরটিতে বিদ্যাসাগর থাকিতেন, সেই ঘরটি দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয় কি? সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অবস্থায় কলেজের যে ঘরটিতে বাস করিয়া ছিলেন, সেই ঘরটি কি বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বক্ষে করিয়া এখনও দণ্ডায়মান নাই? তাঁহারই ঘরের সম্মুখে যে মাটি তিনি নিজে কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তির আখ্ড়া করিয়াছিলেন, যে মাটি তিনি নিজে গায়ে মাখিয়া কুস্তি করিতেন, সেই ভূমির সেই পবিত্র মাটি মস্তকে করিয়া একটু লইয়া আসিবে কি? সেখানে এখন মাটি আছে ত, সমস্ত জায়গাটা কঠিন পাষাণবৎ সানবাঁধান হইয়াছে? সেই মাটি মাখো, মাটি মাখো। গ্রীকপুরাণের অসুরের মত সে মাটি স্পর্শ করিলেই নবীন বলে বলীয়ান্ হইবে, মাটি মাখো, মাটি মাখো। (১৩-১৪ পৃষ্ঠা)

তের

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্রোহে বাঙ্গালী, কলিকাতা ১৯৫৭॥

বিদ্রোহে বাঙ্গালী গ্রন্থে বাংগালী সিপাহী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলী বর্ণনা কোরেছেন। "সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলীকে উপজীব্য করিয়া সেকালে যে কয়জন দেশীয় লেখক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাশীর সৈয়দ আহমদ খান, কানপুরের নানক চাঁদ, এলাহবাদের ভোলানাথ চন্দর এবং বাংলা দেশের দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।" পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত জন্মভূমি মাসিক পত্রিকায় বইটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের কাল ১২৯৮ থেকে ১৩০৩। তখন রচনাটির নাম ছিলো আমার জীবন। নাম যাই থাক না কেনো গ্রন্থখানি আদৌ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র জীবনের ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের কালে যে সব বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনা দুর্গাদাসকে বিচলিত ও অভিভূত কোরেছে আশ্চর্য কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা ও পুংখানুপুংখতার সংগে এ বইতে তা বর্ণিত হোয়েছে।

আলোচ্য সংস্করণের (১৯৫৭ ইং) পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৪১৮। ৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিদ্রোহ-পূর্ব ও বিদ্রোহ-বহির্ভূত বিষয়ের বর্ণনা। দুর্গাদাসের সামাজিক পরিচয়, সেনাবাহিনীর গঠনপ্রকৃতি (পৃঃ ৫০-৬৩) এবং বাজার দর সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য এই অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রসংগত বর্মা মুলুকের মগ (পৃঃ ২১-২৯) ও নাইনিতাল কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ নর্তকী সম্প্রদায় (রাংজানি) সম্পর্কে (পৃঃ ৬৩) অনেক সূক্ষ্ম সরস ও অজানিত কথা বলা হোয়েছে। এর পর বিদ্রোহের কথা। আট সংখ্যক ইররেগুলার অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের হিসাবরক্ষকের চাকুরী নিয়ে দুর্গাদাস সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। রেজিমেণ্টের সংগে ১৮৫৭তে দুর্গাদাস যখন বেরিলীতে এসে পৌঁছুলেন তখন চারিদিকে আসন্ন বিদ্রোহের উত্তাপ ও উৎকণ্ঠা ভালোভাবে অনুভব করা যাচ্ছিল। বিদ্রোহের প্রকৃত বিস্ফোরণ হোলো রবিবার, ৩১এ মে। এই বিদ্রোহে বিপর্যস্ত এলাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত, তার প্রবল আঘাতে চালিত ও তাড়িত দুর্গাদাস যেনো বিদ্রোহের এক ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অবিচ্ছেদ্য অংগ। দুর্গাদাস বিদ্রোহের বাহ্য ঘটনাবলীকে অতি নিকট থেকে দেখেছেন, অতি নিকটে থাকার জন্যে তার বিষাগ্নির আঁচ এড়াতে পারেন নি এবং এই নৈকট্য তাঁর ইংরেজমুগ্ধ বীর হৃদয় এক মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল না বোলেই বিদ্রোহের জটিলতম ঘটনাবর্ত ও তরংগাভিঘাতের সংগে অনিবার্যভাবে যুক্ত থেকে একাধিক ক্ষেত্রে তার মর্মদেশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিদ্রোহের প্রথম দিবস বর্ণিত হয়েছে ১০৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। তৃতীয় দিনের বর্ণনা শেষ হয়েছে ১২৩ পৃষ্ঠায়।১৩৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চতুর্থ দিনের কথা। এমনি করে, ১৪ই জুন পর্যন্ত বেরিলীর মুসলিম সিপাহী ও অভিজাত নাগরিক, হিন্দু বেনে, শেঠ, সন্ন্যাসী, সৈনিক ও ইংরেজ শাসক সেনাপতিবর্গের দশা-দুর্দশার কথা দুর্গাদাস পরিণত চাতুর্যের সংগে লিপিবদ্ধ কোরেছেন। প্রাথমিক সাফল্যের পর বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর দিল্লী যাত্রার উদ্যোগ পর্বে ১৭০ পৃষ্ঠায় বইয়ের ১ম খণ্ড শেষ। বিদ্রোহী শিবির থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে দুর্গাদাস আগষ্ট মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত বেরিলীতে থাকেন। ৩১৪ পৃষ্ঠায় দুর্গাদাস বর্ণনা কোরেছেন কি কোরে একের পর এক বিপদ অতিক্রম কোরে অবশেষে তিনি ইংরেজ শিবির নাইনিতালে গিয়ে পৌঁছুলেন। গ্রন্থের বাকী অংশে ইংরেজের কথা। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হোয়েও তাঁরা যে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন,

ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় কোরে কৌশলে বিদ্রোহীদের পরাজিত কোরেছেন, তার কাহিনী দুর্গাদাস দরদ দিয়ে বোলেছেন। বিদ্রোহ দমিত, গ্রন্থও সমাপ্ত। কাহিনীকারের শেষ বাণী :

> আবার বেরিলীতে ইংরেজের রাজত্ব বসিল। মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। কিন্তু আর না। অদ্য এইখানেই আমার জীবন-চরিত শেষ করিলাম। অবশিষ্ট জীবনী আর লিখিবার উপযুক্ত নহে। (পৃঃ ৪১৮)

দুর্গাদাস প্রভুভক্ত ইংরেজ ভৃত্য। স্বভাবতই তাঁর বর্ণনায় ইংরেজ প্রীতি ও ইংরেজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক্ষেত্রবিশেষে লজ্জাহীন। তবু প্রশংসার বিষয় এই যে, দুর্গাদাস তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। বেরিলির ফজলুল হককে গুণ্ডা ও বদমায়েশ বলেছেন বটে (পৃঃ ১১৪), কিন্তু পরে তাঁর যে জীবন বৃত্তান্ত পেশ কোরেছেন তা থেকে আমরা স্বতন্ত্র সীদ্ধান্তেও পৌছুতে পারি (পৃঃ ১৭৬)। বিদ্রোহী সেনাবাহিনীদের উন্মাদনাকে ঘৃণ্যবর্ণে চিত্রিত কোরেও স্বীকার করেছেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (পৃঃ ১৬৯, ১০০)। বেরিলিতে বিদ্রোহীরা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যে সকল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাতে হিন্দু ধনপতি ও রাজনীতিবিদদের কেউ কেউ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ কোরেছিলেন। ইংরেজের দাস দুর্গাদাস যে সর্বত্র সিপাহীর আন্দোলনকে নিছক মুসলিম সিপাহী ও মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর হেয় ষড়যন্ত্ররূপে বিচার করেন নি, তাঁর পক্ষে এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়! দুর্গাদাসের মানস-প্রকৃতি ছিল নাগরিক, সৌখিন, মজলিসী। নিজের অবশ্যকরণীয় নওকরী ছাড়াও তিনি নর্তকীর কদর কোরতে জানতেন, নানারকম সংগীতের রসজ্ঞ সমজদার ছিলেন, জাতিধর্ম নির্বিশেষে কলাবিলাসী নাগরিকদের আদর আপ্যায়নে তুষ্ট রাখতেন। হিন্দু বাংগালী সিপাহী এতো ষোল আনা ইংরেজের গোলাম হওয়া সত্বেও জীবনের বিচিত্র রসের পিপাসা ও আস্বাদন দুর্গাদাসের রোজনামচাকে সর্বজন-পাঠ্য সাহিত্য-কর্মের মর্যাদা দান কোরেছে। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা, গোলা বারুদের বিস্ফোরণ ও রণনীতির নিষ্ঠুরতার অন্তরালে যে সকল মানবিক দ্বন্দ্বশঙ্কা, প্রেম-উৎকণ্ঠা স্বতন্ত্র নিয়মে ক্রিয়াশীল ছিলো তার অপকট স্বীকারোক্তিও এখানে একাধিকবার লক্ষণীয়।

দুর্গাদাস বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা কোরতে অস্বীকার করায় “বখ্‌ত খাঁ যেন হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভীষণ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, ‘ইংরেজ আওর

বাঙ্গালী সব এক হ্যায়। তুমকো নেহি মালুম হ্যায়, কি, হাম আভি তুমারা গরদান কাটনেকো হুকুম দে সকতে হেঁ। নিমক হারাম! বেইমান! হাজার রূপেয়া তনখা ভি কবুল নেহি করতা? খুব মালুম হ্যায় কি ইংরেজকা সাথ তুমহারী সাজিস হ্যায়।'' (পৃঃ ৯৪) কিন্তু বিদ্রোহী সেনাদলের দ্বিতীয় অধিনায়ক মহম্মদ সফী নিজের ব্যক্তিগত ওয়াদা রক্ষা কোরতে তবু পশ্চাদপদ হন নি। তাঁর কল্যাণে দুর্গাদাসকে সাধারণ কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হোল না। বিদ্রোহী সৈনিকদের পর্যন্ত যা জোটে নি সেই আটা, ঘি, হিন্দু-রক্ষী মারফৎ লাভ কোরলেন। মহম্মদ সফীর সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে পলায়নে পর্যন্ত সমর্থ হোলেন। এরকম একবার নয় কয়েকবার ঘটেছে। নাইনিতালে ইংরেজের সংগে মিলিত হওয়ার প্রাক্কালে আরেকবার তিনি হলদোয়ানিতে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়েন।

> পূর্বোক্ত সর্দ্দারের আর দুইজন সওয়ার আমাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফজল হকের সম্মুখে সমানীত করিয়া সকল বৃত্তান্ত একে একে বিবৃত করিল। তিনি কোন কথার উত্তর করিলেন না। কেননা, তখন তিনি জানু পাতিয়া মালা হস্তে 'ওজিফা' পড়িতে ছিলেন। তাহারা আমাকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মৌলবী ওজিফা সমাপ্ত করতঃ দুইটি হস্ত একবার আপনার মুখে দিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে আরক্ত-লোচন, সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ শুকাইয়া গেল। কিন্তু ব্যাকুলতা বা অধীরতা স্বীকার করিলাম না। মৌলবী অতি পরুষ এবং জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—'তু কোন হ্যায়?' আমি ইতিপূর্বে বিদ্রোহী সৈন্যদের নিকট যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলাম, এখানে তাহাই বলিলাম। কিন্তু তিনি তাহা বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, 'তুঁ আপনে তঁই চাপরাশী বানাতা হ্যায়—সব ঝুঁটা বাত হায়, চাপরাশীকা গুপ্তগু এইসী সলিব নেহী হোতী হ্যায়। তুঁ কাফরোঁকো রসদ পৌঁছতা হ্যায়। লে অব উসকা মজা চখ্।' এই বলিয়া সর্দ্দারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'ইসকো কল ফজর তোপমে উড়া দেও।' (পৃঃ ২১৯)

সে রাতেও মুসলমানস্পৃষ্ট পানি পান করতে অস্বীকার করায় হিন্দু বাহকের হাত দিয়ে দুধ জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। 'বুঝিলাম সত্য সত্যই মুসলমানের আমার উপর দয়া হইয়াছে।' (পৃঃ ২২৫) পরদিন সকালে

> আমি যে স্থলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছিলাম, সেই স্থলে নবাব সাহেব দুই জন অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া আসিলেন। তিনি আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি আমাকে উত্তম রূপ দেখিবার

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এক জন প্রহরী আমার বন্ধন শিকলসমূহ শিথিল করিয়া ভীমরবে কহিল 'খাড়া হো যাও।' আমার ওষ্ঠাগতপ্রাণ, উত্থানশক্তি এক রকম রহিত। কিন্তু কি করি, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম এই বুঝি তোপে উড়াইবার বা নাসা কর্ণচ্ছেদের হুকুম হইল। দুর্গতিনাশিনী দেবী জগদ্ধাত্রীর নাম কেবল মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সেই নবাব—সেই গভর্ণর—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আমাকে মধুর রবে তখন জিজ্ঞাসিলেন, 'বাবু সাহেব! আপ হিয়া ক্যায়সে আয়ে?'··· (পৃঃ ২২৬)

তাঁহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আমার চক্ষুকোণে জল আসিল। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। ক্রমশঃ গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সৌম্যমূর্তি নবাবসাহেব ধীরে ধীরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন, 'বাবু সাহেব! কাঁদিবেন না, বড়ই সংকট কাল। চোখের জল শীঘ্র মুছিয়া ফেলুন। কি হইয়াছে, কি ঘটিয়াছে, আমাকে সংক্ষেপে শীঘ্র বলুন।' আমি মৌলবী ফজল হকের নিকট চাপরাশী বলিয়া যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলাম, সেই কথা বলিলাম এবং পথের অন্যান্য সকল সংবাদ তাঁহাকে কহিলাম। শেষে অতি বিনীতভাবে জানাইলাম, আমাকে এ যাত্রা আপনি রক্ষা করুন।

নবাব সাহেব আমাকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'বাবু সাহেব! পহিলে মেরা গরদান হোই কাটেগা, পিছে আপ্‌কা। আপ্ কুছ ফিকির (চিন্তা) না করিয়ে।' অন্য কেহ শুনিতে না পায়, এরূপ অস্ফুটস্বরে তিনি আমাকে এই কথাগুলি বলিলেন।··· (পৃঃ ২২৭।)

সেই চুন্না মিয়া আমার নিকট হইতে অতি দ্রুতপদে মৌলবী ফজল হকের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, 'আমি ঐ বাঙ্গীকে চিনি, ঐ ব্যক্তি ভাল মানুষ, বেরিলিতে চাপরাশীর কাজ করিত এবং সংগতিপন্ন ছিল। উহার ভ্রাতা নাইনিতালে আছে, ইহা আমি জানি। তাই ও ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে যাইতেছিল। রসদ পৌঁছিবার সংগে উহার কোন সম্পর্ক নাই। এ ব্যক্তি বিশ্বাসী এবং মুসলমান রাজ্যের মংগলাকাংক্ষী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি।' এইরূপ নানা কথা চুন্না মিঞা ফজল হককে বুঝাইয়া বলিলে, ফজল হক কহিলেন, 'হুজুর! আপ মালিক হ্যায় যো আপ জানতেহেঁ তো ছোড় দিজিয়ে।'··· (পৃঃ ২২৮)

আমার সেবার জন্য চুন্না মিয়া চারি জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা বাজার হইতে নববস্ত্র আনিয়া দিল। আমি স্নানান্তে বস্ত্র পরিধান করিলাম।

> দেখিতে দেখিতে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, চাল, ডাল, আলু, আটা ও অন্যান্য মসলাসমূহ আনীত হইল। মাটির উনান তৈয়ারি হইল।
>
> বলা বাহুল্য, আমার মুক্তির সংগে সংগে আমার প্রার্থনানুসারে টাট্টুওয়ালা ও সেই নবীন হিন্দুস্থানী যুবকেরও মুক্তিলাভ হয়। (পৃঃ ২৩১)

মুক্তিলাভ কোরে দুর্গাদাস ইংরেজদের সংগে যোগ দেন এবং বিদ্রোহ দমনে এক বিশিষ্ট সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি বা বদান্যতামূলক রণনীতিবিরুদ্ধ আচরণ ছাড়াও বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর দুর্বলতার ও ব্যর্থতার অনেকগুলো কারণ দুর্গাদাস গ্রন্থের নানা স্থলে উল্লেখ কোরেছেন। ক্ষমতালাভের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ব্যাপক বিশৃংখলা সেগুলোর মধ্যে প্রধান। যে অভিজাত শক্তি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণে তৎপরতা প্রকাশ করেন তাঁদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল মধ্যযুগীয়, নেতিবাচক। তাঁদের চারিত্রিক সত্ত্বও ছিল মজ্জাহীন। হলদোয়ানি-নাইনিতালের চরম সংগ্রামে বিদ্রোহীদল যে আত্মঘাতী অবাবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দেয় তা বর্ণনা কোরতে গিয়ে লেখক বলেন :

> এই সময় আট দশটি তোপ, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং আড়াই সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া বিদ্রোহিগণ যদি নাইনিতাল আক্রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে অনায়াসেই তাহাদের নাইনিতাল করতলগত হইত। ইংরেজ একটিমাত্র গোর্খা পল্টন লইয়া কিছুতেই তখন নাইনিতাল রক্ষা করিতে সক্ষম হইত না। নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ, বেরিলি হইতে প্রায় এগার হাজার সৈন্য নৈনিতাল আক্রমণার্থ পাঠাইয়াছেন। তাহারা কিন্তু হলদোয়ানি প্রভৃতি নানা স্থানে আড্ডা করিয়া বসিয়া আছে, কেবল শুভকালের প্রতীক্ষা করিতেছে। ... এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডায়, আলস্যে এবং উপেক্ষায় দিন কাটিতে নাইনিতাল আক্রমণ আর করা হইল না। (পৃঃ ৩২২)

রসদের অপ্রাচুর্য, পাহাড়ীয়া অঞ্চলের সুন্দরী নর্তকীদের নিয়ে সৈনিকদের মধ্যে হল্লা রেশারেশি, নেতৃবৃন্দের অন্যান্য দুর্বলতার সংঙ্গে যুক্ত হোয়ে, এই এলাকার বিদ্রোহীদের পতন আশু এবং অনিবার্য কোরে তুললো।

<u>বিদ্রোহে বাংগালীর</u> আবেদন মূলতঃ রোমাঞ্চকর। কি কোরে বাংগালী সিপাহী দুর্গাদাস বিদ্রোহের কবলে পড়ে বাড়ি ঘোড়া টাকা হারালেন (পৃঃ ৬৯-৭৮), বন্দী হলেন, মৃত্যুর দণ্ডাদেশে বধ্যভূমিতে নীত হয়েও মুক্তি পেলেন, পলায়নের পথে ঘোর নিশাকালে ভয়ানক অরণ্যে দিশাহারা হলেন (পৃঃ ২৪২-২৬৩),

ইংরেজ অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালনার ভার পেলেন, বিদ্রোহিদের নির্মম ভাবে নিশ্চিহ্ন কোরে দিলেন—এসকল লোমহর্ষক কথাই এই বইতে বর্ণময় রূপ লাভ কোরেছে। এই শিহরণমুলক কাহিনীর বুনটের ফাঁকে ফাঁকে দুর্গাদাস যে অপরিচিত জগতের মানুষ ও আচরণের প্রাণপুষ্ট স্মৃতিচিত্র এঁকে গেছেন বাংলা সাহিত্যে তার সমগোত্রীয় দৃষ্টান্ত বিরল।

নিছক সিপাহী বিদ্রোহের আলেখ্য হিসেবেও বইটি মূল্যবান। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাংগালী হিন্দু সিপাহী বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে নেকনজরে দেখতে পারে নি। এর মধ্যযুগীয়তা তাকে স্বাধীনতার এই প্রবল বিক্ষোভ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হোতে দেয় নি। মুসলিম শাসন সম্পর্কে বৈরীভাব ও তুলনায় পাশ্চাত্য শাসকবর্গ সম্পর্কে মোহ বিদ্রোহ প্রসংগে তাকে ব্যাকুল বা উদ্বিগ্ন হোতে দেয় নি। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনীতে মিউটিনী সম্পর্কে মাত্র সাড়ে তিন লাইন লিখেছেন ঃ

> জেলিয়াপাড়াতে যখন আমাদের বাস, তখন ১৮৫৭ সালে মিউটিনি ঘটে, এবং আমাদের কলেজ পটলডাংগা হইতে উঠিয়া গিয়া বহুবাজার রোডের তিনটি বাড়িতে থাকে। মিউটিনী থামিলেও ঐ স্থানে কলেজ কিছুকাল থাকে, তৎপরে নিজ আলয়ে উঠিয়া আসে। (পৃঃ ৩৫-৪৩)

রাজনারায়ণ বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা কোরেছেন। ইংরেজ এবং ইংরেজাশ্রিত হিন্দু নগরবাসী বিদ্রোহের বিস্ফোরণে কি পরিমাণ আতংকিত ও জ্ঞানহারা হোয়ে পড়েন উভয় গ্রন্থকারই তা সকৌতুকে বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনার পেছনে ইংরেজের প্রতি বক্র অনুকম্পা যেমন স্পষ্ট তেমনি বিদ্রোহিদের প্রতি অবিশ্বাসও দৃঢ়মূল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংগালী বুদ্ধিজীবীর জাতীয়তাবাদের চেতনায় বিচিত্র পর্যায়ে জাতিবৈরিতা কি অনুপাতে মিশ্রিত ছিল তার স্বরূপ নির্ণয়ে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাংলা রচনামাত্রেই বিশেষ সাহায্য করবে। বিদ্রোহে বাংগালী যে এ ক্ষেত্রে এক অতি প্রামাণ্য এবং বিস্তৃত দলিলরূপে গৃহীত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুর্গাদাস তাঁর আশপাশের নাগরিক ও সামরিক জীবনের গঠনপ্রকৃতি যে রীতিতে ব্যাখ্যা কোরেছেন তার সূক্ষ্মতা ও পুংখানুপুংখতার তারিফ অন্যত্র কোরেছি। তৎকালীন বাজার দর ও দুর্গাদাসের নিজস্ব ধন দৌলতের সংকেত বহনকারী একটি মাত্র দীর্ঘ উদ্ধৃতি নজীর হিসেবে পেশ কোরে বিদ্রোহে বাংগালীর বর্ণনা শেষ কোরব।

আমার বাটীতে মা-কালীর নামে প্রত্যহ একটী করিয়া ছাগ বলিদান হইত। দুই সের করিয়া মাছের বরাদ্দ ছিল। ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মাখন—এ সকল ঢালাও ছিল। খাইতাম আমরা দুই ভাই। এত বড়-মানুষি সত্ত্বেও যে মাসিক খরচ খুব বেশী হইত, তাহা নহে। তখন বেরিলিতে একশত সিক্কার ওজনে এক টাকায় আড়াই সের ভাল ঘৃত পাওয়া যাইত। আমার চাউল আসিত অতি উৎকৃষ্ট। পিলিভিটের নিউরিয়া নামক এক স্থান আছে, তথাকার চাউল প্রসিদ্ধ। মিহি চাউল লম্বা লম্বা দানা। সম্মুখে সেই চালের ভাত বাড়িয়া দিলে মল্লিকা ফুলের সুগন্ধে যেন সে স্থান আমোদিত করিত। সেই চালের মণ ছিল ৩৷৹ টাকা। এখন সে চাল ১২৲ টাকা মণেও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। রাশি চাল ১৷৹ টাকা বা ২৲ টাকা মণ ছিল। উৎকৃষ্ট আটা ১৲ টাকায় ৩২ সের পাওয়া যাইত। খাঁটী দুধ টাকায় ৩০ সের। বাজারে দুধ (মহিষের) এক পয়সা সের। হিন্দুস্থানীরা মাছ-মাংস বড় অধিক খাইত না। বেরিলির মুসলমানগণ মাছ-মাংসের বিশেষ ভক্ত। মাছের সের ⁄৹. কখন ৵৹। রুই, কাতলা, পুঁটি মাছ মিলিত। পাঁঠা একটার মূল্য ৷৹ হইতে ১৲ টাকা।... ভাল আম চারি আনায় বা পাঁচ আনায় একশত। খুব খাস আম আট আনা শয়ের উর্দ্ধে কৈ আমি কখনও দেখি নাই। (পৃঃ ৪৩)

বেরিলিতে যখন আমি আসি, তখন আমার হাতে মজুদ প্রায় ৩২ হাজার টাকা। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় ৭৫৲ টাকা মূল্যে এক লৌহ-সিন্দুক কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেই সিন্দুকের ভিতর বেরিলির বাসায় আমার টাকা থাকিত। মোহর, টাকা, নোট এই তিন রকমে ৩২ হাজার টাকা ছিল। তখন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার প্রথা তত প্রবল ছিল না, কোম্পানীর কাগজের সুদ অতি কম বলিয়া আমি ঐ টাকায় কোম্পানীর কাগজ কিনি নাই। নগদ টাকা তোড়াবন্দী করা সিন্দুকে থাকিত। (পৃঃ ৪৫)

ব্রহ্মদেশে সর্ব্বরকমে আমার মাসিক কিছু কম চারি শত টাকা মাহিনা ছিল। ব্রহ্মদেশে আমার এক পয়সাও খরচ ছিল না। মাহিনার টাকা সমস্তই জমিত। (পৃঃ ৪৫) ব্রহ্মদেশ হইতে আমি প্রায় বার হাজার টাকা আনিয়াছিলাম।... বেরিলিতে তখন আমার মাসিক মাহিনা ছিল ১৬৫৲ টাকা (পৃঃ ৪৬)। আমার নিকট যে ৩২ হাজার টাকা ছিল, তন্মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ধার দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।... অনিচ্ছাসত্ত্বেও এরূপভাবে ধার দেওয়ায় আমার লোকসান কিছু ছিল না। আমি মাসিক প্রায় আট-নয় শত টাকা সুদ পাইতে লাগিলাম। সকলেরই নিকট মান্য ও ভালবাসা প্রাপ্ত হইলাম। (পৃঃ ৫০)

চোদ্দ

ডঃ জনসন মনে কোরতেন যে কেবলমাত্র স্বরচিত হোলেই তাকে আদর্শ জীবনচরিত বলা যেতে পারে। অন্যথায় ত্রুটী বিচ্যুতির অশেষ সম্ভাবনা। কারণ কারো জীবনচরিত রচনা করা মানে সে ব্যক্তির কর্ম-জীবনের নানা ঘটনা ও কীর্তিসমূহের একটা খানাতল্লাসীমূলক অতি দীর্ঘ ক্লান্তিকর তালিকা তৈরী করা নয়। জীবনচরিত তাহলে সাহিত্যের অঙ্গ না হয়ে সমাজবিজ্ঞানের ভূষণ বোলে বিবেচিত হোতো এবং কেবল সত্যাসত্যের বৈজ্ঞানিক তুলাদণ্ডেই তার মূল্য নিরূপণ করা যেতো। সেরকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে কারো জীবন বর্ণিত হয় নি তা নয়।

> কোনো কোনো জীবনচরিতকার তাঁদের গ্রন্থে কেবল তথ্য জড়ো কোরে গেছেন। তাও এমন জাতের যা সাধারণের অধিগম্য দলিল দস্তাবেজ থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারতো। তাঁরা কেবল ব্যক্তির কীর্তিকলাপের কালানুক্রমিক তালিকাই প্রস্তুত কোরেছেন, জীবনী রচনা করেন নি। নায়কের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও আচরণ সম্পর্কে এতই ঔদাসীন্য প্রকাশ কোরেছেন যে, লেখকের সকল শ্রম ও পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার না কোরেও আমরা বোলতে পারি যে এই বংশ-পদবী জন্ম-মৃত্যুর নির্ভুল তারিখ তথ্য সম্বলিত বিপুল গ্রন্থটি পাঠ করার পরিবর্তে যদি আমরা বর্ণিত চরিত্রের ভৃত্যের সঙ্গে ক্ষণকাল আলাপ করার সুযোগ পেতাম তাহলে সে ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় অনেক বেশী পরিমাণে জানতে পারতাম।[৬৬]

আমরা সাহিত্য-বিচারে এই শ্রেণীর গ্রন্থের উল্লেখ অহেতুক মনে করি। "জীবনী-কারের কাজ হোলো যে সকল কর্ম ও কীর্তি ব্যক্তির স্থূল গৌরবের কারণস্বরূপ সেগুলোর উপর স্বল্প গুরুত্ব আরোপ করা। সদর এলাকা ত্যাগ কোরে প্রবেশ কোরতে হবে অন্দর মহলে, সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের গোপনতম কন্দরে। প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র সহজ আচরণের ক্ষুদ্রতম ঐশ্বর্যকেও অনাবৃত কোরে উপস্থিত কোরতে হবে ব্যক্তিকে—যেখানে অন্যের সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনা শুধুমাত্র মানবোচিত ক্ষমতায় ও দুর্বলতায়।"[৬৭] ব্যক্তিসত্তার এমন হার্দ্য উদঘাটন অন্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া দুরূহ। অথচ একাজটি সুসিদ্ধ না হোলে জীবনী-পাঠের আসল আনন্দই মাটি।

> জীবনচরিতে বর্ণিত মহৎ জীবনের ভিত্তিভূমিতে পাঠক যখন এমন মানবীয় ভাব ও কর্মের সন্ধান পায় যার সঙ্গে তার মতো সাধারণ সামাজিকও একাত্মবোধ করতে পারে, তখনই সে আনন্দ লাভ করে। অন্য কোনো শ্রেণীর রচনাই পাঠকের চেতনাকে এত দ্রুত সজাগ কোরে তোলে না, এত মুগ্ধ কোরে রাখে না, এত অনুকরণসাধ্য আদর্শের দ্বারা সংক্রামিত করে না। বাইরের বসন ভূষণ, ভাগ্যচক্রে লাভ করা যশ প্রতিপত্তি-এগুলো থেকে আলাদা কোরে মানুষকে বিচার কোরলে দেখা যাবে যে তার অনেক ভালোমন্দো গুণাগুণ অন্য কারো থেকে স্বতন্ত্র নয়। একই বাসনার দ্বারা আমরা চালিত, একই মোহে আচ্ছন্ন, একই আশায় উদ্দীপ্ত, বিপদে বিচলিত, কামনায় বিজড়িত, আনন্দে বিভোর।[৩৮]

মূলতঃ জীবনচরিত ও আত্মজীবনীর শিল্পরূপ একই রসের আবেদনকে মূর্ত কোরে তুলতে প্রয়াসী। সংজ্ঞানুসারেও আত্মচরিত হোলো স্বরচিত জীবনচরিত।[৩৯] বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ নিজেই নিজের বইয়ের নামকরণ করেন <u>বিদ্যাসাগর চরিত। স্বরচিত</u>। জীবনী ও আত্মজীবনী উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্ট চরিত্রের সার্থকতা নির্ভর করে তা কতোটা তীব্রতা ও উজ্জ্বলতা লাভ কোরেছে, জন্মমৃত্যুর বন্ধনীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অন্তহীন রহস্য মননীয়রূপে উদ্বেল ও উদ্ভাসিত হোয়ে উঠেছে। নাটক নভেলে সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য শুধু এই যে শিল্পীর কলারীতির বিনোদন যে মোহই বিস্তার করুক না কেন, পাঠকের এ বিশ্বাস অটুট থাকা চাই যে কল্পনাহীন বাস্তবই এখানে সার্বভৌম।

এই প্রসংগে পাঠকের আরো একটি দাবী বিচারযোগ্য। জীবনী বা আত্মজীবনীতে শিল্পরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তি চরিত্রটির কি সামাজিক ও লৌকিক সত্য হিসেবেও মূল্যবান হওয়া বাঞ্ছনীয়? যদি তিনি ইতিহাসের কোনো সুবিদিত মহৎ ও স্মরণীয় পুরুষ হন, মনে হয় যেন, আত্মচরিতকারের পক্ষে তাহলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে প্রত্যাশিত আনন্দ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে পাঠক যেন আগে থেকে খালি আসন হৃদয়ে প্রসারিত কোরে রেখেছেন, মনের মানুষ মনের মতো করে এখন দখল চাইলেই অলঙ্কৃত ও উল্লসিত বোধ কোরবেন।

জীবনী ও আত্মজীবনীর মধ্যে যে অনৈক্য তা প্রধানতঃ রূপগত, ধর্মগত নয়। জীবনচরিতে লেখকের নিজস্ব ধ্যানধারণার অতিপ্রক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। তার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। লেখকের নিজের জীবনের প্রিয় বিশ্বাসের অনুমোদন অনুসন্ধান ও তার প্রতিফলন আবিষ্কারের চেষ্টা অনেক সারবান জীবনালেখ্যকে

একপেশে অনির্ভরযোগ্য চিত্রে পরিণত কোরেছে। কিন্তু আত্মজীবনীতে লেখকের নিতান্ত নিজস্ব কাম ক্রোধ, প্রেম প্রীতি, সংস্কার বিশ্বাস, সাধনা সিদ্ধান্ত, ক্রিয়া কর্ম সবই অতি অন্তরংগ রূপে বর্ণনীয়। যত তিনি ব্যক্তিগত হবেন, রচনায় শুধু মাত্র নিজেকে ব্যক্ত কোরবেন, নিজের চিত্ত ও চরিত্রের গূঢ় মর্ম প্রকাশে সক্ষম হবেন, নিজের বিদিত সত্তার বিকাশ যে সকল তুচ্ছ মহৎ ঘটনাবস্তুর অধীন ছিল তার বর্ণনা শোভন ও তাৎপর্যপূর্ণ রূপে কোরতে পারবেন ততই অটোবায়োগ্রাফিটি চমৎকারিত্ব লাভ করবে।

পনের

বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়দের প্রকৃত জীবন তাঁদের আত্মজীবনীসমূহকে শিল্পকর্মনিরপেক্ষ হৃদয়গ্রাহিতায় ভরে রেখেছে। রাসসুন্দরী দাসীর আত্মকাহিনী সে মহিমার সুযোগ গ্রহণে অপারগ। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কর্মজীবন তুচ্ছ ও নগণ্য না হলেও তুলনায় বিবর্ণ। মীর মশাররফ হোসেন সমকালীন জীবনবোধের কোনো প্রধান ধারাকে সূচিত বা নিয়ন্ত্রিত কোরবার অবকাশ পান নি। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীবনের যে নবীন উৎকণ্ঠা ভাবে ও কর্মে শিক্ষিত বাঙালীর নাগরিক জীবনকে চঞ্চল কোরে তুলেছিল তার সান্নিধ্য বর্জন কোরে মীর সাহেব আজীবন মফস্বলে কাটিয়েছেন। নতুন যুগের নির্মাণকারী সহযোগী অপরাপর ব্যক্তিবর্গের কথা যতো অবলীলাক্রমে রাজনারায়ণ বসু কি শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের আত্মকথায় উল্লেখ কোরেছেন মীর সাহেবের তা সাধ্যাতীত ছিল। তাঁর আমার জীবনীর কথ্যবস্তুর লৌকিক পরিমণ্ডলটি দেশের হিন্দু-মুসলিম মানসের বিবর্তন বৃত্তে কোনো অসাধারণ গৌরবের দাবীদার নয়। আমার জীবনীর শিল্পমর্যাদা কোনো অকল্পিত, সুপ্রচারিত কর্মরাশির পটভূমিতে বিকাশ লাভ করে নি। এ এক প্রকার নিরবলম্ব একক সত্তার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার রোজনামচা মাত্র, বর্ণনার কৌশলে যতটা কলামণ্ডিত হোতে পেরেছে ততটাই আমাদের চিত্ত জয় করেছে। মীরের সার্থকতা জনৈক ব্যক্তির 'মনের কথা' প্রকাশ করায়। মীর সাহেব তার দক্ষ কারিগর। অন্দর মহলের কথা তিনি জানেন এবং বোলতে জানেন। কিন্তু এ অন্দরমহলের সদর এলাকায় আত্মজীবনীতে প্রত্যাশিত ভাব ও ব্যক্তিত্বের দ্যুতি অনুজ্জ্বল, দুর্নিলক্ষ্য।

ষোল

একটি একেবারে মৌল প্রশ্ন আমরা এযাবৎ এড়িয়ে গেছি। আমার জীবনীতে মীর সাহেব মনের কথা খুলে বোলবেন বোলে ওয়াদা করেছিলেন বটে কিন্তু আমরা পাঠশেষে প্রশ্ন না কোরে পারি নাঃ সত্য সত্য কি 'মনের কথা' প্রকাশ লাভ কোরেছে? স্বরচিত বোলেই কি সরল অর্থে সকল আত্মজীবনী লেখকের আত্মসাক্ষাৎকারের প্রামাণ্য দলিল বোলে গৃহীত হবে? ডঃ জনসন অবশ্য অনেক আশা নিয়ে বোলেছিলেন যে, "জীবনচরিত স্বরচিত হলেই তা সম্পূর্ণ সত্যমূলক হওয়া সম্ভব।" আমরা সংশয়বাদী। রচনাকারী হয়তো সত্য-কথনে কুণ্ঠিত নন। নিজের চিত্ত ও কর্ম ব্যাখ্যা করার মানসিকতাও হয়তো তাঁর আছে। কিন্তু সত্তার সার প্রকাশ করা, নিপুণভাবে তাকে ব্যক্ত করা শিল্পকর্ম হিসেবেই ক্ষমতাসাপেক্ষ। এক আধজন প্রতিভাবান আত্মচরিত লেখক হয়তো একটা প্রশংসনীয় নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব বজায় রেখে সুমানস বিচারে ও বিশ্লেষণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু অপরের জীবনবৃত্ত রচনায় জীবনীকার যে শবচ্ছেদকারীর নির্লিপ্ততা নিয়ে পুরাতন তথ্যের স্তূপের মধ্যে সত্যানুসন্ধান করে বেড়াতে পারেন, নিজের জীবনের গোপন-অগোপন, উঁচু-নীচু গ্লানি-গর্ব সম্পর্কে সেরকম অকুণ্ঠিত বেপরোয়া মনোভাব শতেকে একজনের মধ্যে মিলতে পারে। নিকলসন সাহেবের মতে এখন পর্যন্ত সে প্রতিভা জন্মগ্রহণ করে নি।[৪৩]

ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ কোরে আদালতের কাঠগড়ায় যে সাক্ষ্যদান করা হয়, উকীল মাত্রেই জানেন যে, তা অকাট্য সত্য নয়। লেখকের জবানবন্দীও মিশ্রিত সত্য মাত্র। সত্যভাষণের নানা স্তরে আত্মজীবনীকারের প্রকাশব্যগ্র চেতনা সঞ্চরণশীল। তার মধ্য থেকে নির্জলা লৌকিক সত্যটি উদ্ধার কোরতে হোলে অনেক সময় বিস্তর পরিশ্রম কোরতে হয়। বিচিত্র উৎস থেকে আহরিত বাহ্য প্রমাণ ও আন্তর নজীর সমূহকে পরস্পরের আলোতে পরখ কোরে তারপর আমরা এক একটি গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে পারি। মীর মশাররফ হোসেনের জীবন সম্পর্কে যে সকল বৃত্তান্ত মাঝে মাঝে আমাদের বিভিন্ন পত্রিকা-পুস্তকে প্রকাশিত হোতে দেখেছি তার অনেক কথাই কোনো বিশুদ্ধ বিচারের ফল নয়, হয় নিছক অনুমান, নাহয় সরল চিত্তে গৃহীত ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ধৃত মীরেরই কোনো উক্তি।

মীর সাহেব তাঁর শেষ বয়সে রচিত এই আত্মজীবনীতে তাঁর প্রথম প্রণয়ের ওপর যে নাটকীয়তা ও রোমান্স রস আরোপ কোরেছেন তা সর্বত্র পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করে না। আলোচ্য গ্রন্থটির প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে এই প্রেমের ব্যর্থ পরিণতির বর্ণনা। অনেক ক্ষেত্রেই তা উপন্যাসে চিত্রিত হৃদয় লীলার কাহিনীর মতো সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য। এই কাহিনী রচনায় মীর সাহেবের একটা বড় কৃতিত্ব এই যে, মূল পরিস্থিতির দীর্ঘ বর্ণনাচ্ছলে কোথাও নিজেকে তিনি প্রমাণ মাপের মানুষের চেয়ে বৃহদায়তন কোরে আঁকেন নি। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর প্রিয়তমা যখন নিশ্চিন্ত মরণের দিকে এগিয়ে চলেছে—সেই অন্তিম চিত্র রচনার কালেও মীর মশাররফ ঝাঁড়ফুঁক তুড়মী ইত্যাদি বাজীকরী বিদ্যায় নিজের পারদর্শিতা ঘোষণায় একটুও নিম্নকণ্ঠ বা পরিমিতবাক নন। বুঝতে কষ্ট হয় না যে প্রখর প্রেমের দীপালোকে যে চরিত্রটি এই গ্রন্থে ঝলমল কোরে উঠেছে তিনি মানব নন, মানবী ; মীর মশাররফ হোসেন নন, ইনি তাঁর পরিপক্ক কৈশোরের অতি পরিণত প্রেমিকা, তাঁর মানসসুন্দরী। আঙ্গিক ও আবেদনের এই বিশিষ্ট পরিচর্যা মীরের আমার জীবনীকে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য আত্মচরিতগুলো থেকে পৃথক কোরে রেখেছে। কেবল মাত্র নবীন সেনের আমার জীবন অংশত এর জ্ঞাতিস্থানীয়। সেখানেও প্রথম প্রণয়ের একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে যার নায়িকা অতিশয় কিশোরী হোলেও প্রেমের বাসনা ও কামনাকে নিপুণভাবে ব্যক্ত কোরতে জানে এবং কিশোর নায়কও রঙ্গমঞ্চীয় পটুত্বের সঙ্গে সে লীলায় অংশ গ্রহণ কোরেছে।[৪১] প্রথম প্রেমের আদর্শায়িত বর্ণনায় প্রগল্‌ভ আরেকজন প্রবীণ পুরুষ হোলেন দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়।[৪২]

সতের

যে সকল রন্ধ্র পথে আত্মজীবনীতে মিথ্যাচার প্রবেশ করে[৪৩] তার একটি হোলো মানুষের স্মৃতির স্বাভাবিক ক্ষয় প্রবণতা। বার্ধক্যে বাল্যস্মৃতি সাধারণতঃ কুয়াশাচ্ছন্ন। যে স্পষ্টতা, অখণ্ডতা, ও ধারাবাহিকতা নবীন ও মীরের রচনায় দীপ্যমান তা এই কারণেও অনেক পাঠকের কাছে স্থানবিশেষে কল্পনারোপিত বোলে মনে হোতে পারে। দ্বিতীয়ত স্বরচিত জীবন-কাহিনীতেও লেখক রস সম্পাদনের মোহে আত্মবিস্মৃতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। মীর সাহেবের চেয়ে নবীন সেন এই মোহের বেশী বশ। তৃতীয়ত যে স্মৃতি অপ্রীতিকর তাকে পরিবর্জন করার মানবসুলভ মোহের প্রবণতা উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। চতুর্থত যে অভিজ্ঞতা গ্লানিকর হেয়বোধের সংগে বিজড়িত তাকে অবদমিত বা একেবারে বিলুপ্ত কোরে দেয়ার প্রবৃত্তি থেকেও কোনো আত্মচরিতকার মুক্ত নন।

পার্থক্য শুধু এই যে সে বিলুপ্তি কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন।[৪৪] দেহের বিকার বর্ণনায় মীর সাহেব যতটা অকুণ্ঠ হোতে পেরেছেন তা বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য আত্মজীবনী লেখকের তুলনায় স্মরণীয়। পঞ্চম, স্মৃতি যে কেবল সময়ে ক্ষয়ে যায় বা রচয়িতার ইচ্ছায় লোপ পায় তাই নয়, পরিণত বয়সের পরিবর্তিত মানসের অনেক নতুন যুক্তিব্যাখ্যায় মণ্ডিত হোয়ে তার রূপান্তরও ঘটে। প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে মীর সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে যে তীব্র তিক্ত মনোভাব প্রকাশ কোরেছেন, মৃত প্রেমিকার চরিত্রকে যে আবেগ নিয়ে আদর্শায়িত কোরেছেন তার কতটা প্রকৃত অবস্থার অনুসারী তা নির্ণয় করা কঠিন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল আজিজ-উন্-নিসা। তিনি গৌরবর্ণা ছিলেন। প্রচুর হাসতে পারতেন। এই নবীনাকে যখন বিয়ে করেন তখন মীর সাহেবের বয়স সাড়ে সতেরো। এই বিয়ের আট বছরের মাথায় মীর সাহেব যে মাসিক পত্র সম্পাদন করেন তার নাম ছিল আজীজন্ নেহার। নিশ্চয়ই পত্রিকা একদিনে প্রকাশিত হয় নি, তার জন্যে দীর্ঘকাল জল্পনাকল্পনা কোরতে হোয়েছে। তখন নামকরণের পেছনে যে পতিহৃদয় ক্রিয়াশীল ছিল তার স্বরূপ পত্নীবৈরিতার আলোকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। পারিবারিক সংবাদ পরিবেশনে মীর সাহেব যে অনেক সময়ে রচনাকালীন মুহূর্তের পরিবর্তনশীল ভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হোতেন তার অন্য দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা যেতে পারে। নিজের পিতামাতার, বিশেষ করে মাতার অসন্দিগ্ধ অকৃত্রিম অমলিন পতিপ্রেমের যে চিত্র উদাসীন পথিকের মনের কথায় এঁকেছেন,[৪৫] আমার জীবনীতে তার বিরুদ্ধ সত্যকেই প্রকারান্তরে স্বীকার কোরেছেন।[৪৬] এই জন্যে ইতিপূর্বে আমরা এরকম মত প্রকাশ কোরেছি যে মীর-জগৎ ও মীর-মানসকে সম্যক রূপে উপলব্ধি কোরতে হোলে তাঁর উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮০৯), গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮০৯), আমার জীবনী (১৯১০) ও বিবি কুলসুম (১৯১০) প্রভৃতি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থকে পাশাপাশি রেখে পাঠ কোরতে হবে, এক বইয়ের দুই চরণের মধ্যবর্তী অনুক্ত মর্মকে অন্য বইয়ে উদ্‌ঘাটিত তথ্যের তুলনামূলক বিচার দ্বারা খোলাসা করে নিতে হবে! মীরের অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনাকালে আমরা আমাদের এই বক্তব্যকে আরো বিশদরূপ দান কোরতে সচেষ্ট হবো। ইতিমধ্যে মূলের সংগে পাঠকবর্গের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হোক, এই উদ্দেশ্যে আমার জীবনীর দীর্ঘ উদ্ধৃতিসমূহের পৃষ্ঠানুক্রমিক সংকলন পরিশিষ্টে প্রকাশ করা গেল।

পরিশিষ্ট

আমার জীবনী। প্রথম খণ্ড। স্বত্বাধিকারী শ্রী মীর মশাররফ হোসেন কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, ৩৬, নং গোরাচাঁদ রোড, ইটালী—মুন্সী সাদেক আলী দ্বারা প্রকাশিত। ১৩১৫ সাল ১লা আশ্বিন। কলিকাতা, ১৭, নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, 'কলিকাতা যন্ত্রে' শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

আমার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটী কথা।

১। আমার জীবনী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ড ৮ পেজী ডিমাই চার ফর্ম্মা মাসে মাসে অথবা মাসে দুইবার প্রকাশ হইবে।

২। প্রতি খণ্ডে সম্পূর্ণ দুই কি তিন ফর্ম্মা আমার জীবনী থাকিবে। অপর ফর্ম্মায় গাজীমিয়াঁর বস্তানীর শেষ অংশ প্রকাশ হইতে থাকিবে। আমার জীবনীর সহিত গাজী মিয়াঁর বস্তানীর শেষ অংশে বিশেষ সংস্রব আছে—......।......

১০।...... ...।

বিনয়াবনত— ...।

আমার আত্মকথা। প্রার্থনা।

হে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, অসীম করুণাময় পরাৎপর পরমেশ্বর! সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপিতা, সর্ব্বময় সৃষ্টিকর্ত্তা এলাহি! তোমার অনন্ত মহিমা স্মরণ করিয়া সষ্টাংগে প্রণিপাত সহিত তোমারই সহায়ে 'আমার জীবনী' জনসমাজে প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রভু, সহায় হও। সত্য তত্ত্ব প্রকাশে হৃদয়ে বল দেও। অসত্য ঘটনা, অসত্য ধারণা প্রকাশ হইতে লিখনি সংকোচিত কর। সদা সর্ব্বদা পরহিংসা পরদ্বেষ পরকুৎসা, পরনিন্দা হইতে তফাৎ রাখিও।...দয়াময়! 'এসলামের জয়' প্রকাশ আশা পূর্ণ করিয়াছ। 'হজরত ইউসোফ' যন্ত্রস্থ—শেষ আশাই—আমার জীবনী—কর জোড়ে প্রার্থনা করিতেছি অধমের মনের আশা পূর্ণ করিও।

মাননীয় পাঠকগণ সমীপে।

প্রিয় পাঠকগণ! 'আমার জীবনী' প্রকাশ কথা হঠাৎ মনে হইয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি তাহা নহে। এ সংকল্প বহুদিনের। এ আশা একযুগেরও অধিককালের। কাল চক্রে—চক্রে অবস্থার গতিকে, আজ ১৬ বৎসর

পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও আশা পথে দণ্ডায়মান হইতে পারি নাই। দেখুন—প্রমাণ। উদাসীন পথিকের মনের কথা পুস্তকে দ্বিতীয় তরংগে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন! কি লিখা আছে। বাংলা ১২৯৭ সালে আমার জীবনীর বিষয় আলোচনা হইয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে তাহাও লিখক আভাসে বলিয়াছেন। আজ কোন দিন? ১লা আশ্বিন্ ১৩১৫ সাল। প্রায় ১৯ বৎসরের কথা। ১৯ বৎসর পূর্ব্বের সঙ্কল্প। ......

আমার জীবনে শত শত ত্রুটী, শত শত জাহেলী (মুর্খতা) এবং অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। তাহার ফলও হাতে হাতে পাইয়াছি। সেই সকল বিষয় প্রকাশ হইলে ভবিষ্যতে একটি মানব সন্তানও যদি সাবধান সতর্কে জগতে চলিতে পারেন তাহা হইলে আমার জীবন স্বার্থক ও সহস্র লাভ মনে করিব। আর, একটি কথা বলিয়াই আমার কথা শেষ করিতেছি। আমার জীবনী অতি সরল ভাষায় লিখিত হইবে। আর যে সকল কথা মোসলমান সমাজে সর্ব্বসাধারণ মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার অবিকল বাংলা আমি জানি না। ভাবার্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। লাভের মধ্যে শ্রুতি কঠোরতায় কেহ শুনিতেই ইচ্ছা করেন না। সেই সকল শব্দ যেমন প্রচলিত আছে সেই রূপই প্রকাশ করিব।

১ উপক্রমণিকা।

আমার জীবনী।

আমি কে?

চিনি না। চিনিতে পারিলাম না। কতদিন ভাবিলাম কত চিন্তা করিলাম, কিছুই হইল না, — আভাস ইংগিতেও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কতদিন জনমানববিহীন বিজন বনে, কত দিন সুপ্রশস্ত প্রান্তরে, কত নিশিথ সময়ে নির্জ্জন গৃহে, শয়ন শয্যায়, দার্জ্জিলিং পাহাড়ের উচ্চশিখরে নির্জ্জন উপবনে, ঘোর নিশীথ সময়ে গৌরনদী তটে, বসিয়া কত চিন্তাই করিয়াছি,—জানিতে পারিলাম না—আমি কে? ..

২ মাথা একটি। মাথায় কিছু নাই বলিয়াই বোধ হয়।...

৩ হাত পা আছে—অকর্ম্মার এক শেষ। মসজিদে যাইতে কষ্ট বোধ হয়।...

কর্ণ মহোদয়...সৎ কথা সৎ উপদেশ.. চাহেন না.. মনের কথা আর কি বলিব! সকল কথা খুলিয়া বলিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে পারি। মনের কথা মনেই থাকিল।...

কম নহে, বাল্য জীবন হইতে গত ৬৫ বৎসরের ঘটনা শুনাইব। সংগে সংগে বর্ত্তমান সময়ের ঘটনাও সময় সময় প্রকাশ করিব।...

সত্যাশ্রয়ে সত্যই আমার জীবনীর মূল উদ্দেশ্য। সত্য প্রকাশেই আমার স্থির সংকল্প।...

৪ ...লোকাচারে যাহা বলে—পুরুষ'নুক্রমে লৌকিক আচারে ব্যবহারে কথায়, লিখিত পুস্তকে কুরসীনামায় গভর্ণমেন্টের আপিসে আদালতে, ফরিদপুর সব জজ আদালতে ১৯০৬ সালের ৩৯ নং মকদ্দমায় যাহা দেখিতে পাই, তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রকাশ্য দেহের মীমাংসা করিতেছি আমি কে?...

২১ চক্ষু থাকে ত চাহিয়া দেখ। আমাদের মহামাননীয় বৃটিশরাজ সরকারী গেজেটে ১৯০০ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতা গেজেটে আমার বস্তানী
২২ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন? খুশ বাহবা দিয়া লেখকের বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন,—রংপুর অঞ্চলের কোন ছায়া অবলম্বন করিয়া গাজিমিয়াঁ চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন। তারপর ১৩০৮ সালের পৌষ মাসের পত্রিকা প্রদীপে ...।

৯৪ ...লাহিনী পাড়ার বাটীর পশ্চিম-দ্বারী বৃহৎ ঘর, যে ঘরে আমার পূজনীয় মাতৃদেবী শয়ন করিতেন। সেই ঘরে আমার জাতঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল। যত ভাই-ভগ্নি—ঐ এক ঘরেই সকলের জন্ম, সন মাস তারিখ দণ্ড সকলি জন্ম পত্রিকায়
৯৫ লেখা আছে।...সংস্কৃত কয়েকটি বচন সহ এবং জ্যোতিষি পণ্ডিত গণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মাত্র উল্লেখ করিব।... সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া বাংলা অক্ষরে কম্পোজ করা কঠিন বলিয়াই এবার হইল না, আগামীতে চেষ্টা করিব।
৯৬ যদি বলেন, এরূপ জন্ম-পত্রিকা হইবার কারণ কি? খাঁটী মুসলমান গৃহে এরূপ ঘটিবার কারণ কি? ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে মুসলমানের কিরূপ শোচনীয় দশা ছিল, তাহা ভাবিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আমি সেই দুর্ঘটনা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি...ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠে অনিচ্ছা। জাতীয় বিদ্যাশিক্ষায় শৈথিল্য। জাতীয় ভাব রক্ষায় অমনোযোগী। এ সকল ঘটিবার কারণ? বিধর্মীদিগের প্রবল পরাক্রম, ধন-গৌরব, শাসন, বিচার, রাজ্য-বিভাগ, সমগ্র বিভাগেই মুসলমান শূন্য। যাঁহাদের দ্বারা এ সকল স্থান অলঙ্কৃত, তাঁহারা দেখিতেও ভাল—ক্ষমতাও কম নহে।—তাঁহাদের বাক্স, সিন্দুক টাকা-পয়সায় পরিপূর্ণ। বিজাতীয় ভাষার কল্যাণে রাজপুরুষদিগের সহিত মাখামাখি ভাব, কাজেই নির্জ্জিব নিরক্ষর বঙ্গীয় মুসলমানগণ অনেক কার্যে তাঁহাদের আদর্শ...। অনেক বড় বড় জমিদার, ধনী মুসলমান,—জোড়া জোড়া প্রতিমা তুলিয়া আশ্বিন মাসে ... দু'দশ হাজার বাহবা গ্রহণ...।

লাহিনীপাড়া গ্রামে, মাতামহ মুন্সী জিনাতুল্লার বাটীতে, বিবি দৌলতন্নেসার গর্ভে, বাটীর আংগিনার মধ্যে ঘর....আমার জন্ম হয়।

৯৭ আমার যে সময় জন্ম হয়—সে সময় আমাদের দেশে অত্যন্ত ভূতের ভয় ছিল। ভূতও এক শ্রেণীর ছিল না।...শিশু সন্তানদিগের জন্ম পেঁচাপেঁচি নির্দ্ধারিত ভূত। জাতঘরে তাহাদেরই অধিকার আধিপত্য। জাতঘরের বারান্দায় দিবারাত্র সমভাবে আগুন জলিত। শুর্কন কাঠের আগুন দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। ক্ষণকালের জন্ম আগুন নিবিবে না। বারান্দার এক পার্শ্বে চাটাই দ্বারা ঘিরিয়া দিবারাত্র কোরাণ-শরীফ পাঠ...। জন্মের পরক্ষণেই সাতবার আজান...। প্রত্যেকের মনে বিশ্বাস যে আজানের আওয়াজ যতদুর বাতাসে লইয়া যায়, কি স্থির বায়ু ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, ততদুর ভূত-প্রেত, দেও-দৈত্য, দানো, জেন-পরি অধিকন্তু সয়তান থাকিতে পারে না। ইহার পরেও বাড়ীর সীমার মধ্যে উচ্চ বংশখণ্ডে গরুর মাথা—মুড় ঝাটা বাড়ুন বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। জাতঘরের দরওয়াজার একপার্শ্বে গরুর মাথা গোহাড় কাঁটা কুমড়ার ডাটা সহ পাতা কপাটের গায়ে চৌকাটের সংগে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জাতঘরের

৯৮ কপাট জানালার ফাক, বেড়ার ছিদ্র—যেখানে যতটুকু ছিল, তাহাও বন্দ করা হইয়াছিল ..। বাতাসও যাইবে না। তাহার পর জাতঘরে সমস্ত রাত্রি যে প্রদীপ জলিবে, সে প্রদীপের রশ্মিকণা বাহির হইতে কেহ দেখিতে না পারে। এ সকল আয়োজন কেবল পেঁচাপেঁচির ভয়ে।... পাঁচ দিন গত হইলে ষষ্ঠির রাত্র। ...ছয় কুলার রাত্র কহে।...সেই রাত্রে ঘর-দ্বার বন্দ হওয়ার পুর্বে—ভাল কলম দোত কালি, সাদা কাগজ, একখানা কলমকাটা ছুরি, এই কয়েকটা জিনিষ অগ্রে যত্নপূর্বক এক পাত্রে করিয়া অন্য কোন স্থানে রাখা হয়। তাহার পর (সরস্বতীর বিদ্যার) ঢোল তবলা সেতার বেহালা তাস পাশা দাবা লাঠী শুড়কী তরবার, ইত্যাদি শিশুর শিয়রে রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল বিদ্যায় শিশু পারদর্শিতা লাভ করিবে—ইহাই আশা।

৯৯ ...আকিকা...। কোরবানী...। তাহার মাংস, হাড় হইতে এমনভাবে ছাড়াইয়া লইতে হয় যে হাড়ে আঘাত না লাগে, দাগ না বসে, ভাঙ্গিবার ত কথাই নাই। ..

১০২ পিতামাতার খাওয়া নিষেধ।...গাজীর গাম হইয়াছিল।...চার বৎসর চার মাস চার দিন পর আমার হাতে তাক্তি (হাতে খড়ি) হইয়াছিল।... প্রবাদ ছিল মুনসী

১০৩ সাহেব হাতে খড়ি দিলে তাহার দারগাগিরী চাকুরী না হইয়া যায় না। মুনসী সাহেব বাঙ্গলার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। সে সময়ে বাংলা পত্র, কথাবার্ত্তার ভাষায়—অর্থাৎ যে গ্রামের যেরূপ কথা তাহাতেই লিখা হইত। খত্ পত্র ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে ভাষার ব্যবহার ছিল না, কাহারও প্রয়োজনও হয় নাই।...

১০৪ মুন্সী সাহেবরা বাংলার কিছুই জানিতেন না। যাহারা জমিদারের খাজনা আদায়-কারী গোমস্তা বা পাটওয়ারী ছিল, তাহারা জমা খরচ বাকীজায়, দাখিলা লিখা চিঠি পাঠের বিদ্যা থাকিলেই গ্রামে তাঁহার নাম জাঁকিয়া উঠিত।...

১০৫ এক বৎসরের মধ্যেই কোরাণ শরিফের প্রথম পারা (অধ্যায়ের) তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুরা পাঠ করা শেষ করিলাম। অক্ষর পরিচয়ে বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই কোরাণ পাঠ করা হইল। শিক্ষক মুন্সী মহোদয়েরও কোরাণের অর্থ জ্ঞান নাই, আমি শিক্ষা করিব কি প্রকারে ?...

পাঠশালায় আসিয়া কলম কপালের নীচে রাখিয়া উপুড় হইয়া জোরে জোরে কবিতা পড়িতাম, পাঠশালার ছুটীর পূর্ব্বে আমরা সকলে কলম কপালের নীচে রাখিয়া উপুড় হইয়া পড়িতাম, নন্দী মহাশয় পড়াইতেন।

জয় জয় দেবী, চর চর সার
কুচ যুগে শোভে মুক্তার হার
বিনা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।
ত্বং সরস্বতী নির্ম্মল বরণ,
রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণ। (ইত্যাদি)

মাথা খুব জোরে কলমের উপর চাপিয়া ধরিতাম, যে কলমটী কপালে লাগিয়া কপালের সঙ্গে বাধিয়া উঠে, বাধিয়া উঠিলেই মহা পণ্ডিত হইব।...গলা টানা করিয়া মাথা পিঠের দিকে নীচু করিয়া রাখিতাম, যে কলম কপাল হইতে ছটকিয়া না পড়ে।...

১০৯ কেনী বলিলেন—মীর সাহেব! আপনি আমাদের অর্থাৎ একা আমার নহে সমুদয় ইংরেজ জাতীর হিতৈষী। বিশেষ আমরা যে কয়েকজন নীলকুঠী করিয়া এদেশে বাস করিতেছি, আপনি সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্খী। যথাসাধ্য আমরা সকলে আপনার উপকার সাহায্য করিতে সর্ব্বতোভাবে বাধ্য। যে প্রকার সাহায্য আপনি চাহিতেছেন, আমরা করিতেছি। আমি যতদিন বাঁচিব করিব। আমাদের সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস—আপনিও আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য উপকার করিবেন। আমাদের নীলকরদিগের—এমন কি বৃটিশ জাতির হিত ভিন্ন কখনই অহিতের

১১১ দিকে অগ্রসর হইবেন না। এই সকল ভাবিয়া...আপনার বড় পুত্রকে...বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান।...আপনার একটি পয়সা খরচ লাগিবে না। যাওয়া আসার খরচ...থাকার খরচ পড়ার খরচ সমুদায় আমি দিব।...চার বৎসর মন বেঁধে ছেলেকে আমার কন্যাদের সহিত বিলাত পাঠান।...

[এই খণ্ডের শেষে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ রয়েছে : মুন্সী সাদেক আলীর সহিত আমার জীবনীর কোন সংশ্রব রহিল না। আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান মীর মহবুব হোসেন...প্রকাশের ভার গ্রহণ করিলেন।]

পঞ্চম খণ্ড। ১৩১৫ মাঘ॥

১১২ আমার জীবনীর পাঠক কে?

এইক্ষণে সেই অসীম শক্তিধর জয় জগদীশ নাম করিয়া আপাততঃ ১২ খণ্ডে শেষ করিতে পারিলেই লজ্জার দায় হইতে রক্ষা পাই। ভবিষ্যত অন্য চিন্তা—অন্য বন্দোবস্ত। —শুধু অমুক তারিখে জন্মিলাম, অমুক সনে অমুক কার্য্য করিলাম,—অমুক তারিখে মরিলাম ইহাতে জীবনী সম্পূর্ণ হয়না। আর সকল জীবনীতেই বিশুদ্ধ চরিত্র কার্য্যদক্ষতা সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়—সরল, দেশহিতৈষী ইত্যাদি গুণেরই দীপক বেহাগ ললিত, ভৈরবী রাগের গান,—চৌতাল ধামাল ধ্রুপদ, আড়াঠেকা বাজনার সহিত শুনিতে পাই। কিন্তু আমার মত হতভাগার জীবনীর ন্যায় জড়িত জীবনী এ পর্য্যন্ত কাহার শুনি নাই—দেখি নাই। —হইতে পারেন তাঁহারা স্বর্গীয় দেবতা, হইতে পারে তাহারা…কিন্তু…

১১৩ কবীরের বচনের সমর্থন করিয়া আমরাও বলিতেছি জগতে আসিয়া কেহই অক্ষত শরীরে বাহির হইতে পারেন নাই। কিছু না কিছু ক্ষত হইয়াছে, আর না হয় কিঞ্চিৎ দাগ লাগিয়াছে। আমার জীবনীর—দাগ ধরা,—যাঁহার জীবনী তিনি অক্ষতশরীরে বাহির হইতে পারিবেন না। কারণ তিনি পুণ্যাত্মা নহেন—মহাপাপী! পাপীর জীবন কাহিনী শুনিতে অনেকেরই ইচ্ছা হইবে না।…তাই বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না। কেহ পাঠ না করিলেও আমরা দুঃখিত নহি। …আর কিছু না হউক, ভবিষ্যত বংশধরগণের বিশেষ কার্য্যে আসিবে। আমার জীবন কাহিনী শুনিয়া কেহ সতর্কও হইতে পারেন।.. আমার জীবনীর পাঠক কে?—লোক দেখিতে পাই না। প্রমাণ? অধিকাংশ গ্রাহকই নীরব।

১২০ [মা বাবাকে বলছেন]…আপনার নিখুঁত কুলে এক হাজার টাকার লোভে কালি মাখাইবেন না। আপনি নাদির হোসেন মুন্সীকে জানেন?… মীর মহেব আলীর ফেল্ জামিনের মকদ্দমায় যে এক বৎসরের ফাটক হইয়াছিল, মীর মহেব আলীই আমার নিকট বলিয়াছেন, নাজীর নাদের হোসেন আমার পায়ে বেড়ী না দিয়া লোহার কড়া পরাইয়া দিলেন। …নাদের হোসেন যসহরের নাজীর ছিল, সেই সময় গরীবপুরের ফকীর মামুদ তরফদারের কন্যাকে বিবাহ করে। সেই ফকীর মামুদের নাতীই নাদের হোসেনের পুত্র।…আপনার মেয়েকে তরফদারের নাত বৌ করিবেন না। .. দেওয়ার চাইতে বিষ খাওয়াইয়া

১২২ মেয়েটিকে দুনিয়া হইতে তফাৎ করা ভাল।… তৃতীয় মাসে সামসননেসার জ্বর …বিবাহ কথা ফুরাইল।

পিতা চিরকালই ইংরেজ ভক্ত।... দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণে নীলকরের দৌরাত্ম্য অংশই চিত্র করিয়া গিয়াছেন। পরিণাম ফল... [নীল বিদ্রোহ] ...নীলকরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। কি প্রকারে শান্তির বাতাস বহিল প্রজারা আশ্বস্ত হইল, ব্রিটিশ রাজ প্রতি কি প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িল, সে সকল বিষয় এক উদাসীন পথিকের মনের কথা ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে নাই। দীনবন্ধু বাবু ইংরেজের ক্রটি ইংরেজের কুৎসাই গাইয়া গিয়াছেন। ইংরেজের মধ্যে যে দেব ভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা স্নেহ এবং ভালবাসার ভাব আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নিমক রুটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতনভোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও সে ইংরেজ প্রদত্ত টাকার উপসত্ত্ব ভোগ করিতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নুন নেমক এখনও খাইতেছেন সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া তুশ বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দীনবন্ধুর প্রেত আত্মা বাহবা ভোগ করিতেছেন, ইহাদিগকে কি বলা যায়? ইহারই নাম পাতফোঁড়—যে পাতে খান সে পাতই ছিদ্র করেন। লবণ ফুটিয়া বাহির হইবে।...

১২৩ [বাবার উক্তি:] ... তবে কেন বলিলেন যে ইংরেজ কি চিরকালই এদেশে থাকিবে! হ্যাঁ নীলকাজ বন্দ হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজ চিরকালই এদেশে থাকিবে। আপনারা যে এক জোট হয়ে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, নীল নাও হতে পারে, নীলকর সাহেবরাও আর নীল বুনানী করবেন না। তাঁদের যা কিছু করা—এই দেশের লোক দ্বারাই করেন।... অন্য কারবার আরম্ভ করবেন। আপনারা যে তাহাদিগকে এ দেশ হতে তাড়াতে ফিকির করছেন তাহা কখনই পারবেন না। নীল না হয় তার যে উপায় থাকে করুন আমি তার মধ্যে আছি। কিন্তু নীলকর ইংরেজ তাড়ান মধ্যে আমি নই।....

১২৪ এক বৎসর খাটিয়া মীর মহেব আলী এইক্ষণে নীলবিদ্রোহী সময়ে প্রজার দলে মিশিয়াছেন। সাগোলামাজ্জমও প্রজার দলে... কোম্পানীর আমলে বাঙ্গলা দেশে দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। জমিদারেরাই প্রজার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা ছিলেন। জমিদারের অত্যাচার প্রজার অসহ্য হওয়াতেই যেন তাঁহাদের আর্ত্তনাদে পরম কারুণিক দয়াময় জগদীশ্বর ইংরেজ নীলকরকে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন।...প্রজা জমিদার তালুকদার নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে কতই নাজেহাল হইয়াছেন, কত অপমান ভোগ করিয়াছেন, তাহা উদাসীন পথিক দেখাইয়াছেন।...দৌরাত্ম্য,

১৩৩ অবিচার, স্বার্থপরতার শেষ সীমা পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে, সাধারণ প্রজার মনে একতার ভাব উদয় হয় না। প্রজা নীলকুঠীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া

জোটবদ্ধ হইল। শেষে কার্য্যও করিল—সফলকামও হইল। সমুদায় নীলকুঠী দেউলিয়া—ঋণদায় জমিদারী দালান কোঠা খরিদ করিয়া লইলেন।

১৩৪ নীল বিদ্রোহের পরেই আমার পূজনীয়া জননীর পীড়া। বৎসরকাল ... ভোগ করিয়া ... দেহত্যাগ ... আমার বয়স ১৪ বৎসর ... মহ্‌ তেসামের ৪ ... বক্তলাল হোসেনের ... দেড় ... ।

...সেতার বাদ্য মধ্যে আমার পিতা—বেহালা বাজাইতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। [বেলগাছির জমিদার] করিমবক্স চৌধুরি সাহেব গত্‌ বাজাইতে ওস্তাদ ছিলেন। ... যেদিন কন্যা মরিয়াছেন — কন্যার দাফন কাফন শেষ করিয়া আসিয়াই [পিতা] সেতার লইয়া বসিয়াছিলেন সারাটি রাত্রি সেতার বাজাইয়াছিলেন।... অনবরত দুই চক্ষের জলে গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া বুক বহিয়া

১৩৫ পড়িতেছে।... মাতার মৃত্যু দিনের ঘটনা আমার স্মরণ আছে।...পিতাও চক্ষের জল

১৩৬ ফেলিতে ফেলিতে, কতক্ষণ পর বলিয়া উঠিলেন। — আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হইল না। আজ দুইটা বৎসর আমি তোমাকে দেখি নাই। তুমিও আমাকে দেখ নাই, অথচ এক বাড়ীতেই দুজন বাস করি।... তুমি তোমার মনের ঘৃণায় আমাকে ডাক নাই আসি নাই। আমিও আমার মনের বলে ... আসি নাই। আজ শুনিলাম তুমি সকলের মায়া মমতা ত্যাগ করে ... মুখের আবরণ ফেলিয়া দেও — জনমের মত তোমাকে দেখিয়া যাই।...

ষষ্ঠ খণ্ড। ১৩১৫ ফাল্গুন।

১৪৫ ...পিতা নিরবে দুই চক্ষের পানি ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। জননী তাহা অনুমানে বুঝিয়া মুখাবরণ সরাইলেন চক্ষে জলধারা।

১৫১ ...আমাদের দেশের লোকে সে সময়ে সাহেবের নাম শুনিলেই কাঁপিয়া উঠিত।... দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে মেড়ুয়াবাদী এক জাতি আছে। তাহারা সকলেই নৌকায় থাকে, নৌকায় শিল পাটা তিশি গম, পাথুরিয়া চুন বোঝাই করিয়া পশ্চিম দেশ হইতে উত্তরাঞ্চলে লইয়া যায়। ... গৌর নদী হইয়া বহরে বহরে নৌকা যাইত। ... মেড়ুয়াবাদী অর্থাৎ পশ্চিম দেশীয় নৌকার বহর উজান মুখে চলিলে গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া যাইত। স্ত্রীলোকের ঘাটে যাওয়া বন্দ হইত।...

১৬৪ ...এখন আর আমি বালক নহি—যুবক। ... বিদ্যাশিক্ষা এখানেই যেন ইতি বোধ হইতেছে।... কুমারখালীতে ইংরেজী স্কুল হইয়াছে, বাটী হইতে ছয় মাইল ব্যবধান। তাহার পর ইংরেজী পড়িলে পাপ ত আছেই। আর মরিবার সময় গিডী মিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ্‌ রসুলের নাম মুখে আসিবে না। তাহার পরেও আত্মীয়স্বজন গুরুজনগণের ধারণা যে ইংরেজী পড়িলে, একরূপ ছোটখাট

শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, সরাব খায়। অবহা ঝটকার বিচার নাই। হাল্লাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক নাপাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাট করিয়া নানা ভাবে ছাঁটে, সাহেবী পোষাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।...

১৬৫ এই সময় আমার কার্য্য বাংলা চিঠিপত্র আর বাঙ্গলার হেঁয়ালী লিখা। আমার প্রথম হেঁয়ালী যথা—

কামারের মার ফেলে
পাঁঠার ফেলে পা।
লবংগের বংগ ফেলে
বেছে বেছে খা॥

...ফারসী বিদ্যা ... অক্ষর পরিচয়, বানান করিয়া পাঠ, আর কতকগুলি পদ্য মুখস্থ আওড়ান ভিন্ন সে বিদ্যা যেন কিছুই এ ধড়ে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু সাজিয়া গুজিয়া মুন্সীজিকে সংগে করিয়া আমরা ৫.৬ জন শিষ্য অন্য কোন আত্মীয় বাড়ীতে বয়েত বাহাস করিতে যাইতাম।...

১৬৯ ...পূজনীয় পিতা পুঁথি শুনিতে বড়ই নারাজ।

সপ্তম খণ্ড। ১৩১৫ চৈত্র।

১৭৮ যৌবন জোয়ারায়ন্ত।
প্রথম প্রবাস।

১৮০ ....পিতার সংগে পদমদী...। চন্দন মৃগীতে নবাব মীর মহাম্মদ আলী...বৈমাত্র মাতামহী ..। . যেমন আমরা বলি দেখ নাই, পদমীর লোকে বলে দেহ নাই। ঘোড়াকে বলে গোরা, ঘর স্থানে ঘড়, আবার খড় স্থানে খর। ভাই স্থানে, বাই, চক্ষে দেখ না চহি দেহ না, ভাত বাত, নারকল নারেল, বেল—ব্যাল তেল—ত্যাল, এইরূপ কাপর, মুরি, ছেরা—নানা কথার পরিবর্ত্তন ভাব দেখিলাম।

১৮১ ...নবাব সাহেব খুব ভালবাসিলেন।... পূজনীয় পিতার সহিত নানা-প্রকার আমোদ আহ্লাদ করেন।... গান বাজনার মজলিস প্রায়ই হইত ... যাওয়ার অধিকার ছিল না। . গোপনে দালানের অন্য কক্ষে থাকিয়া ... শুনিতাম। স্ত্রীলোকেরা নাচ করিত তাহাও গোপনে গোপনে দেখিতাম।

১৮২ [নবাব বিরোধী মাতামহীর উক্তি]

১৮৮ একদিন নবাব সাহেবের বজরার মধ্যে বসিয়া আছি। আহারান্তে নবাব সাহেব তাস খেলিতে ইচ্ছা করিয়া তাস হাতে লইয়া বঁটিতে লাগিলেন। .. কি

একটা নাম ধরিয়া ডাকিতেই একটি স্ত্রীলোক, পিছনের কামরা হইতে আসিয়া নবাবের বামদিকে সেঁসিয়া বসিল এবং নবাবের হাত হইতে তাস কাড়িয়া লইয়া নিজেই ফিটিতে লাগিল। প্রাণের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। কারণ নবাব সাহেব গুরুজন, তাহার পর স্ত্রীলোকের সঙ্গে এরূপ একত্র এক বিছানায় কখনও বসি নাই। ... প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। .. [নবাব সাহেব:]— খেল। দোষ কি? আমার সংগে খেলা করিবে তাতে কোন কথা নাই। তবে নিতান্ত ছোট লোক নীচজাতি বদ্‌লোকের সঙ্গে খেলা করা, তা যে খেলাই হউক, এমনকি! বসা-ওঠা নিতান্তই অন্যায়। খেলা করা দেল বহলান ইহাতে কোন দোষ নাই। জানত, খেল। ...

১৮৯ ...সে খেলও আবার বিবি ধরা। ...এক দুই করিয়া ৭ বার...

১৯১ বিবি ধরিলাম।

১৯২ ...বাইজি খেমটাঅলীদিগের নৌকা ঘাটে লাগিয়াছে। ...নবাবই আলাপ... করিতেছেন।

১৯৫ ...কোন কথা নাই—তবু ভয়। নির্দ্দোষ হৃদয় সদাসর্বদা নির্ভয়, সুস্থ ও সবল। সেই বজরায় যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কয়েকদিন তাস খেলা করিয়াছি, তাহার চক্ষে চক্ষু মিলাইয়াছি, ভ্রূর টান সেও দেখাইয়াছে, আমিও দেখিয়াছি। কপাল কুঞ্চনও তাহাই। সময় সময় খেলার ভাবে নয়ন বাঁকা—ভ্রূ বাঁকা সেও দেখাইয়াছে আমিও বাধ্য হইয়া দেখাইয়াছি। ঈষদ্ হাস্যভাব—দুইয়ের দেখাদেখি হইয়াছে। মুচকি হাসি তাহাও ঐ খেলার জন্য, এক কথায় দুই অর্থ—প্রকাশ্য আর গুপ্ত। তাস নিক্ষেপ চটাপটী—বল পরীক্ষা ইত্যাদি কারণে মনে নানা ভাবের উদয় হইয়াছে।...

১৯৭ বাইজীর হাত-পা নাড়া, চখ্‌ ঠারা, মাথা কাঁপান, দেহ দোলান, বক্ষস্পন্দন, কটিচালন যাহাকে নাচ বলে, তাহা দেখিলাম ...।

২০৯ অষ্টম খণ্ড। ১৩১৬ বৈশাখ।

মাষ্টার বাবু বলি এখন দেখুন চন্দ্রপীড় শব্দ। ...আমি ছোট পুস্তকখানি পড়িয়া দেখিলাম,—কাদম্বরী, আর পুস্তকের নাম পড়িয়া দেখিলাম শব্দার্থ প্রকাশিকা। ...চুপি চুপি পড়িতে লাগিলাম।

২১০ ...পদমদী অঞ্চলে চিরকাল বাঘ শূকরের ভয়। যে সময়ের কথা সে সময়ে শূকর অপেক্ষা বাঘের ভয় বেশী ছিল। ... খরাপাতিয়া শ্রীকণ্ঠ মাছ ধরিতেছিল...বাঘ...

২১৫ এই অঞ্চলে তিন প্রকারে বাঘ মারে। ১। বাঁশপাতা ফাঁদ। ২। খোঁয়াড়, ৩। তীর পাতিয়া।

২২৪ [বংশ পুরান। মাতামহীর জবানীতে।]

২৪৪ নবম খণ্ড। ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ।

....যদি তোমার বাপ অন্য স্ত্রীলোক ঘরে না আনিতেন, যদি আপন স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে না রাখিতেন, তাহা হইলে তোমার মা অকালে মরিবেন কেন?... সতীনের যন্ত্রণা আগুনে পীর পয়গম্বরের মেয়েরা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারে-খারে গিয়াছেন। আমরা ত কোন ছার। বিবি হনুফার জন্য বিবি ফাতেমা জ্বলিয়াছেন। তারপর ইমাম হাসানের স্ত্রী জায়েদা জয়নাবের কথা...?

২৫৭ [কলিকাতা অভিযান]

২৬৪ ...পদমদী যাইয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম। নূতন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে...।

দশম খণ্ড। ১৩১৬ আষাড়।

২৭৪ মাষ্টার বাবু প্রতি রাত্রেই নবাবের মজলিসে আসিতেন গান করিতেন, তাস খেলিতেন, পণ্ডিত মহাশয় বসিয়া থাকিতেন।...অতি গুপ্তস্থানে বসিয়া আমদ

২৭৫ আহ্লাদ নাচগান, রগড় রহস্য দেখিতাম।...মনোমোহিনীর শয়ন শয্যার এক

২৭৬ পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া প্রমদ কুঠুরীর সমুদয় অবস্থা দেখিতাম। এই তাস খেলার কল ভবিষ্যতে মহা বিষময় ফলিল।... সর্ব্বদা মেলামেশার গুণ অতি চমৎকার। নিজে ভুগিয়া ভোগ করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত বুঝিলাম, সর্ব্বদা মেলামেশা একত্র

২৭৭ বসা-উঠা, একত্র আহার ইত্যাদি কার্যে যাহাদের সহিত একত্র মেশা যায়, অর্থাৎ যে মিশিতে যায় সে যদি কাঁচা মন, কচি মাথা, দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া মিশিতে যায়—তবে সে পাকা মন, সুদৃঢ় মস্তক এবং সবল হৃদয়ের অনেক গুণ, মস্তকের বহু ভাব, পাকা মনের অনেক গুণ সঞ্চয় করিতে পারে।... পাকা পোক্তর কিছু হয় না, মরণ হয় কাঁচার।...

২৭৯ ...হল কামরায় প্রায়ই বাত্তি থাকে না।...থাকিলেও এক কোণে সামান্য...। ঘরের মধ্যে আসিতেই দেখি সম্মুখে মোহিনী মূর্তি। সেই এক প্রকার স্নেহে আমার হাত ধরিয়া বুকে বুকে স্পর্শ করিয়া মুখের উপর সেই মোলায়েম সুগন্ধিযুক্তগণ্ডস্থল রাখিয়া আমায় কয়েকটি কথা চুপি চুপি বলিলেন—এবং আমার হাতে কয়েকটি পানের খিলি দিয়া বলিলেন, ফেলিও না, মার খাইবে। বেত লাগাইব। আমি দেখিব। ওখানে বসিলেই দেখিতে পাইব। তুমি ফেলিয়া দিয়াছ কিনা।...

২৮১ অভ্যাস দোষে, সংগ দোষে এরূপ হইল, যে আর পড়িতে ইচ্ছা হয় না। স্ত্রীলোকের সংগে হাসি রহস্য তাস খেলিতে ইচ্ছা করে। একটি বৎসর এইভাবে...। পিতৃদেবের আদেশ কৃষ্ণনগর যাইয়া কলেজে পড়।...

২৮২ বগুলা ষ্টেশনে....কুলি-মজুর, সইস-কোচম্যান মুখে বাংলা কথা শুনিয়া আমি ত অবাক যে এই সকল লোক এত ভাল কথা বলে। আমাদিগকে যে কথা সন্ধান, তালাস, খুঁজিয়া মুখে আনিয়া বলিতে হয়, এরা স্বভাবতঃই অনর্গল বলিয়া যাইতেছে।...এতই মিষ্ট...এত মর্যাদাপূর্ণ...।

২৮৫ স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মধুমাখা। যেমন পরিশুদ্ধ বাংলা তেমনই লালিত্যপূর্ণ। তেমনি কণ্ঠস্বর রস পোরা।

২৮৬ কলেজে ভর্তি হইলাম। কলিজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে...। কৃষ্ণনগরের চাল-চলন দেখাদেখি ক্রমে আমার স্বভাবের উপর আধিপত্য করিতে লাগিল। দশজনের আচার ব্যবহারই আমার অনুকরণীয় হইল। কৃষ্ণনগরে মুসলমানের গৌরব মাত্র নাই। হিন্দু প্রধান দেশ। ধুতি পরিতে শিখিলাম। চাদর বা উড়নী গায়ে দেওয়া অভ্যাস হইল। মাথার চুল ছাটিয়া ফ্যাসানেবাল করিলাম। হায় হায়! বাউরী চুল কাটিয়া থাক্ থাক্ করিলাম। পিছনের দিকে কিছুই নাই। সম্মুখভাগে সিতীকাটার উপযুক্ত মত থাকিল। পাজামা চাপকান বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। টুপীটাও ক'দিন পর সহপাঠীরা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিল।... মুসলমান যাহারা কৃষ্ণনগরে আছেন, আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি। পরন পরিচ্ছদও হিন্দুয়ানী। চালচলন হিন্দুয়ানী, কান্নাকাটি হিন্দুয়ানী। মুসলমানের নামও হিন্দুয়ানী যথা—সামসদ্দীন, সতীশ। নাজমাল হক, নজু। বোরহান, বিরু। লতীফ, নতু। মশাররফ, মশা। দায়েম, দাঁশ। মেহদি, মাদি। ফজলল করিম, ফড়িং। এই প্রকার নামে ডাকা হয়।...তেল মাখিয়া বাজারের ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া হয়। ভিজে কাপড়ে বাসায় আসিয়া কাপড় বদলাইতে হয়।...

২৮৯ একবার কলিকাতায় গেলে মুন্সী নাদের হোসেন পুত্র কারাম মাওলা ওরফে চাঁদ মিয়ার সহিত দেখা।...

২৯৫ ইতিমধ্যে নাজির সাহেব আসিয়া...বলিলেন...আমার বাসা এখানেই আছে, কারাম মওলাও কালীঘাটের স্কুলে পড়ে, আমার ইচ্ছা যে আপনিও আমার এই বাসায় থেকে কালীঘাট স্কুলে পড়ুন। আপনার বাবার নিকট আমি লিখিয়া পাঠাইতেছি।...

একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড। ১৩১৬ ফাল্গুন।

বিজ্ঞাপন।

আমার জীবনী দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশ হইয়া আপাততঃ কিছু দিনের জন্য বন্ধ রহিল।...

আমার নিবেদন।

আমি এইক্ষণে জিয়ন্তে মৃতবৎ হইয়া আছি। দুঃখের কথা কি বলিব, বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ আমার জীবনের জীবনী প্রিয়তমা সহধর্মিনী বিবি কুলসুম পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি আছি এইমাত্র বিশ্বাস। কিন্তু কোন বিষয়ে আমার উৎসাহ যত্ন বাসনা সাধ কিছুই নাই। এই সকল কারণে জীবনী প্রকাশে আরও বিলম্ব হইল। আমার দুঃখে যদি কেহ দুঃখ বোধ করেন, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। বিবি কুলসুম নামে একখানি পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশ হইবে।

অধুনা—জীবন্মৃত

মীর মশাররফ হোসেন

পদমদী

বিদায়।

চির বিদায় নহে। কিছু দিনের জন্য বিদায়। ... পূর্ব্বে কত কথা, কত মধু বোল, ১৷৹ আনা দিবার বেলায় গোল বাধিয়া গেল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ঐ খরচায় বার সংখ্যা দিব। বাধ্য হইয়া প্রকাশে বাধ্য হইলাম।...এই বার সংখ্যা জীবনীতে আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। যাহা হউক জীবনের প্রথম হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত (বিবাহ ঘটনা) প্রকাশ হইয়া রহিল। জীবনের চারিভাগের এক ভাগ প্রকাশ হইল। অদ্য পর্য্যন্ত (১৩১৬ সালের ভাদ্র মাস) ৪৩ বৎসরের ঘটনা প্রকাশে বাঁকি রহিল। ···

১৩১৬ সন
১লা ফাল্গুন।

বিনয়াবনত—
জীবনী লেখক।

৩০৬ কলেজ একমাসের জন্য বন্ধ হইল। চাকরটীকে সংগে করিয়া বাড়ীতে আসিলাম ... চিকণ ধুতি পরিয়া কোঁচা ঝুলাইয়া সিতী কাটিয়া, খোলা মাথায়—জীবনে তাঁহার (পিতার) সম্মুখে যাই নাই। এই প্রথম গমন।··· কৃষ্ণনগরের কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিনদ সেথ দ্বারা তোমার খাওয়ার জন্য গোমাংসের ঝুরি পোরা সমশ পিঠে,—আর মুরগীর ডিম যাহা পাঠান হইয়াছিল ... তোমার বাসায় লইয়া যাইতেই নাকি অনেক ছেলেরা কাড়াকাড়ী করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল!... হাঁ তাহারা সকলেই খায়।... হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন রূপই ভিন্ন ভেদ

৩০৭ মনে করে না। আমাদের দেশের মত নহে ...। পিতা বলিলেন আমি বড়ই খুসী হইলাম। হিন্দু মুসলমান এরূপ প্রণয় ভাবে জীবন কাটাইলে, সে জীবন যত সুখের সে সুখ আর কোন সুখ নাই। কলিকাতা হইতে নাজীর সাহেব পত্র লিখিয়াছেন, তোমাকে তাঁহার বাসায় রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবেন। সমুদায় খরচপত্র তিনি দিবেন।...

৩০৯ ...লেখাপড়ার নাম কাহারও মুখে শুনিনা। ... চাঁদমিয়াঁর মুখেও না। ... সে ... কেবল দাবা আর তাসেতেই মজিয়া আছেন। আবার বারুণীঠাকুরাণীর সহিত অতি নির্জ্জনে দেখাশুনা আলাপ প্রলাপ করেন। — আমার সহিত ঠাকুরাণীর এতদিন বিদ্বেষ ভাবই যাইতেছে। লম্বোদরী ক্ষীণ গ্রিবা ঠাকুরাণীর বহু প্রলোভনের মধ্যে আমি প্রায় তিনটি বৎসর কাটাইয়াছি। গায়ের রক্ত দেহের আত্রান মনমজান, প্রাণমাতান ভাব, দেখিয়া ঠাকুরাণীর পদসেবা করিতে আত্মমন সমার্পণ করিতে ইচ্ছা হইত, কারণ বড় বড় মহানুভব ঋষিতুল্য জ্ঞানী, পূজ্যপাদ গুরুজন, প্রাণসখা বন্ধুগণ হরিহরাত্মা ...

৩১০ আমার বিবাহ প্রস্তাব লইয়া বহুক্ষণ যাদু আমার পিছনে লাগিয়াই আছে। যাদু গ্রাম্য লোক নিরক্ষর নাজির সাহেব সাহেবের খানসামা বিদ্যা নাই বুদ্ধি কিছু কিছু আছে। সে একটানা ...।

৩১২ ...বড় বিবি যেমন খাপসুরাত তেমনি দেখিতে আপনার সংগে এমনি মানাইবে যে খোদাতালা যেন দুইজনকে জোড়া মিল করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। নাজির সাহেবের তিন মেয়ে — বড় মেয়ের নাম লতিফন, আর মেজটার নাম আজীজন। দুইটির বিবাহই হইবে। লতীফন বিবি ভারি খাপসুরাত, — বগা সুন্দর নয়। মেজেটা বগ ধবধবে সুন্দর। ... বড়বিবি ... লিখাপড়াতেও তেমনি ভাল। হেবাল তুল্লা মামুজী লিখাপড়া শিখিয়েছেন। মেজটাও পড়ত কিন্তু সে এক বছরে কখগঘ পড়তে পারলেনা। হরফ কয়েকটা চিন্তে পাল্লে না। কখ দুই অক্ষর চিন্তে পারে — লিখতে পারে — কেবল ক। লতীফন বিবি অনেক পড়েছে। ... রাতদিন লেখাপড়া নিয়েই আছেন। গায়ের রং দুধে আলতা মিশান চক্ষু দুটী মোটা কিন্তু লম্বা ছন্দ। ভ্রূদুটী ভারি খাপসুরাত। হায়রে চুল! যেমনই চুলের গোছা তেমনি লম্বা পিঠ ছেয়ে মাজা পাছা ঢেঁকে একেবারে হাঁটু পর্য্যন্ত পড়েছে। শরীরে আণ্ডেট কাকে দেখাই, আপনাকে বোঝাই কাকে দেখিয়ে। মানানসই লম্বা বেঁটে নহে। এমন কোন পুতত্তের পুত নাই, কি কোন মেয়েমানুষ নাই, যে লতীফন বিবির চোখ মুখ নাক হাত পায়ে একটা খুঁত বাহির করিতে পারে। সেলাইয়ের কাজ উলের কাজ খুব ভাল জানে।

৩১৩ ঘুম হইল না। ... ক্রমে চক্ষু নাসিকা বদন বক্ষ হস্তপদ সমুদয় অংগপ্রত্যংগ এমন কি সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশকলাপ ক্রমে হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠিতে যুগল আঁখিদ্বয়ের কৃষ্ণরেখা সংযুক্ত নীলাভ তারা দুটি যেন ফুটিয়া আমার হৃদয়াকাশ উজ্জল করিয়া তুলিল।

৩১৫ আমি সুখী হইব কিনা কোন পক্ষই দেখিতেছেন না। নাজীর সাহেব টাকাকড়ি না দিয়া তাঁহা অপেক্ষা উচ্চ ঘরের একটি ছেলেকে ফাঁদে আটকাইতে পারিলেই তাঁহার আশা পূর্ণ।...... আমি এখন বিবাহ না করিয়াই বা কি করি? ...

৩১৮ [যাদু:] হুজুর কাল রাত্রে আমাদের সকল চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে তোমরা মীর সাহেবকে কেহই মীর সাহেব বলিয়া ডাকিতে পারিবা না। বড় দুলামিয়াঁ বলিয়া ডাকিও। আজ হইতে আপনি আমাদের বড় দুলামিয়াঁ।...

৩১৯ যদিও বিবাহ হইতে এখনও তিনমাস বিলম্ব ... মক্কার পুব চলিয়া যান ...।

৩২৫ আমি শুইলাম। চাদর খানা পরিষ্কার — ধুইয়া আইসার পর আর ব্যবহার হয় নাই। কিন্তু বালিশটা খাঁটি নয়। বালিশের খোল ধবধবে। কিন্তু কাহার যেন মাথার নীচে ছিল। স্ত্রীলোকের মাথার সুঘ্রাণ তেলের অতি উত্তম ঘ্রাণ... ভাবিলাম, এ কার বালিশ আমাকে মাথায় দিতে দিয়াছে? কর্তৃর বালিশ?

৩২৬ তাহা দিবে না। তাঁর মাথার চুলের গন্ধ এরূপ সুগন্ধিযুক্ত হইতে পারে না। ফজলে হাকমিয়াঁর স্ত্রীর বালিস! তাও নহে, তিনি শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়াছেন, অমনি মাথার বালিশটি ছাড়িয়া দিয়াছেন অসম্ভব। ফজলে হাক মিয়াঁর মধ্যম ভগ্নি সে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাইবে কেন? তাহার নিদ্রা ভংগ করিবে কেন? বাড়ীর লোকেও জানে পূর্ব হইতেই চিঠিপত্র আসিয়াছে, খবরা খবর হইয়াছে— সকলেই জানে আসিতেছে। — যার যেখানে ব্যাথা সেখানেই তার হাত। বালিশ আর কাহার নহে ...

৩৩০ যে মুখখানি খুব ফুটফুটে সুন্দর দুই ঠোঁটের দুই দিক বহিয়া পানের লাল পড়িয়া রঙ্গ হইয়াছে, দূর হইতে মুখের কেতা ভালরূপ দেখা গেল না, তত্রাচ যাহা নজরে পড়িল—নাক যেন একেবারেই নাই। মুখখানা গোলগাল গাড়ীর চাকার মত। তিনিই উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, আর হাসিয়া কুটি কুটি হইতেছেন।... [যাদু:—] ছেলে মানুষের মত তাঁহার ব্যবহার নহে, তাঁহার ভাবি সাহেব তাহার চাইতে বয়সে বেশী, কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনায় একেবারে হালকা, বড়ই হালকা, ভারিত্ব নাই। বড় বুবুজানের মত ধীর গম্ভীর নাহেন। ভাবি সাহেব বড়ই হাসকুটে,... আর বড় বুবুজান বাবা! তাঁহার মাতা এই সকল দেখে মেয়েকে ভয় করেন।... সামান্য কথায় যেমন মাজিলা বুবুজানেরা হাসিয়া কুটীকুটী হন, বড় বুবুজান তেমন নহেন। ... যেদিন আমরা এসেছি তার

পরদিনই…বড়মিয়া আপনার কষ্টের কথা পায়ে ফোস্কার কথা, সারাটি দিন না খাওয়ার কথা যখন তাঁহার মায়ের কাছে বলিলেন, মা বিবি ত খুব আপসোস কর্তে লাগলেন…।

৩৩২ মেজ বুবুজান … হেসে আটখানা হলেন।….বড় বুবুজান…হাসলেন না। উঠে চলে গেলেন। ভাবি সাহেব কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেন। আর বেশী হাসি হয়েছিল আপনার শোবার বালিস লইয়া। মেজ বুবুজান শুয়ে শুয়ে কেচ্ছা শুনিতেছিলেন। চাহিলে বলিলেন আমার বালিস কেউ নিও না, বলিয়াই বালিসের উপর বসিয়া রহিলেন। তাহার পর মা বিবি ভাবি সাহেবের নিকট …চাহিলেন যে বাহিরের একটা ভদ্র সন্তান আসিয়াছে তোমার মাথার বালিসই হউক, কি অন্য একটা বালিস দাও। আমার…আছে কিন্তু বড়ই ময়লা …। ভাবি সাহেব বলিলেন, আমার বালিসের ওয়ার ময়লা। আজ আবার তিনি আসিয়াছেন তাহার জন্য একটি মাত্র ফরসা ওয়ারের . বলেন ত সেইটাই দিই। মা বিবি…ভাব বুঝিয়া বড় বুবুজানকে জানাইলেন।…বাক্স খুলিয়া নূতন ধোয়া চাদর, আর আপন মাথার বালিস দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন।… নূতন ওয়ার বাক্স হইতে বাহির করিয়া আরেক বালিসে পরাইয়া নিজে রাখিলেন …। মা বিবি বড় বুবুজানের কথায় কার্য্যে কোন কথা কহেন না। তিনি জানেন বড়মিয়াঁ অপেক্ষা, বড় বুবুজানের বুদ্ধি বেশী। নাজীর সাহেবও সময় সময় বলিতেন, যে লতিফনের

৩৩৩ বুদ্ধি বিবেচনা ফজলে হকের নাই, বিদ্যাও নাই কি করিব। বুবুজান নিজের মাথার বালিস…। আমি ভাবিলাম নূতন ওয়ার বাহির বাটীতে আপনার জন্য দিবেন। আমি পূর্ব্ব বালিস হাতে করিয়া ভাবিতেছি! কি করি, বেশী কথা বলিলে তিনি চটিয়া জান কি করি? আমি বিলম্ব করিতেই আমাকে এক ধমক দিয়া বলিলেন, তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বালিস বিছানা লইয়া যা— আমি কেবল বলিয়াছি, ঐ বালিস? আর যাবে কোথা? আগুন হয়ে বলে উঠলেন—তোর বালিস! না আমার? তোর সে কথায় কাজ কিরে গোলাম ….। আমি বলি…তাঁহার হাতের লেখা আমাকে দেখাতে পার।…পরদিন যাদু আমার পা টিপিতে আসিয়া একখানা টুক্‌রা কাগজ আমার বালিসের নীচে রাখিয়া চলিয়া গেল।…অক্ষরগুলি পরিষ্কার গোটা গোটা জড়ান নহে।… "কাকে বিষ্ঠা খায়--অনর্থক

৩৩৪ ডাকে। পেটে কিছু রাখে না। ছোট লোক মূর্খ যা ইচ্ছে তাই খায় পেটে রাখে না। কথা ভাল, কিন্তু সমাজ ভেদে দোষ-গুণের প্রভেদ। মূর্খের দলে বদনাম। ব্যস্ততায় নানা বিঘ্ন। কিছুই গোপন থাকিবে না। শয়ন শয্যা স্বহস্তে পরিষ্কারের আশা। যেখানেই পাইবেন, সেখানেই রাখিবেন। পাইব।—

কেহ নয়।

কালি কলম।"

৩৩৫ [লতীফন বিবি যাদুকে:] ...যা! এখন যেখানে যাচ্ছিস সেখানে যা। তিনি যখন চাহেন নাই তোকে দিব কেন? আর তিনি লেখাপড়া জানা মানুষ। এসেছেন বিদেশে, পরের বাড়ীতে আপন দোত কলম লিখার সরাঞ্জাম ছেড়ে এলেন কেন?...এ বাড়ীতে যে লিখাপড়ার নাম নাই.. তিনি জানেন না? আমি দিব না। কখনই দিব না। .. চলে যা, কিছু পাবি না।... ফজলে হাক...বলিলেন ...আপনার লিখাপড়া করা অভ্যাস...লতীফনের কাছে ভাল ভাল বাংলা কেতাব আছে, তাহা দেবে না। কেতাব কাহাকেও দেয় না।...

৩৩৭ "...আপনি বোধ হয় ব্যস্ত হইয়াছেন। বিদেশ, আপন লোক কেহই সঙ্গে নাই। আপন বলিতেও কেহ নাই—সকলেই পর—এ কয়েকটা কথা মন হইতে চিরকালের জন্য দূর করিবেন। এখানে সকলই আপনার, পর কেহই নাই। আপনার জীবনের সঙ্গিনী আপনার সুখ দুঃখের ভাগিনী যে, সেই এখানে আছে। জগতে এমন মায়া মমতা—এরূপ ভালবাসা, সম্বন্ধ কাহার সহিত নাই ও হইবে না—সেই এ বাড়ীতে আছে। ব্যস্ত হইবেন না, ধৈর্য্যগুণ বড় গুণ—বহুকালের কথা! আপনার নিকটে বলিতে লজ্জা হয়—'সবুরে মেওয়া ফলে'। আপনার উপরে—আপনার হস্তে যে আত্মমন, দেহ, জাতী কুল, মান-মর্য্যাদা সমর্পণ করিবে সেই এখানে আছে—। প্রতিদিন এক পথে বেড়াইবেন না। এই গ্রামে আবাল বৃদ্ধ সকলেই

৩৩৮ আপনাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সকলেই দেখিতে ইচ্ছা করে। যেখানে পান, সেখানেই রাখিবেন।

আপনারই
ল"

...লিখিলাম—

"প্রথম ছত্রে 'প্রা' লিখিয়া কাটিয়াছেন। তাহার পর—'প' লিখিয়া কাটিয়াছেন। আমার মন সন্দেহ যুক্ত নয়, খাঁটী মন। যাহা মনে তাহাই মুখে। কি বলিয়া সম্বোধন করিব? মনের কথা বলিতেছি, ঠিক করিতে পারিলাম না। আজ আপনি কিছু বলেন নাই, আমিও কিছু বলিলাম না।...আমাদের সমাজের গতি চমৎকার। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। যে সম্বন্ধ উপস্থিত ইহাতে স্ত্রীলোকের প্রতি বহু পরিমাণে নির্ভর করা কর্ত্তব্য। তাহা সমাজে কৈ? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে কে? পিতামাতা ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন।...ভাঙ্গিয়া দেন ...। এই যে এক ভয়ানক প্রথা—ইহার জন্যই আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে।

তোমারই আমি।"

৩৩৯ রাত্র প্রভাত হইল, প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুসলমানের বিবাহ পদ্ধতি—মনের কথা যাহা মনে উদয় হইল, যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে তাহার দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য লিখিলাম।..

মধ্যম কন্যার বিবাহ জন্যেও ঘটক ছুটাছুটী করিতেছে।... পানীশারা গ্রামে মীর হোসেন আলীর সহিত মধ্যম কন্যার বিবাহ স্থির হইল।... সকলেই বলে মধ্যম কন্যাটা হাবা—এক প্রকার পাগল। বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নাই, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলে, মনে হিংসা পোরা, দেখিতে খুব সুন্দরী—অর্থাৎ গায়ের রং খুব

৩৪২ পরিষ্কার সাদা ধবধবে। . বেআক্কেল—পশুর সমান।...বালীস উঠাইয়া চাদর উঠাইতেই দেখি.. প্রথম লিখা আছে, মাথা খাও পত্রখানি বুঝিয়া পড়িও। উপরি উপরি ভাবে পড়িও না—আজ মন খুলিয়া লিখিলাম। আর শীঘ্র লিখিব না।—দুইবার পড়িও।

"ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। আমি তোমার, তুমি আমার! তুমি আমার স্বামী আমি তোমার স্ত্রী। ধর্ম্ম সূত্রে বাঁধা পড়ি নাই, তুমিও বাঁধা পড় নাই। তবে কি সাহসে এমন গুরুতর সম্বন্ধে সম্বোধন করিলাম। আমি তোমায় ভাল রূপে জানিয়াছি। আজ দুই মাস গত হয় তোমার মন পরীক্ষা করিয়াছি। তোমাকে চিনিয়াছি। আমি এ জগতে থাকিতে তুমি অন্য কাহারও হইতে পার না। আমিও মনে মনে বুঝিয়াছি স্থির করিয়াছি, তোমায় ছাড়া আমিও অন্য কাহারও হইতে পারি না। কারণ তোমার কথা অচলের ন্যায় অটল খাঁটি এবং বলবত। আমার কথা উলট পালট করিবার সাধ্য কাহারও নাই। "যদি" কথায় যেমন কথায় বাধা পড়ে, "কিন্তু" কথায় কথাটা উল্টাইয়ে দেয়। তোমার আমার কথায় "যদি"ও বসিতে পারে না, "কিন্তু" ও আসিতে পারে না। তথাচ বলিয়া রাখি। তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া আমাকে মরিতে দিও দাসীর এই ভিক্ষা।

তোমার বামে বসিতে আমার যেরূপ বাসনা, নিশ্চয় আমাকে বামে বসাইতে তোমারও সেইরূপই ইচ্ছা। আমার প্রতিজ্ঞা — ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা জীবনেও তুমি জীবনান্তেও — তুমি আমার, — মনে সুখ জন্মিল না। কথাটা চাপা দিয়ে শান্তি বোধ হইল না। মনের আবেগ রক্ষা করিতে পারিলাম না। জীবনেও তুমি আমার স্বামী, জীবন অন্তেও তুমি আমার স্বামী। প্রাণ জুড়াইল। আজ তাপিত প্রাণ শীতল হইল। আমাকে দেখিবে লিখিয়াছ। তাহা বলিতে পার। কারণ আমি তোমাকে প্রতিদিন দুই তিনবার করিয়া দেখি। যখনি দেখি,

৩৪৩ বোধ হয় তুমি যেন কি ভাবিতেছ! তুমি পুরুষ তোমার ভাবনা কিসের! আর যদি আমার জন্য ভাবনা, সে নিতান্তই ভুল। যে ভাবনাই হউক আমাকে লিখে জানাইও। আমিও ভাবিব। কারণ আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী। ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে আমাকে একবার দেখিতে চাও কেন? আমি কি তোমার মনের মধ্যে আঁকা নাই? যে চক্ষে দেখিতে চাও সে চক্ষের উপরে শূন্যভাবে আমার

ছায়া সর্ব্বদা তোমায় দেখিতে কি ছায়া করে নাই? সে ছায়ার ছায়া কি তোমার তোমার নয়নে পতিত হয় না? আমার আছে। তোমার থাকিবে না কেন?"

৩৪৪ [আজ বুধবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ। বিয়ে হবে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে ১৮৬৫। গায়ে হলুদ আচারাদি প্রসংগে লতীফনের নির্দেশ ছিল কেউ যেন মীর সাহেবকে অনাত্মীয়ের মতো এই আচারের বাইরে ফেলে না রাখে।

৩৪৯ লতীফনের মাতার অনুরোধে মীর সাহেবের অন্দর মহলে গেলেন] ... আমার সম্মুখে দেয়ালে একখানা বৃহৎ আয়না টাংগানো আছে — দক্ষিণ পার্শ্বে অতি নিকটে বারান্দায় একটি কামরা। বোধ হয় দুই হাত ব্যবধান। ...দ্বারে বৃহৎ একখানি পর্দ্দা ঝুলিতেছে। ... মাথা তুলিয়া নিজের ছায়া সম্মুখের দর্পণে দেখিতেছি, ... আমার পিছনের দ্বার কপাট বন্ধ। আরসীতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ঝিলিমিলি আছে, বন্ধ করা। ... পর্দ্দার মধ্য হইতে কথা আসিল ... মা... করিতেছেন। ...

৩৫২ পর্দ্দার ভিতর হইতে চিঠি পড়া শেষ হইল। কে পড়িল বুঝিতে পারিলাম না। .... "... তোমার মা নাই ... তুমি আমার পেটে সন্তান তুল্য। " আমার

৩৫৪ চক্ষে জল আসিল। ... ফজলে হক মিঁয়া আমার কথা শুনিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার গমন দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ বৃহৎ দর্পণের দিকে আমার নজর পড়িতেই, অপরূপ এক নারীমূর্ত্তি ছায়া নজরে পড়িল। পিছনের সে খড়খড়ি যুক্ত কপাট সরিয়া গিয়াছে। ঠিক চৌকাট নিকটে যুবতী যেন আমার পশ্চাদ্দিকে দাঁড়াইয়াছে। অতি শুভ্র একখানা রুমাল দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ক্ষণকাল পরে চক্ষুর আবরণ খুলিল, চক্ষে চক্ষে মিলিল — চার চক্ষু একত্র হইল, চিনিলাম। হৃদয়ে অংকিত ছায়া, নিঃসন্দেহে যাহা ভাবিতাম তাহা ভাবিয়া লইলাম। দর্পণ মধ্যস্থিত যুবতীর চক্ষু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর লাল হইয়াছে। সমুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইয়া শ্যামজ্যোতি মাঝে মাঝে চমক মারিতেছে। সেই ঈষৎ লোহিত অধর ওষ্ঠে হাসী নাই। বিস্ফারিত জোড়া ভুরুযুক্ত চক্ষে আনন্দের চিহ্ন নাই। আমার মুখের উপর চক্ষু পড়িয়াই আছে। আমি সময় সময় মুখ হইতে পদতল পর্য্যন্ত একবার চক্ষু ফিরাইয়া আবার সেই মুখখানির প্রতি চাহিতেছি। প্রতীমাঘরের দেবীদিগের চক্ষুভাব যেরূপ স্থির, ধীর — এও সেই প্রকার। আমি আমার হৃদয় প্রতিমা দেখিতেছি। আর কথা কহিতেছি।

আমি এমনি হতভাগা যে আমার স্ত্রীকে আমি একখানা সামান্য চিরুণী পর্য্যন্ত দিতে পারিলাম না। দর্পণে প্রতিফলিত ছায়ায় দেখিতেছি, যুবতী দক্ষীণ

হস্ত ঊর্দ্ধে উঠাইয়া ঈশ্বরকে দেখাইতেছে, সেই তর্জ্জনী অংগুলী ললাটে স্পর্শ করিল। তখনি উভয় হস্ত উভয় পার্শ্ব হইতে উঠাইয়া অতি মোলায়েমের সঙ্গে সুচিক্কণ রেসমী বসনে আবৃত্ত বক্ষঃস্থলে বামহস্তের উপর দক্ষীণ হস্ত অনেক্ষণ চাপিয়া রাখিয়া আমার চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া স্থির ভাবে রহিল। পর্দ্দার মধ্য হইতে বলিতেছেন ...

৩১৫ এদিকে আমি আমার দুই হস্ত উঠাইয়া আমার হৃদয়োপরি চাপিয়া ধরিলাম, একটু পরেই দক্ষীণ হস্ত উঠাইয়া বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া দর্পণস্থ ছায়াকেই বক্ষের ধন অর্পণ করিলাম।... পর্দ্দার মধ্য হইতে কথা আসিল ...। দেখিতেছি দর্পণের ছায়া যেন সরিতেছে। বিবাহের চিহ্ন — হাতে সুত্র বাঁধা —হাতে একখানা পত্র খামে মোড়া ... আঁটা। ছায়া যেন ক্রমেই অগ্রসর ... একেবারে আমার পৃষ্ঠে তাহার বক্ষঃস্থল অতি মোলায়েম ভাবে স্পর্শ করিল, অতিত্রস্তে বাহুদ্বয় দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিয়া পত্র আমার সম্মুখে কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। আর দক্ষিণ দিকে ঘাড় নওয়াইয়া আমার কানে ২ তিনটি কথা বলিয়াই প্রস্থান, চাহিয়া দেখি, দর্পণে চাহিয়া দেখি আমার পশ্চাদ্‌দিগের দ্বার বন্ধ ...।

৩৫৬ আহা যে সময় তাহার সুকোমল হস্তদ্বয় দ্বারা বাঁধিয়া এক হাত আমার কান্ধের উপর, অন্য হাত দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া আমার বক্ষোপরি উভয় হাতের সম্মিলন করিয়া মাথা নওয়াইয়া রেশমী ফুলদার বসন সজ্জিত বক্ষ আমার পৃষ্ঠে চাপিয়া সুগন্ধিপূর্ণ অনুরাগ রঞ্জিত মুখখানি আমার কানের সহিত সংযোগ করিয়া যাহা বলিবার বলিল ...। মাথার কেশগুচ্ছ সেই বালিশের সুগন্ধে পরিপূর্ণ। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, সমুদয় শেষ, দ্বার বন্ধ। এ কি ঘটিল।

..."স্বামীন! আমাদের শাস্ত্রে প্রস্তাব আর স্বীকারেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, দুইজন সাক্ষীর দরকার আর একটা প্রধান কথা মোহর আনা।... শুক্রবার অবশ্যই হইবে। বিবাহ কথায় সকলেই খুসী হয় ...। আমার যদিও পূর্ব্বে একভাব ছিল, গতরাত্র হইতে আর একভাব হইয়াছে। কারণ আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি সে বড় ভয়ানক স্বপ্ন।...

৩৫৭ স্বপ্ন সকল মিথ্যা বলি কোন সাহসে? আমার স্বপ্ন বড়ই বিপদের স্বপ্ন। আমার জন্য ভাবিও না। তোমার জন্যই আমার বেশী ভাবনা তোমার নিকট আমার কোন কথাও গোপনীয় নাই। গোপনীয় ভাব নাই।... কেবল লোকাচার আচার ব্যবহার কয়েকটি কাজ বাকী। ধরিতে গেলে সে কিছু নয়। আমি তোমার। আমার জন্য তুমি বিপদগ্রস্থ হও, এ কথা আমার প্রাণে সহিবে না। তোমার জন্য আমি মরি ক্ষতি নাই। আমার জন্য তুমি মর কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া বনে জংগলে ঘুড়িয়া বেড়াও ইহা আমার ইচ্ছা নহে। প্রিয় প্রাণ!

প্রাণের ভালবাসা স্বামী! গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি তোমার আমার বিবাহ হইতেছে। ধর্ম্ম সাক্ষি করিয়া …। ইহার মধ্যে দক্ষিণ দিক হইতে এক প্রাচীন ব্যাঘ্র আসিয়া এক লম্ফে আমার ঘাড় ভাংগিয়া লইয়া গেল। তুমি বাঘের পিছনে ২ দৌড়িয়াছ। বাঘ যেন শেষে মানবরূপ ধারণ করিল। কদাকার ভয়ানক মোটা পেট আমাকে বগলে চাপিয়া লইয়া চলিল। নিশিথ রাত্রে তুমি যে গান করিয়া থাক বাড়ীর লোক কেউ জানে না। কেহ শুনিতে পায় না। যে সময়ে তুমি গান কর সে সময় কাহার চক্ষের ঘুম ছাড়ে না। আমি প্রত্যহ শুনিয়া থাকি। … তোমার শয়ন কামরা আর আমার শয়ন কক্ষ অতি নিকট তাহা তুমি জাননা।

"স্বপ্নে দেখা দিয়ে আজি প্রভাতেতে কান্দাইলে" গানের শেষ চরণ … ঘুম ভাঁঙ্গিয়া গেল। তুমি নিশ্চয় জানিও আমার মনে ডাকিয়া বলিতেছে আমাদের কপালে সুখ নাই। চারিদিকে বিপদের ছায়া দেখিতেছি। যদি আমার বিপদ হয় … কোন ভয়ের কারণ নাই। তুমি সাবধানে থাকিও হঠাৎ পাগলের মত কোন কার্য্য করিও না। …. সত্যই যদি আমাকে বাঘে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহার জন্য উতলা হইও না। এই আমার অনুরোধ। মংগলমতে বিবাহ শুক্রবার

৩৫৮ গত না হইলে আমি বিবাহের বসন ভূষণ কিছুই ব্যবহার করিব না। তুমি বর সাজিয়া বাহির বার দিও।

তোমার চিরসংগিনী

স্ত্রী—

পুনঃ আমি তোমাকে প্রতিদিন দেখিয়া থাকি, তুমি আমাকে দেখ নাই। উপায় করিব বলিয়াছিলাম। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার কিছুই করিতে হয় নাই, পীতার পরই তাহার মূল। মতার আন্তরিক যত্নেই আমার প্রতিজ্ঞা সফল।"

৩৬০ শুক্রবার …।

৩৬১ ২য় বর বয়সে প্রবীন, দাড়ী গোপ মাথার চুল সমুদায় সাদা। মাঝে মাঝে এক আধটি কাল চুল, পূর্বে যে কাল ছিল তারই প্রমাণ করিতেছে। দাঁতগুলি যাহা ছিল তাহার মধ্যে অনেকেই নাই, কিন্তু সম্মুখের দুটি দাঁতের মধ্যে একটি একেবারেই নাই, ২য়টি তামার তারের বাঁধন ছাঁদনে অন্য দাঁতের সংগে পেঁচাও বন্ধনে এক প্রকার খাড়া দেখায় বটে কিন্তু কথার আঘাতে বাতাসের ঘায়ে অস্থির। যেমন পড় পড় বোধ হয়। বুক হইতে পেট পর্য্যন্ত বেহদ্দ মোট— গায়ের কাপড় পেটের উপর ফাঁক হইয়া রহিয়াছে। … একটি স্ত্রী … তাহার পর 'খাদেমা' একজন আছেন। … বয়স তো 'আল্লা হাফেজ' …।

৩৬২ বড় বরের বিবাহ মন্ত্র পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি সে সময় আমিনদ্দীন মামা সাহেবকে দেখিয়া অস্থির চিত্তে কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছি। তিনিও কাঁদিতেছেন।

আমি আমার মামাকে দেখিয়া অন্যমনস্ক। আমার কানে পাত্রীর নাম যেন উকিলে বলিল—লতীফননেসা... শুনিয়া যেন শুনিলাম না। হোসেন আলী সহিত... লতিফনের নাম কেন হইল ?...উকীল সাক্ষী পড়াইতে আসিলেন।...স্বীকার উক্তি অম্লান চিত্তে মুখে উচ্চারণ করিলাম। পাত্রীর নাম যে তারা উলট পালট করিবেন, তাহা আমার মনে উদয় হয় নাই।...নামের সময় আজীজননেসা শুনিয়া আমি অজ্ঞান হইয়া বালিসে মাথা ঠেকাইয়া রহিলাম।...

৩৬৪ ওদিকে বাড়ীর মধ্যে মহা ক্রন্দনের রোল। ডাক্তার আনিতে তখনিই দুই তিন দিকে লোক ছুটিল।...কে বার বার মূর্চ্ছা যাইতেছে।...

৩৬৬ পিতা বলিয়া দিয়াছেন .... আমার অমতে বিবাহ! আমি সেখানে যাইব না।

৩৬৭ পুত্র-বধুর মুখ দেখিব না। ..মাতামহী বলিয়াছেন ... আমি তাহাকে ঘরে আনিব। বাজার হইতে অস্থান কুস্থান যেখান হইতে যে জাতীয় মেয়ে সে ভালবাসিয়া স্ত্রী বলিয়া আনিবে আমি তাহাকে আদর যত্ন করিব ভালবাসিব। ... বিবাহের পর মুখদর্শন স্ত্রী-আচার হয় নাই। .. শয়ন করিয়া রহিলাম। রাত্র ১১টার সময় বাড়ীর মধ্যে আবার সোরগোল হাংগামা... শেষে শুনিলাম বড় জামাই বাবু বাটীর মধ্যে যাইয়া বসিয়াছেন পর্দ্দার আড়ালে পাত্রী ...পাত্রীর মুখের কাপড় সরাইতেই দেখিলেন...দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গিয়াছে, নিশ্বাস বন্ধ...জামাই বাবু ঐ অবস্থা দেখিয়া...বাহিরে...আসিয়াছেন '... শেষে বলিলেন, উপরি ভাব হইয়াছে। হয় জ্বেন নয় ভুতের আসর হইয়াছে। আমার বাটীতে দুই দিনের জন্য লইয়া যাই—কবিরাজ দ্বারা ভুতুড়ে রোজার দ্বারা ইহার দাওয়াই জড়িবুটী মন্ত্র-তন্ত্র তাবিজ না করিয়া দিলে আরাম হইবে না।...

৩৭২ বড় বিবি 'এজেন' দেন নাই। সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সম্পূর্ণ নারাজিতে বিবাহ হইয়াছে।...

৩৭৬ ফজলে হক মিয়াঁর স্ত্রী বলিল ঐ আইনার মধ্যে নজর করুন। নজর করিতেই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।... থাকিতে পারিলাম না। মাথা হেঁট করিলাম।... কলিজার 'কাঁপানি ...। গৌরবর্ণ কিন্তু মুখের গঠন ও ওষ্ঠ অধর চিবুক নিতান্তই কদাকার নাসিকা এক প্রকার নাই বলিলেও হয়, ভ্রূর রেখা আছে মাত্র।... চক্ষু মুদ্রিত সুতরাং চক্ষের ভাব দেখিতে আমার ভাগ্য হইল না।...দয়াময় আমার কপালে ইহাই ছিল।...

৩৭৭ আমি তন্ত্র-মন্ত্রের বড়ই ভক্ত ছিলাম। ভুত নামান, তুড়মি খেলা, সাপ ধরা ইত্যাদি কার্য্য আমি বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলাম।...

যাহারা ঐ সকল মন্ত্রতন্ত্রের বলে যাদু ইত্যাদির খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞ, বুদ্ধি শক্তির চালনা ক্ষমতা একেবারে নাই বলিলেও হয়,
৩৭৮ তাঁহারা মনে মনে নিশ্চয়রূপে বিশ্বাস করিয়াছেন যে আমি একজন মহা গুণিন। যাদুমন্ত্রে মহাপণ্ডিত। ...

৩৮২ বড় বিবির পীড়া আরোগ্য হওয়া দূরে থাকুক অধিক পরিমাণে বেশী হইয়াছে। অধিকন্তু জ্বর পেটের বেদনা, বাঁচাই মুস্কিল। ...

৩৮৩ আজ আবার বাটীর মধ্যে চলিলাম। ...

৩৮৪ বিছানা বালিশ নিতান্ত অপরিষ্কার। সমুদায় ঘরে আবর্জ্জনা ছড়ান। এখানে আগুণের ছাই, ওখানে পোড়া কাঠ খণ্ড কয়লা মুখে করিয়া পড়িয়া আছে। জল খাবার গ্লাস, অন্য ২ খাদ্যের জন্য থালা বাটী যাহা ঘরে আসিয়াছে তাহাও স্থানে স্থানে কোনটা সোজা ভাবে কোনটা ... কলসীর সম্মুখে কতক স্থান জলে ডুবিয়া আছে। দুই তিনটা পাটী কটু ভাবে ··· কোন স্ত্রীলোকের তামাক খাওয়ার অভ্যাস আছে ... আগুনের তাওয়ার ... ছাই ··· জলপোরা নারকলী হুকা গড়াইয়া ...দুর্গন্ধময়...কলকেটি ছুটিয়া দুহাত তফাতে ... হুক গুল ... কেহ আহার করিয়াছে... উচ্ছিষ্ট এঁটো ভাত ... কাঁটা চিংড়ির ঠেং, বেগুণের ডাটা, অর্দ্ধপেসিত কংকার খোসা, দুই একটা বীজ সহ ঐ ভাতের মধ্যে পড়িয়া লাল, লোহিত, পীত, হরিত রঙ্গের বাহার দিতেছে। ... রোগীর মাথায় তেল দেওয়া হইয়াছে ...ধাক্কা লাগিয়া তেলের বাটি অর্দ্ধ চক্রাকারে ... দুইটি মুরগী তাওয়ায় বসিয়া আপন আপন আণ্ডায় তা দিতেছে। ... কোণেই ভাঙ্গা ইট, গুড় সুরকির এক গাদা ... । [আমি :] ... "... ঘর পরিষ্কার হইতে থাকুক ..." —

৩৮৬ [বিকারের ঘোরে লতীফন :] ".. সেই দুপারে আমি কিছু খাব না তবু জোর করে কাল আলকাতরা মাথা খানিক কি যেন জোর করে আমার মুখের মধ্যে দিয়া মুখ চাপিয়ে ধরেছিল। প্রাণ যায়। নিশ্বাস ফেলিতে পারিনা। কি করি ওগো আমার প্রাণ যায় কি করি। দায় ঠেকিয়া গিলিলাম। গন্ধ এমন দুর্গন্ধ যে আর বলতে পারি না আমাকে অষুধ খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ছেলে কোলে করে সেই মীরের আসল বিবি চুপি চুপি আসিয়া বলে গেল আপনি কল্লেন কি ? চামচিকা আর কাকলাস পোড়ান, হাড় বাছা লবণতেল মাখান চাটনী —আর তোমার বঁচওয়া নাই। ··· তোমার মরণ হবে। তিন সপ্তাহ মধ্যে
৩৮৮ তুমি মরে যাবে। .. এ বাড়ীতে এত লোক থাকিতে আমার এই ঘরের বিছানা, আবর্জ্জনা ময়লা কাহারও চক্ষে পড়না। দুর্গন্ধ ... কথাটা কই কাহার মাথায় আসিল না ? ... (হঠাৎ মাথার উপর আমার দক্ষিণ হাতের কফিণ ধরিয়া —) এ

কে? আমার মাথায় গোলাপ দিচ্ছে!... ভগ্নি! যিনি আমার ব্যারাম আরাম করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন তিনি কে? এখন তাঁহাকে দেখিতে আমার কোন বাধা নাই। দুইদিন পরেই বুঝিবে।... তুমি?... এখন আমি তোমার ভগ্নি!... তুমি আমার ভাই। যদি যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইতে... পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পার...।"

৩৮৯ আমি চিকিৎসা করি। আহার ঔষধ ব্যবস্থা সমুদায় আমার আদেশের উপর নির্ভর।... আমার পড়াতেল [মাথায়] দিবেন...।

৩৯০ যে মুখে কখনও হাসি দেখি নাই একটু হাসির আভা দেখাইয়া বলিলেন — তুমি পড়িয়া দিয়াছ? কাহার নামে পড়িয়াছ? আমি তখন তাঁহার পৃষ্ঠের দিকে বসিয়া মাথায় তেল দিতে আরম্ভ করিলাম। শেষে দেখি তিনি ঘুমিয়া গিয়াছেন। ...ঘর হইতে বাহির হইতেই, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন — দেখ! তোমার নিকট আমার বলিবার কোন কথা নাই। আশীর্ব্বাদ করিও তোমার মুখখানি মনে করিতে করিতে যেন আমার মৃত্যু হয়।... আমার অন্তিম সময় না দেখিয়া এখান হইতে যাইও না। তুমিও কি এদের সংগে পাগল হইয়াছ! ভূত-প্রেত আমার ব্যারাম ভাল করিবে? না তুমি ভাল করিতে পার? আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আমার মনে সম্ভ্রম লজ্জা কিছুই নাই। আমার কথায় আশ্চর্য্যবোধ কর না। আমার জীবন যৌবন প্রাণ সকলি তোমাকে দিয়া বসিয়াছি, — আর কোন ভাবনা আমার নাই। সময়ে আরো কয়েকটি কথা বলিব। শুনেছি ভূতুড়ে কবিরাজ এসেছে, সন্ধ্যার পর ভূত আনিবে। সে সময়ে তুমি সেখানে থেক।.... মনের একটা সাধ ছিল, — সরে এস, কানে কানে বলি। মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিব। ... তুমিই আমার স্বামী আমি তোমার স্ত্রী...।

৩৯১ সন্ধ্যার পর ফুল পাতা ভূত আনা।...

৩৯২ গুপ্তভাবে আমার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিয়াছে।... আমার সহিত ঐ বিদ্যা সম্বন্ধে সংমিলন হওয়ায় আমাদের বিদ্যার নিয়মানুসারে — বিধি অনুসারে আমি তাহাদের যাহা, তাহারাও আমার তাহা — প্রকাশ্যে লোকে যাহাই দেখুক। আর যাহাই বুঝুক।...

৩৯৭ কথা বলা, দীপও দপ করিয়া নিবিয়া যাওয়া ভূতেরও প্রস্থান — আমি ছাড়া সকলেই হতজ্ঞান।...

৩৯৮ লতিফন বিবি তার মাতার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছেন। কখনও জ্ঞান, কখনও অজ্ঞান, সকলের চক্ষুই জলপূর্ণ।... লতীফন বিবি বলিতেছেন — মা! .. আমি চলিলাম, আমাকে একবার তার মুখখানি দেখাও। মরিবার সময় আরামে মরিতে পারিব।... মা ... কৈ? তোমরা কেহই ছোট দুলা মিয়াঁকে ডাকিলে না?...

৩৯৯ লতীফন বিবি জিহ্বা বাহির করিয়া জলের সংকেত করিতেই ... তুমি
৪০০ আসিয়াছ? দেও জল দেও, আমার মুখে উঠাইয়া দেও, কোন লজ্জা নাই। আমি জগৎ ছাড়িয়াছি, কাহার ভয়? ...

৪০১ তুমি আমাকে যত চিঠি লিখিয়াছ সমুদায় একত্র করিয়া কাপড়ে মুড়িয়া তাবিজ করিয়া ঠিক হৃদয়ের উপর এই বক্ষের উপরে ঝুলাইয়া রাখিতাম।.... আমার লিখা পত্র তোমার নিকট...যত্নেই আছে আমি জানি। যদি তোমার ভাগ্যে কখনো ভালবাসা বুদ্ধিমতী স্ত্রী হয়...তাহাকে আমার ঐগুলি পড়িয়া শুনাইও।...মা! দোহাই তোমার ধর্ম্মের! তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি দোহাই তোমার খোদা রসুলের মিথ্যা বলিও না। মামু হেরাসতুল্যা দোহাই আপনার মাতাপিতার, আপনি সাক্ষী, ভাই উকীল, মাতা আমার নিকট বসিয়া, হাসান আলীর সহিত বিবাহ, আমি এজেন দিয়াছিলাম, মত প্রকাশ করিয়াছিলাম? আপনারা কি আমার উক্তি লইয়া উকীল হইয়াছিলেন?...বলুন যদি ধর্ম্ম মানেন। ...আমি স্বীকার হই নাই।...

৪০৩ মা! আজিজন সহিত আমার স্বামীর বিবাহ দিয়াছ? বিবাহ দিয়াছ সে নামের বিবাহ। আমি জীবিত থাকিতে তাহা হইতে পারে না। হারাম্ হারাম্ আমি মরিব কিন্তু...আজিজন কখনই সুখী হইবে না। হইতে পারে না। ..

৪০৫ আমি তোমার। সকলই তোমার। আমার মরা লাশ অন্য কাহাকে দেখিতে দিও না। তুমি দেখিও, কারণ তুমি আমার ভাই! প্রাণের ভাই!...এস এগুয়ে এস, সময় হইয়াছে।—যাহা সাধ ছিল তাহা পূর্ণ করি—তোমার জানুর উপর মাথা রাখিয়া তোমার মুখের দিকে তাকাই এই শেষ কথা,...স্বামী! প্রাণের স্বামী! আমি চলিলাম।

লা এলাহা এল্লালাহো মোহাম্মদ রসুলাল্লা। পড়িতে পড়িতে চক্ষু তারা নীচে নামিল।...মুখ বিকৃত হইল না। মাত্র ঠোঁট দুখানি একটু তর তর করিয়া নড়িয়া উঠিল।...

মৃত দেহের গোর করণ সম্বন্ধে কোনরূপ ত্রুটি হইল না, লতীফন যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিল তাহা সকলই সম্পন্ন হইল'—

তথ্য-সংকেত

১ মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, কলিকাতা ১৩১৫।

২ রকফেলার ফাউণ্ডেশন ফেলোশিপের দৌলতে ১৯৫৬ সালে একবার মার্কিন মুলুকে যাওয়ার পথে এবং আরেকবার ১৯৫৮তে মার্কিন মুলুক থেকে ফেরার পথে চার হপ্তা কোরে দুবারে মোট আট হপ্তা লণ্ডনে বই ঘাঁটার সুযোগ পাই। এই সময়ে মীর সাহেবের গ্রন্থটি কমনওয়েলথ রিলেশনস লাইব্রেরীতে পাঠ করি। এই সুযোগ লাভের জন্য আমি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

৩ প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা, কলিকাতা ১৩৫৩।

৪ বিপিন বিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসংগ, কলিকাতা ১৩২০।

৫ দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, বিদ্রোহে বাঙ্গালী, কলিকাতা ১৯৫৭। প্রথম প্রকাশ ১২৯৮—১৩০৩, মাসিক জন্মভূমিতে।

৬ হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা ১৩১১।

৭ রাস সুন্দরী দাসী, আমার জীবন, কলিকাতা ১২৭৫।

৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত), কলিকাতা ১৮৯১।

৯ দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় আত্মজীবন-চরিত, কলিকাতা ১৩০৩।

১০ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, কলিকাতা ১৮৯৮।

১১ রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, কলিকাতা ১৯০৯।

১২ নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, পাঁচ খণ্ড, কলিকাতা ১৯০৮—১৯১৩।

১৩ মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, ১৯০৯—১৯১০।

১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, ১৯১১—১৯১২।

১৫ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস [সচিত্র], কলিকাতা ১৯১৫।

১৬ শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, কলিকাতা ১৯১৮।

১৭ প্রমথ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮/০।

১৮ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত।

১৯ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী ১৩৫৫ মাঘ, পৃঃ ২৮২—২৮৩।

২০ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে গদ্য, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃঃ ১৪৬-৭।

২১ ঐ, পৃঃ ১৪৮।

২২ বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী (সাহিত্য), বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতির সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৪৪ ফাল্গুন। এই সংগ্রহে মুদ্রিত বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)-এর বিজ্ঞাপন।

২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্র পূজা, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৬১, পৃঃ ১৬-১৭।

২৪ গোপাল হালদার, বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৬৫, পৃঃ ১৭২, দ্রষ্টব্য।

২৫ বিদ্রোহে বাঙ্গালী, পূর্বোক্ত, ভূমিকা পৃঃ /০।

২৬ বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭।

২৭ রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭-৬৮।

২৮ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃঃ ৮।

২৯ দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কাব্যমালা, ১৩২৭, পৃঃ ৬৫।

৩০ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

৩১ ঐ, পৃঃ ৩২৫।

৩২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৭৫, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃঃ ৪১।

৩৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, বিশ্বভারতী ১৩৫৫, পৃঃ ১০৫।

৩৪ শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ডায়রী, কলিকাতা ১৩৬৪, পৃঃ ১৯।

৩৫ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, এবং রাজনারায়ণ বসু, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯-১০১।

৩৬ Brown, E. P., Arranged & Compiled, *The Critical Opinions of Samuel Johnson*, Princeton University Press, 1926, pp. 25-26.

৩৭ ঐ।

৩৮ ঐ।

৩৯ সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী, কলিকাতা ১৯৫৬। লেখক সোমেন বসু ৩য় পৃষ্ঠায় বলেছেন, "আত্মজীবনী শুধু ইতিহাস নয়, আত্মজীবনী ঘটনা পারম্পর্য রক্ষিত ধারাবাহিক জীবনকথা নয়, আত্মজীবনী মানুষের হয়ে ওঠার কাহিনী।" এই সংজ্ঞা সার্থক জীবনী সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য বোলে আমরা মনে করি। সোমেন বসুর বইটি বর্তমান প্রবন্ধ রচনা শেষ হবার পর হাতে পড়ে। সাধারণ বিষয়বস্তু এক হলেও, আমাদের উভয়ের আলোচনার রীতি এক নয়। সিদ্ধান্ত সমূহও পৃথক। তাছাড়া গোটা তিনেক বই ছাড়া ওঁর ও আমার আলোচনার এলাকা ঐক্যহীন। এসব মনে কোরে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি বিলম্বে হলেও প্রকাশ কোরতে কুণ্ঠিত হলাম না।

৪০ Nicolson, H., *Developement of English Biography*, London, 1927, p. 15.

৪১ নবীন সেন, আমার জীবনী, ১ম খণ্ড, ১৯০৮, পৃঃ ৬০।

৪২ দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২-৪৩।

৪৩ Maurois, Andre'; *Aspects of Biography*, Cambridge, 1929, Chapter 5 pp. 131-160.

৪৪ শরীরকে সাহিত্যে স্থান দিতে বাঙালী লেখক নিতান্ত কুণ্ঠিত ও নারাজ। বিলেতের ভিক্টোরীয় সাহিত্য এবং স্বদেশের ব্রাহ্ম চিন্তানায়কদের অপরিমিত শালীনতা পূজার প্রভাবই হয়তো আমাদের সত্যদমনের স্পৃহাকে জিইয়ে রেখেছে। দ্রষ্টব্য, শিবনারায়ণ রায়, সাহিত্য চিন্তা, পৃঃ ৬১-৬২।

৪৫ মীর মশাররফ হোসেন, উদাসীন পথিকের মনের কথা, কলিকাতা, ১৮৯০, ষড়বিংশ তরঙ্গ, পৃঃ ১৩৪-১৩৮।

৪৬ মীর মশাররফ হোসেন, আমার জীবনী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪।

কাসীদাতুল বুর্‌দাহ্‌

শাইখুল ইমাম আবু মুহাম্মদ শার্‌ফুদ্দীন
ইব্‌নে সাঈদ ইব্‌নে হাম্‌মাদ আল্‌ বু'সিরী (রহ)

কাব্যানুবাদ : **নূরুদ্দীন আহ্‌মদ**

কবি-পরিচিতি

কবি মিশর বাসী ছিলেন। তিনি মধ্য মিশরের বু'সির গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার গ্রামের নামানুসারে তিনি বু'সিরী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ণ নাম ইমাম মুহম্মদ বিন্‌ সাইদ বিন্‌ হাম্মাদ বিন্‌ আবদুল্লাহ বিন্‌ খান্‌হাজ ইব্‌নে হেলাল আস্‌ সান-হাজী বু'সিরী। কবির পিতা বু'সেরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন দেলাসের বাসিন্দা। কেহ কেহ সেইজন্য তাঁহাকে দেলাসেরীও বলিয়াছেন। তিনি নকলনবিশী করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেন। তিনি সুফী-পন্থী সাধক ছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত দরবেশ সুফী আবুল আব্‌বাস আহম্‌দ আল্‌ মারসীর সাগরেদ ছিলেন। [দায়েরাতুল মা' আরেফ বোসিতানী এবং আর, এ, নিকলসন, লিটারারী হিষ্টরী অব্‌ দি আরাব্‌স্‌ খণ্ড ৫, পৃঃ ৬৯৪]।

মাকরেজী এবং ইব্‌নে শাকীর মতে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৬৯৬ হিঃ— ১২৯৬-৯৭ খৃঃ। ১৮৯৪ খৃঃ প্যারিসে তাঁহার কাব্যের একখানা তরজমা হইয়াছে। [ইন্‌স্‌ অব্‌ ইসলাম, খণ্ড১, পৃঃ ৮০৪]।

কবিতা রচনার পটভূমিকা

দেওবন্দের খ্যাতনামা আলেম জনাব মওলানা জুল্‌ফাকার আলী সাহেব তাঁহার লিখিত এই কাব্যের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই কাব্য রচনার কারণ প্রসংগে একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

কবি বলিতেছেন, "আমার এই কাব্য রচনার কারণ এই যে, আমি অবশাঙ্গ হওয়াতে আমার দেহের নিম্ন ভাগ একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল। আমি একেবারেই অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই অবস্থায় আমার মনে একটি প্রেরণার উদয় হইল। উহা এই যে, আমি হযরত রাসুলে আকরাম (দঃ) এর প্রশংসাসূচক কিছু পদ্য রচনা করিয়া আমার এই রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিব। সেই আশায় আমি অত্র কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলাম। অতঃপর রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলাম যে, হযরত (দঃ) আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনি হস্ত দ্বারা আমার দেহ মুছাইয়া দিতেছেন। জাগিয়া দেখিলাম, আমি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গিয়াছি। পরদিন ভোরে আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া একজন ফকিরের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। ফকির বলিল: হে মহাত্মন, আপনি রসূলুল্লাহর প্রশংসায় যে কবিতা লিখিয়াছেন উহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া শুনান। আমি বলিলাম: আমার নিকট তো রসূলুল্লাহর প্রশংসাসূচক অনেক কবিতাই রহিয়াছে। তুমি কোনটি শুনিতে চাও। ফকির বলিল: যে কবিতার প্রথম ছত্রে "আ—মেন্ — তাজাক্কুরে জীরানে বে'জি সালামেন্" রহিয়াছে, আমি উহা শুনিতে চাই। ইহা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম যেহেতু আমি তখনও সেই কবিতা সম্পর্কে কাহাকেও কিছু বলি নাই। ফকির বলিল: খোদার শপথ যাঁহার সম্পর্কে আপনি এই কবিতা রচনা করিয়াছেন আমি তাঁহার সম্মুখেই ইহা গীত হইতে শুনিয়াছি। তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া দুলিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি সেই ফকিরকে উক্ত কবিতাটি অর্পণ করিলাম। সে চলিয়া গেলে তাহার ও আমার মধ্যে যাহা আলোচনা হইয়াছিল উহা লোকের নিকট ব্যক্ত হইয়া গেল। সংবাদটি এই ভাবে ছড়াইয়া পড়িল। তাহেরার উজির বাহাউদ্দিনের নিকট ইহা পৌঁছিয়া গেল। তিনি এই কবিতা শ্রবণ করিলেন এবং উহাকে পুস্তিকাকারে সুসংবদ্ধ করিলেন। তিনি মানস করিয়াছিলেন যে এই কবিতা নগ্ন মস্তকে দণ্ডায়মান অবস্থায় তওয়াফ করিতে করিতে পাঠ করিবেন। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ অতিশয় ভক্তি সহকারে ইহা শ্রবণ করিতেন।

قصيدة البردة

১

أمن تذكر جيران بذي سلم
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

যু, সালামের[1] পড়শি' সনে
প্রিয়ে কি তোর পড়লো মনে?
তাই কি যুগল নয়ন হতে
ঝরলো রুধির অশ্রু সনে?

২

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة
أو أومض البرق في الظلماء من إضم

অথবা কি প্রিয়ের সুবাস
আন্‌লো বাতাস পাক মদীনার।[2]
তড়িৎ রেখা চম্‌কালো কি
'এজাম'[3] গিরির গহন আঁধার।

৩

فما لعينيك إن قلت اكففا همتا
وما لقلبك إن قلت استفق يهم

কী যে হলো দুই নয়নের
বাঁধন ভেঙে শুধুই বহে,
মনকে যতই বারণ করি
ব্যথায় তবু সতঃই দহে।

৪

أيحسب الصب أن الحب منكتم
ما بين منسجم منه ومضطرم

রে! বিরহী! ভাব্‌ছ বৃথা
প্রেমের কথা রয়না ঢাকা,
ফাঁস করে দেয় অশ্রু ধারা
আর হৃদয়ের ব্যাকুল থাকা।

৫

لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل
ولا أرقت لذكر البان والعلم

প্রেম যদি নাই হতো এ'
অশ্রু কেন ঝরলো তবে,
'বিরান' টিলাও কানন স্মরি'
হৃদয় কেন ব্যাকুল হবে?

৬

فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت
به عليك عدول الدمع والسقم

কেমন করে লুকাই বলো
প্রেম যে এবার পড়লো ধরা,
সাক্ষী তোমার ক্লিষ্ট ছবি
আর নয়নের অশ্রু ঝরা।

৭

واثبت الوجد خطى عبرة وضنى
مثل البهار على خديك والعنم

প্রণয় বিধুর পাণ্ডু কপোল
আর রুধিরের অশ্রু-রেখা
যুগল-গালে নিখুঁত করে
আঁক্‌লো প্রেমের গোপন লেখা।

৮

نعم سرى طيف من اهوى فارقنى
والحب يعترض اللذات باالالم

সত্য বটে প্রিয়ার স্মৃতি
নিশিথ কালে জাগ্‌লো হিয়ায়
সেই ত সকল শান্তি আমার
ডুবিয়ে দিল ব্যথার তলায়।

৯

يالائمى فى الهوى العذرى معذرة
منى اليك ولو انصفت لم تلم

আমার যারা নিন্দাকারী
শোন আমার নালিশ শোনো,
প্রেম সে কেমন দেখলে গুণে
দোষ দিতে না আমায় কোনো।

১০

عدتك حالى لاسرى بمستتر
عن الوشاة ولا دائى بمنحسم

রটিয়ে গেছে তোমায় ছেড়ে
আমার প্রেমের গোপন বাণী,
মুছবেনা এ' হৃদয় হতে
হোক না যতই জানাজানি।

১১

محضتني النصح لكن لست اسمعه
ان المحب عن العذال في صمم

বৃথাই দেওয়া হিত উপদেশ
পৌঁছবে না তো আমার কানে,
সত্যিকারের প্রেমিক বধির
উপদেশের হয়না মানে।

১২

اني اتهمت نصيح الشيب في عذلي
والشيب ابعد في نصح عن التهم

অসময়ে আসলো জরা
কেলেংকারীর নিশান তুলে,
অপবাদের উর্ধ্বে জরা
হিত উপদেশ সেই তো মূলে।

১৩

فان امارتي بالسوء ما اتعظت
من جهلها بنذير الشيب والهرم

কামনা যে মূর্খ নিরেট
বুঝল না সে পুণ্য বাণী,
মানল না তাই জরার ভীতি
পক্ক কেশের চোখ রাঙানী।

১৪

ولا اعدت من الفعل الجميل قرى
ضيف الم برأسي غير محتشم

শুভ্র কেশের মাহাত্ম্যকে
দিল না সে পুণ্য ডালি,
এমন মহান অতিথ এসে
অনাদরে নামল খালি।

১৫

لو كنت اعلم اني ما اوقره
كتمت سرا بدا لي منه بالكتم

জানা যদি থাকত আমার
এ অতিথির এই অপমান,
‘খেজাব’ দিয়ে ঢাকিয়ে দিতাম
বৃদ্ধ কালের শুভ্র নিশান।

১৬

من لى برد جماح من غوا يتها
كما يـرد جماح الخيل باللجم

কে পরাবে বল্‌গা বল
অবাধ্য এ মনকে আমার,
লাগাম দিয়ে বাধিয়ে দেওয়া
যেমন গতি পাগলা ঘোড়ার।

১৭

فلا تـرم بالمعاصى كسر شهو تها
ان الطعام يـتوى شهو ة النـهم

পাপের নেশা টুট্‌বে না তোর
মনের বাঁধন থাক্‌লে ছাড়া
ভোগ লালসার আকুল নেশা
বাড়িয়ে চলে ভোগের দ্বারা।

১৮

والنفس كالطفل ان تهمله شب على
حب الرضاع وان تفطمه ينفطم

বাসনা ঠিক অবোধ শিশু
পরিচর্যা করবে যত
শিশুকে দুধ না ছাড়ালে
দুধপানে সে থাকেই রত।

১৯

বাসনার প্রতি ঃ—

فاصرف هواها و حاذر ان توليه
ان الهوى ما تولى يصم او يصم

মুক্ত কর নিজকে এবার
কলুষ রিপুর শাসন থেকে
নয়তো তোমার মৃত্যু নিঘাত
নয় অপবাদ আন্‌বে ডেকে।

২০

و راعها وهى فى الاعمال سائمة
وان هى ستحلت المرعى فلا تسم

খ্যাতির লোভে পুণ্য করা
সেটাও বটে রূপ বাসনার
এমন পুণ্য যোগায় শুধু
নিত্য খোরাক ভোগ লালসার।

২১

كم حسنت لذة اللمرء قاتلة
من حيث لم يدر ان السم في الدسم

কতোবার সে দিল ফাঁকি
সাজিয়ে মধু রঙীন সাজে
কেউ জানে না সে অমৃতে
সর্বনাশা ‘জহর’ রাজে।

২২

واخش الدسائس من جوع و من شبع
فرب مخمصة شر من التخم

তৃপ্তি ভোজন, কৃচ্ছ্র সাধন
ভয় কর সে দুটোই অতি
তৃপ্তি হতে লোক দেখানো
উপোস করায় অনেক ক্ষতি।

২৩

واستفرغ الدمع من عين قد امتلات
من المحارم و الزم حمية الندم

অশ্রু ধারায় ভাসাও তারে
জ্বল্‌লো যে চোখ দৃষ্টিপাপে
শুদ্ধ কর সব কালিমা
লজ্‌জায় আর অনুতাপে।

২৪

وخالف النفس والشيطان واعصهما
وان هما محضاك النصح فاتهم

শয়তান আর রিপুর সাথে
‘জেহাদ’ কর বিরোধ কর
তাদের সকল মধুর বাণী
মিথ্যা হতে মিথ্যা ধর।

২৫

ولا تطع منهما خصما ولا حكما
فانت تعرف كيد الخصم والحكم

কোনটারই ধার ধার’ না
যুক্তি তাদের কিংবা আদেশ
চিন্‌তে তোমার নাইকো বাকী
কুচক্রিদের হিত উপদেশ।

২৬

استغفر الله من قول بلا عمل
لقد نسبت به نسلا لذى عقم

খোদার নিকট চাইছি ক্ষমা
'আমল' ছাড়াই 'ওয়াজ' করে
পুত্র কন্যা ঠিক যেন এ'
অপুত্রক এক পিতার ঘরে।

২৭

امرتك الخير لكن ما ائتمرت به
وما استقمت فما قولى لك استقم

তোমায় দিলাম হিত উপদেশ
নিজের বেলায় শূন্য থলি,
আপন পথের নাই ঠিকানা
তোমায় সুপথ ধরতে বলি।

২৮

ولا تزودت قبل الموت نافلة
ولم اصل سوى فرض ولم اصم

মরণ নিকট ঘনিয়ে এলো,
পুণ্য কিছুই হয়নি যোগাড়
শূন্য ছাড়া নাই কিছু আর
অধিক 'ফরজ' নামাজ রোজার।

রসুলুল্লার (দঃ) প্রসংশায় :—

২৯

ظلمت سنة من احيى الظلام الى
ان اشتكت قدماه الضر من ورم

অন্ধকারে রাত্রি জেগে
স্ফীত হল দুই পা যাহার
কি সর্বনাশ! ভুল করেছি
ছেড়ে পুণ্য নীতি তাঁহার।

৩০

وشد من سغب احشاءه وطوى
تحت الحجارة كشحا مترف الادم

তীব্র ক্ষুধার দহন জ্বালায়
উদর চেপে বাঁধলো পাথর
সুবৃক্ষ হল কোমর, প্রাণ
হয়নি তবু একটু কাতর।

৩১

وراودته الجبال الشم من ذهب
عن نفسه فاراها ايما شمم

লুটালো যার পায়ের তলায়
আকাশ ছোঁয়া স্বর্ণ গিরি*
অবাক বটে সেদিক পানে
দেখলে না তো বারেক ফিরি।

৩২

واكدت زهد ه فيها ضرورته
ان الضرورة لا تعد واعلى العصم

ধরার তাগিদ আর প্রয়োজন
টুটায়নি' তাঁর পুণ্য সাধন
শুদ্ধ হৃদয় উর্ধ্বে সদাই
পায়ের তলায় ধরার বাঁধন।

৩৩

وكيف تدعوا الى الدنيا ضرورة من
لولاه لم تخرج الد نيا من العدم

কেমন করে বাঁধবে বলো,
এই ধরণীর বাঁধন তাঁরে
কারণে যাঁর সৃষ্টি ধরা
সেকি তারে বাঁধতে পারে?

৩৪

محمد سيد الكو نين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم

মোহাম্মদ সে দুই জগতে
জ্বিন, মানবের মুক্তি দাতা
আরব আযম তাঁহার দ্বারে
সবার ঋণের দু'হাত পাতা*

৩৫

نبينا الامر النا هى فلا احد
ابر فى قول لا منه ولا نعم

সত্য পথের আদেশ দাতা
মিথ্যা থেকে নিষেধ কারী
নবী মোদের নাই তুলনা
সত্য বাণীর নিশান ধারী।

৩৬

هو الحبيب الذى ترجى شفاعته
لكل هول من الاهوال مقتحم

সেই সে প্রিয় হাবীব খোদার
ভরসা শুধু যাঁর সাফায়াৎ
কঠিন হতে কঠিন তরো
ভীষণ তরো রোজ কেয়ামত।

৩৭

دعا الى الله فالمستمسكون به
مستمسكون بحبل غير منفصم

ডাক দিল সে, খোদার পানে
শুন্‌লো যারা সে ডাক কানে
ধর্‌লো তারা শক্ত শিকল[১]
ছিঁড়বে না সে কোনই টানে।

৩৮

فاق النبيين فى خلق و فى خلق
ولم يدانوه فى علم ولا كرم

উচ্চ স্বভাব, সৃষ্টিতে আর
ছাড়িয়ে গেল সব নবীদের
নাগাল কেহ পায়নিক তাঁর
মাহাত্ম্য আর অসীম জ্ঞানের।

৩৯

وكلهم من رسول الله ملتمس
غرفا من البحر او رشفا من الديم

তাঁহার জ্ঞানের সাগর হতে
দানের বারি ধারা হতে
সব নবী-ই বিনয় ভরে
অঞ্জলি নেয় দু' হাত পেতে।[৮]

৪০

و واقفون لديه عند حدهم
من نقطة العلم او من شكلة الحكم

সব নবী-ই দাঁড়িয়ে দূরে
যাঁর যে জ্ঞানের সীমার পরে
সিন্ধু হতে বিন্দু যেমন
দূর ব্যবধান সৃষ্টি করে।[৯]

৪১

فهو الذي تم معناه وصورته
ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم

সেই সে নবী রূপ ও স্বরূপ
পূর্ণ যাঁহার পূর্ণ রূপে
কবুল তাঁরে করলো খোদা
আপন প্রিয় বন্ধু চুপে[১০]

৪২

منزه عن شريك في محاسنه
فجوهر الحسن فيه غير منقسم

একক তিনি গুণ গরিমায়
সমভাগী নাই কেহ তাঁর
রূপের তিনি উৎস ধারা
অবিভাজ্য রূপের আধার।

৪৩

دع ما ادعته النصارى في نبيهم
واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

নাসারারা তাদের নবীর
করলো যে সব মিথ্যা দাবী
সে সব ছেড়ে বাকী সকল
তারীফ কর ন্যায্য ভাবি।[১১]

৪৪

وانسب الى ذاته ما شئت من شرف
وانسب الى قدره ما شئت من عظم

বৃদ্ধি কর সত্তাতে তাঁর
যা' চাও উচ্চ কুল অভিমান
যুক্ত কর মর্যাদাতে
অবারিত মহত্ব মান।

৪৫

فان فضل رسول الله ليس له
حد فيعرب عنه ناطق بفم

যেহেতু সেই রসুল যাঁহার
বিশিষ্টতার নাই কিনারা
কেউ পারে না পৌঁছতে সেথায়
মুখের ভাষার লুপ্ত ধারা।

৪৬

لو ناسبت قدره آياته عظما
احيى اسمه حين يدعى دارس الرمم

তাঁহার নামে উঠতো বেঁচে
যদিই প্রাচীন অস্থি যত[১২]
তাঁর মহিমার মূল্য মাফিক
সে অলৌকিক কাণ্ডটি হতো।

৪৭

لم يمتحنا بما تعيى العقول به
حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم

শিক্ষা তাঁহার মোদের প্রতি
পরীক্ষা নয় জটিল কোনো[১৩]
এমন সরল যুক্তি সহ
নাই সন্দেহ ভাব কখনো।

৪৮

اعيى الورى فهم معناه فليس يرى
للقرب والبعد فيه غير منفحم

ব্যর্থ হলো সৃষ্টি সারা
বুঝতে গভীর রহস্য তাঁর
নিকট কিংবা দূরের যে কেউ
রুদ্ধ সেথায় শক্তি সবার।

৪৯

كالشمس تظهر للعينين من بعد
صغيرة و تكل الطرف من امم

সূর্য যেমন দূরের থেকে
যায় না দেখা সঠিক ভাবে
নিকট থেকেও যায় না দেখা
দীপ্ত তাঁহার কিরণ তাপে।

৫০

وكيف يدرك في الدنيا حقيقته
قوم نيام تسلوا عنه بالحلم

জ্ঞানী যেথায় অকূল পথিক
বুঝ্‌তে তাঁহার জ্ঞান পরিধি
অজ্ঞরা কি বুঝবে অঘোর
ঘুমায় যারা চক্ষু মুদি।

৫১

فمبلغ العلم فيه انه بشر
وانه خير خلق الله كلهم

সরল কথায় এই বুঝে লও
'বশর' তিনি সৃষ্টি মাঝে,[১৪]
তুলনা যাঁর নাই ভুবনে
খোদার সেরা সৃষ্টি রাজে।

৫২

وكل اى اتى الرسل الكرام بها
فانما اتصلت من نوره بهم

যতই নবী এলেন ধরায়
অলৌকিকের মুকুট মাথায়
সেতো আমার নবীর আশিস
সে তাঁহারই জ্যোতির আভায়।

৫৩

فانه شمس فضل هم كواكبها
يظهرن انوارها للناس فى الظلم

নবী কুলের তিনিই রবি
অন্যরা সব গ্রহ তারা[১৫]
তাঁর মহিমার কিরণ লভি
বিশ্বে দিল আলোর ধারা।

৫৪

اكرم بخلق نبى زانه خلق
بالحسن مشتمل بالبشر متسم

কী অপূর্ব সৃষ্টি নবীর
চরিত্রকে রূপ সে দিল
সে রূপ তাঁহার ভূষণ হয়ে
আলোয় ললাট উদ্ভাসিল।

৫৫

كالزهر فى ترف والبدر فى شرف
والبحر فى كرم والدهر فى همم

ফুলের মতো কোমল পেলব
চাঁদের মত রূপের আধার
সাগর হেন অতল গভীর
কালের মতো নাই সীমা তাঁর।

৫৬

كأنه وهو فرد فى جلالته
فى عسكر حين تلقاه و فى حشم

একক তিনি অংশী বিহীন
বিরাট মহান সত্তাতে তাঁর,[১৬]
সৈন্যগণের মধ্যে যেমন
সেনাপতি উচ্চে সবার।

৫৭

كأنما اللؤلؤ المكنون فى صدف
من معدنى منطق منه و مبتسم

কেউ করেনি 'স্পর্শ আজো
শুক্তি পেটে মুক্তা রাশি,
সেই মোতিই ফুটায় তাঁহার
পুণ্য কথা পুণ্য হাসি

৫৮

لا طيب يعدل تربا ضم اعظمه
طوبى لمنتشق منه و ملتثم

অস্থি তাঁহার কর্‌লো ধারণ
যে পবিত্র ধরার ধূলি[১৭]
ধন্য সেজন চুম্‌লো তারে
যে জন আপন বক্ষে তুলি।

৫৯

ابان مولده عن طيب عنصره
يا طيب مبتداء منه و مختتم

পবিত্রতার উৎস যাঁহার
পুণ্য ভরা জন্মতিথি
তিরোধানে তাঁহার দেখুক
পবিত্রতার লয় এ ক্ষিতি।

৬০

يوم تفرس فيه الفرس انهم
قد انذروا بحلول البؤس و النقم

তাঁর জনমের সম্ভাবনার
লখন দেখে বুঝ্‌লো ইরাণ[১৮]
মহাম্মদের আস্‌লো সময়
রাজ্য তাদের হবেই বিরান।

৬১

وبات ايوان كسرى وهو منصدع

كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم

তাঁর আগমের পুণ্য দিনে
পড়ল পারশ প্রাসাদ চূড়া
ছিন্ন হলো সৈন্য সেপাই
রাজ্য হলো চূর্ণ গুঁড়া।

৬২

وساء ساوة ان غاضت بحيرتها

ورد واردها بالغيظ حين ظم

শুকিয়ে গেল 'সাওয়া'র নদী
আতংকিত 'সাওয়া'র বাসী[১৯]
এ কোন যুগের প্রভাত এলো
মিথ্যা যুগের মিথ্য নাশি।

৬৩

والنار خامدة الانفاس من اسف

عليه والنهر ساهي العين من سدم

তার উদয়ের নূতন উষায়
নিব্‌লো অনল পারশ রাজের[২০]
স্রোতস্বিনী স্তব্ধ গতি
রুদ্ধ ধারা সলিল স্রোতের।

৬৪

كأن بالنار ما بالماء من بلل

حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم

অগ্নি শিখা শীতল হলো
স্তব্ধ হলো নদীর ধারা
বিপ্লবের এ পদধ্বনি
জাগলো ধরায় নূতন সাড়া।

৬৫

والجن تهتف والانوار ساطعة

والحق يظهر من معنى ومن كلم

গায়েব থেকে জ্বীন ও পরি
স্বাগতমের তুল্‌লো ধ্বনি[২১]
সুরের ঝলক ঘোষিয়ে গেল
আজ কাহার এ' আগমনী।

৬৬

والجن تهتف والانوار ساطعة
والحق من معنى و من كلم

বিকাশ পেল সত্য এবার
'আজব' সকল দৃশ্য পটে
'গায়বি' আওয়াজ জানিয়ে গেল
সত্য এবার আসলো বটে।

৬৭

عموا و صموا فا علان البشائر لم
تسمع و بارقة الا نذار لم تشم

বিরোধিরা রইলো বধির
শুনল না এ শুভাগমন
দেখ্‌লোনা তো চক্ষু তুলি
খোদার ভীষণ বজ্র পতন।

৬৮

من بعد ما اخبر الا قوام كاهنهم
بان دينهم المعوج لم يقم

যদিও তাদের জ্যোতিষগণক
জানিয়ে ছিল 'কওম' সবে
তাদের বাতিল ধর্ম সকল
শীগ্‌গিরই সব বিলীন হবে।

৬৯

و بعد ماعاينوا فى الافق من شهب
منقضة وفق ما فى الارض من صنم

যদিও তারা দেখ্‌লো চোখে
বজ্রশিখা গগণ সীমায়
যদিও তারা দেখ্‌লো কাবার
'বোৎ' গুলি সব ধূলায় লুটায়।[২২]

৭০

حتى غدا عن طريق الوحى منهزم
من الشياطين يقفوا اثر منهزم

শয়তান 'সব সেই তিথিতে
রাস্তা ছেড়ে 'অহী'র পথের
শংকা-ত্রাশ-প্রাণ-চকিত
ভাগ্‌লো পিছে এক অপরের।[২৩]

৭১

كانهم هربا ابطال ابرهة
او عسكر بالحصى من راحتيه رمي

আবরাহা' দউজ ভাগলো যেন
আবাবিলের পাথর ঘাতে
বেদীন ফৌজ ছুটলো যেন
কাঁকর ঘায়ে নবীর হাতে।[২৪]

৭২

نبذا به بعد تسبيح ببطنهما
نبذ المسبح من احشاء ملتقم

নবীর মুঠার কাঁকর গুলি
ছুটলো খোদার তস্‌বীহ গুণে
মৎস যেমন মুক্তি দিল
ইউনুস নবীর তস্‌বীহ শুনে।

৭৩

جاءت لدعوته الاشجار ساجدة
تمشي اليه على ساق بلا قدم

কলম যেমন সরল রেখায়
বর্ণমালা সাজিয়ে চলে[২৫]
বৃক্ষ রাজি তেমনি সোজা
দাঁড়ায় নবীর পায়ের তলে।

৭৪

كانما سطرت سطرا لما كتبت
فروعها من بديع الخط في اللقم

বৃক্ষ সারি চল্‌তো ছুটি
নবীর পিছন পিছন ঘিরে
কলম যেমন সরল রেখার
ছত্র-মালা আঁকতে ধীরে।

৭৫

مثل الغمامة انى سار سائرة
تقيه حر وطيس للهجير حمي

তপ্ত দিনের দুপুর বেলা
নীরদ যেমন চলতো সাথে
ধীর অথবা ক্ষিপ্র গতি
তরুর গতি সেই ধারাতে।

৭৬

اقسمت بالقمر المنشق ان لـه
من قلبه نسبة مبرورة القسم

শপথ! শোন চাঁদের সাথে
নবীর প্রাণের যোগই ছিল
তাইতো তাঁহার হৃদয় যেন
চাঁদের মতই দুভাগ হ'লা[২৭]

৭৭

وما حوى الغار من خير ومن كرم
وكل طرف من الكفار عنه عم

সাওর' গিরি ঠাঁই দিল যেই
সত্য ও ন্যায় বক্ষে রাখি[২৮]
কাফেরগণ দেখছে সবই
নবীর প্রতি বন্দ আঁখি।

৭৮

فالصدق في الغار والصديق لم يريا
وهم يقولون ما بالغار من ارم

সত্য স্বরূপ মহান নবী
সত্য পথিক আবু বাকার
ছিলেন গুহায়, বেদীন তবু
দেখলো সবই শূন্য আঁধার

৭৯

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على
خير البرية لم تنسج ولم تحم

ভাবলো তারা পলাতকের
হেথায় পাবার নাইকো আশা[২৯]
মাকড়সা ও কপোত যখন
গুহার মুখে বাঁধ্‌লো বাসা

৮০

وقاية الله اغنت عن مضاعفة
من الدروع وعن عال من الاطم

বর্মোপরি বর্ম ছাড়া
দৃঢ় দুর্গ প্রাচীর ছাড়া
নির্ভাবনা করলো তাঁকে
খোদা আপন শক্তি দ্বারা।

৮১

ماسا منی الد هر ضیما واستجرت بـه
الا و نلت جوارا منه لم یضم

নবীর 'দামান' ধরার পরে
কাল আমাকে দেয়নি দুঃখ
তাঁর করুণার আশীষ হতে
দিনের তরে হইনি বিমুখ।

৮২

و لا التمست غنی الدا رین من ید ه
الا استلمت الند ی من خیر مستلم

চাইনি আমি তাঁহার দ্ব'রে
দিন দুনিয়ার ভাগ্য বরাত
পুণ্য হাতের যে দান তাঁহার
তাই নিয়েছি যুক্ত দুহাত।

৮৩

لا تنکر الو حی من رؤیا ه ان له
قلبا اذا نامت العینا ن لم ینم

স্বপ্ন যোগে অহি'র কথা
সত্য বটে মিথ্যা সে নয়
দু'চোখ যদিও মুদ্রিত তাঁর
হৃদয় সদা জাগ্রত রয়।

৮৪

و ذاک حین بلوغ من نبو تـه
فلیس ینکر فیه حال محتلم

নবুয়তির প্রত্যুষ কালে
স্বপ্ন ছিল তুল্য 'অহি'র
যৌবনেরই প্রভাত কালে
স্বপ্ন দেখার অর্থ গভীর।

৮৫

تبارک الله ما وحی بمکتسب
و لا نبی علی غیب بمتهم

সেই খোদারই সব মহিমা
'অহি' যাঁহার আপন বাণী
নবী যখন দেয় সে খবর
মিথ্যা নহে একটু খানি।

৮৬

كم ابرات وصبا باللمس راحته
و اطلقت ا ربا من ربقة اللمم

কতই রোগী নীরোগ হলো
শুধু পুণ্য স্পর্শে তাঁহার
বদ্ধ পাগল সুস্থ হলো
জ্ঞান লভিল দিব্যি আবার।[৩১]

৮৭

واحيت السنة الشهباء دعوته
حتى حكت غرة فى الأعصر الدهم

অনাবৃষ্টির বছর কতোই
'দোয়া'তে তার পাইল জীবন
উর্ব্বরতায় ছাইল মুলুক
তরু হল কৃষ্ণ বরণ।

৮৮

بعارض جاد او خلت البطاح بها
سيبا من اليم او سيلا من العرم

কল্যাণে তাঁর নাম্‌তো ধারা
বর্ষিত মেঘ মুষল ধারে
নীল নদীতে ছুট্‌তো তুফান
ডুবতো এরাম বন্যা ভারে।

কোরআন প্রসংঙ্গে :—

৮৯

دعنى ووصفى ايات له ظهرت
ظهور نار القرى ليلا على علم

দাও ছেড়ে আমায় বলি
সেই মো'জেজার কথাই খালি
তুলনা যার 'দাওয়াত' দেওয়া
পাহাড় চুড়ায় আগুন জ্বালি।[৩২]

৯০

فالدر يزداد حسنا و هو منتظم
و ليس ينقص قدرا غير منتظم

মালায় গাথা মোতির ছড়া
বাড়ায় শোভা অনেক খানি,
বিনি গাঁথায় আসল মোতির
হয় কি কোন মূল্য হানি?

৯১

فما تطاول امال المديح الى
مافيه من كرم الأخلاق و الشيم

পৌঁছল নাতো বর্ণনা মোর
মনের আশার প্রান্ত সীমায়।
চরিত্র তাঁর পূর্ণ ছিল
কতোই মহৎ গুণ গরিমায়।

৯২

ايات حق من الرحمن محدثة
قديمة صفة الموصوف بالقدم

ভাষায় সুরে রূপ ও দেহে
সৃষ্টি শামিল খোদার কোরআন,**
'কালাম' খোদার গুণ হিসাবে
আদিম যাহার নাই অবসান।

৯৩

لم تقترن بزمان و هي تخبرنا
عن المعاد و عن عاد و عن ارم

কালের সাথে নাই যোগাযোগ
খোদার কালাম সৃষ্টি সে নয়।
রোজ হাসরের, বিচার দিনের,
আদ ইরমের খবর সে কয়।

৯৪

دامت لدينا ففاقت كل معجزة
من النبيين اذ جاءت و لم تدم

এই কোরআনের নাই অবসান
থেকেই যাবে স্থায়ী হয়ে,
সকল যুগের সব নবীদের
সব মোজেজার ঊর্ধে রয়ে।

৯৫

محكمات فما يبقين من شبه
لذى شقاق ولا يبغين من حكم

'হুকুম নামা' এমনি সে যে
'ফয়সলা' সে সব বিরোধের,
কাহার প্রতি হুকুম দিতে
নাই প্রয়োজন কাহারও মতের।

৯৬

ماحوربت قط الا عاد من حرب
اعدى الاعادى اليها ملقى السلم

শত্রুরা সব দাঁড়িয়ে ছিল
বিরোধিতায় কোরআন পাকের,
কবুল তারে করল সবাই
নয় পরাভব মান্‌লো আখের।

৯৭

ردت بلاغتها دعوى معارضها
رد الغيور يد الجانى عن الحرم

এই কোরআনের বাক্য ছটা,
ছুষমনে সব করছিলো কাৎ
সম্মানিত হাতের নিকট
জব্দ যেমন ঘৃণ্য ছুহাত।

৯৮

لها معان كموج البحر فى مدد
و فوق جوهره فى الحسن والقيم

কোরআন পাকের তত্ত্ব রাশি
ঢেউ সাগরের পরম্পরা,
গরীমা তার মুক্তা মণির
চাইতে অধিক মূল্য ধরা।

৯৯

فما تعد و لا تحصى عجائبها
و لا تسام على الاكثار بالسام

অপূর্ব তার 'কালাম' রাশি
সংখ্যাতীত নাই কো শুমার,
যতই কেন পাঠ কর না
নাই অরুচি তিক্ততা ভার।

১০০

قرت بها عين قاريها فقلت له
لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم

সিক্ত চোখে পাঠ করে যেই
বল্‌বো তাহার ধন্য জীবন,
দৃঢ় মুঠায় আকৃড়ে ধর
খোদার রশি ধরার মতন।

১০১

ان تتلها خيفة من حر نار لظى
اطفأت حر لظى من وردها الشبم

পাঠ করিলে পাক এ কোরআন
জাহান্নামের অগ্নি ভয়ে,
পর্শে শীতল এই আয়াতের
অনল যাবে স্নিগ্ধ হয়ে।

১০২

كانها الحوض تبيض الوجوه به
من العصاة وقد جاءوه كالحمم

করবে বিধৌত আব্-ই কওসার
দোজখ বাসীর দগ্ধ আনন,৩৪
পাক কালামের রৌশনী তেমন
করবে মনের ময়লা নাশন।

১০৩

وكالصراط وكالميزان معدلة
فالقسط من غيرها فى الناس لم يقم

পুল সিরাত আর 'মিযান' যেমন
পাপ পুণ্যের ন্যায় বিচারক,
তেমনি কালাম পাক এ' খোদার
কুল মানবের, ন্যায় বিধায়ক।

১০৪

لا تعجبن لحسود راح ينكرها
تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم

অমান্য যে করল কোরআন
হিংসা বশে জ্ঞান থাকিতে,
অবাক না হও এমন কাজের
নজীর অনেক পারবো দিতে।

১০৫

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد
وينكر الفم طعم الماء من سقم

উজল রবির কিরণ দেখে
রুগ্ন চোখে সরষে ফোটে
রোগীর মুখে-অমৃত হোক
স্বাদ তাহাতে নাইকো মোটে

১০৬

يا خير من يمم العافون ساحته
سعيا و فوق متون الا ينق الرسم

হে মহাজন! ছুটছি এবার
তোমার পুণ্য দয়ার দ্বারে,
তোমার দিকে দুপায় হেঁটে
ক্ষিপ্র গতি 'শোতর' চড়ে।

১০৭

من هو الاية الكبرى لمعتبر
و من هو النعمة العظمى لمغتنم

তোমার উচ্চ জ্ঞান মহিমা
যাহার নিকট হয় প্রতিভাত,
তাহার নিকট সেই তো সেরা
নবুয়তির সেই তো 'কিমাত'।

মে'রাজ সম্পর্কে :—

১০৮

سريت من حرم ليلا الى حرم
كما سرى البدر فى داج من الظلم

'হরম' ১ থেকে 'হরম' ২ পানে
নিশীথ কালে করলে গমন,[৩৫]
আঁধার ভেদি চন্দ্র যেমন
দীপ্ত আভায় দেয় দরশন।

১০৯

و بت ترقى الى ان نلت منزلة
من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم

সেই নিশিতে উচ্চ হতে
উঠলে চরম উচ্চ সীমায়,[৩৬]
খোদা পাকের সামনে হাজির
কেউ লভেনি সেই মহিমায়।

১১০

و قدمتك جميع الانبياء بها
و الرسل تقديم مخدوم على خدم

সেই নিশিতে সব নবীরা
তোমায় দিল উচ্চ আসন,[৩৭]
সসম্মানে প্রভুকে দেয়
আসন ছেড়ে সেবক যেমন।

১১১

وانت تخترق السبع الطباق بهم
فى موكب كنت فيه صاحب العلم

সেই নিশিতে ভেদ করিতে
'বোরাক' যোগে সপ্ত গগন,
তোমার সাথী গণের মাঝে
করলে তুমি ঝাণ্ডা বহন।

১১২

حتى اذا لم تدع شاوالمستبق
من الدنو ولامرقا لمستنم

সেই অসীমের প্রান্ত সীমায়
হয় নি যেথায় কারও যাওয়া,
পৌঁছলে তুমি সেথায় গিয়ে
মর্য্যাদার এ' আসন পাওয়া।

১১৩

خفضت كل مقام بالاضافة اذ
نوديت بالرفع مثل المفرد العلم

"আয় মোহাম্মদ" বলে তোমায়
করলো খোদা যে সম্বোধন,
তোমার বিশিষ্টতার দাবী
উঠ্‌লো সবার উর্ধে তখন।

১১৪

كيما تفوز بوصل اى مستتر
عن العيون وسر اى مكتتم

তুমি একা লাভ করিলে
সেই মিলনের গোপন বানী,[৩৮]
সৃষ্টি মাঝে কাহারও নিকট
হয়নি সে সব জানাজানি।

১১৫

فخرت كل فخار غير مشترك
و جزت كل مقام غير مزدحم

সে গৌরবের সিংহাসনে
নাই কোনও জন শরীক তোমার,[৩৯]
পৌঁছলে তুমি যেই মহিমায়
নাই যেথা কেউ ভিড় করিবার।

১১

و جل مقدار ما وليت من رتب
و عز ادراك ما اوليت من نعم

মহান তোমার সেই ‘ফজিলৎ’
যাঁহার তুমি মালিক বটে,
সুদুর্লভ ও জ্ঞানের অতীত
অসাধারণ একক বটে।

১১৭

بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا
من العناية ركنا غير منهدم

মো’মেন এক খবর শোনো
সত্যি পেলে তোমরা সবে,’’
মহা অবদান এ’ দ্বীনের
চিরদিন যা’ অটুট রবে।

১১৮

لما دعى الله داعينا لطاعته
باكرم الرسل كنا اكرم الامم

‘দাওয়াত’ দিলেন খোদা মোদের
নবীর ‘তাবেদারী’র লাগি,’’
মহান নবীর উম্মত হওয়ায়
সে গৌরবের আমরা ভাগী।

মহানবীর শত্রুদের সম্পর্কে ঃ—

১১৯

راعت قلوب العدى انباء بعثته
كنباة اجفلت غفلا من الغنم

তোমার আবির্ভাবের সাড়া
জাগ্‌লো যখন বিশ্ব জুড়ে,
শত্রুরা সব বক্‌রী হেন
ভয়েই প্রাণ ছুটল উড়ে।

১২০

مازال يلقاهم في كل معترك
حتى حكوا بالقنا لحما على وضم

মুজাহেদের সামনে যখন
পড়্‌তো বেদীন যুদ্ধ মাঠে,
অবশ হয়ে পড়্‌তো তারা
মাংস যেমন কসাই পাটে।

১২১

ودوا الفرار فكادوا يغبطون به
اشلاء شالت مع العقبان والرخم

মোজাহেদের আঘাত থেকে
থাকতো তারা ত্রস্ত এমন,[৪২]
ঈর্ষা হতো মৃত্যু ভুকের
মুখে দেখে মাংস হরণ।

১২২

تمضى الليالى ولا يدرون عدتها
ما لم تكن من ليالى الاشهر الحرم

মাসগুলি সব কাট্‌তো তাদের
হিসাব বিহীন শঙ্কা ত্রাসে
সংজ্ঞা তাদের আসতো ফিরে
যুদ্ধ বিহীন কয়টি মাসে।[৪৩]

১২৩

كانما الدين ضيف حل ساحتهم
بكل قرم الى لحم العدى قرم

মোজাহেদের অস্ত্র তলে
বিরোধিরা পড়লো এমন
মাংসভোজী অতিথগণে
মাংস দিয়ে পোষণ যেমন।

১২৪

يجر بحر خميس فوق سابحة
ترمى بموج من الابطال ملتطم

মোজাহেদের সাগর ধারা
অশ্ব পিঠে গর্ব ভরে,
ঊর্মি হেন চলতো ধেয়ে
সকল্লোলে পরস্পরে।

১২৫

من كل منتدب لله محتسب
يسطو بمستأصل للكفر مصطلم

সবাই তারা খোদার ডাকে
ছুটছে বেগে আত্মহারা,
আঘাত হেনে নাফরমানীর
মূলোৎপাটন করবে তারা।

১২৬

حتى غدت ملة الاسلام وهى بهم
من بعد غربتها موصولة الرحم

এই পথেই ন্যায়ের সেনা
দরিদ্রতার ভিতর দিয়ে,
মহান জাতি তুল্‌লো গড়ে
ঐক্য প্রেমের জোট পাকিয়ে।

১২৭

مكفولة ابدا منهم بخير اب
و خير بعل فلم تيتم و لم تئم

বীর মুজাহেদ তাদের পরেই
দ্বীন ইসলামের ছায়ার আসন
এতীম, স্বামী হারার মত,
আর হবেনা এ দ্বীন কখন।

১২৮

هم الجبال فسل عنهم مصادمهم
ماذا راى منهم فى كل مصطدم

ছিলেন তারা লড়াই মাঠে
দৃঢ় অটল পাহাড় যেন,
সত্যি কিনা জওয়াব কি দেয়
তাদেরে না শুধাও কেন?

১২৯

فسل حنينا وسل بدرا و سل احدا
فصول حتف لهم ادهى من الوخم

শুধাও 'হোনায়েন'আর 'বদরে'
'ওহোদ' মাঠে শুধাও এখন,**
বেদ্বীনগণের মরণ যেথায়
মহামারীর চাইতে ভীষণ।

১৩০

المصدرى البيض حمرا بعد ماوردت
من العدى كل مسود من اللمم

শুভ্র উজ্জল তরবারি সব
মুজাহেদের মুঠায় থেকে,
বেদ্বীনগণের মুণ্ড ছুঁয়ে
আস্‌তো চলে শোণিত মেখে।

১৩১

والكا تبين بسمر الخط ما تركت
اقلامهم حرف جسم غير منعجم

ধূসর বরণ বর্শাগুলি
শত্রু দেহের চর্ম পাতে,
আঁকতো লেখা রক্ত বরণ,
সেপাই সকল ক্ষিপ্ত হাতে।

১৩২

شاكى السلاح لهم سيما تميزهم
والورد يمتاز بالسيما من السلم

মোজাহেদের তুল্য ছিল
দুষমনেরও অস্ত্র শোভা,[৩৫]
কিন্তু ছিল মোজাহেদের
দীপ্ত আনন পুণ্য আভা।

বাবুল গাছে থাকলে কাঁটা
তাতেই সে আর হয়না গোলাব,
রং সুষমায় বাবুল হতে
গোলাব কতই ভিন্ন স্বভাব।

১৩৩

يهدى اليک رياح النصر نشرهم
فتحسب الورد فى الاكمام كل كم

খোদার আশীষ আনতো বয়ে
বেহেশত্‌ হতে পুণ্য সুবাস,
তার পরশে বীর সেনানীর
ছুটতো মুখে 'নূরের' উচ্ছাস।

১৩৪

كانهم فى ظهور الخيل نبت ربا
من شدة الحزم لا من شدة الحزم

পাহাড় চূড়ায় তরুর মত
অশ্ব সওয়ার বীর সেনানী।
অটল এমন পতন হবার
নেইকো ভীতি একটু খানি।

১৩৫

طارت قلوب العدى من باسهم فرقا
فما تفرق بين البهم والبهم

পরাক্রমে সেপাইগণের
শত্রু এমন আত্মহারা,
মেঘের ছায়া দেখলে ভয়ে
ব্যাঘ্র ভেবে ছুটতো তারা।

১৩৬

و من تكن برسول الله نصرته
ان تلقه الاسد فى اجامها تجم

ভাগ্যে যাহার জুটবে নবীর
পুণ্য ভরা আশীষ ধারা,
ব্যাঘ্র তারে বিবর মাঝে
ঢাকবে স্নেহের পরশ দ্বারা

১৩৭

وان ترى من ولى غير منتصر
به ولا من عدو غير منقصم

কেউ ছিলনা বন্ধু এমন
পায়নি নবীর আশীষ ধারা,
কেউ ছিলনা শত্রু নবীর
হয়নি পতন সর্বহারা।

১৩৮

احل امته فى حرز ملته
كالليث حل مع الاشبال فى اجم

মিল্লতেরই কেল্লা মাঝে
ঠাঁই দিল সে উম্মতে তাঁর
সিংহ যেমন শঙ্কাহারা
শাবকসহ গুহার মাঝার।

১৩৯

كم جدلت كلمات الله من جدل
فيه وكم خصم البرهان من خصم

নবুয়তির শত্রু কতো
করলো বিষম বিরোধিতা,
কোরআন তাদের করলো নাকাল
অহঙ্কারীর ভাঙলো মাথা।

১৪০

كفاك بالعلم فى الامى معجزة
فى الجا هلية والتاديب فى اليتم

অন্ধকারের সেই যুগেতে
পূর্ণ-প্রমাণ লও মোজেজার
অসাধারণ জ্ঞান মহিমা
আর এতিমের সে শিষ্টাচার।

কবির নিজের সম্পর্কে :—

১৪১

خدمته بمديح استقيل به
ذنوب عمر مضى فى الشعر والخدم

কাটিয়ে গেল জীবন আমার
দুনিয়াদারীর কাব্য গাথায়
তাই এনেছি নাত এ' তোমার
সেই গুনাহের ক্ষমার আশায়।

১৪২

اذ قلدانى ما تخشى عواقبه
كاننى بهما هدى من النعم

পরের তোষণ কাব্য কথন
মোর পরিণাম করলো ভীষণ
কসাইখানার যাত্রী ভীতু
হার-পরা সেই উটের মতন।

১৪৩

اطعت غى الصبا فى الحالتين وما
حصلت الا على الا ثام والندم

কাব্যে গাঁথায় পরের কাজে
ফুরিয়ে গেল জীবন আমার
হয়নি কিছু লাভের যোগাড
গুণাহ আর লান্‌ছনা ভার।

১৪৪

فيا خسارة نفسى فى تجارتها
لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم

হায় বেপারী কি সর্বনাশ,
ব্যবসা যে তোর করলি বিনাশ।
এই জগতের পুঁজির বদল
পরকালের করলি না আশ।

১৪৫

ومن يبع آجلا منه بعاجله
يبن له الغبن في بيع وفي سلم

সগু লাভের আশায় যে জন
হারায় পরিণামের পুঁজি,
মুনাফা আর পণ্য দুয়ের
সর্বনাশ সে লইল খুঁজি।

১৪৬

إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض
من النبي ولا حبلي بمنصرم

যদিও পাপের বোঝাই ভারী
হই নি তাতে মোটেই নিরাশ,
তাঁর শাফায়াত যায় নি টুটে
আশার বাঁধন হয়নি বিনাশ।

১৪৭

فإن لي ذمة منه بتسميتي
محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم

নবীর দ্বারে ভরসা আমার
তাঁহার প্রতিশ্রুতির ছলে,
ত্বরিয়ে যাব ভীষণ বিপদ
সেই "মোহাম্মদ" নামের বলে।

১৪৮

إن لم يكن في معادي آخذا بيدي
فضلا وإلا فقل يا زلة القدم

যদি রে তোর সেই ভরসা,
ত্বরিয়ে না লয় দয়ার হাতে,
উপায় কি তোর, বলিস্ তখন
"পাও কেন মোর পড়লো খাতে।"

১৪৯

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه
أو يرجع الجار منه غير محترم

হাত পেতে তাঁর দয়ার দ্বারে,
নিরাশ হওয়া সুদূর কথা,
তাঁর করুণার ভরসা করে,
লান্ছিত কেউ হয়নি তথা।

১৫০

و منذ الزمت افكارى مدا ئحه
و جدته لخلاصى خير ملتزم

যে দিন থেকে হৃদয় আমার
ঠাঁই পেয়েছে তাঁহার গীতি,
লাভ করেছি আশার আলো
হৃদয় যেন নেইকো ভীতি।

১৫১

و لن يفوت الغنى منه يد اتربت
ان الحيا ينبت الازهار فى الاكم

কেউ থাকেনা রিক্ত ফকির
পেলে নবীর দানের মুঠি,
নীরদ ঝরা সলীল ধারায়
পুষ্প যেমন উঠলো ফুটি।

১৫২

و لم ارد زهرة الدنيا التى اقتطفت
يدا زهير بما اثنى على هرم

'দিন্ হারেমের', নান্দী গেয়ে,
'যোহায়ের' পেল যে সুখ্যাতি,
সেই লালসা নেইকো আমার
গেয়ে নবীর পুণ্য গীতি।

১৫৩

يا اكرم الخلق مالى من الوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم

ও গো মহান হাবীব খোদার
তোমায় ছাড়া আর কে আছে ?
ক্ষুদ্র বিরাট সব বিপদে
লইব স্মরণ তাহার কাছে।

১৫৪

و لن يضيق رسول الله جاهك بى
اذا الكريم تجلى باسم منتقم

মহান বিচারপতি রূপে
যে দিন প্রভুর বিকাশ হবে,
আমার নবীর নাই কোন ভয়
সে দিন আমায় তরিয়ে লবে,

১৫৫

فان من جودك الدنيا وضرتها
ومن علومك علم اللوح والقلم

কল্যাণে তাঁর সৃষ্টি ধরা
আর ধরণীর সূত্র রেখা,
‘লওহ’ ‘কলম’ হতে তাঁহার
অসীম অগাধ জ্ঞান যে শেখা

১৫৬

يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت
ان الكبائر في الغفران كاللمم

হস্‌নে নিরাশ, পদস্খলন,
যতই রে তোর হোক না ভারী,
গুনা’র সাগর বিন্দু হবে,
পড়লে ক্ষমার সামনে তারি।

১৫৭

لعل رحمة ربي حين يقسمها
تاتي على حسب العصيان في القسم

গুনাহগারের প্রতি খোদার
উথ্‌লে যখন উঠ্‌বে দয়া,
হয়তো গুনার তুল্য ভাগে
জুট্‌বে ভাগে অধিক দয়া।

১৫৮

يارب واجعل رجائي غير منعكس
لديك واجعل حسابي غير منخرم

আমার আশার অনুজ্ঞি দাও
প্রভু তুমি পুরণ করে।
থাক ধারণা অটুট্ আমার
তোমার অসীম দয়ার প'রে।

১৫৯

والطف بعبدك في الدارين ان له
صبرا متى تدعه الاهوال ينهزم

আশীষ ঢাল দাসের প্রতি,
এই ভু-লোকে আর দ্যুলোকে,
ধৈর্য আমার পালায় ভেগে
বিপদ এসে যখন ঠোকে।

১৬০

وائذن لسحب صلوة منك دائمة
على النبي بمنهل ومنسجم

অবারিত তোমার দয়ার
পরদা খানি হোক বিমোচন,
আমার নবীর উপর নিতুই
অঝোর ধারায় হোক বরিষণ।

১৬১

والال والصحب ثم التابعين لهم
اهل التقى والنقى والحلم والكرم

স্বজন নবীর, আর সাহাবী
আর তাঁহাদের অনুগামী,
পুণ্য পরাণ মহৎ জনের
মাথায় আশীষ অসুক নামি।

১৬২

ما رنحت عذبات البان ريح صبا
واطرب العيس حادى العيس بالنغم

'বানের' শাখায় প্রভাত মলয়
বইবে য'দিন শিহর তুলি,
নকীব য'দিন উষ্ট্রকে তার
শুনায় মধুর কন্ঠ বুলি।"

কাসীদাতুল বুরদার টিকা

১। যু' সালাম— কণ্টকাকীর্ণ গাছ, বাবুল জাতীয় বৃক্ষ, এখানে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান।

২। এজাম—মদীনার প্রান্তস্থিত একটি পাহাড়।

৩। অর্থাৎ রসুলে করীম (দঃ) দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত।

৪। হযরত (দঃ) ক্ষুধার জ্বালায় সময়ে পেটে পাথর বাঁধিয়া কোমর সরল রাখিতেন।

৫। আবু ইমাম বাহেলী বর্ণিত একটি হাদিসে রহিয়াছে যে মক্কার সকল গিরি পর্বতকে আল্লাহ্ স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিণত করিয়া রসুলুল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করতঃ বলিয়াছিলেন— 'হে খোদা! আমি ইহা চাইনা আমি একদিন তৃপ্ত হইয়া খাইব আর একদিন উপবাস করিয়া তোমার নিকট ফরিয়াদ করিব"।

৬। হযরত (দঃ) বিশ্ব মানবের যেমন নবী ছিলেন তেমনই তিনি জিন জাতিরও নবী ছিলেন।

৭। শক্ত শিকল—কোরআন বা ইসলাম।

৮। রসুলের (দঃ) অগাধ জ্ঞান ভাণ্ডারের নিকট সকল নবীই মুখাপেক্ষী ছিলেন।

৯। রসুল (দঃ) ছিলেন জ্ঞান সমুদ্র। অন্যান্য নবীগণ তাঁহাদের পরিমিত জ্ঞান সীমায় অবস্থিত।

১০। বিশ্ব মানবতার রূপ তাঁহাতে বিকাশ লাভ করিয়াছে। আল্লাহ তাঁহাকে নিজ প্রিয় বন্ধু রূপে কবুল করিয়াছেন।

১১। খৃষ্টানগণ তাঁহাদের নবীকে 'খোদার পুত্র' ইত্যাদি বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। আমাদের নবীকে সেই পর্যায় তুলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা ব্যতীত অন্য সব প্রশংসাই তাঁহার জন্য বৈধ।

১২। মৃত অস্থি জীবন লাভ করিলে তাঁহা রসুলের মোজেজার অনুরূপই হইত।

১৩। তিনি যে ইসলাম জগতবাসীর সম্মুখে পেশ করিয়াছেন উহা দুর্বোধ্য বা জটীল নহে' উহা সরল এবং যুক্তি সহ।

১৪। সকল মহত্ব সত্বেও তিনি 'বশর'—তিনি মানুষ। মানবতার তিনি আদর্শ তবুও তিনি মানুষই।

১৫। তাঁহার অস্তিত্ব নবীকুলে সূর্যের ন্যায় এবং অন্যান্য নবীগণ গ্রহ নক্ষত্র সদৃশ।

১৬। তাঁহার বৈশিষ্টে তিনি একক, সৈন্য বাহিনীর মধ্যে সেনাপতির যে স্থান বিশ্ব মানব শ্রেণীতে তিনি সেই সেনাধীপ তুল্য।

১৭। রসূলের রওজা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া স্বীকৃত।

১৮। পারস্যের জ্যোতিষগণ বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা পারস্য সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন ইহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা রসূল (দঃ) আবির্ভাবের কাল সমুপস্থিত ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

১৯। 'সাওয়া' স্থান বিশেষের নাম।

২০। অগ্নিপূজক পারস্যবাসীর সহস্র বৎসর কাল যাবত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড সহসা নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

২১। রসূল (দঃ) আবির্ভাবের সময় দৈব শব্দ যোগে তাঁহার আগমন বার্তা ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় এমন একটী জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল যে, হযরত আমিনা সেই জ্যোতিতে পারস্য রাজ প্রাসাদ পর্যন্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন।

২২। হযরত (দঃ) এর জন্ম মুহূর্তে কাবা গৃহের প্রতিমাগুলি আপনা হইতে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল।

২৩। শয়তান ও জিন সমূহ রসূলুল্লাহর জন্ম তিথিতে ত্রাসান্বিত হইয়া ছুটাছুটি করিয়াছিল।

২৪। 'বদর' এবং 'হোনাইনের' লড়াইর মধ্যে রসূলুল্লাহ বে-দ্বীন সৈন্যগণের প্রতি ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

২৫। বৃক্ষ সমূহ রসূলুল্লাহর ইংগিতে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিত। ইহা তাঁহার একটি মোজেজা ছিল।

২৬। তপ্ত দুপুরে মরুভূমিতে মেঘমালা রসূল (দঃ) কে ছায়াদান করিয়া চলিত। সিরিয়ার বানিজ্য সফর কালে জনৈক খৃষ্টান পাদ্রী কর্তৃক ইহা দৃষ্ট হইয়াছিল।

২৭। চাঁদের সহিত হযরত (দঃ) হৃদয়ের যোগাযোগ ছিল বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। চাঁদ বিদীর্ণ হইয়াছিল। রসূলে-খোদার (দঃ) বক্ষও বিদারণ করা হইয়াছিল। চাঁদ সমগ্র পৃথিবীতে নির্মল আলো বিকীরণ করিতেছে। হযরত (দঃ) তাঁহার হৃদয়ের আলোতে বিশ্ব-ভূবন আলোকিত করিয়াছিলেন।

২৮। "সত্য ও ন্যায়" অর্থে এখানে হযরত (দঃ) কে এবং হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রঃ) কে বুঝাইতেছে।

২৯। 'সাওর' গিরিমুখে মাকড়সা এবং কবুতর বাসা বাঁধিয়াছিল। ইহাতে কাফের-গণের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা সেই গহ্বরে লুকাইয়া নাই।

৩০। স্বপ্ন যোগেও 'ওহী' অবতীর্ণ হইত। ইহা অস্বীকার্য নয়।

৩১। নবুয়তির প্রারম্ভে কিছুকাল স্বপ্ন যোগেই ওহী আসিত।

৩২। আরব দেশের প্রথা ছিল ব্যাপক নিমন্ত্রণের জন্য পাহাড়ের শীর্ষদেশে আগুন জ্বালাইয়া নিমন্ত্রণ ঘোষণা করা হইত।

৩৩। কোরআনের ভাষা বর্ণমালা, রূপ ও কলেবর সৃষ্টংস্থ, কিন্তু উহা খোদার বাণী হিসাবে চিরন্তন, অনাদী। উহা আল্লাহর সেফাত।

৩৪। আব-ই-কাওসার = হাসরের মাঠের একটি পানীয় পানির কূপ।

৩৫। 'হরম থেকে' 'হরম' পানে = প্রথম হরম মক্কাশরীফ, দ্বিতীয় 'হরম' বাইতুল মুকাদ্দস। ইহা মেরাজ রজনীর ঘটনা।

৩৬। সেই রজনীতে তিনি আল্লাহর পরম সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছিলেন।

৩৭। বয়তুল মুকাদ্দসে মসজিদে সকল নবীগণের 'রূহ' একত্রিত হইয়াছিলেন সেখানে তাঁহারা সকলে রসুলে করিম (দঃ) কে ইমাম করিয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন।

৩৮। মেরাজ রজনীর সেই নৈকট্য লাভের রহস্য তিনি ব্যতীত আর কাহারও নিকট জ্ঞাত নাই। তিনি একাই সেই মিলন রহস্যের অধিকারী।

৩৯। শাফায়াত করিবার অধিকার, কওসর কূপের অধিকার এবং মাকামে মাহামুদা'র মর্যাদালাভ তিনি ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

৪০। অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম। ইহা চিরস্থায়ী; অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইহা কখনও রহিত হইবে না।

৪১। শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়ার আমন্ত্রণ লাভ করিয়া আমরাও শ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত হইয়াছি।

৪২। ভীরু কাফেরগণ মুসলিম মোজাহেদগণকে এরূপ ভয় করিত যে, মৃতভূক পাখীর মুখে মাংস হরণ দেখিয়া তাহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিত যে কেন তাহারা মৃতভুকের শীকারে পরিণত হইল না।

৪৩। প্রাচীন আরবের যুদ্ধ-বিহীন মাসগুলি :

রজব, জিলকাদাহ, জিল-হাজ্জ ও মোহার্‌রম।

৪৪। 'বদর' হোনাইন ও 'ওহোদ' প্রভৃতি যুদ্ধ-ময়দানে বে-দ্বীন সৈন্যগণের মৃত্যু ঠিক যেন মহামারীর আকারে ঘটিয়াছিল।

৪৫। বেদ্বীন সৈন্যগণেরও অস্ত্রবল ছিল; কিন্তু মুসলিম মোজাহেদগণের মুখমণ্ডলে যে ঈমানের দীপ্তি ছিল—তাহা বেদ্বীনগণের ছিল না।

৪৬। হাদীসে বর্ণিত আছে:—'মোহাম্মদ' যাহার নাম হইবে সে কেয়ামতে সেই নামের কল্যাণে মুক্তিলাভ করিবে—কবি রসুলের সেই প্রতিশ্রুতির ভরসা করেন—কেননা তাঁহার নামের সহিত 'মোহাম্মদ' যুক্ত রহিয়াছে।

লেখক-পরিচিতি

॥ মুহম্মদ আবদুল হাই, এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন)
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ কাজী আবদুল মান্নান, এম. এ. (ঢাকা)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ মুহম্মদ সিদ্দিক খান, এম. এ., বি. এল. (রেঙ্গুন)
গ্রন্থাগারিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্, এম.এ. (কলিকাতা), পি-এইচ.ডি. (লণ্ডন)
অধ্যক্ষ, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম. এ. (কলিকাতা)
ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থ রচয়িতা ॥

॥ মুনীর চৌধুরী, এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড)
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

॥ নূরুদ্দীন আহ্মদ
মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা'
গ্রন্থের অনুবাদক ॥

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	মুদ্রিত পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
২৫	১২	বারিদায়	বারিদচয়
৫০	১৩	সম্পর্কেও	সম্পর্ককেও
ঐ	২২	চওড়া	চড়া
৩১	২৪	মুক্তি	মুক্ত
৩২	১৫	তিলক-রেখা	তিলক-রেখায়
ঐ	২১	দেবচিত	দেবোচিত
৩৩	৫	বিকারকে	বিকাশকে
৩৭	১	অভাব	অভাবে
৪৩	১২	ব্যবহার করে তাঁদের সাহিত্যকে কিম্ভূতকিমাকার করে তুলেন নি।	ব্যবহার করেছেন। জোর করে আরবী পারসী শব্দ ব্যবহার করে তাঁদের সাহিত্যকে কিম্ভূতকিমাকার করে তুলেন নি।
৯৪	২৪	যাদের	মোদের
৪৭	১২	স্মরণ	স্মরণ করে
৪৯	৭	মুক্তির	যুক্তির
৫৫	১১	মহাকাব্যের	আখ্যান কাব্যগুলোর
ঐ	১২	বিচিত্রক্রমেই	বিচিত্র প্রকাশে ক্রমেই
৭৫	২৭	সাহিত্য পত্রিকা	সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা
৯১	২২	অত্যস্ত	অত্যন্ত
১৩৯	১১	গন্থ,	গন্থ'
ঐ	১৫	মনচশ্চক্ষুকে	মনশ্চক্ষুকে
ঐ	২৭	রক্ষনশীলের	রক্ষণশীলের
২১৭	১৩	রে! বিরহী!	রে বিরহী!

A PHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY
OF
NASALS AND NASALIZATION IN BENGALI
BY
MUHAMMAD ABDUL HAI

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে
বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা যেখানে বিরল
বাংলা ভাষা সম্পর্কিত গবেষণার ইতিহাসে এ বইয়ের
প্রকাশ সে ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় পদক্ষেপরূপে
বিবেচিত হবে।
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে
বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে দু'বছর গবেষণার ফল
এ বইটি।
'ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়ে এ যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত,
উদাহরণের প্রাচুর্যের দিক দিয়ে তেমনি সমৃদ্ধ।
ধ্বনিগত, ধ্বনিতত্ত্বগত ও ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের
ভিন্নতায় এবং প্রয়োজন বোধে ঘনিষ্ঠ সহযোগে,
Palatogram ও Kymogrm এর ব্যবহারে বিশিষ্ট।'
মুখবন্ধে
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক
J. R. Firth
এই বইটিকে
'fresh and full of interest to all students
of Linguistics' বলে অভিহিত করেছেন।
এবং এর 'certain important features' এর
পরিচয় দিয়ে
সানন্দে
উৎসুক পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
দাম পনেরো টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—
॥ রেজিষ্ট্রার,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পূর্ব পাকিস্তান ॥

ভারতে :—
॥ ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়
৬/১, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন
কলিকাতা, ১২ ॥